শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

প্রথম ভাগ

স্বামী গম্ভীরানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

গ্রন্থকারের নিবেদন

দ্বিখণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থরচনার একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া কর্তব্য। দুই বৎসরাধিক পূর্বে স্বামী বামদেবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও সন্ন্যাসী ভক্তবৃন্দের জীবনীর একখানি পাণ্ডুলিপি আমাকে দেখিতে দেন। অতঃপর গুরুজনদিগের সহিত পরামর্শক্রমে স্থির হয় যে, উক্ত পরিকল্পনা পরিত্যাগ-পূর্বক একখানি নাতিবৃহৎ পুস্তক-প্রণয়ন আবশ্যক। বর্তমান প্রচেষ্টা ঐ সিদ্ধান্তের ফল। তথাপি ইহা স্বীকার্য যে, স্বামী বামদেবানন্দের প্রাথমিক উদ্যম এবং উৎসাহই ইহার ভিত্তিভূমি। এতদ্ব্যতীত তৎসংগৃহীত তথ্যগুলিও বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পত্র, প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদিদৃষ্টে অথবা প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার সহিত আলোচনাক্রমে এই পুস্তকে এমন অনেক ঘটনা সন্নিবদ্ধ হইয়াছে, যাহা অন্যত্র দুর্লভ। অধিকন্তু বিচ্ছিন্ন জীবনীগুলিতে ঘটনা ও সময়াদির যে অসামঞ্জস্য দেখা যায়, তাহা অনেকাংশে পরিহৃত হইয়াছে।

জীবনীগুলির পারম্পর্য স্থির করা সুকঠিন। তথাপি বিশৃঙ্খলার হস্তে আত্মসমর্পণ অবাঞ্ছনীয় বুঝিয়া আমরা প্রথমে সন্ন্যাসীদের জীবনী আলোচনা করিয়াছি। ইঁহাদের মধ্যে আবার পাঁচজন ঈশ্বরকোটির জীবনী প্রথমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সন্ন্যাসীদের পরে গৃহী ভক্তেরা ও সর্বশেষে স্ত্রীভক্তবৃন্দ স্থান পাইয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, ইহাতে উচ্চাবচত্বের প্রশ্নই উঠিতে পারে না—সে বিচার আমাদের পক্ষে অনধিকার চর্চা। আমরা 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'-রচয়িতার সহিত বলি—

ভক্তমধ্যে ছোট বড় জ্ঞান হয় ভ্রম।
সকলে আমার পূজ্য বুঝিবে এমন॥

ছোট বড় বিচারেতে নাহি অধিকার।
সকলে বুঝিবে রামকৃষ্ণ-পরিবার॥

ইহা সত্য হইলেও পাঠক হয়তো লক্ষ্য করিবেন যে, গ্রন্থ-রচনার সৌকর্যার্থে জীবনীগুলির পারম্পর্যবিষয়ে কতকটা শ্রীরামকৃষ্ণপ্রচারের ঐতিহাসিক গতি ও গুরুত্বকেই পরিমাপকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। আমাদের দুঃখ এই যে, উপাদানাভাবে এবং গ্রন্থকলেবরবৃদ্ধিভয়ে আরও কয়েকটি অমূল্য জীবনী ইহাতে সন্নিবিষ্ট হয় নাই।

এই পুস্তকরচনায় আমরা যে-সকল গ্রন্থ বা ব্যক্তি বিশেষের সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

গ্রন্থে কয়েকটি নাম সংক্ষেপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ও শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের নাম যথাক্রমে ঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজীরূপে উল্লিখিত হইয়াছে এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ,' 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' যথাক্রমে 'লীলাপ্রসঙ্গ,' 'কথামৃত' ও 'পুঁথি'রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

সর্বশেষে ভক্তদের চরণে প্রার্থনা এই,

কৃপাবিন্দু ভক্তবৃন্দ কর মোরে দান।
অধমেরে যুগলচরণে দেহ স্থান॥ (পুঁথি)

চৈত্র-সংক্রান্তি, ১৩৫৮

গম্ভীরানন্দ

ভূমিকা

শ্রীভগবান্ যখন জগতে অবতীর্ণ হন তখন তাঁহার দুইটি মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে। প্রথম—যুগপ্রয়োজন-অনুসারে ধর্মের গ্লানি-অপনোদন, দ্বিতীয়—রসাস্বাদন। এই উভয় কার্যের সহায়করূপে তিনি বিশেষ বিশেষ যোগ্য পাত্রকেও ধরাধামে আনয়ন করেন। ইঁহারা বিভিন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ করিলেও যথাসময়ে তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং তাঁহার কৃপায় অচিরে নিজ নিজ স্বরূপ ও তাঁহার সহিত তাঁহাদের চিরন্তন সম্বন্ধ অবগত হন। এইরূপে তাঁহারা নিজেরা তো কৃতকৃতা হনই, অধিকন্তু শ্রীভগবানের পূর্বোক্ত দ্বিবিধ লীলাপুষ্টির সহায়কও হন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ তাঁহার অঙ্গ, কেহ উপাঙ্গ, কেহ বা তাঁহার পার্ষদাদি। ভগবান্ যতদিন স্থূলদেহে সংসারে বিরাজমান থাকেন, ততদিন ইঁহারা তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিয়া থাকেন ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকেও আনন্দ দেন এবং তাঁহার উপদেশ-অনুসারে নিজ নিজ ধর্মজীবন গঠন করেন। পরে ভগবান্ স্থূলশরীর ত্যাগ করিলে ইঁহারা তাঁহার আরব্ধ লোককল্যাণকার্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়া যথাকালে স্ব স্ব ধামে প্রয়াণ করেন।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ ও বিশেষকৃপাপ্রাপ্ত ভক্তমণ্ডলীর সম্বন্ধেও পূর্বোক্ত কথা প্রযোজ্য। তাঁহারা যে এ পৃথিবীর লোক ছিলেন না, তাহা বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদের জীবনের ধারা ও অধ্যাত্মরাজ্যে দ্রুত, অভূতপূর্ব উন্নতির কথা পর্যালোচনা করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। অন্য দশজনের মতই সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিপালিত হইয়া, কিরূপে এক অন্তর্নিহিত প্রেরণায় তাঁহারা নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া—অধিকাংশ স্থলে যৌবনের প্রারম্ভেই—শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে উপনীত হন এবং তাঁহার দিব্যস্পর্শে এক নূতন রাজ্যের সন্ধান পান, তাহা

পাঠ করিলে অতিমাত্রায় বিস্মিত হইতে হয়। আরও বিস্মিত হইতে হয় শ্রীরামকৃষ্ণের লোক চিনিবার ও তাঁহাদিগকে নিজ নিজ ভাব-অনুযায়ী ধর্মরাজ্যে অগ্রসর করিয়া দিবার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া। ইহাতে স্ত্রী-পুরুষ, গৃহি-ত্যাগী, ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদির ভেদ ছিল না। দেহগত কোন বাহ্য আবরণ তাঁহার অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিকে প্রতিহত করিতে পারিত না। কোন কোন স্থলে জগন্মাতা তাঁহাকে পূর্ব হইতেই ইঁহাদের আগমনবিষয়ে জানাইয়া দিয়াছিলেন। এইজন্য সাধনকালের অবসানে তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত ঐসকল চিহ্নিত ভক্তের আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত মিলনপ্রসঙ্গে তাঁহার পূর্বোক্ত শক্তির ভূরি ভূরি নিদর্শন পাই। কিন্তু ঐসকল গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাগুলি প্রধানতঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবৎকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলিয়া আমাদের স্বভাবতঃই জানিবার ইচ্ছা হয়, তাঁহার অদর্শনের পর তাঁহার বিশেষ কৃপাপুষ্ট শিষ্য ও ভক্তগণ কিভাবে জীবনযাপন করিয়াছিলেন—তখনও তাঁহাদের বাক্য ও আচরণে ঠাকুরের মহিমাই পরিস্ফুট হইয়াছিল কি-না এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে তাঁহার অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী-গুলি সফল হইয়াছিল কি-না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ঠাকুরের সহিত মিলনের পূর্বেকার জীবনবৃত্তান্তও কিছু কিছু জানিবার কৌতূহল হয়। স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা' আমাদের এই উভয়বিধ আকাঙ্ক্ষারই অন্ততঃ আংশিক পূর্তি সাধন করে। এজন্য তিনি সকলের ধন্যবাদার্হ।

শ্রীরামকৃষ্ণের পদাশ্রিত বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। আবার তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও পরবর্তী জীবন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও ঘটনাবহুল। পক্ষান্তরে, ঠাকুর যাঁহাদিগকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে খুব উচ্চ স্থান দিয়াছিলেন, এমন কাহারও কাহারও জীবনের ইতিহাস একপ্রকার

অপরিজ্ঞাত বলিলেই চলে। দীর্ঘকাল ব্যতীত হওয়ায় এখন এমন কেহ জীবিত আছেন বলিয়া জানা নাই, যাঁহার নিকট ইঁহাদের সম্বন্ধে নূতন কিছু উপাদান সংগ্রহ করা চলে। কাজেই গ্রন্থকার প্রাপ্ত উপকরণসমূহের যতটুকু বা যতখানি যে-ভাবে সাজাইলে অল্প পরিসরের মধ্যে ইঁহাদের জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটিয়া উঠে, তৎপ্রতিই দৃষ্টি দিয়াছেন এবং ইহাতে অনেক পরিমাণে সফলতাও লাভ করিয়াছেন। ফলে পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে উহাতে বর্ণিত চরিত্রগুলির অলোকসামান্য মহত্ত্ব ও মাধুর্য সাধারণ মনকেও আপনা হইতে এক উচ্চ ভূমিতে লইয়া যায়। মনে হয় অনন্তভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণই যেন এই সকল শুদ্ধ আধার-অবলম্বনে লোককল্যাণার্থ নানাভাবে লীলা করিতেছেন—যেন তিনি ও তাঁহার ভক্তগণ বাস্তবিকই অভেদ। এই কারণেই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে ঠাকুরই রূপায়িত হইয়া আছেন। ভক্তগণের পরবর্তী জীবনের কতকগুলি ঘটনা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, দেহত্যাগের পরও শ্রীরামকৃষ্ণের ঐশী শক্তি তাঁহাদিগকে পরিচালিত করিতেছে এবং নানাপ্রকার আপদ-বিপদে সমভাবে রক্ষা করিতেছে। ইহাতে আমরা তাঁহার অপার্থিব ভক্ত-বাৎসল্যের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হই এবং তাঁহারই চরণে নিজেদের উৎসর্গ করিতে অধিকতর উদ্বুদ্ধ হই।

সাগরগামিনী বিশালকায়া নদী যেমন বহু শাখা বিস্তার করিয়া বিপুল ভূভাগকে শস্যশালী ও অসংখ্য জীবকে জলদানে তৃপ্ত করে, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণও সেইরূপ লোকচক্ষুর অগোচর হইয়াও এই অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্য দিয়া তাঁহার সর্বধর্মসমন্বয়রূপ যুগপ্রয়োজনসাধন ও ত্রিতাপদগ্ধ মানবের শান্তিবিধান করিয়াছেন। অন্য কথায়, ঠাকুর ছিলেন যেন এক বিরাট আধ্যাত্মিক বিদ্যুদাধার, আর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ যেন ঐ অমিত তেজের সঞ্চরণের উপযোগী তারসমূহ। ইঁহাদের বহুমুখী শক্তির উৎস তিনিই; সকলেই এক বিশেষাধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার

দিব্যসংস্পর্শে যে অপূর্ব আধ্যাত্মিক বিকাশ ইঁহাদের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা অল্পকালস্থায়ী না হইয়া আজীবন নরনারায়ণের সেবায় অর্পিত হইয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। সকলের কর্মক্ষেত্র অবশ্য সমান ছিল না এবং হইবার কথাও নহে; কারণ তাঁহাদের জাগতিক জ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষা একরূপ ছিল না। ইঁহাদের মধ্যে বিদ্যাবৈভব ও গুণগরিমায় সকলের শীর্ষস্থানীয় নরেন্দ্রনাথ বা জগদ্বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দও যেমন ছিলেন, তেমনি আবার আভিজাত্যের সম্পর্কশূন্য নিরক্ষর লাটু মহারাজ বা স্বামী অদ্ভুতানন্দও ছিলেন। ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবহরূপে স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতের চিন্তাধারায় একটি ওলটপালট আনিয়া দিয়াছেন—যাহার পূর্ণবিকাশ হইতে এখনও অনেক দেরি, আর লাটু মহারাজ তাঁহার ঈশ্বরীয়ভাববিভোর জীবন ও গ্রাম্য কথাবার্তা দ্বারা, সংখ্যায় তেমন বেশী না হইলেও, যাঁহারাই শান্তিলাভের আশায় তাঁহার নিকট গিয়াছেন তাঁহাদেরই মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। এইরূপে ইঁহাদের ব্যক্তিগত কার্যকলাপে যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়ায় সত্যনিষ্ঠা, ভক্তি-বিশ্বাস, ত্যাগ-তপস্যা, সহিষ্ণুতা, উদারতা, ভ্রাতৃপ্রেম এবং শিবজ্ঞানে জীবসেবা প্রভৃতি দেবদুর্লভ গুণরাজি সকলেরই জীবনে প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-গগনের এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে বড় ছোট বিচার করা আমাদের বুদ্ধির বহির্ভূত; আমাদের নিকট সকলেই অতি মহান্, সকলেই আদর্শস্থানীয়। ইঁহাদের চরিত্রের অনুধ্যানে এবং ইঁহাদের উপদেশ-পালনেই আমাদের পুরুষার্থসিদ্ধি। পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ মাঝে মাঝে বলিতেন, "ঠাকুর তো অনেক দূরের কথা, আগে আমরা স্বামীজীকে বুঝি, তারপর ঠাকুরকে বুঝব।" বাস্তবিকই ইঁহাদের জীবন শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের ভাষ্যস্বরূপ। ইঁহাদের মধ্য দিয়াই আমরা সেই পুরুষোত্তমের লোকোত্তর মহিমার কথঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারি। যিনি ইঁহাদের, বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের, ন্যায় শক্তিশালী

ব্যক্তির মনকে কাদার তালের মত ইচ্ছানুযায়ী আকার দিতে পারিতেন, তিনি না জানি কত বড় শক্তিমান পুরুষ ছিলেন! স্বামী বিবেকানন্দের ও অন্য কাহারও কাহারও সম্বন্ধে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সফল হইতে দেখিয়া আমাদের ঐ ধারণা আরও দৃঢ় হয়।

গ্রন্থকার এই মূল্যবান পুস্তকখানি-প্রণয়নে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে একই ঘটনার বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, সেখানে পরস্পরবিরোধী বিবরণগুলির মধ্যে যেটি গ্রহণীয় তাহাই তিনি বিচারপূর্বক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে উল্লিখিত কতক বিষয় অন্য পুস্তক বা প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও ইহাতে অনেক নূতন তথ্যেরও সমাবেশ আছে। পুস্তকখানির ভাষা সরল অথচ সরস। বঙ্গভাষায় এরূপ একখানি পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা' বাঙ্গলার ঘরে ঘরে বিরাজ করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতার ধর্ম-বৃদ্ধির সহায় হউক, ইহাই ভগবৎসকাশে প্রার্থনা।

বেলুড় মঠ
১লা বৈশাখ, ১৩৫৯

মাধবানন্দ

সূচীপত্র

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ একদা বলিয়াছিলেন, "একদিন দেখছি, মন সমাধিপথে জ্যোতির্ময় বর্ত্মে উচ্চে উঠে যাচ্ছে। চন্দ্রসূর্যতারকামণ্ডিত স্থূল জগৎ সহজে অতিক্রম করে উহা ক্রমে সূক্ষ্ম ভাবজগতে প্রবিষ্ট হল। ···নানা দেবদেবীর ভাবঘন বিচিত্র মূর্তিসমূহ পথের দুই পার্শ্বে অবস্থিত দেখতে পেলাম। ··· মন ক্রমে অখণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ করল। সাত জন প্রবীণ ঋষি সেখানে সমাধিস্থ হয়ে বসে আছেন। জ্ঞান ও পুণ্যে, ত্যাগ ও প্রেমে ইঁহারা মানব তো দূরের কথা, দেবদেবীকে পর্যন্ত অতিক্রম করেছেন। বিস্মিত হয়ে দেখি, সম্মুখে অবস্থিত অখণ্ডের ঘরের ভেদমাত্র-বিরহিত, সমরস জ্যোতির্মণ্ডলের একাংশ ঘনীভূত হয়ে দিব্য শিশুর আকারে পরিণত হল। অদ্ভুত দেবশিশু অসীম আনন্দপ্রকাশে অন্যতম ঋষিকে বলতে লাগল—'আমি যাচ্ছি, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।' ··· নরেন্দ্রকে দেখবা মাত্র বুঝলাম, এ সেই ব্যক্তি।" বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণই ধরাধামে অবতরণের পূর্বে অখণ্ডের গৃহে সচ্চিদানন্দের ঘনীভূত জ্যোতির্ময় বিগ্রহ দেবশিশুরূপে শরীরধারণ করিয়াছিলেন এবং সাগ্রহে ধ্যাননিষ্ঠ অন্যতম যে ঋষির গলে সাবলীল স্বীয় কোমল বাহুদ্বয় বেষ্টন-পূর্বক তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিয়া ধরাধামে লীলাসহচররূপে আগমনের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন, তিনিই বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ। এই যুগ্ম আত্মাই যুগে যুগে নারায়ণ ও নর-ঋষির অবতাররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্মসংস্থাপন করেন।

কলিকাতা মহানগরীর সিমুলিয়া পল্লীর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ দত্ত মহাশয় সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার পিতা রামমোহন দত্ত আইনব্যবসায়ী ছিলেন এবং স্বোপার্জিত অর্থে দত্ত-বংশকে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিলেন। দুর্গাচরণ কিন্তু ভোগে মগ্ন না হইয়া পঁচিশ বৎসর বয়সে স্ত্রী ও একমাত্র শিশুপুত্র বিশ্বনাথকে ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত পিতারই ন্যায় বিশ্বনাথেরও নানা ভাষায় ব্যুৎপত্তি দেখা গেল। ইতিহাসেও তাঁহার প্রবল অনুরাগ জন্মিল। কিন্তু দুর্গাচরণের ন্যায় সংসারবিমুখ না হইয়া তিনি বরং সংসারীই হইলেন। এটর্নীর ব্যবসায়ে তাঁহার প্রচুর আয় ছিল। রন্ধনে তিনি পারদর্শী ছিলেন এবং নিত্য নূতন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ও অপরকে ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। দেশভ্রমণ ছিল তাঁহার আর একটি শখের জিনিস। এই ভ্রমণব্যপদেশে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে উচ্চ স্তরের মুসলমান সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া তিনি তৎপ্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। ধর্মসম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ছিল এই যে, ঈশার বাইবেল এবং হাফেজের বয়েৎসমূহের মধ্যে যে সত্য নিহিত রহিয়াছে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর তত্ত্ব আর কোথাও নাই। বিশ্বনাথের পত্নী ভুবনেশ্বরীও অনুরূপ বুদ্ধিমতী, কার্যকুশলা ও সুরূপা ছিলেন; অধিকন্তু ধর্মে তাঁহার অনুপম অনুরাগ ছিল। সুবৃহৎ সংসার তাঁহার তত্ত্বাবধানে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে পূর্ণ ছিল। এই সকল কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সূচীকর্মাদি-শিল্পাভ্যাস করিতেন এবং রামায়ণ-মহাভারতাদি পাঠ করিতেন। বিবিধ উপায়ে তাঁহার জ্ঞানের ভাণ্ডার সুসমৃদ্ধ হইয়াছিল এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিলেই মনে হইত যে, এই মিতভাষিণী মহীয়সী মহিলা অতি সুশিক্ষিতা, সুরুচিসম্পন্না ও রাজরানীতুল্যা তেজস্বিনী। তাঁহার প্রকৃতি ছিল গম্ভীর অথচ অমায়িক।

ভগবান এই দম্পতিকে চারিটি কন্যা দিয়াছিলেন; তন্মধ্যে দুইটি

অল্পবয়সে গতায়ু হয়। এই কারণে এবং পুত্রমুখ-দর্শনে বঞ্চিত থাকায় মাতা ভুবনেশ্বরীর চিত্তে শান্তি ছিল না। তিনি সকাল-সন্ধ্যায় হৃদয়ের এই বেদনা দেবতার চরণে নিবেদন করিতেন। অতঃপর অনেক ভাবিয়া কাশীধামে তাঁহাদের এক বৃদ্ধা আত্মীয়াকে পত্র লিখিলেন, তিনি যেন বংশরক্ষার জন্য ৺বীরেশ্বর শিবের মন্দিরে যাইয়া প্রত্যহ পূজা দেন ও অভীপ্সিত বর প্রার্থনা করেন। পূজা চলিতে লাগিল—এদিকে ভুবনেশ্বরীও নিত্য শিবপূজা ও শিবধ্যানে মগ্না রহিলেন। অবশেষে সুদীর্ঘ তপস্যার পরে একদিন ভুবনেশ্বরী ৺যোগিরাজ মহাদেবের ধ্যানে সমস্ত দিবস দেবালয়ে যাপনান্তে রাত্রিতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিদ্রাযোগে স্বপ্ন দেখিলেন, দেবাদিদেব রজতগিরিনিভ বরবপু শঙ্কর পুত্ররূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। তদবধি তাঁহার শ্রীবদনের অপূর্ব শোভা ও অপার্থিব জ্যোতিঃ-দর্শনে চমৎকৃত হইয়া প্রতিবাসীরাও বলিতে লাগিলেন যে, এই বারে শিব তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। যথাকালে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী (বঙ্গাব্দ ১২৬৯, ২৯শে পৌষ, পৌষ-সংক্রান্তি, কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি) সোমবার সূর্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পরে (৬টা ৪৯ মিনিটে) ভুবনেশ্বরীর ক্রোড় আলোকিত করিয়া ভুবনবিজয়ী নবসূর্য উদিত হইলেন। স্বপ্ন-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া জননী পুত্রের নাম রাখিলেন বীরেশ্বর। শুভ অন্নপ্রাশনের সময় তাঁহার নাম হইল নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রই ভবিষ্যতের প্রথিতযশা স্বামী বিবেকানন্দ। স্বগৃহে কিন্তু ক্ষুদ্রকায় বীরেশ্বর 'বিলে' নামেই পরিচিত হইলেন।

সুদর্শন বালক পরিবারের সকলের আদরে দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি বড়ই অশান্ত হইয়া পড়িলেন ; তাঁহার দৌরাত্ম্যে সকলেই অস্থির—ভয়প্রদর্শন, ভর্ৎসনা, শাসন কিছুতেই কিছু হয় না। পুত্রের ক্রোধ ও অভিমান দেখিয়া মাতা

ভুবনেশ্বরী খেদপূর্বক বলিলেন, "অনেক মাথা খুঁড়ে শিবের কাছে একটি ছেলে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি পাঠিয়েছেন একটি ভূত।" অনেক ভাবিয়া তিনি অবশেষে সন্তানকে বশে আনিবার কৌশল আবিষ্কার করিলেন—ক্রোধপ্রশমনার্থে তিনি অনেক সময় তাঁহার মস্তকে জল ঢালিয়া দিতেন কিংবা ভয় দেখাইয়া বলিতেন, "যদি দুষ্টুমি করিস, তবে শিব আর তোকে কৈলাসে যেতে দেবেন না।" আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইহা মহৌষধের ন্যায় ফলপ্রদ হইত।

পিতামহ দুর্গাচরণের সহিত দেহগত সাদৃশ্যদর্শনে অনেকে ভাবিতেন যে, দুর্গাচরণই দেহত্যাগান্তে আবার নরেন্দ্ররূপে আসিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, বালকের মনও ছিল পিতামহের অনুরূপ। বাটীতে সাধু-সন্ন্যাসীর আগমনমাত্র নরেন্দ্র তাঁহাদের দিকে ছুটিতেন এবং প্রার্থিত দ্রব্য অবিলম্বে গৃহ হইতে আনিয়া দিতেন—কাহারও অনুমতির অপেক্ষা করিতেন না কিংবা কোন বাধা শুনিতেন না। একবার নববস্ত্র-পরিহিত নরেন্দ্র সগর্বে সকলকে স্বীয় পরিচ্ছদ দেখাইতেছেন, এমন সময় দ্বারে শব্দ উঠিল 'নারায়ণ হরি'। সাধুর আহ্বান-শ্রবণমাত্র নরেন্দ্র তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সাধু পরিধেয়ের প্রয়োজন জানাইলে অম্লানবদনে স্বীয় নববস্ত্র তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিলেন। তাদৃশ ক্ষুদ্র বসন পরিধান করা অসম্ভব বলিয়া সাধু উহা মস্তকে বন্ধনপূর্বক বিদায় লইলেন। সাধুদের প্রতি বিশ্বনাথের শ্রদ্ধার অভাব না থাকিলেও এই ঘটনার পর হইতে গৃহে সাধুসমাগমকালে নরেন্দ্র নিকটে যাইতে পাইতেন না। কৌশলী বালক কিন্তু তাঁহাদের উপস্থিতির আভাস পাইলেই অপরের অজ্ঞাতে উপর হইতে বস্ত্রাদি ফেলিয়া দিতেন এবং অভিভাবকের বুদ্ধিকে পরাস্ত করিতে পারিয়াছেন বুঝিয়া আনন্দ ও আত্মপ্রসাদে উৎফুল্ল হইতেন। তাঁহার দৌরাত্ম্যে অস্থির জ্যেষ্ঠা ভগিনীরা তাঁহাকে ধরিতে অগ্রসর হইলে শুচি-অশুচিতে সমবুদ্ধি নরেন্দ্র

পলায়নপূর্বক নরদমা বা আস্তাকুঁড়ে গিয়া দাঁড়াইতেন এবং মৃদু হাস্য-সহকারে মুখভঙ্গী করত বলিতেন, "ধর না, ধর না।" জীবজন্তুর প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল। বানর, ছাগল, ময়ূর, কাকাতুয়া, পায়রা ও কতকগুলি বিলাতী ইঁদুর তাঁহার প্রিয় ছিল। একটি গাভী তাঁহার যথেষ্ট আদর পাইত। পিতার অশ্বগুলিকেও তিনি ভালবাসিতেন। অশ্বযানের অগ্রভাগে উচ্চে অধিষ্ঠিত কোচোয়ান সশব্দে চাবুক ঘুরাইয়া সবেগে তেজস্বী অশ্বযুক্ত শকটগুলিকে কলিকাতার সর্ব্বত্র পরিচালিত করিতেছে দেখিয়া তাঁহারও মনে ঐরূপ স্বাধীন সবল সারথি হইবার ইচ্ছা জাগিত। একদিন মাতৃক্রোড়ে বসিয়া অশ্বযানে চলিতে চলিতে তিনি পিতার প্রশ্ন শুনিলেন, "বিলে, তুই বড় হয়ে কি হবি বল দেখি?" ইতস্ততঃ না করিয়াই তিনি বলিলেন, "সহিস কিংবা কোচোয়ান।" নরেন্দ্রের বহু সময় অশ্বশালায়ই কাটিত—চঞ্চল সবল বালকের চক্ষে দুরন্ত অশ্বকে বশে রাখা একটা চিত্তাকর্ষক ব্যাপার নিশ্চয়!

রামায়ণে রাম-সীতার কাহিনী পাঠ করিয়া তাঁহার চিত্ত তাঁহাদের চরণে অবনত হইয়াছিল। একদিন প্রতিবাসী এক ব্রাহ্মণছেলের সাহায্যে বাজার হইতে রামসীতার মৃন্মূর্তি আনাইয়া বাড়ির রুদ্ধদ্বার চিলের ঘরে পূজায় লাগিয়া গেলেন। উভয় বালক ধ্যানস্থ। এদিকে সর্বত্র অনুসন্ধান চলিতেছে—নরেন্দ্র কোথায়? কোথাও তাঁহাকে না পাইয়া অবশেষে সকলে ছাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। দ্বার অর্গলবদ্ধ; অতএব বল-প্রয়োগে উহা উদ্ঘাটিত হইল। ব্রাহ্মণবালক অমনি ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইল। পরন্তু আগন্তুকদের সম্মুখে এ কী দৃশ্য—নরেন্দ্র ধ্যানস্তিমিত, বাহিরে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই!

এত শ্রদ্ধার রামসীতাও কিন্তু অধিক দিন নরেন্দ্রের চিত্তে স্থান পাইলেন না; কারণ পিতার আস্তাবলের সবজান্তা সহিস জানাইয়া দিল, "বিবাহ

করা বড় খারাপ।” ইহাতে নরেন্দ্র মহা সমস্যায় পড়িলেন—একদিকে মায়ের নিকট তিনি শুনিয়াছেন রামসীতার অলৌকিক প্রেমকাহিনী, যাহা যুগ যুগ ধরিয়া হিন্দুমাত্রকে ঘোর সংসারে পথ প্রদর্শন করিয়াছে, আর অন্য দিকে আজ এই সংসারতাপক্লিষ্ট বিশ্বস্ত সহিসের মুখে এরূপ নিদারুণ সত্য! সাশ্রুনয়নে নরেন্দ্র মাতার নিকট স্বীয় সমস্যা জ্ঞাপন করিলেন। মাতা সস্নেহে হাসিয়া বলিলেন, “বিলে, ওতে আর কি হয়েছে? তুই শিব-পূজা কর।” সন্ধ্যার অন্ধকারে নরেন্দ্র চিলের ঘরে উঠিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে সীতারামের মূর্তি নিরীক্ষণ করিলেন; অতঃপর দীর্ঘনিঃশ্বাসসহকারে উহা তুলিয়া লইয়া নীচে রাস্তায় ফেলিয়া দিলেন—ঊর্ধ্ব হইতে নিক্ষিপ্ত মৃৎপুত্তলিকা রাজপথের কঠিন আঘাতে সশব্দে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। পরদিন শ্মশানবাসী সন্ন্যাসী শিব আসিয়া রামসীতার আসনে বসিলেন।

শিবচিন্তায় মগ্ন নরেন্দ্রকে একদিন এক খণ্ড গৈরিকবস্ত্র কোমরে কৌপীনের মত পরিধানপূর্বক ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া জননী প্রশ্ন করিলেন, “এ কিরে?” বালসন্ন্যাসী সোল্লাসে জানাইলেন, “আমি শিব হয়েছি।” আবার বালক হইলেও ধ্যানপরায়ণতা ছিল তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। তিনি প্রাচীনদের মুখে শুনিয়াছিলেন, মুনি-ঋষিরা ধ্যানে এতই মগ্ন হন যে, জটা দীর্ঘায়িত হইয়া ক্রমে বটের শিকড়ের ন্যায় ভূমিতে প্রবেশ করে। ধ্যানে বসিয়া নরেন্দ্র তাই লক্ষ্য করিতেন, তাঁহারও ঐরূপ হইতেছে কি-না। ধ্যানকালে জটা ভূমিতে প্রবেশ না করিলেও মন কিন্তু কোন্ এক অজ্ঞাতরাজ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিত। একদিন ধ্যানমগ্ন নরেন্দ্রের পার্শ্বে ভীষণাকার গোক্ষুর সর্প ফণা বিস্তারপূর্বক দুলিতেছে দেখিয়া সঙ্গের বালক সন্ত্রাসে চীৎকার করিয়া উঠিল। প্রত্যুত নরেন্দ্র বাহ্য-সংজ্ঞাহীন! চীৎকারশ্রবণে তথায় সমবেত বয়স্করা সে দৃশ্য-সন্দর্শনে একই কালে ভয় ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে সর্পটি

আপনা হইতেই চলিয়া গেলে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পঠদ্দশায় আর একদিন তিনি রুদ্ধকক্ষে ধ্যানে বসিয়া আছেন—অকস্মাৎ মুণ্ডিতমস্তক এক সৌম্যশান্ত জ্যোতির্ময় পুরুষ দণ্ডকমণ্ডলুহস্তে সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি যেন বলিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু প্রশান্ত মূর্তিকে কিছুকাল দেখিয়াই নরেন্দ্র ভয়ে গৃহত্যাগ করিলেন। হয়তো সেই দিন তিনি বুদ্ধদেবের দর্শন পাইয়াছিলেন। নরেন্দ্রের নিদ্রাও ছিল এক অলৌকিক ব্যাপার! তিনি অভ্যাসমত উপুড় হইয়া শুইতেন। ঐ অবস্থায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেই এক জ্যোতির্বিন্দু সম্মুখে উপস্থিত হইত এবং নানা বর্ণে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া অকস্মাৎ ফাটিয়া যাইত ও চতুর্দিক আলোকে পরিপূর্ণ করিত। সেই আলোকসমুদ্রে ডুবিতে ডুবিতে নরেন্দ্র সুষুপ্তিতে মগ্ন হইতেন। পরমহংসদেব পরে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, উহা ধ্যানসিদ্ধের লক্ষণ।

ছয় বৎসর বয়সে নরেন্দ্রের পাঠশালায় যাওয়া আরম্ভ হইল; কিন্তু দুই-চারি দিনের মধ্যেই তাঁহাকে সহপাঠীদের নিকট হইতে বহু অভিধান-বহির্ভূত শব্দ আয়ত্ত করিতে দেখিয়া পিতা বিদ্যালয়ে গমন বন্ধ করিলেন। অতঃপর গৃহশিক্ষকের অধীনেই শিক্ষা চলিতে লাগিল। নরেন্দ্রের পাঠাভ্যাসের রীতি ছিল অদ্ভুত। তিনি নিমীলিত নেত্রে শুইয়া থাকিতেন, আর গুরুমহাশয় পাঠ বলিয়া যাইতেন—ইহাতেই তাহা অধিগত হইয়া যাইত। এতদ্ব্যতীত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পিতা তখন নরেন্দ্রের বাটীতেই বাস করিতেন এবং নরেন্দ্র তাঁহার নিকট শয়ন করিতেন। কঠিন বিষয় বাল্যকালে সহজে মুখস্থ হয়—এই ধারণার ফলে বৃদ্ধ দত্ত মহাশয় প্রতিরাত্রে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের কিয়দংশ মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন। এইরূপে এক বৎসরে নরেন্দ্রনাথ পুস্তকখানির অধিকাংশ আয়ত্ত করেন।

নেতৃত্বের ভাব তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। বালকদের সহিত রাজা-প্রজা-ক্রীড়ায় তিনি রাজা সাজিয়া মন্ত্রী সেনাপতি প্রভৃতিকে বিভিন্ন কার্যে নিয়োগ করিতেন। দস্যুর বিচারে বসিয়া সান্ত্রীদিগকে আদেশ দিতেন, "দুরাত্মার মুণ্ডচ্ছেদ কর।" দুরাত্মা তখনই তীরবেগে দত্তবাড়ির সদর দরজা পার হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবিত হইত—পশ্চাতে রক্ষীরাও ছুটিত। ইহাতে দ্বিপ্রহরে নিদ্রাতুর ভৃত্যেরা চমকিত হইয়া উঠিত এবং বালকদের দৌরাত্ম্যনিবারণের জন্য তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিত। এদিকে সিংহাসনে উপবিষ্ট নরেন্দ্রের নিকট সমস্ত কৌতুকটিই বড় উপভোগ্য হইত।

আবার সঙ্গীদের প্রতি তাঁহার সখ্যও শতভাবে প্রকাশ পাইত। একবার চড়কতলা হইতে মহাদেব ক্রয় করিয়া জনৈক বন্ধুসহ ফিরিতেছেন। প্রায় অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। অকস্মাৎ একখানি ঘোড়ার গাড়ি দ্রুতবেগে আসিয়া পড়িল। নরেন্দ্র পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন, সঙ্গীটি প্রায় অশ্বপদতলে। অমনি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব-সহায়ে মহাদেবকে বাম কক্ষপুটে স্থাপনপূর্বক দ্রুতবেগে বালকের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে টানিয়া লইয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিলেন। নরেন্দ্রের যখন সাত-আট বৎসর বয়স, তখন তিনি সদলবলে মেটেবুরুজে লক্ষ্ণৌ-এর নবাব ওয়াজিদ্ আলি শা-র পশুশালা দেখিবার জন্য চাঁদপালঘাটে নৌকায় উঠেন। ফিরিবার পথে নৌকাভ্রমণে অনভ্যস্ত একটি বালক নৌকায় বমি করিয়া ফেলিলে মাঝি বালকদিগকে উহা স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়া দিতে বলে; কিন্তু তাহারা পয়সা দিয়া বলে, সে যেন উহা অপরের দ্বারা করাইয়া লয়। পরন্তু মাঝি কটূক্তি করিতে থাকে এবং ঘাটের নিকটে আসিয়া ভয় দেখায় যে, ঐ কার্যসমাধা না হইলে নৌকা তীরে ভিড়াইবে না। বচসা প্রায় মারামারিতে পরিণত হইতে যাইতেছে, এমন সময়ে সর্বকনিষ্ঠ নরেন্দ্র এক

সুযোগে লম্ফপ্রদানপূর্বক তীরে অবতরণ করিলেন এবং দুইজন শ্বেতকায় সৈনিক ময়দানের দিকে যাইতেছে দেখিয়া ছুটিতে ছুটিতে তাহাদের নিকট গিয়া হস্তধারণপূর্বক আকার-ইঙ্গিতে ও ভাঙ্গা ইংরেজীতে নিজেদের বিপদ জ্ঞাপন করিলেন। পল্টনের গোরাদ্বয় ঐ সুন্দর ক্ষুদ্র বালকের আকর্ষণে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল এবং হস্তস্থিত বেত্র কম্পিত করিয়া বালকদিগকে মুক্তিদানের আদেশ জানাইল। মাঝি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বালক-দিগকে তীরে উঠাইয়া দিল।

বিশ্বনাথ বাবুর নিকট অনেক মক্কেল আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মুসলমান মক্কেলকে নরেন্দ্র চাচা বলিতেন। নরেন্দ্র চাচার বিশেষ স্নেহপাত্র ছিলেন এবং তাহার নিকট মিষ্টান্নাদি পাইতেন। হিন্দু মক্কেলদের ইহা অনুমোদিত না হইলেও উদারপ্রকৃতি বিশ্বনাথ ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু তাহা হইলেও দেশাচারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তিনি স্বীয় বৈঠকখানায় বিভিন্ন জাতির জন্য পৃথক হুকা রাখিতেন। নরেন্দ্রের নিকট ইহা একটি সমস্যাবিশেষ ছিল। তিনি যখন অনুসন্ধানক্রমে জানিলেন যে, ভিন্ন জাতির হুকায় ধূমপান করিলে জাতিনাশ হয়, তখন সমস্যাটি আরও জটিল হইয়া উঠিল। একদিন তিনি ইহার তাৎপর্য-পরীক্ষার জন্য অপরের অনুপস্থিতিতে অভিনিবেশসহকারে হুকাগুলি একটির পর একটি টানিতে লাগিলেন। এমতাবস্থায় পিতা সেখানে সহসা প্রবেশান্তে পুত্রের কাণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কচ্ছিস রে?" পুত্র উত্তর দিলেন, "দেখছি জাত না মানলে কি হয়।" পিতা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন এবং "বটে রে দুষ্টু!" বলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

আর একদিন লুকোচুরি-খেলার সময়ে নরেন্দ্রনাথ দোতলার সিঁড়ি হইতে গড়াইতে গড়াইতে নীচে পড়িয়া জ্ঞান হারাইলেন। অনেক চেষ্টার ফলে এক ঘণ্টা পরে চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে ডাক্তার অভিমত প্রকাশ

করিলেন যে, আঘাত অতি গুরুতর হইলেও জীবন-নাশের আশঙ্কা নাই। কিন্তু ইহার ফলে তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুর ঠিক উপরে একটি ক্ষতচিহ্ন চিরজীবনের জন্য রহিয়া গেল। পরমহংসদেব পরে বলিয়াছিলেন, "যদি সেদিন ঐরকমে ওর শক্তি না কমে যেত তা হলে পৃথিবীটা একেবারে ওলট-পালট করে ফেলত।"

সপ্তম বর্ষ বয়সে মেট্রোপলিটান স্কুলে প্রবেশানন্তর খেয়ালী বালক ইংরেজী শিক্ষায় সম্পূর্ণ অসম্মতি জানাইয়া বলিলেন, "ও বিদেশী ভাষা, ও শিখব কেন?" সকলে নানা ভাবে বুঝাইয়াও বিফলমনোরথ হইলেন; কিন্তু মাস কয়েক পরে তিনি নিজেই আগ্রহসহকারে পাঠ আরম্ভ করিলেন এবং অচিরেই বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিলেন। পাঠাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে অল্প বয়সেই তিনি মুষ্টিযুদ্ধ ও শরীরচর্চায়ও পারদর্শী হইয়াছিলেন। বালকদের নায়করূপে তিনি তাহাদের মারামারিতে মধ্যস্থতা করিতেন এবং পুরস্কারস্বরূপ পাইতেন উভয়পক্ষের অনভিপ্রেত আঘাত। আবার আপদ-বিপদেও তিনি তাহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইতেন। একবার সমবয়স্কদের সহিত কেল্লা দেখিতে গিয়াছেন, অকস্মাৎ একটি ছেলে অসুস্থ বোধ করিয়া বসিয়া পড়িলে অপর বালকেরা কিছু হয় নাই ভাবিয়া উপহাস করিতে লাগিল এবং তাহাকে ফেলিয়াই চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। নরেন্দ্র কিন্তু গাড়ি ডাকিয়া বালকটিকে উহাতে বসাইয়া গৃহে লইয়া গেলেন।

নরেন্দ্রের সাহস এবং অনুসন্ধিৎসাও ছিল অপূর্ব। প্রতিবেশী এক বালকের বাটীতে চম্পকবৃক্ষের শাখায় পদদ্বয় সংলগ্ন করিয়া মুক্তহস্তে নতমস্তকে ঝুলিতে তিনি আনন্দ পাইতেন। একদিন বাড়ির বৃদ্ধ কর্তা ক্ষুদ্র বালককে তদবস্থ দেখিয়া সন্ত্রস্তভাবে নিষেধ করিলেন। নরেন্দ্র অমনি কারণ জানিতে চাহিলেন। বালককে সম্পূর্ণ নিরস্ত করার আশায় বৃদ্ধ ভয় দেখাইলেন, "ও গাছে বেহ্মদৈত্যি আছে; যারা ও গাছে চড়ে তাদের ঘাড় মটকে

দেয়।” নরেন্দ্র আপাততঃ নীরব রহিলেন; কিন্তু বৃদ্ধ চলিয়া যাইবা-মাত্র পুনর্বার পরীক্ষার্থে বৃক্ষে উঠিয়া ঠিক আগেরই মত দুলিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রহ্মদৈত্যের আগমনের লক্ষণ দেখা গেল না। সাথী তাঁহাকে বারণ করিলে বলিলেন, “তুই ছোঁড়া আহাম্মক। একজন বলে গেল আর অমনি বিশ্বাস করতে হবে? যদি বুড়োর কথা সত্যি হত, তাহলে অনেকক্ষণ আমার ঘাড়টা মুচড়ে যাওয়া উচিত ছিল।” হয়তো এরূপ ঘটনা স্মরণ করিয়াই উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, “ছেলেবেলায় আমি বড় ডানপিটে ছিলাম; তা না হলে কি আর একটা কানাকড়ি সঙ্গে না নিয়ে দুনিয়াটা ঘুরে আসতে পারতুম রে?”

নরেন্দ্রনাথের সাহসের দৃষ্টান্ত আরও বহু আছে। তন্মধ্যে দুই-একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নরেন্দ্রের বয়স যখন একাদশ বৎসর তখন ‘সিরাপিস্’ নামক ড্রেড্‌নট্ জাতীয় একখানি যুদ্ধজাহাজ কলিকাতায় আসে। নরেন্দ্র সঙ্গীদের সহিত উহা দেখিতে যাইয়া জানিলেন যে, চৌরঙ্গীতে বড় সাহেব থাকেন, তাঁহার অনুমতি আবশ্যক। বড় সাহেবের আফিসে উপস্থিত হইলে চাপরাসী ক্ষুদ্র বালককে তাড়াইয়া দিল। নরেন্দ্র পরাজয় মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি দেখিলেন, বাটীর পশ্চাদ্ভাগে যে লৌহময় সোপানশ্রেণী আছে, উহা বড় সাহেবের গৃহাভিমুখেই উঠিয়াছে। অমনি ঐ পথে সাহেবের গৃহসম্মুখে উপস্থিত হইয়া অপেক্ষমাণ সকলের সহিত শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইলেন এবং যথাকালে সাহেবের অনুমতিপত্র লইয়া নীচে নামিলেন। বহির্দ্বারে ব্যঙ্গচ্ছলে চাপরাসীকে অনুমতিপত্র দেখাইলে সে সবিস্ময়ে বলিল, “ক্যায়সে উপর গয়ে?” বিজয়োল্লসিত নরেন্দ্র মুখভঙ্গীসহকারে বলিলেন, “হাম্ জাদু জানতা।”

নরেন্দ্রদের পাড়ার শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের একটি জিম্‌ন্যাস্টিকের আখড়া ছিল। নরেন্দ্র বয়স্যদের সহিত সেখানে ব্যায়াম

অভ্যাস করিতেন। একদিন ট্রাপিজের (দোলনার) দারুময় ফ্রেম খাড়া করিতে বালকগণ গলদঘর্ম, অথচ প্রতিবারে ব্যর্থমনোরথ হইতেছে দেখিয়া পথচারী এক বলবান ইংরেজ নাবিক তাহাদের সাহায্যে অগ্রসর হইল। তাহার সহায়তায় ফ্রেম অনেকটা উর্ধ্বে উঠিল; কিন্তু হঠাৎ ফ্রেমের একটি পদ নাবিকের কপালে সজোরে লাগিয়া তাহাকে সংজ্ঞাশূন্য করিল এবং ক্ষত স্থান হইতে রুধিরস্রাব আরম্ভ হইল। অবস্থা দেখিয়া বালকগণ পুলিসের ভয়ে যে যে দিকে পারিল পলাইল। প্রত্যুত নরেন্দ্র নাবিকের শুশ্রূষায় নিরত রহিলেন এবং নবগোপাল বাবু ও চিকিৎসকদের সাহায্যে তাহাকে ট্রেনিং একাডেমি বিদ্যালয়ে এক সপ্তাহ রাখিয়া নিরাময় করিলেন। অতঃপর পাথেয় বাবদ চাঁদা সংগ্রহ করিয়া নাবিকের হস্তে প্রদানপূর্বক তাহাকে বিদায় দিলেন।

বিদ্যালয়ের পাঠাভ্যাসের সহিত স্বগৃহে মাতা ভুবনেশ্বরী ও পিতা বিশ্বনাথের নিকট নরেন্দ্রের নানাবিধ শিক্ষা চলিতেছিল। বিশ্বনাথের শিক্ষাপ্রণালীর একটা নিজস্ব ধারা ছিল। একদিন নরেন্দ্র মাতার সহিত বচসা করিতে করিতে হঠাৎ একটি কটু কথা বলিয়া ফেলিলেন। বিশ্বনাথ সাক্ষাৎ তিরস্কার না করিয়া নরেন্দ্রের গৃহদ্বারের উপরিভাগে কয়লা দ্বারা লিখিয়া রাখিলেন, "নরেন্দ্র বাবু তাঁহার মাতাকে অদ্য এই সকল কথা বলিয়াছেন"— উদ্দেশ্য, নরেন্দ্রের বয়স্যগণ উহা পড়িবে এবং নরেন্দ্র তাহাতে লজ্জিত হইবেন। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতে বিশ্বনাথের বহু অর্থব্যয় হইত। অনেক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় তাঁহার গৃহে থাকিয়া অন্নধ্বংস করিতেন, এমন কি নেশাভাঙ্গেরও পয়সা পাইতেন। জ্ঞানোন্মেষ হইলে নরেন্দ্র যখন ইহাতে আপত্তি জানাইলেন, তখন বিশ্বনাথ বলিলেন, "জীবনটা কত দুঃখের তা এখন কি বুঝবি? যখন বুঝতে পারবি তখন এ দুঃখের

হাত থেকে ক্ষণিক নিস্তারলাভের জন্য যারা নেশাভাঙ করে তাদের পর্যন্ত দয়ার চক্ষে দেখবি।" পুত্রকে উপদেশ দিতে যাইয়া পিতা কখন তাঁহার স্বাধীন চিন্তা ব্যাহত করিতেন না—সূত্র ধরাইয়া দিয়া ও বিবিধ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়াই তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন। সুতরাং স্বাধীনচেতা বালক নরেন্দ্র যখন একদিন দ্বিধাশূন্যভাবে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আর আমার জন্য কি করেছেন?" তখন পিতা বিরক্ত না হইয়া বলিলেন, "যা, আরশিতে একবার নিজের চেহারাটা দেখগে, তা হলেই বুঝবি।" আর একদিন তিনি পিতার নিকট জানিতে চাহিলেন, "সংসারে কিরূপ চলা উচিত?" উত্তর পাইলেন, "কখনও কোন বিষয়ে বিস্ময়প্রকাশ করিস না।" এই অমূল্য উপদেশ বিশ্বের বহু রাজপ্রাসাদে ও ভিখারীর পর্ণকুটীরে বিবেকানন্দের মনকে সমভাবে প্রশান্ত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল।

মাতা ভুবনেশ্বরীও অশেষভাবে সন্তানের সদ্‌গুণরাশিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে অযথা নিপীড়িত পুত্র মাতাকে দুঃখের কথা জানাইলে তিনি সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন, "বাছা, যদি তোর ভুল না হয়ে থাকে তবে ওতে যায় আসে কি? ফল যাই হোক না কেন, যা সত্য বলে মনে করবি, তাই করে যাবি। অনেক সময় হয়তো এর জন্য অন্যায় ও অপ্রীতিকর ফল সহ্য করতে হবে; কিন্তু তবু সত্যকে ছাড়বি না।" দূরদৃষ্টিসম্পন্না জননী এতাদৃশ বিবিধ ঘটনায় অবিচলিত থাকিয়া সাময়িক অবিচার, পরাজয় ও বিপর্যয়ের পশ্চাতে যে সত্য, শিব, সুন্দর প্রতিষ্ঠিত আছেন, তৎপ্রতি সন্তানের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতেন বলিয়াই মাতৃভক্ত বিবেকানন্দ একদা সগর্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন, "আমার জ্ঞানের বিকাশের জন্য আমি মার নিকট ঋণী।"

নরেন্দ্রের বয়স যখন চতুর্দশ বৎসর (১৮৭৭ খৃঃ) তখন তাঁহার

পিতা বায়ুপরিবর্তনের জন্য মধ্যপ্রদেশের অন্তর্বর্তী রায়পুরে যান এবং কিছু দিন পরে পত্নী ও পুত্রগণকেও তথায় আহ্বান করেন। রায়পুর পর্যন্ত তখন রেলগাড়ি হয় নাই—এলাহাবাদ ও জব্বলপুরের পথে নাগপুরে পৌছিয়া তথায় গোযানে আরোহণপূর্বক প্রায় এক পক্ষকাল পরে রায়পুরে উপস্থিত হইতে হইত। নিবিড় বনানীপরিবৃত ও বিহঙ্গকাকলীপূরিত শৈলশ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে নরেন্দ্র সহসা এমন এক স্থানে উপনীত হইলেন যেখানে অত্যুচ্চ শৈলশিখরদ্বয় যেন সপ্রেম আলিঙ্গনের জন্য বিপরীত দিক হইতে পরস্পরের প্রতি অগ্রসর হইয়া বনপথকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। পর্বতগাত্রে নিবদ্ধদৃষ্টি নরেন্দ্র দেখিলেন, এক-দিকের শৃঙ্গ হইতে ভূমি পর্যন্ত একটি ফাটলের মধ্যে মক্ষিকাকুলের যুগযুগান্তরের পরিশ্রমের নিদর্শনস্বরূপ এক সুবিশাল মধুচক্র লম্বিত রহিয়াছে। অমনি মক্ষিকারাজ্যের আদি-অন্তের রহস্যচিন্তায় বিভোর নরেন্দ্রের মন এক অসীমের ভাবে তলাইয়া গিয়া তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন করিল। নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন, "কতক্ষণ যে এভাবে গোযানে পড়িয়া ছিলাম তাহা স্মরণ হয় না। যখন পুনরায় চেতনা হইল, তখন দেখিলাম উক্ত স্থান অতিক্রম করিয়া বহুদূর আসিয়াছি। গোযানে একাকী ছিলাম বলিয়া এ কথা কেহ জানিতে পারে নাই।"

নরেন্দ্র তখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন। রায়পুরে বিদ্যালয় না থাকায় তিনি পিতার নিকট পাঠাভ্যাস করিতেন। ঐ শিক্ষা শুধু পুঁথিগত বিদ্যাতে নিবদ্ধ ছিল না—পিতাপুত্রে বহু বিষয়ে আলোচনা, এমন কি ঘোর তর্কও হইত। এতদ্ব্যতীত বিশ্বনাথের বাসস্থানে সমাগত পণ্ডিত ও সাহিত্যিকগণের সহিতও বিবিধ বিষয়ে চর্চাব্যপদেশে নরেন্দ্রের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ হইত। দুই বৎসর পরে বিশ্বনাথ যখন সপরিবারে কলিকাতায় ফিরিলেন, নরেন্দ্র তখন দেহ ও মনে বেশ সবল সুপরিপুষ্ট

ও আত্মপ্রত্যয়শীল। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষা সমাগত-প্রায়। অনেক যত্নে তিনি বিশেষ অনুমতি পাইয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ধারাবাহিক ভাবে দীর্ঘকাল পঠন-পাঠন না হওয়ায় তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, ইহা অনেকেই আশা করেন নাই; কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল যে, মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র তিনিই প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছেন। এই সাফল্যের পুরস্কারস্বরূপে তিনি পিতার নিকট হইতে একটি সুন্দর পকেটঘড়ি পাইলেন।

এই কয় বৎসর শুধু বিদ্যাবুদ্ধিতেই নরেন্দ্রের উৎকর্ষলাভ হয় নাই, তাঁহার অপরাপর সদ্‌গুণও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার পিতা ও মাতা উভয়েই সুকণ্ঠ গায়ক ও গায়িকা ছিলেন। নরেন্দ্রেরও সুকণ্ঠোত্থিত তাল-লয়-সমন্বিত সঙ্গীতে সকলে মুগ্ধ হইতেন। রায়পুরে অবস্থানকালে তিনি পিতার নিকট রন্ধনকৌশল শিখিয়াছিলেন। অধিকন্তু শরীরচর্চা, নৌকাপরিচালন, অসিযুদ্ধ, অভিনয় ইত্যাদি বহুক্ষেত্রেই তাঁহার প্রতিভা অভিব্যক্ত হইয়াছিল। তেজস্বিতা ছিল তাঁহার অন্যতম জন্মগত গুণ। একবার অভিনয়মঞ্চে উঠিয়া আদালতের জনৈক পেয়াদা এক প্রবীণ অভিনেতাকে গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত হইলে নরেন্দ্র উত্তেজিতকণ্ঠে গর্জিয়া উঠিলেন, "ষ্টেজ থেকে বেরিয়ে যাও; যতক্ষণ না পালা শেষ হয় ততক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকগে।" অমনি সাহস পাইয়া শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও।" এইরূপে অভিনয় সেরাত্রে অকাল-মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইল।

প্রবেশিকা-পরীক্ষায় সাফল্যলাভের পর নরেন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইলেন, কিন্তু এক বৎসর পরেই জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউশনে চলিয়া গেলেন। কলেজে তিনি রচনা, অলঙ্কারশাস্ত্র, ন্যায় ও দর্শন অতি

পিতা বায়ুপরিবর্তনের জন্য মধ্যপ্রদেশের অন্তর্বর্তী রায়পুরে যান এবং কিছু দিন পরে পত্নী ও পুত্রগণকেও তথায় আহ্বান করেন। রায়পুর পর্যন্ত তখন রেলগাড়ি হয় নাই—এলাহাবাদ ও জব্বলপুরের পথে নাগপুরে পৌঁছিয়া তথায় গোযানে আরোহণপূর্বক প্রায় এক পক্ষকাল পরে রায়পুরে উপস্থিত হইতে হইত। নিবিড় বনানীপরিবৃত ও বিহঙ্গকাকলীপূরিত শৈলশ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে নরেন্দ্র সহসা এমন এক স্থানে উপনীত হইলেন যেখানে অত্যুচ্চ শৈলশিখরদ্বয় যেন সপ্রেম আলিঙ্গনের জন্য বিপরীত দিক হইতে পরস্পরের প্রতি অগ্রসর হইয়া বনপথকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। পর্বতগাত্রে নিবদ্ধদৃষ্টি নরেন্দ্র দেখিলেন, এক-দিকের শৃঙ্গ হইতে ভূমি পর্যন্ত একটি ফাটলের মধ্যে মক্ষিকাকুলের যুগযুগান্তরের পরিশ্রমের নিদর্শনস্বরূপ এক সুবিশাল মধুচক্র লম্বিত রহিয়াছে। অমনি মক্ষিকারাজ্যের আদি-অন্তের রহস্যচিন্তায় বিভোর নরেন্দ্রের মন এক অসীমের ভাবে তলাইয়া গিয়া তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন করিল। নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন, "কতক্ষণ যে এভাবে গোযানে পড়িয়া ছিলাম তাহা স্মরণ হয় না। যখন পুনরায় চেতনা হইল, তখন দেখিলাম উক্ত স্থান অতিক্রম করিয়া বহুদূর আসিয়াছি। গোযানে একাকী ছিলাম বলিয়া এ কথা কেহ জানিতে পারে নাই।"

নরেন্দ্র তখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন। রায়পুরে বিদ্যালয় না থাকায় তিনি পিতার নিকট পাঠাভ্যাস করিতেন। ঐ শিক্ষা শুধু পুঁথিগত বিদ্যাতে নিবদ্ধ ছিল না—পিতাপুত্রে বহু বিষয়ে আলোচনা, এমন কি ঘোর তর্কও হইত। এতদ্ব্যতীত বিশ্বনাথের বাসস্থানে সমাগত পণ্ডিত ও সাহিত্যিকগণের সহিতও বিবিধ বিষয়ে চর্চাব্যপদেশে নরেন্দ্রের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ হইত। দুই বৎসর পরে বিশ্বনাথ যখন সপরিবারে কলিকাতায় ফিরিলেন, নরেন্দ্র তখন দেহ ও মনে বেশ সবল সুপরিপুষ্ট

ও আত্মপ্রত্যয়শীল। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষা সমাগতপ্রায়। অনেক যত্নে তিনি বিশেষ অনুমতি পাইয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ধারাবাহিক ভাবে দীর্ঘকাল পঠন-পাঠন না হওয়ায় তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, ইহা অনেকেই আশা করেন নাই; কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল যে, মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র তিনিই প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছেন। এই সাফল্যের পুরস্কারস্বরূপে তিনি পিতার নিকট হইতে একটি সুন্দর পকেটঘড়ি পাইলেন।

এই কয় বৎসর শুধু বিদ্যাবুদ্ধিতেই নরেন্দ্রের উৎকর্ষলাভ হয় নাই, তাঁহার অপরাপর সদ্‌গুণও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার পিতা ও মাতা উভয়েই সুকণ্ঠ গায়ক ও গায়িকা ছিলেন। নরেন্দ্রেরও সুকণ্ঠোত্থিত তাল-লয়-সমন্বিত সঙ্গীতে সকলে মুগ্ধ হইতেন। রায়পুরে অবস্থানকালে তিনি পিতার নিকট রন্ধনকৌশল শিখিয়াছিলেন। অধিকন্তু শরীরচর্চা, নৌকাপরিচালন, অসিযুদ্ধ, অভিনয় ইত্যাদি বহুক্ষেত্রেই তাঁহার প্রতিভা অভিব্যক্ত হইয়াছিল। তেজস্বিতা ছিল তাঁহার অন্যতম জন্মগত গুণ। একবার অভিনয়মঞ্চে উঠিয়া আদালতের জনৈক পেয়াদা এক প্রবীণ অভিনেতাকে গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত হইলে নরেন্দ্র উত্তেজিতকণ্ঠে গর্জিয়া উঠিলেন, "ষ্টেজ থেকে বেরিয়ে যাও; যতক্ষণ না পালা শেষ হয় ততক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকগে।" অমনি সাহস পাইয়া শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও।" এইরূপে অভিনয় সেরাত্রে অকাল-মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইল।

প্রবেশিকা-পরীক্ষায় সাফল্যলাভের পর নরেন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইলেন, কিন্তু এক বৎসর পরেই জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউশনে চলিয়া গেলেন। কলেজে তিনি রচনা, অলঙ্কারশাস্ত্র, ন্যায় ও দর্শন অতি

মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন করিতেন। বিশেষতঃ ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার সমধিক বুৎপত্তিলাভ হইল। একদা পারিতোষিক-বিতরণ-সভার সঙ্গে সঙ্গে জনৈক শিক্ষকের বিদায়সভাও অনুষ্ঠিত হয়। স্বনামধন্য বাগ্মী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই যুক্ত অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। এই সভায় সহপাঠীদের অনুরোধে নরেন্দ্র অর্ধঘণ্টাকাল ইংরেজীতে এমন একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন যে, সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। দুই বৎসর পরে তিনি এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি-এ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে তাঁহার জীবনে এক আমূল পরিবর্ত্তনের বীজ উপ্ত হইল।

কলেজ-জীবনের প্রথমে পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের চিন্তাধারার সহিত পরিচয়ের ফলে তিনি স্বধর্মে ও ঈশ্বরবিশ্বাসে আস্থা হারাইয়া অজ্ঞেয়বাদ ও নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকিতেছিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রের মন বস্তুতঃ সেরূপ উপাদানে গঠিত ছিল না। বিশেষতঃ এসময়ে ধর্মের বাহ্যাড়ম্বরে আস্থা না থাকিলেও কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতায় চমৎকৃত কলিকাতার সমাজ উহার মূল তথ্যগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছিলেন। সমসাময়িক অপর বহু শিক্ষিত যুবকের ন্যায় নরেন্দ্রও অবিলম্বে কেশবের গণ্ডিমধ্যে আসিয়া পড়িলেন এবং ঘন ঘন উপাসনাদিতে যোগদান ও ব্রাহ্ম নেতাদের নিকট যাতায়াতের ফলে ব্রাহ্মসমাজের তালিকায় নাম রেজিষ্ট্রি করাইয়া আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজভুক্ত হইলেন। এমন কি, ব্রাহ্মদের অনুকরণে তিনি পরিচিতদের মধ্যে কঙ্কালসার হিন্দুধর্মের নিন্দা, জাতিভেদের সমালোচনা এবং স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রয়োজন সম্বন্ধেও সোৎসাহে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এরূপ বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠান ও সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনে প্রাণের ক্ষুধা মিটিল না। তিনি জানিতেন, ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে ঈশ্বরলাভ। ব্রাহ্মসমাজে বহু চরিত্রবান ব্যক্তির

সান্নিধ্যলাভে তিনি পরিতৃপ্ত হইলেন বটে এবং সমাজমন্দিরে ধর্ম-সঙ্গীতে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া ক্ষণিক উচ্চানুভূতির আভাসও পাইলেন বটে, কিন্তু ঈশ্বরদর্শনের পথ তখনও অজ্ঞাতই রহিয়া গেল। অবশেষে আকুল মনের আবেগ আর সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি তখন গঙ্গাবক্ষে ভাসমান নৌকায় অবস্থানপূর্বক ধ্যানধারণায় সময় কাটাইতেন। ক্ষিপ্ত-প্রায় নরেন্দ্র দ্রুতবেগে নৌকামধ্যে প্রবেশ করিয়া উপাসনারত মহর্ষিকে প্রশ্ন করিলেন, "মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করিয়াছেন?" ব্যগ্র কণ্ঠের অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে ধ্যানোত্থিত মহর্ষি নীরবে প্রশ্নকর্তার দিকে চাহিয়া রহিলেন। একবার, দুইবার, তিনবার সেই তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসাবাণে জর্জরিত হইয়া অবশেষে জিজ্ঞাসুর চক্ষে স্বীয় নয়ন সংস্থাপনপূর্বক মহর্ষি বলিলেন, "তোমার চক্ষুদ্বয় ঠিক যোগীদের চক্ষুর ন্যায়।" সেই নিরর্থক প্রশংসায় লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়া নরেন্দ্র অতৃপ্তহৃদয়ে গৃহে ফিরিলেন।

শাস্ত্র বলেন, শিষ্যের মন প্রস্তুত হইলে ভগবৎকৃপায় গুরুলাভে বিলম্ব হয় না। সিমুলিয়া পল্লীর সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এক দিন স্বীয় ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তবৃন্দকে সাদরে আমন্ত্রণপূর্বক এক ক্ষুদ্র উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। উহাতে সুকণ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞের প্রয়োজন হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথ পূর্বপরিচিত নরেন্দ্রকে তথায় লইয়া আসেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁহার প্রধান লীলাসহায়কের এই প্রথম মিলন এইরূপেই সংঘটিত হইয়াছিল। "নরেন্দ্রনাথকে সেদিন দেখিবা-মাত্র ঠাকুর যে তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কারণ প্রথমে সুরেন্দ্রনাথকে এবং পরে রামচন্দ্রকে নিকটে আহ্বানপূর্বক সুগায়ক যুবকের পরিচয় যতদূর সম্ভব জানিয়া লয়েন এবং একদিন তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ

করেন। আবার ভজন সাঙ্গ হইলে স্বয়ং যুবকের নিকট আগমনপূর্বক তাঁহার অঙ্গলক্ষণসকল বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাহার সহিত দুই-একটি কথা বলিয়া অবিলম্বে এক দিবস দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।"[১]

উক্ত ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরেই নরেন্দ্রের এফ-এ পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে শহরের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কন্যাদানের আগ্রহ জানাইলেন এবং পাত্রী শ্যামবর্ণা ছিল বলিয়া দশসহস্র মুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু বিশ্বনাথ ও আত্মীয়স্বজনের অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও নরেন্দ্রের সম্মতি পাওয়া গেল না। শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত রামচন্দ্র দত্ত নরেন্দ্রের পিতৃ-গৃহেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ধর্মভাবের প্রেরণায় নরেন্দ্র এই প্রকার বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন বুঝিয়া তিনি একদিন তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, "যদি ধর্মলাভ করিতেই তোমার যথার্থ বাসনা হইয়া থাকে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট চল।" তদনুসারে দুই-এক জন বয়স্য সমভিব্যাহারে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের পৌষ মাসে একদিন তিনি রামচন্দ্র ও সুরেন্দ্রের সহিত সুরেন্দ্রের গাড়িতে দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রের এই প্রথম আগমনের কথা ঠাকুর এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন: "পশ্চিমের (গঙ্গার দিকের) দরজা দিয়া নরেন্দ্র প্রথম দিন এই ঘরে ঢুকিয়াছিল। দেখিলাম, নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য নাই, মাথার চুল ও বেশভূষার কোনরূপ পারিপাট্য নাই, বাহিরের কোন পদার্থে ইতরসাধারণের মত একটা আঁট নাই, সবই যেন তার আলাদা। এবং চক্ষু দেখিয়া মনে হইল, তাহার মনের অনেকটা ভিতরের দিকে কে যেন জোর করিয়া টানিয়া রাখিয়াছে। দেখিয়া মনে

১। 'লীলাপ্রসঙ্গ—দিব্যভাব,' ৫৫-৫৬ পৃঃ

হইল, বিষয়ী লোকের আবাস কলিকাতায় এত বড় সত্ত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভব !” মেজেতে মাদুর পাতা ছিল ; নরেন্দ্র উহাতে বসিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদ্বারা আদিষ্ট হইয়া গাহিলেন, “মন, চল নিজ নিকেতনে, সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে ?” ইত্যাদি। নরেন্দ্র ষোল-আনা মন দিয়াই গাহিলেন এবং ঠাকুরও ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। গানের পরেই ঠাকুর সহসা গাত্রোত্থানপূর্বক নরেন্দ্রের হস্তধারণ করিলেন ও তাঁহাকে লইয়া স্বগৃহের উত্তরের বারান্দায় উপস্থিত হইলেন। উত্তরের শীতল বাতাস নিবারণের জন্য সেখানে স্তম্ভগুলির অবকাশস্থল ঝাঁপ দিয়া আবৃত ছিল। সেখানে যাইয়াই গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আর নরেন্দ্রের হস্ত নিজ হস্তে লইয়া দরদরিত ধারে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে পূর্বপরিচিতের ন্যায় বলিতে লাগিলেন, “এত দিন পরে আসিতে হয় ? আমি তোমার জন্য কিরূপ অপেক্ষা করিয়া আছি তাহা একবার ভাবিতে নাই ?” ইত্যাদি কথা বলেন, আর রোদন করেন। পরক্ষণেই আবার করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন, “জানি আমি, প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীরধারণ করিয়াছ।” এতাদৃশ অদ্ভুত আচরণে নরেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, “এ কাহাকে দেখিতে আসিয়াছি, এতো একেবারে উন্মাদ ! না হইলে বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র আমি, আমাকে এই সব কথা বলে ?” এদিকে ঠাকুর পরক্ষণেই নরেন্দ্রকে তথায় থাকিতে বলিয়া গৃহ হইতে মাখন, মিছরি ও সন্দেশ আনিয়া স্বহস্তে তাঁহাকে খাওয়াইলেন। নরেন্দ্র যতই বলেন যে সঙ্গীদের সহিত ভাগ করিয়া খাইবেন, ঠাকুর ততই “উহারা খাইবে, এখন তুমি খাও” বলিয়া সবগুলি খাওয়াইয়া নিরস্ত হইলেন। পরে হাত ধরিয়া বলিলেন, “বল, তুমি শীঘ্র একদিন এখানে আমার নিকট একাকী

আসিবে?” আশু বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ‘আসিব’ বলিয়া নরেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর গৃহমধ্যে উপবিষ্ট নরেন্দ্র লক্ষ্য করিলেন যে, পূর্বমুহূর্তের পাগল ঠাকুর উচ্চ ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেছেন এবং ত্যাগবৈরাগ্যের কথা বলিতেছেন—আলোচনামধ্যে কোন অসংলগ্ন ভাব নাই, আচরণেও উন্মাদের আভাসমাত্র নাই। উভয় অবস্থার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যবিধানে অপারগ নরেন্দ্র স্থির করিলেন যে, ইনি অর্ধোন্মাদ; কিন্তু উন্মাদ হইলেও তাঁহার ত্যাগ ও পবিত্রতা অতুলনীয় এবং এইজন্য তিনি মানবহৃদয়ের শ্রদ্ধা, পূজা ও সম্মানের অধিকারী। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

এদিকে নরেন্দ্র চলিয়া গেলে ঠাকুরের হৃদয় অহর্নিশ পুনর্মিলন-আকাঙ্ক্ষায় এইরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে, অনেক সময় বোধ হইত বুকের ভিতরটায় কে যেন গামছা নিংড়াইবার মত জোরে মোচড় দিতেছে। আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া ঝাউতলার দিকে যাইয়া “ওরে, তুই আয়রে, তোকে না দেখে আর থাকতে পারছি না” বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতেন। পরে অপর কোন কোনও বালক-ভক্তের জন্যও তাঁহার আর্তি প্রকাশ পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি নিজে বলিয়াছেন, “নরেন্দ্রের জন্য যেমন হইয়াছিল, তাহার তুলনায় সে কিছু নয় বলিলে চলে।”

সন্দেহদোলায়িত-চিত্তে গৃহে প্রত্যাগত নরেন্দ্রের জীবনধারা পূর্বেরই ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের সেই অবোধ্য অথচ মধুর স্মৃতি এবং স্বীয় সত্যনিষ্ঠা তাঁহাকে অবিরাম তথায় যাইতে প্ররোচিত করিতেছিল। অবশেষে নরেন্দ্র একদিন পদব্রজে সেখানে চলিলেন; তখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর স্বগৃহে একাকী ছোট তক্তাপোশখানিতে বসিয়াছিলেন। তিনি নরেন্দ্রকে দেখিয়া সাহ্লাদে নিকটে ডাকিয়া নিজ পার্শ্বে বসাইলেন এবং আবিষ্টের ন্যায় অস্পষ্টভাবে কি যেন বলিতে বলিতে ক্রমে নরেন্দ্রের দিকে

সরিয়া আসিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র ভাবিলেন, আজ আবার পাগলের না জানি কি অভিনয় হইবে! ভাবিতে না ভাবিতে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় দক্ষিণ-চরণে নরেন্দ্রের অঙ্গস্পর্শ করিলেন, অমনি মুহূর্তমধ্যে নরেন্দ্র দেখিলেন, সমস্ত বস্তু বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে—নিখিল বিশ্বের সহিত নরেন্দ্রের আমিত্ব যেন কোন্ এক মহাশূন্যের দিকে ধাবিত হইতেছে! তবে কি মরণ সম্মুখে? নরেন্দ্র আত্মসংবরণে অসমর্থ হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওগো, তুমি আমায় এ কি করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন!" শুনিয়া অদ্ভুত ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন এবং হস্তদ্বারা নরেন্দ্রের বক্ষঃস্পর্শপূর্বক বলিলেন, "তবে এখন থাক্, একবারে কাজ নেই—কালে হবে।" আশ্চর্যের বিষয়, নরেন্দ্র অমনি দেখিলেন, সমস্ত পূর্ববৎ অবস্থিত আছে। ইহা কি মোহিনী-বিদ্যা? বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল না; কারণ প্রবল-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, পুরুষকারের প্রতিমূর্তি নরেন্দ্রের মন এই দুর্বল মানবের নিকট চকিতে পরাস্ত হইবে—ইহা যুক্তিসহ নহে। তিনি তো বরং ইঁহাকে অর্ধোন্মাদ জানিয়া ইঁহার বশ্যতাস্বীকারে সম্পূর্ণ অসম্মত ছিলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, চিন্তার অতীত কত ব্যাপার আছে—ইহাও তাহারই একটা হইবে। আবার ইহাও বুঝিলেন যে, যিনি ইচ্ছামাত্র এইরূপ একটি শক্তিশালী মনকে কাদার তালের মত ভাঙ্গিতে গড়িতে পারেন, তাঁহাকে পাগলও বলা চলে না। ঠাকুর কিন্তু তারপর সহজ ভাবেই আলাপ-আলোচনা ও রঙ্গ-পরিহাস করিতে লাগিলেন। খাওয়াইয়া, আদর করিয়া যেন তাঁহার আশ মিটিতেছে না! অপিচ বিদায়কালে ধরিয়া বসিলেন, "আবার শীঘ্র আসিবে বল?" নরেন্দ্র তদনুরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াই বাড়ি ফিরিলেন।

নরেন্দ্র শীঘ্রই পুনর্বার দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। সেদিন জনতা নাই। ঠাকুর তাঁহাকে পার্শ্ববর্তী যদুলাল মল্লিকের উদ্যানবাটীতে বেড়াইতে লইয়া

গেলেন। উদ্যান ও গঙ্গাতীরে কিয়ৎকাল ভ্রমণানন্তর বৈঠকখানায় আসিয়া উপবিষ্ট হইলে নরেন্দ্র লক্ষ্য করিলেন, পূর্বদিনেরই ন্যায় ঠাকুরের ভাবান্তর হইতেছে। নরেন্দ্র সতর্ক থাকিলেও পূর্বদিনেরই ন্যায় সহসা নিকটে আসিয়া তিনি তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। অমনি নরেন্দ্র সম্পূর্ণ বাহ্যসংজ্ঞা হারাইলেন; যখন জ্ঞান ফিরিল তখন দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার বক্ষে হাত বুলাইয়া দিতেছেন এবং তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া মৃদুমধুর হাস্য করিতেছেন। বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য নরেন্দ্রকে ঠাকুর সেদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, নরেন্দ্র কে—কোথা হইতে আসিয়াছেন—কেন আসিয়াছেন—কতদিন ধরাধামে থাকিবেন ইত্যাদি। নরেন্দ্রও তদবস্থায় নিজ অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া এসকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়াছিলেন। তৎশ্রবণে ঠাকুর নিশ্চিন্ত হইলেন যে, নরেন্দ্রের সম্বন্ধে যাহা কিছু দেখিয়াছিলেন বা ভাবিয়াছিলেন, সবই সত্য। তিনি জানিলেন যে, যেরূপ গুণ বা শক্তির দুই একটির মাত্র অধিকারী হইতে পারিলে মানব জনসমাজে বিপুল প্রতিপত্তি লাভ করে কিংবা স্বমত-প্রতিষ্ঠার জন্য সঙ্ঘ গঠন করে, নরেন্দ্রনাথের অন্তরে তাদৃশ অষ্টাদশটি বিদ্যমান আছে; পরন্তু নরেন্দ্র ঈশ্বর, জগৎ ও মানবজীবনের উদ্দেশ্যসম্বন্ধে চরম তথ্যের সন্ধানলাভপূর্বক ঐ শক্তি যথাযথ প্রয়োগ করিতে না পারিলে হিতে বিপরীত হইবে। অতএব নরেন্দ্র যাহাতে নিজ জীবনের উদ্দেশ্য ও ঠাকুরের মহান্ ভাব যথাযথ গ্রহণপূর্বক নিজের জীবনের গতি উহারই সাফল্যের জন্য নিয়মিত করেন, শ্রীরামকৃষ্ণ অতঃপর তৎপ্রতিই সবিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলেন। নরেন্দ্রও দেখিলেন, দৈববলে বলীয়ান্ এই আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ অবলীলাক্রমে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির মনকে উচ্চপথে পরিচালিত করিতে পারেন—ইঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা নিষ্ফল এবং ইঁহার কৃপা অতি ভাগ্যের কথা। তাঁহার পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষাদৃপ্ত ও ব্রাহ্মসমাজের স্বাধীন চিন্তায় অভ্যস্ত মন আজ বাধ্য হইয়াই

মানিয়া লইল যে, বিরল হইলেও এইরূপ মহামানব বস্তুতঃই আছেন, যিনি সত্যের প্রত্যক্ষ সন্ধান দিতে পারেন। সুতরাং ইঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করাই বিধেয়। কিন্তু তিনি এই বিষয়েও দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন যে, বশ্যতা স্বীকার করিলেও নির্বিচারে কিছুই গ্রহণ করিবেন না। পরীক্ষার ফলে যাহা সত্য মনে হইবে তাহাই মাত্র লইবেন, অপর সমস্ত হয় বর্জন করিবেন কিংবা তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন।

দীর্ঘ পাঁচ বৎসরকাল নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। যুগাবতারের অদ্ভুত প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তিনি প্রায় প্রতিসপ্তাহেই এক বা দুই দিবস দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন বা তথায় অবস্থান করিতেন। ঠাকুরও নরেন্দ্রকে দেখিলে আনন্দবিহ্বল কিংবা দীর্ঘকাল না দেখিতে পাইলে বিরহব্যাকুল হইতেন। অনেক সময় সেই বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য কলিকাতায় যাইতেন। ভক্তদের নিকট নরেন্দ্রের প্রশংসায় তিনি সহস্রমুখ হইয়া উঠিতেন, যুবক-ভক্তদিগকে তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দিতেন এবং সর্ববিষয়ে তাঁহার উপর অগাধ বিশ্বাস রাখিতেন। নরেন্দ্রের তদানীন্তন তেজস্বিতা ও স্বচ্ছন্দ ব্যবহার অনেক সমালোচকের চক্ষে উচ্ছৃঙ্খলতারই রূপান্তর বলিয়া মনে হইলেও গভীর-অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর জানিতেন যে, এই পুরুষপ্রবরের উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহার যুগধর্ম প্রচারের সৌধ উত্থিত হইবে। নরেন্দ্রের সম্বন্ধে ঠাকুরের উচ্চ ধারণার আভাস নিম্নোক্ত কথাবার্তা হইতে কিঞ্চিৎ পাওয়া যাইবে। একদা নরেন্দ্রেরই সম্মুখে ঠাকুর বলিলেন, "দেখিলাম, কেশব যেমন একটা শক্তির বিশেষ উৎকর্ষে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে, নরেন্দ্রের ভিতর ঐরূপ আঠারটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। আবার দেখিলাম, কেশব ও বিজয়ের অন্তর দীপশিখার ন্যায় জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল রহিয়াছে; পরে নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখি, তাহার ভিতরে জ্ঞানসূর্য উদিত হইয়া

মায়ামোহের লেশ পর্যন্ত তথা হইতে দূর করিয়াছে।" নরেন্দ্র অবশ্য সে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় একটুও অহংকৃত না হইয়া বরং ক্ষোভ ও লজ্জায় প্রতিবাদ জানাইলেন, "মহাশয়, করেন কি? লোকে আপনার এরূপ কথা শুনিয়া আপনাকে উন্মাদ বলিয়া নিশ্চয় করিবে। কোথায় জগদ্বিখ্যাত কেশব ও মহামনা বিজয়, আর কোথায় আমার ন্যায় একটা নগণ্য স্কুলের ছোঁড়া!" ঠাকুর উহাতে নরেন্দ্রের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া মৃদুহাস্যে উত্তর দিলেন, "কি করব রে! তুই কি ভাবিস্, আমি ঐরূপ বলিয়াছি? মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) আমাকে ঐরূপ দেখাইলেন, তাই বলিয়াছি; মা তো আমাকে সত্য ভিন্ন মিথ্যা কখন দেখান নাই—তাই বলিয়াছি।"

নরেন্দ্রও ঠাকুরের প্রেমে সত্যই আবদ্ধ হইয়াছিলেন; তাই যখন ব্রাহ্ম-সমাজাদিতে ঘুরিয়া এমন কাহাকেও পাইলেন না, যিনি বলিতে পারেন তাঁহার ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তখন যদিও স্বতঃই ইচ্ছা হইতেছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণকেও অনুরূপ প্রশ্ন করিবেন, তথাপি আবার ভয় হইতেছিল—"ইনিও যদি ঐরূপ সোজা উত্তর না দিয়া প্রশ্ন এড়াইয়া যান তাহা হইলে তো আর দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না।" যাহা হউক, মনের অস্বস্তি দীর্ঘকাল মনেই চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া তিনি একদিন সাহসভরে ঠাকুরকে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করিয়াছেন?" তৎক্ষণাৎ দ্বিধাহীন সুস্পষ্ট উত্তর আসিল, "হাঁ গো, এই যেমন তোমায় দেখছি।" ইহা বলিয়াই ঠাকুর ক্ষান্ত হইলেন না; তিনি নরেন্দ্রকে জানাইলেন যে, তাঁহাকেও দেখাইয়া দিতে পারেন। নরেন্দ্র অন্ধকারে পথ পাইলেন, যদিও তাঁহার যুক্তিপ্রবণ মন তখনও সর্ববিষয়ে ঠাকুরের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইল না। তাই ঠাকুর যখন স্বীয় অনুভূতি বা নরেন্দ্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গোপনীয় তথ্য-উদ্‌ঘাটনান্তে বিশ্বাসোৎপাদনজন্য বলিতেন, "মা দেখাইয়াছেন ও বলাইয়াছেন," স্পষ্টবাদী, নির্ভীক নরেন্দ্র

তখন বিচারের পথ অবলম্বনপূর্বক বলিতেন, "মা দেখাইয়া থাকেন, অথবা আপনার মাথার খেয়ালে ঐসকল উপস্থিত হয়, তাহা কে বলিতে পারে?" এই কথা বলিয়া পাশ্চাত্ত্য মনস্তত্ত্বের মতাবলম্বনে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল আমাদিগকে অনেক ক্ষেত্রে প্রতারিত করে এবং ঐরূপ দর্শনাদি মনের বাসনানুসারেই হইয়া থাকে। কখন কখন নরেন্দ্রের এই রকম কথা ঠাকুরকে ভাবাইয়া তুলিত—"তাইতো, কায়মনোবাক্যে সত্যপরায়ণ নরেন্দ্র তো মিথ্যা বলিবার লোক নহে!" এইরূপ ভাবনায় পড়িয়া মীমাংসার জন্য অবশেষে শ্রীশ্রীজগদম্বার শরণাপন্ন হইলে মা বলিয়া দিলেন, "ওর (নরেন্দ্রের) কথা শুনিস কেন? ও ছেলেমানুষ! কিছুদিন পরে ও সব কথা সত্য বলে মানবে।" মাতৃবাক্যে একান্ত নির্ভরশীল ঠাকুর ঐ আশ্বাসবাণীতেই নিশ্চিন্ত হইলেন।

দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রের কলেজের পাঠাভ্যাসও চলিতেছিল। অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি লইয়া তিনি জন্মিয়াছিলেন; সুতরাং কলেজের পাঠাভ্যাসের জন্য অল্প সময়ই প্রয়োজন হইত—অতিরিক্ত সময় বন্ধুবান্ধবের সহিত আমোদ-আহ্লাদে বা বিবিধ-বিষয়-শিক্ষায় ব্যয়িত হইত। প্রবেশিকা-পরীক্ষা দিবার বৎসরের প্রারম্ভ হইতে (১৮৭৯) তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস-সমূহ আগ্রহসহকারে পড়িয়াছিলেন। এফ-এ অধ্যয়নকালে ন্যায়শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ একে একে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বি-এ পরীক্ষার পূর্বে ইংলণ্ড ও ইউরোপের বর্তমান ও প্রাচীন ইতিহাস এবং পাশ্চাত্ত্য দর্শনশাস্ত্রসমূহের সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন। এইরূপ চর্চার ফলে তাঁহার দ্রুত পাঠের শক্তি অদ্ভুত বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহাকে গ্রন্থের প্রতি ছত্র পড়িতে হইত না—প্রত্যেক অনুচ্ছেদের প্রথম ও শেষ পঙ্‌ক্তিতে মনঃসংযোগ করিয়াই তিনি গ্রন্থকারের বক্তব্য বুঝিয়া লইতেন। এমন কি, ক্রমে প্রতি পৃষ্ঠার প্রথম ও শেষ চরণে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই যথেষ্ট হইত, কিংবা একসঙ্গে তিন-চারি

পৃষ্ঠাও উল্টাইয়া যাইতে পারিতেন। নরেন্দ্র পাঠাভ্যাসকালে সর্বপ্রকার বিলাসিতা বর্জনপূর্বক ব্রহ্মচারীর আদর্শে চলিতেন। বয়স্য কাহাকেও শৌখিন দেখিলে মুখের উপর দু'কথা শুনাইয়া দিতেন ; বিশেষতঃ চলাফেরায় নারীজনোচিত হাবভাবের আভাসমাত্র থাকিলে সেই পুরুষসিংহের ধৈর্যচ্যুতি হইত। এই সময়ে তাঁহার আবার নির্জনবাসও আরম্ভ হয়। বি-এ পরীক্ষার পূর্বে বাটীর বালকবালিকা ও লোকজনের কলরবে পাঠের অসুবিধা হয় দেখিয়া তিনি মাতামহীর আলয়ের বহির্বাটীর একটি ক্ষুদ্র দ্বিতলের গৃহে আশ্রয় লইলেন ; অন্দরমহলের সঙ্গে উহার কোন সংশ্রব ছিল না। দৈনিক পাঠ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেন না। বাহির হইতে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলে দেখা যাইত, একখানি অপ্রশস্ত কক্ষ—প্রস্থে চারি হাত ও দৈর্ঘ্যে প্রায় দ্বিগুণ—আসবাবের মধ্যে একটি ক্যাম্বিসের খাট, তাহার উপর ময়লা ক্ষুদ্র বালিশ, মেজের উপর ছিন্ন মাদুর এবং এক কোণে একটি তানপুরা, সেতার ও বায়া। এই ঘরটিকে তিনি 'টঙ্গ' আখ্যা দিয়াছিলেন। আত্মীয়বর্গ হইতে এইরূপে বিচ্ছিন্ন থাকিলেও বন্ধুবৎসল নরেন্দ্রের এই পাঠাগারও প্রায়শঃ বন্ধুদের সহিত বিবিধ আলোচনা ও সঙ্গীতাদিতে মুখর হইয়া উঠিত। অপরের প্রাণে ব্যথা দিতে অসমর্থ নরেন্দ্র তাই অনেক সময় একান্তে অধ্যয়নোদ্দেশে টঙ্গের সংলগ্ন এবং তদপেক্ষাও স্বল্পায়তন চোরকুঠরীতে হামাগুড়ি দিয়া আশ্রয়গ্রহণানন্তর দীর্ঘকাল অপরের অলক্ষ্যে পাঠে মগ্ন থাকিতেন। নরেন্দ্রের গৃহে প্রচুর অর্থ এবং তাঁহার অধীনে বহু দাসদাসী থাকিলেও এইরূপ অনাড়ম্বর দীন আবেষ্টনের মধ্যে এবং দরিদ্র সহপাঠীদের সাহচর্যেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। ইহারই মধ্যে আবার রাত্রে ঈশ্বরপ্রণিধানে তাঁহার অনেকক্ষণ কাটিত। নরেন্দ্রের চরিত্রে একাধারে এই সব বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ দেখিয়া লোকে অবাক হইত। ইহারই মধ্যে আবার কলেজেও সুনাম

হইয়াছিল—দর্শনের অধ্যাপক হেষ্টি সাহেব তাই বলিয়াছিলেন, "নরেন্দ্র প্রকৃতই একজন প্রতিভাবান্ বালক।"

বি-এ পাশের পর নরেন্দ্র বি-এল্ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বি-এ পরীক্ষার স্বল্পকাল পরেই (১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে) তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইল। পিতার আয় ছিল যেমন প্রচুর, ব্যয়ও ছিল তেমনি অপরিমিত। মুক্তহস্ত বিশ্বনাথ পরিবারের জন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই। বিপদ দেখিয়া নরেন্দ্রের পিতৃগৃহে প্রতিপালিত বন্ধুবান্ধব সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন অপর আত্মীয়-স্বজন এই সুযোগে সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে অগ্রসর হইলেন। ভবিষ্যতে যিনি দরিদ্রনারায়ণের সেবা প্রবর্তনপূর্বক জগদ্বরেণ্য হইবেন, আজ তাঁহাকে দারিদ্র্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিবার জন্যই বোধ হয় এই আয়োজন! কিন্তু সে শিক্ষা বড় নিদারুণ, বড় মর্মন্তুদ! যাঁহার সংসারে মাসিক সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইত এবং যাঁহার কৃপালাভের জন্য বহু ব্যক্তি লালায়িত থাকিত, সেই নরেন্দ্র আজ পদব্রজে কলেজে যাইতেছেন—সে পদ নগ্ন, পরিধানে অতি স্থূল বস্ত্র, উদর অন্নহীন! দারিদ্র্য যাহাদের জন্মসাথী, তাহারা দারিদ্র্যের ঠিক পরিচয় পায় না; কিন্তু অকারণে অকস্মাৎ সচ্ছলতা হইতে বঞ্চিত যাহাকে অনাহারে দিনাতিপাত করিতে হয় এবং মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীর শুষ্ক বদন নিরীক্ষণ করিয়াও অশ্রুরোধপূর্বক মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে হয়, সে জানে 'দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী,' এই কথা কত সত্য। বাটীতে অভাব জানিয়া নরেন্দ্র 'নিমন্ত্রণ আছে' বলিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেন এবং অনেক দিন অনাহারেই কাটাইতেন। সময় বুঝিয়া মহামায়াও মোহজাল বিস্তার করিলেন। এক সঙ্গতিসম্পন্না রমণী প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, নরেন্দ্র তাঁহার সম্পত্তি গ্রহণপূর্বক দুঃখের অবসান ঘটাইতে পারেন। বিষম অবজ্ঞা ও কঠোরতা-অবলম্বনে তিনি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

পরন্তু গৃহের এই অর্থাভাবে মাতা ভুবনেশ্বরী পর্যন্ত বিশেষ বিচলিতা হইলেন। এক প্রভাতে নরেন্দ্র শ্রীভগবানের নামোচ্চারণপূর্বক শয্যাত্যাগ করিতেছেন শুনিয়া মাতা বলিলেন, "চুপ কর্, ছোঁড়া। ছেলেবেলা থেকে কেবল ভগবান্, ভগবান্! ভগবান্ তো সব কল্লেন!" মাতার সেই তীব্র মনোবেদনার আঘাতে পুত্রের হৃদয়ও এই সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং ঈশ্বরের প্রতি দারুণ অভিমানে পূর্ণ হইল। অতএব গোপনে কার্য করিতে অপারগ নরেন্দ্র যুক্তি-তর্ক-সহায়ে মনের ভাব বন্ধুদের নিকট খুলিয়া বলিতে লাগিলেন। মুখে মুখে প্রচারিত এই সকল কথা বিকৃত হইয়া রব উঠিল—নরেন্দ্র নাস্তিক হইয়া গিয়াছেন, হয়তো বা কুসঙ্গে পড়িয়াছেন। কলিকাতাস্থ ভক্তরাও ইহা শুনিলেন এবং তাঁহাদের কেহ কেহ দেখা করিতে আসিয়া ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন যে, যাহা রটিয়াছে তাহার সমস্তটা না হইলেও অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য। ইঁহারা তাঁহাকে এতটা হীন ভাবিতে পারেন জানিয়া অভিমানে স্ফীত নরেন্দ্র পাশ্চাত্ত্য দর্শনাবলম্বনে বলিতে লাগিলেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না, দণ্ডভয়ে ভগবানে বিশ্বাস করা দুর্বলতা মাত্র! ফলে নরেন্দ্রের অধঃপতন সুস্পষ্ট, এই দৃঢ়তর প্রত্যয় লইয়া ভক্তগণ তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন—ইহা বুঝিয়া নরেন্দ্র আনন্দিত হইলেন। ক্রমে এই সব কথা ঠাকুরের কর্ণে পৌঁছিল; কিন্তু জগদম্বার অভ্রান্ত নির্দেশে পরিচালিত তিনি একান্ত বিশ্বাসভরে বলিলেন, "চুপ কর্, শালারা! মা বলিয়াছেন, সে কখনও ঐরূপ হইতে পারে না। আর কখনও ঐরূপ কথা বলিলে তোদের মুখ দেখিতে পারিব না।"

নরেন্দ্র অন্নসংস্থানের জন্য কর্মের অনুসন্ধানে ঘুরিতে লাগিলেন। একদিন অবসন্নদেহে এবং ততোধিক অবসন্নমনে গৃহে ফিরিতেছেন আর ভাবিতেছেন, শিবের সংসারে এই অশিবের তাণ্ডবলীলা কেন? ঈশ্বরের

ন্যায়ের রাজ্যে এত অন্যায় কেন? কিন্তু উপবাসক্লিষ্ট দেহ আর এক পদও অগ্রগমনে অক্ষম হওয়ায় তিনি পার্শ্বস্থ বাটীর রোয়াকের উপর চেতনাহীন জড়ের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। বাহিরের জ্ঞান কতক্ষণ ছিল না তিনি জানেন না; কিন্তু অন্তরে যেন দৈবশক্তিপ্রভাবে আবরণের পর আবরণ অপসৃত হওয়ায় একে একে তাঁহার সমস্ত সমস্যা মিটিয়া গেল। ঐ ভাবে রাত্রি-অবসান হইয়া যখন প্রভাত আগতপ্রায়, তখন নিদ্রোত্থিত নরেন্দ্র বাহিরের জগতে অন্তরের সেই প্রশান্তির কোনও প্রতিচ্ছবি দেখিতে না পাইলেও অমিত বল ও অদম্য বিশ্বাস লইয়া গৃহে ফিরিলেন এবং পুনর্বার অর্থচেষ্টায় মহানগরীর রাজপথে নামিলেন। এইরূপে জননী প্রভৃতির প্রতি কর্তব্যপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নরেন্দ্রনাথ কিয়ৎকাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবাজারের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিযুক্ত থাকিলেন। অনন্তর কিছুকাল এটর্নির কার্যশিক্ষার চেষ্টায় ঘুরিয়া অর্থাভাবে উহা ছাড়িতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে কয়েকখানি পুস্তক-অনুবাদের দ্বারা এবং অন্যান্য বিবিধ উপায়ে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টায়ও তিনি ব্যাপৃত ছিলেন।

এদিকে ঠাকুর বিভিন্ন কথায় নরেন্দ্রের প্রতি অটুট বিশ্বাসমাত্র জানাইয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না; পরন্তু সংসারের কার্যে বিব্রত থাকায় নরেন্দ্র দীর্ঘকাল দক্ষিণেশ্বরে আসিতে পারিতেছেন না দেখিয়া কলিকাতার ভক্তদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তাঁহারা যেন তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া আসেন। তবু নরেন্দ্রের যাওয়া হইল না। অধিকন্তু দশজনের কথা শুনিয়া যখন ভক্তগণও সত্যই নরেন্দ্রের মানসিক অবস্থা-পরীক্ষার্থে তৎসকাশে আসিতে লাগিলেন এবং কথাচ্ছলে আপন আপন সন্দেহ প্রকাশ করিয়া ফেলিতে লাগিলেন, তখন নরেন্দ্র ভাবিলেন, "অবশেষে কি শ্রীরামকৃষ্ণও আমার প্রতি সন্দেহযুক্ত হইলেন?" কাজেই দারুণ অভিমানে স্থির করিলেন, আর দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন না। কিন্তু মনে

মনে ইহাও বুঝিলেন যে, তিনি সাধারণ মানবের ন্যায় সংসারধর্ম-পালনের জন্য পৃথিবীতে আসেন নাই। সুতরাং সর্ববিষয়ে ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, সংসারত্যাগই শ্রেয়ঃ। এমন সময়ে একদিন কলিকাতায় এক ভক্তগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ পদার্পণের সংবাদ পাইয়া নরেন্দ্রনাথ শ্রীগুরুর শেষ দর্শনের জন্য সেখানে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর অমনি ধরিয়া বসিলেন, তাঁহার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইবে। নরেন্দ্র অনেক আপত্তি জানাইলেন; কিন্তু কিছুই কার্যকর হইল না—দক্ষিণেশ্বরে যাইতেই হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া ভাবাবেগে বিভোর ঠাকুর নরেন্দ্রকে আলিঙ্গনপূর্বক সাশ্রুনেত্রে গাহিতে লাগিলেন,

"কথা কহিতে ডরাই, না কহিতে ডরাই;
(আমার) মনে সন্দ হয়—
বুঝি তোমায় হারাই, হা-রাই!"

সে প্রেমের উচ্ছ্বাসে নরেন্দ্রের হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দুই নয়নে অশ্রু উথলিয়া উঠিল। তাঁহাদের এই প্রকার আচরণে বিস্মিত পার্শ্বস্থ সকলেরই অনুসন্ধিৎসা জাগিলেও ঠাকুর কোন কারণ নির্দেশ না করিয়া শুধু বলিলেন, "আমাদের ও একটা হয়ে গেল।" সে রাত্রে সকলে চলিয়া গেলে তিনি নরেন্দ্রকে একান্তে বলিলেন, "জানি আমি, তুমি মার কাজের জন্য এসেছ, সংসারে কখনই থাকিতে পারিবে না; কিন্তু আমি যতদিন আছি, ততদিন আমার জন্য থাক।"

পরদিন শান্তহৃদয়ে নরেন্দ্র গৃহে ফিরিলেন। কিন্তু পরিবারের দুরবস্থা পূর্বেরই ন্যায় চলিতে লাগিল। অগত্যা একদিন তিনি স্থির করিলেন যে, ঠাকুরকে প্রতিবিধানের জন্য ধরিতে হইবে। অতএব দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিলেন, "আপনি মা কালীকে বলে কয়ে আমাদের সাংসারিক দুঃখনিবারণের একটা উপায় করে দিন।"

ঠাকুর বলিলেন, "ওরে আমি কোন দিন মার কাছে কিছু চাই নাই—তবু তোদের যাতে একটু সুবিধা হয়, তজ্জন্য অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তুই তো মাকে মানিস না—তাই মা তোর কথায় কান দেন না।" ব্রাহ্মসমাজের চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত নরেন্দ্র তখনও প্রতিমাপূজায় আস্থাহীন; কিন্তু ঠাকুরের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস; তিনি জানেন, ঠাকুরের ইচ্ছাতে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে। সুতরাং ঐ কথায় নিরস্ত না হইয়া বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ঠাকুর বলিলেন, "যা, মাকে প্রণাম করে প্রার্থনা কর—হয়ে যাবে।" নরেন্দ্র ৺কালীমন্দিরে চলিলেন। সন্ধ্যার সুমধুর আরাত্রিক-ধ্বনি তখন মানবমনের সমস্ত গ্লানি দূরে সরাইয়া এক প্রশান্ত প্রতিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে; আর মায়ের নয়নে রহিয়াছে অপূর্ব করুণাদৃষ্টি এবং ওষ্ঠদ্বয়ে মৃদুমন্দ প্রাণবিমোহক হাস্যরেখা! জীবন্ত দেবী লোককল্যাণে বরাভয়করা হইয়া মানবকে আশ্বাস দিতেছেন—যেন পূর্ব হইতেই শরণাগতের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। নরেন্দ্র প্রণামান্তে ভাবগদ্‌গদ-চিত্তে প্রার্থনা করিলেন: "মা, বিবেক-বৈরাগ্য, জ্ঞান-ভক্তি দাও।" নিঃস্পৃহ-হৃদয়ে নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে ফিরিয়া আসিলে শ্রীগুরু প্রশ্ন করিলেন, "কিরে, মাকে বলেছিস তো?" অমনি দিব্যভাবে আত্মবিস্মৃত নরেন্দ্রের চিত্তদর্পণে সংসারের করালমূর্তি ফুটিয়া উঠিল; তিনি বলিলেন, "না, মশায়, সে কথা বলতে ভুলে গেছি।" ঠাকুর তাঁহাকে পুনর্বার যাইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু বৈরাগ্যের পুঞ্জীভূত-মূর্তি নরেন্দ্রনাথ মাতৃচরণে উপস্থিত হইয়া আবার সংসার ভুলিলেন; তৃতীয় বারেও তাহাই ঘটিল। শেষে বিফলমনোরথ হইয়া ঠাকুরকেই ধরিয়া বসিলেন, "মশায়, আপনাকেই এটা করে দিতে হবে।" অগত্যা ঠাকুর বলিলেন, "যা, মার ইচ্ছায় আর তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের কোন অভাব হবে না।"

নরেন্দ্রের পুরুষোচিত মতিগতি ও তেজস্বিতা-দর্শনে ঠাকুর বিশেষ আনন্দিত হইতেন। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "এর (স্বদেহের) ভিতরে যেটা রয়েছে সেটা শক্তি; ওর (নরেন্দ্রের) ভিতরে যেটা আছে সেটা পুরুষ—ও আমার শ্বশুরঘর।" তিনি জানিতেন, নরেন্দ্র যেন 'খাপখোলা তলোয়ার'—তাঁহার মধ্যে যে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে তাহার তেজে জাগতিক আবর্জনা মুহূর্তে ভস্মসাৎ হইয়া যায়। তাই সকাম ব্যবসায়ী ভক্তের আনীত যে-সকল দ্রব্যাদি তিনি অপরকে আহার করিতে দিতেন না, তাহা দ্বিধাহীন চিত্তে নরেন্দ্রের মুখে তুলিয়া ধরিতেন। নরেন্দ্রের কেহ প্রশংসা করিলে বলিতেন, "তা হবে না কেন গো? ওর জন্যই তো এবার এখানকার (স্বদেহের) আসা।" আরও বলিতেন, "ও অখণ্ডের ঘর—সপ্তর্ষির একজন—নর-নারায়ণ ঋষির নর;" "ও নিত্যসিদ্ধের থাক—ও যেদিন নিজেকে জানতে পারবে, সেদিন আর দেহ রাখবে না;" "ও হচ্ছে আগুন, ওর স্পর্শে পাপ-তাপ সব পুড়ে খাক হয়ে যায়; ও যদি শোর-গরুও খায়, কোন দোষ হবে না।"

এত উচ্চ ধারণা পোষণ করিলেও কিন্তু নরেন্দ্রের ভুল-ভ্রান্তি-সংশোধনে ঠাকুর সর্বদা তৎপর ছিলেন। নরেন্দ্র একদিন অন্ধ-বিশ্বাসের কথা তুলিলে ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "বিশ্বাসের আবার অন্ধ কিরে? বিশ্বাসমাত্রই তো অন্ধ! বিশ্বাসের কি আবার চোখ আছে নাকি? হয় বল শুধু বিশ্বাস, না হয় বল জ্ঞান। তা না হয়ে আবার অন্ধ-বিশ্বাস, চোখ-ওয়ালা বিশ্বাস—এ কি রকম?" নরেন্দ্র নিরাকারবাদী হইলেও অদ্বৈতমতে তাঁহার আস্থা ছিল না। তাই ঠাকুরের মুখে 'সবই ব্রহ্ম' এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "হ্যাঁ, তাও কি কখন হয়? তা হলে ঘটিটাও ব্রহ্ম, বাটিটাও ব্রহ্ম।" এইরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনায়ও বিচলিত না হইয়া অন্তর্দৃষ্টি-

সম্পন্ন ঠাকুর যোগ্য শিষ্যকে অদ্বৈতমার্গেই পরিচালিত করিতেন। সাধারণ ভক্তদিগকে তিনি ভক্তিশাস্ত্রের চর্চায় নিরত রাখিতেন; কিন্তু নরেন্দ্রের অনিচ্ছা জানিয়াও 'অষ্টাবক্রসংহিতা'দি অদ্বৈতমূলক গ্রন্থপাঠের নির্দেশ দিতেন। আবার নরেন্দ্র পাছে শুষ্ক জ্ঞানী হইয়া পড়েন এই ভয়ে প্রায়ই ভক্তপ্রবর গিরিশ বাবু কিংবা শ্রীযুক্তা গোপালের মায়ের সহিত তাঁহার তর্ক বাধাইয়া দিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন।

নরেন্দ্রের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণের এক প্রধান কারণ ছিল এই যে, নরেন্দ্র ঠাকুরের ভাব অপরের তুলনায় অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কোনও এক দিবসে ঠাকুর বৈষ্ণবমতের সারমর্ম সকলকে বুঝাইতে যাইয়া বলিলেন, "তিনটি বিষয় পালন করিতে নিরন্তর যত্নবান থাকিতে ঐ মতে উপদেশ করে—'নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণবপূজন'। যেই নাম সেই ঈশ্বর—নাম-নামী অভেদ জানিয়া সর্বদা অনুরাগের সহিত নাম করিবে; ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জানিয়া সর্বদা সাধু-ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা, পূজা ও বন্দনা করিবে এবং কৃষ্ণেরই জগৎসংসার একথা হৃদয়ে ধারণা করিয়া সর্বজীবে দয়া···।" এই পর্যন্ত বলিয়াই তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। সমাধিভঙ্গে বলিতে লাগিলেন, "জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা! কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।" কথার পরে বাহিরে আসিয়া নরেন্দ্র বলিলেন, "কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম!··· ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল—বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়।··· যাহা হউক, ভগবান যদি কখন দিন দেন তো আজি যাহা শুনিলাম, এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করিব—পণ্ডিত-মূর্খ ধনি-দরিদ্র ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল

সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।" বস্তুতঃ নরনারায়ণের সেবক ভাবী বিবেকানন্দ তখন হইতেই রূপ গ্রহণ করিতেছিলেন।

ক্রমে দক্ষিণেশ্বরের সুমধুর দিনগুলি ফুরাইয়া গেল। ঠাকুর গলরোগে আক্রান্ত হইয়া প্রথমে শ্যামপুকুরে এবং পরে কাশীপুরে আসিলেন। শ্যামপুকুরে নরেন্দ্র সর্বদা যাতায়াত ও তত্ত্বাবধান করিতেন; অনন্তর কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনের পর সেবাশুশ্রূষা-পরিচালনের জন্য সেইখানে রহিয়া গেলেন। কাশীপুরের উদ্যানবাটীটি শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের ইতিহাসে গুরুসেবা, ভগবদারাধনা, তপস্যা ও সংঙ্ঘসৃষ্টির বিভিন্ন প্রচেষ্টার নিদর্শন ও আকররূপে চিরস্মরণীয়। বহু ভক্ত ঠাকুরকে অবতাররূপে স্বীকার করিলেও এক মহাভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন—তাঁহারা ভাবিতেন, ঠাকুরের রোগ একটা লীলামাত্র; উহাতে সত্যসত্যই তাঁহার দৈহিক যন্ত্রণা হয়, এইরূপ মনে করার কারণ নাই। কিন্তু নরেন্দ্র-পরিচালিত যুবকবৃন্দ[২] ঐ সকল বাদ-বিতর্কে যোগ না দিয়া প্রত্যক্ষদৃষ্ট কষ্টকে সত্য বলিয়া স্বীকারপূর্বক নির্বিচারে শ্রীগুরুর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। অথচ নরেন্দ্রের মনে দেব-মানব শ্রীরামকৃষ্ণের লীলায় এইরূপ এক অনুপম বিশ্বাস ছিল, যাহাকে কেবল মানুষ বা দেবতার মাপকাঠিতে পরীক্ষা করা চলে না। একদা অনেকের মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল, হয়তো বা অসাবধানতাবশতঃ সেবকদের দেহেও শ্রীরামকৃষ্ণের রোগ সংক্রামিত হইবে। অমনি বিশ্বাসের প্রতিমূর্তি জ্বলন্তপাবকসদৃশ নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিষ্ঠীবনমিশ্রিত পথ্যের পাত্রটি হস্তে লইয়া অম্লানবদনে অবশিষ্ট পথ্য পান করিলেন—সন্দেহ চিরতরে নিস্তব্ধ হইয়া গেল!

কাশীপুরে অবস্থানকালে গুরুভ্রাতৃগণ নরেন্দ্রের প্রেরণায় শাস্ত্রপাঠ ও

২। রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, লাটু, তারক, গোপালদাদা (বুড়ো), কালী, শশী, শরৎ, (ছট্‌কো) গোপাল।

সাধনাদিতে বিশেষ মনোনিবেশ করেন। তাঁহাদের অবসরকাল কঠিন তত্ত্বালোচনায় মুখরিত হইয়া উঠিত; আবার গভীর নিশীথের অন্ধকার ধ্যাননিরত যুবকদের সম্মুখে প্রজ্বলিত ধূনির আলোকে উদ্ভাসিত হইত। নরেন্দ্র ঐ সময়ে কখন কখনও দক্ষিণেশ্বরে ধ্যানাদির জন্য যাইতেন। একদা তিনি বুদ্ধের ভাবে এতই প্রভাবিত হইয়া পড়েন যে, তারক (শিবানন্দ) ও কালী (অভেদানন্দ)-কে সঙ্গে লইয়া বুদ্ধগয়ায় গমনপূর্বক তথায় তিন রাত্রি কাটাইয়া আসেন।

কাশীপুরে সাধনায় মগ্ন নরেন্দ্রের মন শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় বহু অনুভূতি-লাভে সমর্থ হয়। তিনি ধ্যানকালে ললাটমধ্যে এক ত্রিকোণাকার জ্যোতিঃ দর্শন করিতেন—ঠাকুর উহাকে ব্রহ্মযোনি বলিয়া নির্দেশ করেন। অনেক সময়ে নরেন্দ্র দেখিতেন, ধূনির পার্শ্বে নানা দেবদেবীর সমাগম হইয়াছে। এই সাধনার ফলে এক সময় তাঁহার অনুভূতি জাগিল যে, তাঁহার মধ্যে এইরূপ আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে, যাহা অপরে সংক্রামিত করা চলে। সুতরাং পরীক্ষাচ্ছলে শিবরাত্রির গভীর নিশীথে ধ্যানকালে অভেদানন্দকে স্বীয় অঙ্গস্পর্শ করিয়া থাকিতে বলিলেন। ঐরূপ করিলে অভেদানন্দের বোধ হইল, যেন একটা বৈদ্যুতিক শক্তি তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।[৩] তদবধি ভক্ত অভেদানন্দ ঘোর বৈদান্তিকে পরিণত হইলেন। পরন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ইহা শুনিয়া নরেন্দ্রকে সাবধান করিয়া দিলেন, তিনি যাহাতে ভবিষ্যতে এইভাবে শক্তির অপপ্রয়োগ না করেন কিংবা অপরের মধ্যে বলপূর্বক বিজাতীয় ভাব সঞ্চার না করেন।

এই কালে নরেন্দ্রের মনে নির্বিকল্প সমাধির আকাঙ্ক্ষা বড়ই তীব্র হইয়া উঠিল। একদিন অন্তরের বাসনা গোপন রাখিতে না পারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে উহা নিবেদন করিলেন। ঠাকুর আশ্বাস দিলেন যে,

৩। 'কথামৃত' ৩য় ভাগ, পরিশিষ্ট, ২য় পরিচ্ছেদ।

তাঁহার দেহ নিরাময় হইলে ঐরূপ ব্যবস্থা হইবে; কিন্তু নরেন্দ্রের তখন বিলম্ব অসহ্য। অগত্যা ঠাকুর বলিলেন, "তুই কি চাস বল?" নরেন্দ্র জানাইলেন, "আমার ইচ্ছা হয়, শুকদেবের মত একেবারে পাঁচ-ছয় দিন সমাধিতে ডুবে থাকি, তারপর শুধু দেহরক্ষার জন্য খানিকটা নীচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে যাই।" ঠাকুর অমনি গম্ভীরকণ্ঠে ধিক্কার দিয়া বলিলেন, "ছিঃ, ছিঃ, তুই এত বড় আধার—তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলুম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটবৃক্ষের মত হবি—তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে—তা না হয়ে কিনা তুই শুধু নিজের মুক্তি চাস!" ঐরূপ তিরস্কারে নরেন্দ্রের নয়নে অজস্র অশ্রু ঝরিতে লাগিল—তিনি বুঝিলেন, ঠাকুরের হৃদয় কত মহান্। কিন্তু তাঁহার আকাঙ্ক্ষা অসম্পূর্ণ রহিল না। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি একদা সন্ধ্যার পরে নির্বিকল্প ভূমিতে আরূঢ় হইলেন—শরীর স্থির নিস্তব্ধ! গোপাল দাদা (অদ্বৈতানন্দ) এই জড়বৎ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে ঠাকুরের নিকট যাইয়া সংবাদ দিলেন, "নরেন্দ্র মরিয়া গিয়াছে।" চারিদিকে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল; কিন্তু তত্ত্ববেত্তা ঠাকুর বলিলেন, "বেশ হয়েছে—থাক্ খানিকক্ষণ ঐরকম হয়ে। ওরই জন্য যে আমায় জ্বালাতন করে তুলেছিল।" রাত্রি এক প্রহর পরে নরেন্দ্র সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুরের নিকট আসিলে তিনি বলিলেন, "কেমন, মা তো আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলে। চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে, তখন আবার চাবি খুলব।" এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের ধ্যান এতই পরিপক্বতা লাভ করিয়াছিল যে, একদিন গিরিশ বাবু তাঁহার সহিত এক বৃক্ষমূলে ধ্যানে বসিয়া দেখিলেন যে, মশকের উপদ্রবে তিনি যদিও চিত্ত-সমাধানে অসমর্থ হইতেছেন, তথাপি নরেন্দ্র শান্তভাবে বসিয়া আছেন; নরেন্দ্রের দেহ

মশকে আচ্ছাদিত বলিলেও চলে, অপিচ গিরিশচন্দ্রের আহ্বানেও তাঁহার কোন সাড়া নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের কিয়দ্দিবস পূর্বে তাঁহার দৈহিক যন্ত্রণা-নিবারণের কোনও উপায় নির্ধারণে অসমর্থ হইয়া নরেন্দ্র হতাশভাবে উন্মাদপ্রায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। এমন কি, একদিন সন্ধ্যার পর হইতেই গগনবিদারক 'রাম রাম' শব্দ উচ্চারণপূর্বক বাগানের সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত রাত্রি কাটাইলেন। শেষরাত্রে ঠাকুর তাঁহার কণ্ঠধ্বনি-শ্রবণে নিকটে ডাকাইয়া আনিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন, "হ্যাঁরে, তুই ও রকম কচ্ছিস কেন? ওতে কি হবে?" কিঞ্চিৎ থামিয়া পুনঃ বলিলেন, "ভাখ্, তুই এখন যেমন কচ্ছিস, এমনি বারটা বছর মাথার উপর দিয়ে ঝড়ের মতন বয়ে গেছে। তুই আর এক রাত্তিরে কি করবি, বাবা!"

লীলাসংবরণের কয়েক দিন পূর্ব হইতেই ঠাকুর নরেন্দ্রকে প্রত্যহ সন্ধ্যায় আপনার সকাশে ডাকিতেন এবং সকলকে বাহিরে যাইতে আদেশ করিয়া রুদ্ধদ্বার কক্ষে দুই-তিন ঘণ্টাকাল যাবৎ বিবিধ উপদেশ দিতেন। তিন-চারি দিবস পূর্বে তাঁহাকে সম্মুখে বসাইয়া তিনি সমাধিমগ্ন হইলে নরেন্দ্র অনুভব করিলেন, যেন একটা সূক্ষ্ম তেজঃরশ্মি বিদ্যুৎ-কম্পনের ন্যায় তাঁহার দেহে সঞ্চারিত হইতেছে। ক্রমে তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখেন, সমাধিব্যুত্থিত শ্রীরামকৃষ্ণের চক্ষে জলধারা; কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিলেন, "আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকীর হলুম! তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করবি। কাজ শেষ হলে পরে ফিরে যাবি।" ঠাকুর বিদায় লইতেছেন বুঝিয়া নরেন্দ্রের বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না—শুধু গণ্ড বহিয়া বিগলিতধারায় অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। লীলাশেষের দুই দিন পূর্বে

আর একবার নরেন্দ্রকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "ত্যাখ্, নরেন, তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি। কারণ তুই সব চেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালবেসে, যাতে আর ঘরে ফিরে না গিয়ে এক স্থানে থেকে খুব সাধন-ভজনে মন দেয় তার ব্যবস্থা করবি।" ক্রমে বিদায়ের অতি বিষাদময় সুর বাজিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় একদিন নরেন্দ্রের মনে অকস্মাৎ চিন্তা জাগিল, "আচ্ছা, উনি তো অনেক সময় নিজেকে ভগবানের অবতার বলে পরিচয় দিয়েছেন, এখন এই সময়ে যদি বলতে পারেন 'আমি ভগবান' তবেই বিশ্বাস করি।" মানবের দুর্দমনীয় সন্দেহ যেন আজ অকস্মাৎ নরেন্দ্রের মন-অবলম্বনে মূর্ত হইয়া উঠিল, আর অমনি লীলাধৃতবিগ্রহ মানবের ভগবান এই নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও নরেন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "এখনও তোর জ্ঞান হল না? সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ—তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।" কৃতাপরাধ নরেন্দ্র মৌনবিস্ময়ে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। ইহার দুই দিবস পরে (১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট), ৩১শে শ্রাবণ, ঝুলনপূর্ণিমার রাত্রে ১টা ৬ মিনিটে ঠাকুর মহাসমাধিতে মগ্ন হইলেন।

সেই মর্মন্তুদ বিচ্ছেদের পর এক সপ্তাহের মধ্যেই একরাত্রে উদ্যানে ভ্রমণনিরত নরেন্দ্র দেখিলেন, সম্মুখে ঠাকুরের জ্যোতির্ময় মূর্তি। চক্ষুর ভ্রম মনে করিয়া তিনি নির্বাক রহিলেন। কিন্তু পার্শ্বস্থিত গুরুভ্রাতা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "নরেন, দেখ দেখ।" সংশয় দূর হইল—নরেন্দ্র বুঝিলেন, ঠাকুরের স্থূলদেহ নষ্ট হইলেও তিনি শাশ্বত জ্যোতির্ময়দেহে দর্শন দিতে আসিয়াছেন। অমনি সকলকে নরেন্দ্র ডাকিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহারা আসিবার পূর্বেই সে মূর্তি অদৃশ্য হইল।

কাশীপুরত্যাগ হইতে আমেরিকাযাত্রা পর্যন্ত নরেন্দ্রের জীবনের

বহু ঘটনা অপর গুরুভ্রাতাদের জীবনের সহিত বিজড়িত বলিয়া আমাদিগকে অন্য প্রবন্ধেও আলোচনা করিতে হইবে; অতএব পুনরুক্তিভয়ে এখানে কেবল প্রধান ঘটনাগুলি সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের স্বল্প পরেই ভক্ত সুরেন্দ্রনাথের উৎসাহে ও অর্থব্যয়ে বরাহনগরে মঠ-স্থাপনান্তে নরেন্দ্রের অন্যতম প্রধান কার্য হইল যুবক-গুরুভ্রাতাদের গৃহে গৃহে যাইয়া তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসে প্রণোদিত করা। এইরূপে প্রধানতঃ তাঁহারই অনুপ্রেরণায় গৃহে প্রত্যাগত যুবকগণ ক্রমে মঠে সমবেত হইতে থাকিলেন। একটি বিশেষ ঘটনা-অবলম্বনে এই সঙ্ঘরচনা সুগম হইয়াছিল। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের বড়দিনের সময় যুবক-ভক্তদের অনেকেই[৪] আঁটপুরে বাবুরামের বাটীতে গমন করেন। সেখানে বৃক্ষমূলে ধুনি জ্বালাইয়া সদালোচনা চলিত। একরাত্রি ভাববিহ্বল নরেন্দ্র উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে ঈশার ত্যাগ, বৈরাগ্য, পবিত্রতা ও প্রেমের কথা বলিতে বলিতে সন্ন্যাসি-জীবনের তপশ্চর্যা, আত্মনিবেদন, কষ্টসহিষ্ণুতা ইত্যাদির আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা সকলের মনে এরূপ দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিলেন যে, তদ্ভাবে ভাবিত যুবকগণ তখনই সঙ্কল্প করিলেন তাঁহাদের ভাবী জীবন ঐ আদর্শেই পরি-চালিত হইবে। এই দিব্যভাবের আবেশ কাটিয়া গেলে তাঁহারা সবিস্ময়ে জানিতে পারিলেন যে, উহা ঈশার আবির্ভাবের প্রাক্‌সন্ধ্যা। আঁটপুর হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইঁহারা যখন সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলেন তখন নরেন্দ্রের নাম হইল বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বরাহনগর মঠের প্রাণ—তাঁহার পরিচালনায় তখন চলিয়াছিল শাস্ত্রপাঠ, বিচার, পূজা, ধ্যান, তপস্যা। জীর্ণগৃহে বাস, উদরে প্রায়শঃ অন্ন নাই, অন্নের সহিত ব্যঞ্জনের সংস্পর্শ অতীব বিরল—আর সঙ্গে সঙ্গে মঠের জন্য হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম! কিন্তু সেদিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ

৪। নরেন্দ্র, বাবুরাম, শরৎ, শশী, তারক, কালী, নিরঞ্জন, গঙ্গাধর, সারদা।

নাই—শ্রীরামকৃষ্ণচরণে সমর্পিতপ্রাণ যুবকগণ তখন ঈশ্বরলাভকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া জানেন। এইরূপে ১৮৮৬ হইতে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় বৎসর বরাহনগর মঠ রামকৃষ্ণসঙ্ঘের ইতিহাসে অভূত-পূর্ব ত্যাগবৈরাগ্যের ও একনিষ্ঠ সাধনার এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ শৈশবে মাতা ও পিতার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছেন; যৌবন-প্রারম্ভে শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে বসিয়া সনাতনধর্মের পীযূষপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন; সম্প্রতি ভারতভ্রমণপূর্বক উহার চিরন্তন সংস্কৃতির পরিচয়গ্রহণের সময় সমাগত। বিধির পরিচালনায় ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পদব্রজে ভ্রমণের ফলে পরিব্রাজক বিবেকানন্দের চিত্তে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছিল, পরবর্তী জীবনে উহাই তাঁহার নবযুগের বাণীকে রূপ প্রদানপূর্বক সাধারণের পক্ষে গ্রহণীয় করিয়া তুলিয়াছিল। নবভাবপ্রচারের উৎসরূপে বরাহনগরের মঠজীবন গঠন করা যেমন যুগপ্রয়োজনে অত্যাবশ্যক ছিল, তেমনি ভারতকে নবভাবে উদ্বুদ্ধ করাও ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। কিন্তু বিবেকানন্দ ছিলেন অল্পায়ু; অতএব শতবৎসরে সমাপ্য সাধনা ও তদনুরূপ সাফল্য এই সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে আত্মবিকাশে অগ্রসর হইয়া তাঁহার জীবনকে এমন এক বিচিত্র মহিমায় সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল, যাহার ইঙ্গিত-মাত্রও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া অসম্ভব।

পরিব্রাজক-জীবনের প্রারম্ভে তিনি দিন কতকের জন্য বরাহনগর হইতে অদৃশ্য হইতেন এবং যাইবার সময় বলিয়া যাইতেন, "এই শেষ, আর ফিরছি না।" কিন্তু প্রতিবারেই নিকটবর্তী কোন স্থানে কিছুদিন কাটাইয়া মঠে ফিরিতেন। অবশেষে দীর্ঘভ্রমণমানসে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মঠ ত্যাগপূর্বক ক্রমে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে একদিন

দুর্গাবাড়ি যাইবার পথে একদল বানর তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলে তিনি দ্রুতবেগে পলাইতে লাগিলেন—বানরগণও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অকস্মাৎ একজন সন্ন্যাসী ডাকিয়া বলিলেন, "থাম, থাম, বানরদের সামনে রুখে দাঁড়াও।" বিবেকানন্দ ফিরিয়া দাঁড়াইতেই বানরগণ ভয়ে পলায়ন করিল। স্বামীজী শিক্ষা পাইলেন যে, জীবনযুদ্ধে জয়ী হইতে হইলে বীরবিক্রমে বিপদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে হয়।

কাশীধাম হইতে তিনি অযোধ্যা হইয়া আগ্রায় গেলেন। আগ্রা হইতে বৃন্দাবনে যাইবার পথে কপর্দকহীন পথশ্রান্ত বিবেকানন্দ দেখিলেন, এক ব্যক্তি পথপার্শ্বে আরামে ধূমপান করিতেছে। অমনি তাঁহারও পিপাসাবোধ হওয়ায় তিনি লোকটির নিকট কলিকাটি চাহিলেন; কিন্তু সে পাপভয়ে ভীত হইয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ, হাম ভঙ্গী (মেথর) হ্যাঁয়।" স্বামীজী নিরাশচিত্তে চলিয়া যাইতে যাইতে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন—ভাবিলেন, "সারাজীবন আত্মার অভেদ চিন্তা করিয়া শেষে জাতিভেদের পাকে পড়িলাম—ছিঃ ছিঃ, এখনও সংস্কার!" হাঁটিয়া পূর্ব-স্থানে আসিলেন—লোকটি তখনও বসিয়া আছে; বলিলেন, "বাবা, আমায় শিগ্‌গীর এক ছিলিম তামাক দাও।" সে স্মরণ করাইয়া দিল যে, সে মেথর; কিন্তু কে শুনে সে কথা? স্বামীজী তখন পণ করিয়া আত্মপরীক্ষায় অগ্রসর। তিনি ধূমপান সারিয়া আবার আপন পথ ধরিলেন।

রাধাকুণ্ডে তিনি রাধারানীর মহিমার প্রমাণ পাইয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। কুণ্ডে স্নানের পূর্বে একমাত্র কৌপীন ধৌত করিয়া পার্শ্বে রাখিয়া যেমন জলে নামিয়াছেন অমনি বানর আসিয়া উহা লইয়া গেল। স্নানান্তে তিনি উহা যথাস্থানে না পাইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন যে, উহা বানরের হস্তগত ও ছিন্নভিন্ন। নিষ্কিঞ্চন ভিখারী সন্ন্যাসীর উপর রাধারানীর রাজ্যে এ কি উপদ্রব! উলঙ্গ অবস্থায় লোকালয়ে যাওয়াও চলে

না; কাজেই রাধারানীর উপর অভিমানভরে আত্মগোপনের জন্য দ্রুত বনাভিমুখে চলিলেন। তখনই এক ব্যক্তি তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে আহ্বান করিতে থাকিলে তিনি লক্ষ্যাভিমুখে ছুটিতে লাগিলেন। প্রত্যুত সেই ব্যক্তি নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্বগৃহে যাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইল এবং তথায় লইয়া গিয়া নববস্ত্রাদি-দানান্তে সযত্নে আহার করাইল।

বৃন্দাবন হইতে হাতরাস স্টেশনে উপনীত হইয়া অভুক্ত স্বামীজী এক পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে সহকারী স্টেশনমাস্টার শ্রীযুক্ত শরৎ-চন্দ্র গুপ্তের দৃষ্টি সেই তেজঃপুঞ্জসদৃশ যুবক-সন্ন্যাসীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি বিবিধ খাদ্যসামগ্রী আনাইয়া তাঁহাকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইলেন এবং দৈনিক কর্মাবসানে তাঁহার সান্নিধ্যলাভের আশায় স্বগৃহে লইয়া আসিলেন। শরৎ বাবু ও হাতরাসের অপরাপর ভদ্রলোকদের আগ্রহাতিশয্যে স্বামীজীকে কয়েক দিন বিভিন্ন বাটীতে বাস করিতে হইল। কিন্তু একদিন প্রভাতে উঠিয়া তিনি শরৎ বাবুকে জানাইলেন যে, সন্ন্যাসীর অধিকদিন এক স্থানে থাকা অনুচিত, তাই তিনি অন্যত্র গমনে কৃতসঙ্কল্প। শরৎ বাবু যখন দেখিলেন, স্বামীজীর সঙ্কল্প অপরিবর্তনীয়, তখন সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, "আপনি আমায় আপনার শিষ্য করিয়া লউন।" স্বামীজী প্রথমে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চাহিলেন; কিন্তু শরৎ বাবুর ধনুর্ভঙ্গ-পণ দেখিয়া পরীক্ষাচ্ছলে বলিলেন, "তুমি সত্যই যদি আমার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত থাক, তবে আমার ঐ ভিক্ষাপাত্রটি লইয়া স্টেশনের কুলিদিগের নিকট হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ কর।" শরৎ বাবু অম্লানবদনে তাহাই করিলেন; অতঃপর গৃহসুখে জলাঞ্জলি দিয়া গুরুদেবের সহিত উত্তরাখণ্ডে প্রস্থান করিলেন।[৫] গুরু-শিষ্যের ইচ্ছা ছিল, সেই বারে ৺কেদার-বদরী-দর্শনে যান; কিন্তু শরৎচন্দ্র অসুস্থ

৫। বরাহনগর মঠে গমনান্তে সন্ন্যাসপরিগ্রহণপূর্বক তিনি স্বামী সদানন্দ নামে পরিচিত হন; রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে তাঁহার সুবিদিত নাম ছিল গুপ্ত মহারাজ।

হইয়া পড়ায় উভয়ে হৃষীকেশ হইতে হাতরাসে ফিরিলেন। এখানে আসিয়া স্বামীজীরও অসুখ হইল। এমন সময়ে দৈবক্রমে তথায় উপস্থিত স্বামী শিবানন্দ তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া বরাহনগর মঠে লইয়া গেলেন। এইবারে ভ্রমণের ফলে স্বামীজীর যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, কথাপ্রসঙ্গে উহা প্রকাশ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে আপাত-বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষ আবার এক হইবে।" বলা বাহুল্য, ইহা ভাবুকের কল্পনা-বিলাস নহে ; বাস্তব-আদর্শবাদী বিবেকানন্দের জীবন ইহা কার্যে পরিণত করিতে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

মঠে কয়েক মাস অবস্থানের পর তিনি যোগিশ্রেষ্ঠ পওহারী বাবার দর্শনমানসে গাজীপুরে রায় গগনচন্দ্র বাহাদুরের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ঐ বাটীতে অবস্থানকালে বহু দেশী ও বিদেশী ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে এবং ইতিহাস, সমাজ, দর্শন, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত-শ্রবণে সকলে মুগ্ধ হন। কিন্তু এখানে মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না—বহু চেষ্টায়ও পওহারী বাবার সাক্ষাৎ না পাইয়া তিনি ক্ষুণ্ণমনে বরাহনগরে ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার পরে স্বামীজী বৈদ্যনাথ, প্রয়াগ ও কাশী হইয়া ১৮৯০ সনের জানুয়ারীতে গাজীপুরে গমনপূর্বক গগন বাবু ও বাল্যবন্ধু সতীশ বাবুর বাটীতে কিছুদিন কাটাইয়া অতঃপর পওহারী বাবার দর্শনের সুবিধা হইবে মনে করিয়া বাবাজীর গুহার পার্শ্বে এক নির্জন লেবুবাগানে আশ্রয় লইলেন। কয়েক দিন চেষ্টার পর অবশেষে বাবাজীর দর্শনলাভ হইল—চাক্ষুষ দর্শন নহে, দ্বারপার্শ্ব হইতে আলাপমাত্র। পরিচয় নিবিড়তর হইতে থাকিলে বাবাজী উপদেশ দিয়াছিলেন, "জন্ সাধন, তন্ সিদ্ধি," "গুরুকে ঘরমে গৌকে মাফিক পড়ে রহো"। ক্রমে বাবাজীর প্রতি স্বামীজী অধিকাধিক আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন ; তিনি জানিলেন, বাবাজী হঠযোগী ও রাজযোগী ;

স্বকক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি রাখেন ও তাঁহাকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। বিবেকানন্দ স্থির করিলেন, যোগমার্গে সিদ্ধিলাভের জন্য বাবাজীর নিকট দীক্ষা লইবেন। পরন্তু অনুমতি লাভের জন্য স্বামীজী যেমন গুহাভিমুখে চলিলেন অমনি চরণদ্বয় অচল হইল, দেহ অবশ ও ভারী ঠেকিল, মন একটা সঙ্কোচ ও অভিমানের বেদনায় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু তথাপি তিনি স্বীয় সঙ্কল্পে অটল রহিলেন এবং বাবাজীর নিকট যথেষ্ট আশা-ভরসা পাইয়া দীক্ষার দিন স্থির করিলেন। এদিকে নির্দিষ্ট দিনের পূর্বরাত্রে শয্যায় শয়ান বিবেকানন্দের মনে এই সকল চিন্তারই আলোড়ন চলিয়াছে, এমন সময় দেখেন, অন্ধকার গৃহ উদ্ভাসিত করিয়া পরমহংস-দেবের মূর্তি সম্মুখে উপস্থিত—সেই মুদিতবদন করুণ মূর্তির স্নেহসিক্ত নয়ন দুইটি তাঁহারই চক্ষে সংলগ্ন। বেদনাক্লিষ্ট সেই দৃষ্টিতে ব্যথিত স্বামীজীর সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত ও কম্পিত হইতে লাগিল—তিনি বলিলেন, "না না, তা কখনই হবে না—রামকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহই এ হৃদয়ে স্থান পাইবে না—জয় রামকৃষ্ণ।" কিন্তু সন্দেহ ঘুচিল না। সুতরাং পরীক্ষাচ্ছলে দুই-এক দিন পরে আবার ইচ্ছাপূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি অপসারিত করিয়া তৎস্থলে বাবাজীকে বসাইতে সচেষ্ট হইলেন, অমনি পুনর্বার শ্রীরামকৃষ্ণের সেই সকরুণ জ্যোতির্ময় মুখখানি সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চেষ্টা বিফল করিল। পাঁচ-ছয় দিন এইরূপ দর্শনলাভের পর স্বামীজী দীক্ষাগ্রহণের বাসনা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিলেন। এতদ্ব্যতীত স্বামীজী দেখিলেন যে, বাবাজী কোন কোন বিষয়ে স্বামীজীর নিকট শিক্ষার্থী; অতএব বাবাজীর মুখাপেক্ষী না হইয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অতুলনীয় প্রেমে চিরাবদ্ধ রহিয়া গেলেন।

স্বামীজী গাজীপুর হইতে কাশীতে আগমনপূর্বক প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের আতিথ্যগ্রহণ করিলেন। গাজীপুর থাকাকালেই সংবাদ

পাইয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় কঠিন পীড়াগ্রস্ত। অধুনা সংবাদ আসিল যে, ভক্তবর বলরাম বসুও শয্যাগত। ইহাতে বিবেকানন্দ বড়ই বিচলিত হইলেন; পরন্তু সেরূপ কাতরতাদর্শনে প্রমদাদাস বাবু তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, সন্ন্যাসীর পক্ষে উহা অনুচিত, কারণ উহা মায়ারই রূপান্তরমাত্র। ইহার উত্তরে স্বামীজী জানাইলেন, "বলেন কি, সন্ন্যাসী হইয়াছি বলিয়া হৃদয়টা বিসর্জন দিব? যে সন্ন্যাসে হৃদয় পাষাণ করিতে উপদেশ দেয়, আমি সে সন্ন্যাস গ্রাহ্য করি না।" ফলেও দেখা গেল যে, হৃদয়বান সন্ন্যাসী অচিরে বলরাম বাবুর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু বিধির নির্বন্ধ কে খণ্ডাইবে? ১৩ই এপ্রিল বলরামবাবু বাঞ্ছিতলোকে চলিয়া গেলেন এবং ২৫শে মে সুরেন্দ্রনাথও শ্রীরামকৃষ্ণপদে লীন হইলেন।

দুই মাসাধিক মঠে অবস্থানের পর স্বামীজী ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পুনবার উত্তরপশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন—পথপ্রদর্শকরূপে সঙ্গে চলিলেন তিব্বত ও হিমালয়ভ্রমণে অভিজ্ঞ স্বামী অখণ্ডানন্দ। এই ভ্রমণকালে নৈনিতাল হইতে বদরিকাশ্রমগমণের পথে স্বামীজী একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন হন এবং ধ্যানান্তে অখণ্ডানন্দকে জানান যে, সেদিন তাঁহার এক অপূর্ব অনুভূতি হইয়াছে। অখণ্ডানন্দ পরে স্বামীজীর দিনলিপি খুলিয়া দেখিলেন, লিখিত আছে "আমি আজ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের একাত্মতা অনুভব করিয়াছি—বিশ্বের যা কিছু সব এই ক্ষুদ্র দেহমধ্যে আছে; দেখিলাম, প্রতি পরমাণুমধ্যে বিশ্বসংসার বিদ্যমান। আলমোড়ার অনতিদূরে স্বামীজী ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মূর্ছিতপ্রায় হইয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলে অখণ্ডানন্দ জলের সন্ধানে গেলেন। এমন সময় সম্মুখস্থ গোরস্থানের রক্ষক এক মুসলমান ফকীর একটি শশা খাইতে দিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিল। যথাকালে বিদেশ

প্রত্যাগত জগদ্বিখ্যাত স্বামীজীকে যেদিন আলমোড়াবাসীরা মহাসমারোহে অভ্যর্থনা জানান, সেদিন সভাস্থলের এক কোণে ঐ ফকীরকে দণ্ডায়মান দেখিয়া স্বামীজী তাঁহাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করেন এবং জনতার নিকট জীবনদাতারূপে পরিচিত করিয়া দেন। লব্ধোপকার মহতের উপকারস্মৃতি ও প্রতিদান অতীব অপূর্ব।

অতঃপর তাঁহারা আলমোড়ায় যাইয়া সারদানন্দ ও কৃপানন্দের সহিত মিলিত হইলেন এবং সকলে এক সঙ্গে উত্তরাখণ্ডের তীর্থদর্শনে চলিলেন। ইতোমধ্যে অখণ্ডানন্দ অসুস্থ হওয়ায় স্বামীজীর হিমালয়ভ্রমণ শেষ করিতে হইল এবং চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে অখণ্ডানন্দকে সমভূমিতে প্রেরণ-পূর্বক তিনি অপর গুরুভ্রাতাদের সহিত অগ্রসর হইয়া ক্রমে মুশুরী পাহাড়ের নীচে রাজপুরে তুরীয়ানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপর হৃষীকেশে আগমনপূর্বক তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছিবার কিছুদিন পরেই জ্বরাক্রান্ত হইয়া তাঁহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হইল। দৈবক্রমে একজন সাধু তথায় আসিয়া সমস্ত অবগত হইলেন এবং একটি ঔষধপ্রয়োগপূর্বক আশ্চর্যরূপে তাঁহার জীবনরক্ষা করিলেন।

ইহার পরে স্বামীজী কনখল, শাহারাণপুর প্রভৃতি ঘুরিয়া এবং ব্রহ্মানন্দাদি গুরুভ্রাতাদের সাহচর্যে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত করিয়া রোগমুক্ত অখণ্ডানন্দের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষে সদলবলে মীরাটে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি সাধারণ পুস্তকাগার হইতে সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ গ্রন্থকার লাবকের পুস্তকাবলীর এক এক খণ্ড প্রত্যহ আনিয়া পর দিবস ফেরৎ দিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত গ্রন্থাবলী শেষ হইল; কিন্তু গ্রন্থাগারিকের মনে সন্দেহ লাগিল ইহা বস্তুতঃ অধ্যয়ন নহে, পাণ্ডিত্যের খ্যাতি-অর্জনের জন্য লোকদেখানো প্রহসনমাত্র। সন্দেহ একদিন কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশিত হইয়া পড়িলে স্বামীজী পরীক্ষা দিতে অগ্রসর হইলেন।

গ্রন্থাগারিক বিভিন্ন পুস্তক হইতে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, স্বামীজীও সদুত্তরদানে তাঁহার সন্দেহভঞ্জন করিতে থাকিলেন। অবশেষে গ্রন্থাগারিককে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা সম্বন্ধে স্বামী অখণ্ডানন্দের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বামীজী বলিলেন, "আমি এক একটি শব্দের প্রতি নজর দিয়া পড়ি না, এক একটি বাক্য একেবারে পড়িয়া যাই।"

মীরাটে তিন মাসেরও অধিককাল যাপনান্তে স্বামীজী একাকী ভ্রমণোদ্দেশে সকলকে ত্যাগ করিয়া দিল্লী চলিয়া গেলেন। কিন্তু কেহ কেহ নিষেধ না মানিয়াই কিয়দ্দিবস পরে সেখানে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। স্বামীজী তাঁহাদের সহিত কয়েক দিন কাটাইয়া পুনর্বার রাজপুতনাভিমুখে নিঃসঙ্গ যাত্রা করিলেন; যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "তোমরা আমার সঙ্গ ত্যাগ কর। আমি ভিতর থেকে ইঙ্গিত পাচ্ছি, আমার একা থাকতে হবে। তোমরা যাও, যেমন ধ্যান-ভজন-তপস্যা করছ, তেমনি কর। আমি এবার একলা বেরুব; কোথায় থাকব কাউকে সন্ধান দেব না।" ফলতঃ আমেরিকায় যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার সন্ধান তিনি দেন নাই বলিলেই চলে—যদিও ভালবাসার আকর্ষণে বা ঘটনাচক্রে স্বামী অখণ্ডানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও অভেদানন্দ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে তাঁহার সহিত স্বল্প দিনের জন্য মিলিত হইয়াছিলেন। সেসব কথা আমরা অন্য প্রবন্ধে বলিব।

দিল্লী হইতে ফেব্রুয়ারীর প্রথম ভাগে (১৮৯১) আলোয়ারে পৌঁছিয়া স্বামীজী জনসাধারণের মধ্যে আপনাকে অকাতরে বিলাইয়া দিলেন। বৈষ্ণবভাবে ভাবিত নগরবাসীরা স্বামীজীর অশ্রুসিক্ত বদনে আবেগময় শ্রীকৃষ্ণসঙ্গীত-শ্রবণে সিদ্ধান্ত করিল, "বাবাজী নিশ্চয় বৃন্দাবনচন্দ্রের দর্শন পাইয়াছেন; নতুবা আমরাও তো তাঁহাকে ডাকি; কিন্তু কৈ,

আমাদের তো এমন তন্ময়তা হয় না!" ক্রমে ক্রমে স্বামীজীর উপস্থিতি-সংবাদ আলোয়ার-মহারাজের দেওয়ান রামচন্দ্রজীর কর্ণে পৌঁছিল। সুশিক্ষিত ও অনুভূতিসম্পন্ন স্বামীজীর প্রভাবে ইংরেজ-ভাবাপন্ন মহারাজের মতিগতি পরিবর্তিত হইতে পারে ভাবিয়া একদিন দেওয়ানজী স্বামীজীকে নিজগৃহে লইয়া গেলেন এবং মহারাজকে আমন্ত্রণপূর্বক পরিচয় করাইয়া দিলেন। মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, স্বামীজী, শুনছি আপনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত! তা আপনি তো সহজেই অনেক টাকা উপার্জন করিতে পারেন। ঐ পথ ছাড়িয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ান কেন?" স্বামীজী উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আপনি বলিতে পারেন, আপনি রাজকার্যে অবহেলা প্রদর্শনপূর্বক দিনরাত্রি সাহেবদের সহিত খানা খাইয়া, শিকার করিয়া বেড়ান কেন?" স্বামীজীর এই অসমসাহসিক উত্তরে মহারাজ ক্রুদ্ধ না হইয়া সহজভাবেই বলিলেন যে, তাঁহার ঐরূপ করিতে ভাল লাগে। তখন স্বামীজী জানাইলেন যে, তাঁহারও পক্ষে ঐ একই কথা প্রযোজ্য। আলাপ চলিতে লাগিল। মহারাজ আবার কথাপ্রসঙ্গে মূর্তিপূজায় অবিশ্বাস জ্ঞাপন করিয়া স্বামীজীর অভিমত জানিতে চাহিলেন। ঐ বিষয়ে যুক্তি-তর্কে ফল হইতেছে না দেখিয়া স্বামীজী সম্মুখের প্রাচীরে আলোয়ারের মহারাজের যে ফটোখানি ছিল তাহা আনাইয়া দেওয়ানজীকে আদেশ করিলেন, "ইহাতে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করুন।" উপস্থিত সকলে ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন—"সাধু কি উন্মাদ! প্রাণের ভয় পর্যন্ত নাই!" তখন চারিদিকের সশঙ্ক নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া স্বামীজী বুঝাইয়া দিলেন যে, ছবিতে মহারাজ সশরীরে উপস্থিত না থাকিলেও তাঁহার স্মারকরূপে উহা যেমন শ্রদ্ধেয়, তেমনি ভগবানের প্রতীকসমূহও আমাদের পূজার্হ; অধিকন্তু বিম্ব ও প্রতিবিম্বে যেমন এক হিসাবে প্রভেদ নাই, মূর্তি ও ভগবানেও তেমনি অভেদ। এইরূপে

আলোয়ারে দুই মাস অবস্থানপূর্বক সকলের মনে ধর্মভাব, দেশাত্মবোধ, আত্মবিশ্বাস, প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি উদ্দীপিত করিয়া স্বামীজী ২৮শে মার্চ অন্যত্র চলিলেন।

আলোয়ার হইতে জয়পুরে আসিয়া স্বামীজী তথায় প্রায় দুই সপ্তাহ যাপন করিলেন। জয়পুরে জনৈক বৈয়াকরণের সন্ধান পাইয়া তিনি তাঁহার নিকট পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পণ্ডিতজী তিন দিবস ধরিয়া প্রথম সূত্রটির ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিলেও স্বামীজীর ধারণা হইতেছে না দেখিয়া জানাইলেন যে, এই বিষয়ে তাঁহার দ্বারা আর কোনও বিশেষ উপকার সম্ভব নহে। ইহাতে স্বামীজী লজ্জিত হইয়া স্বয়ং যত্নসহকারে তিন ঘণ্টা ধরিয়া ঐ অংশ পাঠ করিতে লাগিলেন এবং যখন ধারণা হইল যে, উহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তখন পণ্ডিতজীর নিকট ব্যুৎপত্তির পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিতজী তো তাঁহার গূঢ় লক্ষ্যার্থপ্রতিপাদক সুচিন্তিত ব্যাখ্যাশ্রবণে স্তম্ভিত!

অনন্তর স্বামীজীর ভ্রমণের ধারা—জয়পুরের পর আজমীর এবং তাহার পর আবু-পর্বতের রমণীয় পরিবেশের মধ্যে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আট কোটি টাকায় নির্মিত অপরূপ কারুকার্যমণ্ডিত জৈনমন্দির-দর্শন; অতঃপর পুনর্বার আজমীরে আগমন এবং দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শনান্তে ১৪ই এপ্রিল আর একবার আবু-পর্বতে উপস্থিতি। এইবারে আবুতে অবস্থানকালে খেতড়ির মহারাজ ও অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সহিত স্বামীজীর পরিচয় হয়। তাঁহার মধুর ও জ্ঞানগর্ভ বাক্যালাপে বিমুগ্ধ খেতড়ির মহারাজ কিয়দ্দিবস পরেই তাঁহাকে লইয়া স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পরম আহ্লাদে তাঁহার সেবায় রত হইলেন ও তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। রাজসভায় নারায়ণ দাস নামে একজন অভিজ্ঞ বৈয়াকরণ ছিলেন। এই সুযোগ বৃথা যাইতে না দিয়া স্বামীজী তাঁহার নিকট অসমাপ্ত পতঞ্জলির

মহাভাষ্য-অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন এবং স্বীয় ব্যুৎপত্তির জন্য অচিরেই পণ্ডিতজীর প্রশংসালাভে সমর্থ হইলেন। খেতড়ির রাজা অপুত্রক ছিলেন। তিনি একদিন পুত্রলাভের জন্য সানুনয়ে গুরুদেবের আশীর্বাদপ্রার্থী হইলে এইরূপ পরম অনুগত ভক্তের অনুরোধ অনুপেক্ষণীয় জানিয়া স্বামীজী প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। আমরা দেখিব—সত্যসঙ্কল্প ব্রহ্মজ্ঞের এই বরদান যথাকালে সফল হইয়াছিল। এই সময়ে এক নিদাঘসন্ধ্যায় প্রমোদকাননে জনৈকা নর্তকীর বীণাবাদনসম্বলিত সঙ্গীতশ্রবণে মুগ্ধ মহারাজ অকস্মাৎ মনে করিলেন, স্বামীজীকে সেখানে আহ্বানপূর্বক এই সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করানো উচিত। আহ্বানশ্রবণে স্বামীজী আসিলেন বটে; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ ধর্মপ্রসঙ্গের পর যেমনি সেই নর্তকী সঙ্গীত আরম্ভ করিল, অমনি তিনি গাত্রোত্থানপূর্বক গমনে উদ্যত হইলেন। কিন্তু মহারাজ বিশেষ অনুরোধ জানাইলেন যে, ইহা অতি উচ্চস্তরের সঙ্গীত—শুনিলে তিনি আনন্দিত হইবেন। অগত্যা পুনর্বার আসন গ্রহণ করিতে হইল। লোকচক্ষে হীনা, সমাজে অবমানিতা রমণী স্বীয় সঙ্গীতমধ্যে অন্তরের করুণ মিনতি ঢালিয়া দিয়া সুরদাসের একটি পদাবলী গাহিতে লাগিল—

> প্রভু মেরে অওগুণ চিত না ধরো।
> সমদরশী হ্যায় নাম তিহারো, চাহে তো পার করো॥
> ইক লোহা পূজা মে রাখত, ইক রহত ব্যাধঘর পরো,
> পারশকে মন দ্বিধা নহী হৈ, দুহুঁ এক কাঞ্চন করো॥

ভক্তকবির ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ এই অপূর্ব সঙ্গীত তারকাখচিত নীলাকাশের নিম্নে শান্ত নৈশ সমীরণে ভাসিয়া চলিল—স্বামীজী সেই ভাবরাজ্যে মগ্ন হইয়া দেখিলেন, সত্যই তো "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" পতিতা নারীর মধ্যেও আজ আদ্যাশক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মা, আমি

অপরাধ করিয়াছি; আপনাকে অবহেলা করিয়া উঠিয়া যাইতেছিলাম—আপনার গানে আমার চৈতন্য হইল।"

ক্রমে খেতড়ি-ত্যাগের সময় আসিল। অনুরক্ত রাজা ও গরীব প্রজাদের নিকট বিদায়গ্রহণানন্তর স্বামীজী গুজরাট অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। প্রথমে আহমেদাবাদে কতিপয় দিবস অতিবাহনান্তে ক্রমে সৌরাষ্ট্রের লিমড়ি নগরে উপস্থিত হইয়া তিনি অনুসন্ধানে জানিলেন যে, নিকটেই সাধুদিগের একটি নির্জন বাসস্থান আছে—সেখানে অনায়াসে থাকা চলে। স্বামীজী সরলমনেই সেখানে আশ্রয় লইলেন; কিন্তু প্রবেশের পরেই বুঝিতে বাকী রহিল না যে, এই সাধুনামধারী ভণ্ডগণের হস্তে তিনি বন্দী। তাহাদের নেতা স্পষ্টই জানাইল, "আমরা এক বিশেষ সাধনায় রত আছি; উহার সিদ্ধির জন্য আপনার ন্যায় একজন উচ্চদরের সাধুর আকুমার ব্রহ্মচর্য-ভঙ্গের আবশ্যক।" স্বামীজী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; কিন্তু বাহিরে কোন উদ্বেগ না দেখাইয়া শান্তমনে জগদম্বার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পর দিবস একটি পূর্বপরিচিত বালক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি একখানি খোলামকুচিতে কয়লার দ্বারা কয়েকটি শব্দ লিখিয়া তাহার মারফৎ লিমড়ি-রাজের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং এইরূপে প্রায় দুই দিবস এই বন্দিশালায় নরকযন্ত্রণা-ভোগের পর রাজার সাহায্যে উদ্ধার পাইলেন। তার পর কয়দিন রাজভবনেই কাটাইয়া তিনি জুনাগড়ে গেলেন।

জুনাগড়ে তিনি রাজদেওয়ান বাবু হরিদাস বিহারীদাস মহাশয়ের অতিথি হইলেন। এই অবসরে তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও মুসলমান—সর্বসম্প্রদায়ের সুপবিত্র ও সুবিদিত ধর্মক্ষেত্র গির্নার-পর্বতে গমন করেন এবং দত্তাত্রেয় ও তীর্থঙ্করাদির পূত স্মৃতি ও অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে আকৃষ্ট হইয়া একটি গুহাভ্যন্তরে কিয়দ্দিবস ধ্যানধারণায় যাপন করেন।

অতঃপর জুনাগড়ে প্রত্যাবর্তনান্তে বন্ধুদের নিকট বিদায় লইয়া তিনি ভুজরাজ্যাভিমুখে চলিলেন। বিদায়কালে দেওয়ানজী তাঁহার হস্তে ভুজরাজ্যের উচ্চ রাজকর্মচারীদের নামে পরিচয়পত্র লিখিয়া দিলেন। পাঠকের হয়তো কৌতূহল জাগিবে যে, পথচারী কপর্দকহীন পরিব্রাজকের এই কি পরিণতি—তাঁহার কেন রাজদ্বার হইতে রাজদ্বারান্তরে পরিচয়-পত্রহস্তে অভিগমন? কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, রাজ-অতিথি হইলেও তিনি সর্বত্র সর্বদা জনসাধারণের সহিত ধর্মচর্চায় লিপ্ত থাকিতেন। অধিকন্তু লোককল্যাণে উৎসর্গিত-জীবন স্বামীজী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, দেশের ধর্ম, শিক্ষা ও কৃষ্টির উৎকর্ষবিধান এবং আর্থিক উন্নতিসাধন করিতে হইলে নেতৃস্থানীয় সকলের ভাবরাজ্যে এক আমূল পরিবর্তন-আনয়ন আবশ্যক। অতএব স্বয়ং নিঃস্ব হইয়াও তিনি ধনিগণের মনোজয় করিতে অগ্রসর হইলেন। ভুজরাজ্যে উপস্থিত হইয়া তিনি দেওয়ানজীর আতিথ্যগ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার ও ভুজরাজের সাহায্যে দূরে ও নিকটে সমস্ত তীর্থ-গুলি দর্শন করিলেন। অনন্তর জুনাগড় হইয়া ভেরাওয়াল ও সোমনাথ (প্রভাস) অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ঐ সকল তীর্থাদি-দর্শনান্তে তৃতীয়-বার জুনাগড়ে প্রত্যাগমনপূর্বক পোরবন্দর (সুদামাপুরী)-দর্শনে চলিলেন।

পোরবন্দরের মহারাজের সহিত পরিচিত হইয়া তিনি আট-নয় মাস রাজপ্রাসাদেই কাটাইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল অবস্থানের বিশেষ কারণ ছিল। তথায় তাঁহার সংস্কৃতশাস্ত্রাদি-অধ্যয়নের সুযোগ ঘটিয়াছিল এবং তাহা তিনি পূর্ণরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তখন তাঁহার প্রায় সমস্ত দিনই অধ্যয়নে অতিবাহিত হইত। রাজসভার সভাপণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ মহাশয় তখন বেদের অনুবাদকার্যে লিপ্ত ছিলেন; তাঁহার অনুরোধে স্বামীজী তাঁহাকে ঐ কার্যে সাহায্য করিতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নহে; তিনি পাণ্ডুরঙ্গ মহাশয়ের সাহায্যে ফরাসী ভাষাও অনেকটা

আয়ত্ত করিলেন। তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ পাণ্ডুরঙ্গ মহাশয় বারংবার বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহার উপযুক্ত প্রচারক্ষেত্র হইতেছে বিদেশ—সভাসদগণও ইহা অনুমোদন করিলেন। বস্তুতঃ স্বামীজীর মনেও এই চিন্তা পূর্বেই উদিত হইয়াছিল এবং জুনাগড়ে অবস্থানকালে তথাকার অন্যতম রাজকর্মচারী শ্রী সি এইচ পাণ্ডিয়ার নিকট এ অভিলাষ জ্ঞাপনও করিয়াছিলেন। কিন্তু ভবিতব্য যাহাই হউক না কেন, সাধারণ মানবের দৃষ্টিতে ভারতের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইলেও নিঃসম্বল সন্ন্যাসীর পক্ষে উহা তখনও কল্পনাবিলাস মাত্র। অতএব আপাততঃ মনের স্বপ্ন মনেই রাখিয়া, কিংবা অকস্মাৎ আগ্রহবশে দুই-চারি জন বন্ধুকে বলিয়া ফেলিয়া, অবশেষে সুদামাপুরীর মায়া কাটাইয়া তিনি দ্বারকায় উপনীত হইলেন এবং শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত সারদামঠে আশ্রয় লইলেন। মঠের নির্জনকক্ষে তাঁহার অন্যতম গভীর চিন্তার বিষয় হইল—এই আত্মহারা, নিপীড়িত, পরানুকরণরত হিন্দু ভারতের তিনি কি করিতে পারেন? কিন্তু ব্যাকুলতার বৃদ্ধি হইলেও পন্থা তখনও অনাবিষ্কৃতই রহিয়া গেল। এদিকে অশান্ত মন তাঁহাকে অন্যত্র লইয়া চলিল।

অতঃপর মাণ্ডবী, নারায়ণ সরোবর, আশাপুরী ও শত্রুঞ্জয়-পর্বতাদি দর্শনান্তে তিনি খাণ্ডোয়ায় উপনীত হইলেন এবং দৈবক্রমে উকিল হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরিচয় ঘটায় তাঁহারই ভবনে প্রায় তিন সপ্তাহ যাপন করিলেন। খাণ্ডোয়াতেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত ভাবের আদান-প্রদানকালে স্বামীজীর মনে চিকাগো ধর্মসভায় যোগদানের ইচ্ছা সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিল। একদিন হরিদাস বাবুকে বলিয়াও ফেলিলেন, "কেহ আমায় যাতায়াতের খরচ দিলে আমি যাইতে পারি।" কিন্তু তখনও উপযুক্ত সময় আসে নাই; সুতরাং তিনি ৺রামেশ্বর-দর্শনমানসে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া প্রথমে বোম্বাই নগরে পৌঁছিলেন।

১৮৯২ সনের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে বোম্বাইএ পদার্পণান্তে স্বামীজী ব্যারিষ্টার ছবিলদাসের বাটীতে আশ্রয়গ্রহণপূর্বক বেদান্তচর্চায় মন দিলেন। এই সময়ে ঘটনাক্রমে স্বামী অভেদানন্দের সহিত দেখা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "কালী, আমার ভিতর এতটা শক্তি জমিয়াছে যে, ভয় হয় পাছে ফাটিয়া যাই।" বোম্বাই হইতে পুনা যাইবার ট্রেনে একই কক্ষে কয়েকজন ভদ্রলোক স্বামীজীকে দেখিয়া ইংরেজী ভাষায় সন্ন্যাসীদের নিন্দা করিতে থাকেন—তাঁহাদের ধারণা ছিল স্বামীজী ঐ ভাষায় অজ্ঞ। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে স্বামীজীও আলোচনায় যোগদান করিলে সকলে সর্ববিষয়ে তাঁহার তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও অকাট্য সিদ্ধান্ত-দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। ঐ কক্ষে গুণগ্রাহী বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়ও ছিলেন; তিনি স্বামীজীকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া প্রায় এক মাস রাখিলেন। পুনা হইতে স্বামীজী বেলগাঁওয়ে উপস্থিত হন এবং সেখানে প্রথমে একজন মহারাষ্ট্র ভদ্রলোকের ও পরে শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করেন। উভয় স্থলে সর্বদা বহু ধর্মপিপাসু তাঁহার সন্দর্শন ও সদালাপ-শ্রবণের জন্য সমবেত হইতেন। সকলেরই দেখিয়া বিস্ময় জন্মিত যে, স্বামীজী যে শুধু ধর্মের জটিল তত্ত্বগুলি সহজ অথচ মৌলিক প্রণালীতে অতি সুন্দর বুঝাইয়া দিতে পারেন তাহাই নহে, জড়বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি অসাধারণ এবং প্রতিটি কথা ভাবসম্পদে পূর্ণ। স্বামীজীর মনে তখনও চিকাগো যাইবার বাসনা জাগিতেছে—একদিন হরিপদ বাবু উহা জানিতে পারিয়া পূর্ণ উৎসাহে অর্থসংগ্রহ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু স্বামীজী জানাইলেন যে, শুভমুহূর্তের তখনও বিলম্ব আছে—৺রামেশ্বর-দর্শন না করিয়া তিনি অন্য কিছুতেই হাত দিবেন না। অতঃপর সস্ত্রীক হরিপদ বাবুকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়া তিনি ২৭শে অক্টোবর দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন।

কয়েক স্থান ঘুরিয়া স্বামীজী মহীশূরে উপস্থিত হইলেন এবং রাজ্যের দেওয়ান স্যার কে শেষাদ্রি আয়ার মহাশয়ের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহারই আহ্বানে আয়ারগৃহে প্রায় একমাস অতিবাহিত করিলেন। ক্রমে আয়ার মহাশয় মহারাজের সহিতও তাঁহার আলাপ করাইয়া দিলেন। অতঃপর তরুণ আচার্যের গুণে মুগ্ধ মহারাজের আদেশে রাজ-প্রাসাদেই তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, রাজসংসারে বাস সর্বদা অবিমিশ্র শান্তির আকর নহে। একদিন রাজসভায় উপবিষ্ট মহারাজ স্বীয় অমাত্যদিগের সম্বন্ধে স্বামীজীর অভিমত আহ্বান করিলে স্পষ্টভাষী নির্ভীক সন্ন্যাসী জানাইলেন যে, পার্ষদরা সর্বদা সর্বত্র যেরূপ স্বার্থপর ও চাটুবাদী ইত্যাদি হইয়া থাকে, বর্তমান ক্ষেত্রেও তাহাই। কথাপ্রসঙ্গে তিনি দেওয়ানের প্রতি কটাক্ষ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। সভা নিস্তব্ধ! স্পষ্টই মনে হইল, এইরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্য হইলেও অপ্রিয়; সুতরাং ক্ষোভের উদ্রেক হইয়াছে। সভাশেষে মহারাজ স্বামীজীকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, অপ্রিয় সত্য না বলাই উচিত, ইহাতে এইরূপ স্থলে বিষপ্রয়োগে প্রাণহানিও ঘটিতে পারে। স্বামীজী বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া উত্তেজিতকণ্ঠে জানাইলেন, "তোষামোদ চাটুকারদিগের ব্যবসায়—সন্ন্যাসীর ব্যবসায় সত্যকথন।" রাজবাটীতে কখন কখনও অনুরূপ কার্যক্ষেত্রেও তাঁহাকে নামিতে হইত। এক-দিন প্রধান অমাত্যের সভাপতিত্বে এক বেদান্ত-সভায় বহু পণ্ডিত বক্তৃতা করেন। পরে স্বামীজী আহূত হইয়া আপন অনুভূতিদ্বারা লব্ধ বেদান্তের নিগূঢ় তত্ত্ব ও জীবনে উহার প্রয়োগ সম্বন্ধে এইরূপ একটি প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা করিলেন যে, চতুর্দিকে ধন্যবাদ বর্ষিত হইল। অপর একদিন স্বামীজীর গুণাবলীতে বিমুগ্ধ প্রধান অমাত্য মহাশয় স্বীয় সেক্রেটারীর সহিত স্বামীজীকে বাজারে পাঠাইলেন—উদ্দেশ্য,

উপহার-স্বরূপে স্বামীজীর অভিপ্রায়ানুযায়ী কোন একটি মূল্যবান বস্তু, প্রয়োজন হইলে সহস্র মুদ্রাব্যয় করিয়াও, কিনিয়া দিবেন। স্বামীজী সমস্ত দ্রব্য দেখিয়া প্রশংসা করিলেন, কিন্তু কিছুই লইলেন না; অবশেষে সেক্রেটারীর অনুরোধে বলিলেন, "আমাকে এখানকার সর্বোৎকৃষ্ট চুরুট আনিয়া দিন।" ইহাকেই বলে নিঃস্পৃহা! অপর একদিন অমাত্যবর ও স্বামীজীকে স্বকক্ষে আহ্বানপূর্বক মহারাজ জানিতে চাহিলেন, তিনি স্বামীজীর জন্য কি করিতে পারেন। স্বামীজী একঘণ্টা যাবৎ ভারতের উন্নতিবিষয়ে চিত্তগ্রাহী আলাপ-আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহার চিকাগো যাইবার অভিলাষ জানাইলে মহারাজ তৎক্ষণাৎ সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে চাহিলেন। কিন্তু স্বামীজীর সেই এক কথা—৺রামেশ্বর দর্শনের পূর্বে কর্তব্য স্থির করা হইবে না। সম্ভবতঃ ভারতের ভাগ্যবিধাতা তাঁহার বরপুত্রকে বিদেশপ্রেরণের পূর্বে স্বদেশের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

মহীশূর-পরিত্যাগান্তে স্বামীজী প্রথমে কোচিনে গেলেন এবং পরে ডিসেম্বর মাসে ত্রিবান্দ্রামে উপস্থিত হইয়া অধ্যাপক সুন্দররামন্ আয়ারের বাটীতে উঠিলেন। অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও বিদ্বৎসমাজে স্বামীজী শীঘ্রই সুপরিচিত হইলেন। এইরূপে নয় দিবস তথায় যাপনান্তে ২২শে ডিসেম্বর ৺রামেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে মাদুরায় রামনাদ-রাজ ভাস্কর সেতুপতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে সেতুপতি শিষ্যত্বগ্রহণ করিলেন। পরে বহুকালের অভিলষিত ৺রামেশ্বর-দর্শনান্তে স্বামিজী কন্যাকুমারী যাত্রা করিলেন। তথায় মন্দিরে যথাবিধি দেবীদর্শনান্তে বীচিবিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে ভারতের শেষ প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবিষ্ট সন্ন্যাসীর ধ্যাননেত্রের সম্মুখে জাগিয়া উঠিল নিপীড়িত হিন্দুজাতির অসহ্য মর্মবেদনা। সে জাতির উন্নতির মুখ নিরুদ্ধ, অন্তরে গভীর অন্ধকার, আর চারিদিকে

দুঃখ-দারিদ্র্যের পূতিগন্ধময় করাল ছবি। ইহার প্রতিকার সম্ভব কি? এই নিপতিত জাতির উদ্ধার বর্তমান যুগে অন্যের সাহায্য-ব্যতিরেকে সুদূরপরাহত—ইহার আত্মচেতনা জাগাইবার জন্যও বহির্দেশ হইতে আঘাত আসা প্রয়োজন। কিন্তু উপায়? সম্মুখে তরঙ্গায়িত অনন্ত জলরাশি, পশ্চাতে স্পন্দহীন মৃতপ্রায় অস্থিকঙ্কালসার বিশাল জনতা! স্বামীজী সঙ্কল্প করিলেন—এই দুর্লঙ্ঘ্য জলধি অতিক্রম করিয়া বিদেশে ভারতের গৌরব খ্যাপন করিবেন এবং ভারতের অপূর্ব আধ্যাত্মিক ভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত দুই-চারিটি অমূল্য সম্পদ পাশ্চাত্যের হস্তে তুলিয়া দিয়া তাহার প্রতিদানে ভিক্ষা করিয়া লইবেন তাহাদের ইহলৌকিক ঐশ্বর্য-লাভের যাদুমন্ত্র। মৃতপ্রায় জাতিকে জাগাইবার ইহাই কৌশল!

স্থিরসঙ্কল্প, লব্ধালোক স্বামীজী গাত্রোত্থানপূর্বক পুনর্বার উত্তরাভিমুখে চলিলেন। পণ্ডিচেরী হইয়া মাদ্রাজে পদার্পণ করিলে নগরের চিন্তাশীল ও শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় ও যুবকগণ অচিরে তাঁহার ভাবগাম্ভীর্য ও মৌলিকতার পরিচয় পাইয়া উপদেশলাভের অভিলাষে তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ক্রমে অনুরাগীর সংখ্যা বর্ধিত হইয়া একটি বৃহৎ দল গড়িয়া উঠিল। কথাপ্রসঙ্গে ভক্তগণ জানিতে পারিলেন যে, স্বামীজী বিদেশগমনে উৎসুক। ইহা তাঁহাদেরও প্রাণে সাড়া দিল; অতএব ঐ সঙ্কল্পকে রূপদানের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামীজীর মন অকস্মাৎ সংশয়ে দোলায়িত হইল—"আমি কি নিজের খেয়ালে ইহা করিতেছি, কিংবা ইহার মধ্যে বিধাতার গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে?" প্রকাশ্যে ভক্তদিগকে জানাইলেন যে, তিনি জগদম্বার অভিপ্রায় জ্ঞাত না হইয়া সংগৃহীত অর্থগ্রহণে অক্ষম; অতএব উহা দরিদ্রদিগের মধ্যে বণ্টিত হউক—৺মহামায়ার ইচ্ছা হইলে অর্থ আপনিই আসিবে অগত্যা অর্থ বিতরিত হইয়া গেল—স্বামীজীও স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ

করিলেন। অসম্ভব-সাধনের পূর্বে ইহা কি সন্দেহজনিত উন্মাদপ্রায় চিত্ত-চাঞ্চল্য, অথবা উদ্দাম লম্ফনে বেলা অতিক্রমের পূর্বে সমুদ্রপ্রায় ক্ষণিক পশ্চাদপসরণ? কেবল ভবিষ্যৎ ইতিহাসে ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে।

অনন্তর ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগে (১৮৯৩) তিনি হায়দরাবাদে উপস্থিত হইলেন। ১৩ই তারিখে সেকান্দ্রাবাদে মহবুব কলেজে 'আমার পাশ্চাত্ত্যগমনের উদ্দেশ্য' বিষয়ে সহস্রাধিক শ্রোতার সম্মুখে তিনি এক বক্তৃতা প্রদানপূর্বক স্বীয় বিদ্যাবত্তা, ভারতের অমূল্য সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্ত্যের নিকট ভারতের প্রাপ্য সাহায্যাদি সম্বন্ধে সকলকে সচেতন ও সমুৎসুক করিয়া তুলিলেন। ইহার এবং ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনাদির ফলে বহু ব্যক্তি তাঁহার বিদেশযাত্রার ব্যয়ভারবহনের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

হায়দরাবাদ হইতে প্রত্যাগত স্বামীজীকে মাদ্রাজবাসীরা বিপুল সম্বর্ধনা জানাইলেন এবং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া পুনর্বার পাশ্চাত্ত্যগমনের উপযুক্ত অর্থসংগ্রহে তৎপর হইলেন। এবারে স্বামীজী তাঁহাদিগকে বাধা দিলেন না; পরন্তু জগজ্জননীর অভিপ্রায় জানার প্রত্যাশায় মনে মনে প্রার্থনাদিতে নিরত রহিলেন। ইতোমধ্যে এক রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমুদ্রতীর হইতে বরাবর জলের উপর দিয়া অপর কূলের দিকে অগ্রসর হইতেছেন এবং তাঁহাকেও পশ্চাদনুসরণের জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন। পরক্ষণেই নিদ্রাভঙ্গ হইলে মনোমধ্যে এক পরম শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল, আর দৈববাণী শোনা গেল, "যাও।" তথাপি উহাতেই সন্তুষ্ট না হইয়া কলিকাতায় শ্রীশ্রীমাকে পত্র লিখিয়া সমস্ত জানাইলেন এবং তাঁহার আশীর্বাদ চাহিলেন। মাতাঠাকুরানী বহু দিবস পরে স্নেহাস্পদের পত্র পাইয়া একদিকে যেমন আনন্দিত হইলেন, অপর দিকে তেমনি বিদেশে সন্তানের অনিষ্ট-আশঙ্কায় অতিমাত্র ব্যাকুল হইলেন! এই দ্বিধাসঙ্কুল-চিত্তে শয়ন করিয়া এক রাত্রিতে তিনি স্বামীজীরই অনুরূপ এক স্বপ্ন দেখিলেন

ও নরেন্দ্রকে পত্রে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন ; অধিকন্তু গমনেরও অনুমতি দিলেন। পত্র পাইয়া স্বামীজীর বদন উৎসাহে সমুজ্জ্বল হইল এবং সে আগ্রহ শিষ্যদের মধ্যেও সংক্রামিত হওয়ায় দুই-এক দিনের মধ্যেই সমুদ্রযাত্রার সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়া গেল।

এদিকে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাতের দুই বৎসর পরে পুত্রমুখ-সন্দর্শনে অতিমাত্র আহ্লাদিত খেতড়ি-রাজ তাঁহার দ্বারা পুত্রকে আশীর্বাদ করাইবার মানসে স্বীয় প্রাইভেট সেক্রেটারী জগমোহনজীকে মাদ্রাজে পাঠাইলেন। স্বামীজী যদিও জানাইলেন যে, ৩১শে মে তাঁহার যাত্রার দিন অবধারিত হইয়াছে, সুতরাং তৎপূর্বে খেতড়ি যাওয়া অসম্ভব, জগমোহন তথাপি ধরিয়া বসিলেন যে, বন্দোবস্ত প্রভৃতির দায়িত্ব খেতড়ি-রাজের উপর ছাড়িয়া দিয়া অন্ততঃ এক দিনের জন্যও তাঁহাকে তথায় যাইতেই হইবে ; এই নির্বন্ধাতিশয়ে যাইতেই হইল। খেতড়ি হইতে ফিরিবার পথে রাজার অভিপ্রায়ানুসারে জগমোহন বোম্বাই পর্যন্ত সঙ্গে যাইয়া স্বামীজীকে জাহাজে তুলিয়া দিলেন এবং রাজপ্রদত্ত কিঞ্চিৎ অর্থও সঙ্গে দিলেন। ৩১শে মে (১৮৯৩) স্বামীজী বিশাল সমুদ্রলঙ্ঘনের জন্য জাহাজে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর স্বামীজীর জীবনের এক অভিনব অধ্যায়—ভারতের জীবনেও তাহাই। এক আত্মবিস্মৃত জাতিকে জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন দানপূর্বক স্বশক্তিতে অবিশ্বাস দূর করা, পরপদাবনত ভারতকে উন্নতমস্তকে বিশ্ব-সমাজে আপন স্থান অধিকারের জন্য আহ্বান করা, মদদর্পিত পাশ্চাত্ত্য জগতে এক অজ্ঞাতপূর্ব সত্যের অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়া সেই সত্যের আকরের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা এবং পররাজ্যশোষক বিদেশীদিগকে স্বার্থত্যাগপূর্বক বিজিতের সেবায় নিয়োজিত করা বড় সহজসাধ্য কর্ম নহে—অথচ ইহাই বিবেকানন্দ-জীবনের ধনুর্ভঙ্গ-পণ! কে তখন জানিত যে, এই অজ্ঞাতনামা নগণ্য সন্ন্যাসীই ভারতে, তথা সমগ্র বিশ্বে, এক নব ভাবধারার

প্রবর্তন করিবেন, কে ভাবিয়াছিল যে, সামান্য ধর্মমহাসভাকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় সমুজ্জ্বল অধ্যায় বিরচিত হইবে? অথচ অবিশ্বাস্য হইলেও উহা সত্য।

বোম্বাই হইতে সিংহল, সিঙ্গাপুর, হংকং ও জাপান হইয়া স্বামীজী প্রশান্ত মহাসাগরের নীলাম্বুরাশি অতিক্রমপূর্বক ১৬ই জুলাই (১৮৯৩) কানাডা রাজ্যের বঙ্কুবর বন্দরে অবতরণ করিলেন এবং তথা হইতে ট্রেনে আমেরিকার অন্যতম বিশাল মহানগরী চিকাগোতে উপনীত হইলেন। তখন বিশ্বমেলা (World's Fair) চলিতেছে—দেশবিদেশাগত নরনারীতে তখন চারিদিক কোলাহলমুখর। অজ্ঞাতকুলশীল নিঃসম্বল সন্ন্যাসীর স্থান এখানে কোথায়? অপরিচিত বন্ধুহীন বিদেশে বিবেকানন্দের বজ্রদৃঢ় চিত্তও অকস্মাৎ কাঁপিয়া উঠিল। এই ব্যয়বহুল শহরে স্বল্প অর্থ লইয়া কিরূপে দীর্ঘকাল কাটাইবেন? সংবাদ লইয়া জানিলেন যে, ধর্মমহাসভা হইবে সেপ্টেম্বরে। ততদিন হোটেলে বাস করিলে তিনি নিঃসম্বল হইবেন। তাই অনিশ্চিত নিষ্ঠুর ভবিষ্যতের দিকে নিরাশ দৃষ্টিতে তাকাইয়া কম্পিত-হস্তে স্বদেশে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহাকে হয়তো ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইবে—সুতরাং অর্থ চাই। ইতোমধ্যে সংবাদ লইয়া জানিলেন যে, বষ্টনে এতদপেক্ষা ব্যয় কম এবং সেখানে শিক্ষিত লোকের সংখ্যাও অধিক, কাজেই আপাততঃ সেখানে যাওয়াই সমীচীন মনে করিলেন। বষ্টনের পথে রেলে সৌভাগ্যক্রমে ব্রিজি মেডোস নামক গ্রামনিবাসিনী এক বৃদ্ধার সহিত আলাপ হওয়ায় স্বামীজী যেন অকূলে কূল পাইলেন। স্বামীজীর গুণে আকৃষ্টা বৃদ্ধা তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন।

ব্রিজি মেডোসে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাইট মহোদয়ের সহিত আলাপ হওয়ায় তিনি স্বামীজীর ধর্মমহাসভায় যোগদানের সর্বপ্রকার বন্দোবস্তের দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে লইলেন এবং

স্বামীজীকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণের জন্য মহাসভার কর্তৃপক্ষের নামে চিঠি দিয়া তাঁহাকে পুনর্বার চিকাগোয় যাইতে বলিলেন। তদনুসারে চিকাগোয় উপস্থিত হইয়া বৈষয়িক ব্যাপারে অনভ্যস্ত স্বামীজী দেখিলেন, রাইট সাহেব মহাসভার যে ঠিকানা লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা হারাইয়া গিয়াছে। লোকের নিকট সন্ধান করিলেন—কিন্তু সুবিশাল মহানগরে কে কাহার সংবাদ রাখে? ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া নিরুপায় স্বামীজী মালগাড়ি রাখিবার প্রাঙ্গণে একটি প্রকাণ্ড খালি বাক্সের মধ্যে শুইয়া ভগবচ্চিন্তায় প্রচণ্ড শীতের রাত্রি কাটাইলেন। রাত্রিপ্রভাতে হ্রদের ধারে ক্রোড়পতিদের বাটীর সম্মুখে অন্ন ও বাসস্থানের অন্বেষণে ফিরিতে লাগিলেন; কিন্তু ইহা তো ভারতবর্ষ নহে যে, কেহ ভিক্ষুকের প্রতি দয়াপরবশ হইবে! অবশেষে ক্লান্তদেহে নিরাশমনে পথের ধারে বসিয়া পড়িলেন। এমন সময়ে সম্মুখবর্তী হর্ম্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল—একজন মহিলা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি কিনা। স্বামীজী কহিলেন, "হাঁ।" ইহাই যথেষ্ট। স্বামীজী অচিরে শ্রীযুক্ত জর্জ ডব্লিউ হেল মহোদয়ের গৃহে আত্মীয়রূপে সাদরে গৃহীত হইলেন—বিধাতা চোখ ফিরাইয়া চাহিলেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর যথাকালে সাড়ম্বরে মহাসভার উদ্বোধন হইলে সমাগত প্রতিনিধিগণ পর্যায়ক্রমে সভাপতিকর্তৃক আহূত হইয়া আপন আপন বক্তব্য বলিতে লাগিলেন। সকলেই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু কেতাদুরস্ত বক্তৃতায় অনভ্যস্ত স্বামীজী বিদেশে ছয় সাত সহস্র সুশিক্ষিত নরনারীর সম্মুখে এই ভাবে আপন হৃদয়ের কথা জানাইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না; অতএব সভাপতিকর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াও বারংবার "এখন নহে" বলিয়া বিলম্ব করিতে লাগিলেন। অবশেষে সভাপতি আর তাঁহার মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই ঘোষণা করিলেন, "পরবর্তী বক্তা স্বামী বিবেকানন্দ।" অমনি নিরুপায় স্বামীজী

শ্রীরামকৃষ্ণচরণ স্মরণপূর্বক যন্ত্রপরিচালিতবৎ দণ্ডায়মান হইয়া সভাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ!" সে আহ্বানে মন্ত্রের ন্যায় কার্য হইল। সাধারণ নিয়মানুরূপ ভব্যতার পরিবর্তে স্বামীজী সামান্য কয়টি শব্দে সমস্ত মহাসভায় যে অন্তরের বাণী প্রকটিত করিলেন, তৎশ্রবণে আমেরিকাবাসী উৎফুল্ল হইল—চতুর্দিকে মহাশব্দে করতালি-নিনাদ উত্থিত হইল। স্বামীজী কিন্তু প্রথমে বুঝিতেই পারেন নাই যে, গতানুগতিক ধারা পরিত্যাগপূর্বক তিনি যে মর্মস্পর্শী ভাষাপ্রয়োগ করিয়াছেন, উহাতেই সমবেত নরনারীর রুদ্ধ প্রেমের উৎসমুখ অকস্মাৎ উন্মোচিত হইয়া সকলকে ভাববন্যায় ভাসাইতেছে; অতএব কিংকর্তব্যবিমূঢ় স্বামীজী মত্ত জনতার সম্মুখে কিঞ্চিৎকাল মৌনবিস্ময়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে প্রায় পাঁচ মিনিট পরে সভা নিস্তব্ধ হইলে গেরুয়া-গাত্রাবরণ ও উষ্ণীষ-পরিহিত ভারতের সন্ন্যাসী বীরদর্পে বক্ষে হস্তদ্বয় নিবদ্ধ করিয়া এবং পদ্মপলাশলোচনদ্বয়ে জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত করিয়া পুনর্বার গম্ভীর-স্বরে আবেগভরে ভারতের শাশ্বত প্রেমের বাণী শুনাইয়া আসনগ্রহণ করিলেন। সেই দিন হইতে সকলে জানিল, স্বামীজী মহাসভার বিশ্ববিজয়ী বীর—আর তাঁহার নামে অপূর্ব যাদু! ইহার পর কোন দিন সভায় শ্রোতৃবৃন্দকে ধরিয়া রাখিতে হইলে সভাপতিকে ঘোষণা করিতে হইত, ঐ দিন সর্বশেষ বক্তা স্বামী বিবেকানন্দ। সেই দিন হইতে চিকাগো মহানগর স্বামীজীর পদতলে লুটাইয়া পড়িল—আমেরিকার সমস্ত শহর সেই দিন হইতে হিন্দুসন্ন্যাসীর প্রশংসায় শতমুখ হইয়া উঠিল এবং চিকাগোর সর্বত্র বীর সন্ন্যাসীর ত্রিবর্ণ প্রতিচ্ছবি দর্শকের বিস্ময় আকর্ষণ করিতে লাগিল।

চিকাগো মহাসভার বিভিন্ন অধিবেশনে বিবিধ বিষয়ে স্বকীয় ভাষণ শেষ হইয়া গেলে স্বামীজীর বিশ্বাস জন্মিল যে, তখনই দেশে প্রত্যাবর্তন

না করিয়া আরও কিছুকাল আমেরিকায় প্রচারকার্যে রত থাকিলে সুফল ফলিবে। আমেরিকার নরনারীরাও এই বিষয়ে প্রচুর উৎসাহ দেখাইলেন। সুতরাং সর্বত্র বক্তৃতাদি চলিতে লাগিল। কিন্তু সুনাম হইলেই শত্রুবৃদ্ধি হয়। তবে আমেরিকার ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে ইহা তত আশ্চর্যের বিষয় নহে—স্বামীজী তজ্জন্য প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু মর্মান্তিক বিষয় এই যে, যেসকল স্বদেশবাসী তখন আমেরিকায় ছিলেন, তাঁহাদের অনেকেও ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া বিবিধরূপে তাঁহাকে জনসমাজে হেয় করিতে চাহিলেন। প্রত্যুত বিধি যাঁহার সহায় মানুষ তাঁহার কি করিবে? ফলতঃ শত্রুঞ্জয় সন্ন্যাসী এই সকলে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বীরদর্পে মহাদেশের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত হিন্দুধর্মের দুন্দুভি নিনাদিত করিয়া বিজয়মাল্যে ভূষিত হইতে থাকিলেন।

এই বিজয়ের ও এই শত্রুতার ঢেউ অচিরে স্বদেশের কূলেও আসিয়া আঘাত করিল। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলিয়াছিলেন, "নরেন জগৎ মাতাইবে"; মঠের ভাইরা দেখিলেন, আজ ইহা সত্যে পরিণত। আর ভারতের দিকে দিকে লক্ষমুখে উচ্চারিত লইল "জয়, বিবেকানন্দের জয়।" কিন্তু একদিকে স্বধর্মপরায়ণ হিন্দু ভারত যেমন স্বামীজীর নামে মাতিয়া উঠিল, অপরদিকে তেমনি আবার বিদেশী ধর্মপ্রচারক ও স্বদেশী স্বার্থান্বেষী একদেশদর্শীর দল তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। পরন্তু বিদেশের ন্যায় স্বদেশেও সেই ক্ষণিক বিদ্বেষ কিয়ৎকাল গরল উদ্গিরণপূর্বক আপনারই অবমাননা করিয়া অচিরে ক্ষীণপ্রভ হইল—ভারতগগনে স্বামীজীর অমল ধবল যশোরাশি একমাত্র জ্যোতিষ্করূপে বিদ্যমান থাকিয়া অধিকতর ভাস্বর দেখাইতে লাগিল।

অর্থের দিক হইতে স্বামীজী তখনও নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারেন নাই; অতএব প্রয়োজনের তাড়নায় ও অভিজ্ঞতার অভাবে প্রথমতঃ একটি বক্তৃতাকোম্পানির আনুকূল্যে তাহাদেরই পরিকল্পনানুযায়ী আমেরিকার এক

প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, যদিও দেশ-বিদেশের মানবের কল্যাণার্থে তিনি সন্ন্যাসের রীতিবিরুদ্ধ অর্থোপার্জনে পর্যন্ত তৎপর হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেছেন, তথাপি লব্ধ আয়ের ন্যায্য অংশ তাঁহাকে না দিয়া কোম্পানি অধিকাংশ অর্থ আত্মসাৎ করিতেছে। কাজেই তাহাদিগকে ছাড়িয়া তিনি স্বাবলম্বী হইলেন। ইহাতে তাঁহার প্রথমতঃ আর্থিক ক্ষতি হইবে যথেষ্ট—ইহা জানিয়াও তিনি সানন্দে এই স্বাধীন পন্থা বরণপূর্বক এক পত্রে ভারতীয় ভক্তদিগকে কার্যধারা-পরিবর্তনের কারণ জানাইলেন, "এইরূপে যথেষ্ট অর্থসমাগম হইতে লাগিল বটে, কিন্তু পরে হঠাৎ মনে উদিত হইল—এ কি করিতেছি! আমি না সম্পূর্ণ কাম-কাঞ্চনত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য! আমার আধ্যাত্মিক শক্তি যে দিন দিন হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে! তৎক্ষণাৎ ঐরূপ টাকা লইয়া বক্তৃতা করা ছাড়িয়া দিলাম।" ইত্যবকাশে তিনি আমেরিকা ও আমেরিকার সমাজ সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। বক্তৃতার অবসরে তিনি আমেরিকানদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে মিশিতেন এবং পুস্তকাগার, মিউজিয়াম, সভাসমিতিতে যোগদানপূর্বক একদিকে যেমন স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডার বর্ধিত করিতেন, অপরদিকে তেমনি প্রচারের নব নব ক্ষেত্র রচনা করিতেন। অথচ ভাবিয়া অবাক হইতে হয় যে, এইরূপে সর্বদা কর্মব্যাপৃত থাকিলেও তাঁহার মন অনুক্ষণ চিরধ্যানমগ্ন হিমালয়েরই মত আপনাতে ডুবিয়া থাকিত। অনেক সময় ট্রামে চলিতে চলিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া তিনি গন্তব্যস্থল অতিক্রম করিয়া যাইতেন; পরে কণ্ডাক্টর আসিয়া ভাড়ার জন্য তাগাদা করিলে সলজ্জভাবে উহা দিয়া নামিয়া পড়িতেন। আর তিনি সর্বদা বোধ করিতেন, কি এক অদৃশ্য দৈবশক্তি যেন তাঁহাকে হাত ধরিয়া সর্বত্র পরিচালিত করিতেছে! ফলতঃ প্রাচ্যভাবে লালিতপালিত বিবেকানন্দের

এই আমেরিকার কার্যকে তপস্যার নামান্তর বলিলেই চলে—স্বদেশ, স্বজাতি, স্বধর্মের অভ্যুত্থান ও শ্রীরামকৃষ্ণের উদার বাণীর প্রচারকল্পে তিনি এই সমস্ত অভাব-অনটন, ত্রুটি-বিচ্যুতি, লোকলজ্জা প্রভৃতিকে অঙ্গের ভূষণরূপে সহজ সরল ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন—যদিও তজ্জন্য প্রতিমুহূর্তে তাঁহাকে অশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইত।

স্বামীজীকে বিদেশে বিভিন্ন সময়ে কিরূপ বিচিত্র হাবভাব ও পরিবেশের মধ্যে এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন লোকসঙ্গে মিত্রতাস্থাপনপূর্বক স্বকার্য-পরিচালনা করিতে হইত, তাহার দুই-চারিটি দৃষ্টান্ত দিলে মন্দ হইবে না। আমেরিকায় ভ্রমণকালে প্রসিদ্ধ বক্তা ও নাস্তিক ইঙ্গারসোলের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। ইঙ্গারসোল বলিয়াছিলেন যে, তিনি জগৎটাকে ভোগ করিতে চান; কাজেই এই জগদ্রূপ নেবুটাকে নিংড়াইয়া যতটা সম্ভব রস বাহির করিয়া লইতে হইবে। স্বামীজী তদুত্তরে জানাইয়াছিলেন যে, নিংড়াইতেই যদি হয় তবে ভগবানের বিধানে বিশ্বাস রাখিয়া ধীরে-সুস্থে নিংড়ানোই উচিত—অত তাড়াহুড়ার প্রয়োজন কি? ধীরে-সুস্থে নিংড়াইলে বহুগুণ অধিক রস পাওয়া যায়। একবার পশ্চিমের এক নগরে বক্তৃতাকালে কয়েকটি যুবক তাঁহার মুখে বেদান্তবাণী শ্রবণ করিয়া বক্তৃতা ও জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে স্বগ্রামে লইয়া যায়। সেখানে এক উল্টানো পিপার উপর দণ্ডায়মান স্বামীজী বক্তৃতায় মগ্ন আছেন, এমন সময় কানের পাশ দিয়া শোঁ শোঁ শব্দে বন্দুকের গুলি ছুটিতে লাগিল! স্বামীজী তথাপি অবিকম্পিত—বক্তৃতা চলিতেই লাগিল! যুবকরা তাঁহাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেখিয়া সহর্ষে চীৎকার করিয়া উঠিল—"বহুৎ আচ্ছা আদমী!" একবার একস্থানে ট্রেন হইতে অবতীর্ণ তাঁহাকে গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ অভ্যর্থনা করিতেছেন দেখিয়া জনৈক কৃষ্ণকায় নিগ্রো অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমি শুনিয়াছি, আপনি আমাদের জাতির মধ্যে একজন

মস্তবড় লোক হইয়াছেন ; তাই আমি আপনার সহিত করমর্দনের সৌভাগ্যলাভ করিতে আসিয়াছি।" স্বামীজী বুঝিলেন, তাঁহাকে অশ্বেতকায় দেখিয়া ঐ নিগ্রো ভাবিয়াছেন যে, তিনিও নিগ্রো ; পরন্তু তিনি ইহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া, বা দাম্ভিক শ্বেতাঙ্গদের ন্যায় নিগ্রোকে অবমানিত না করিয়া, স্বীয় মৌনদ্বারা নিগ্রোর স্বাজাত্য স্বীকার-পূর্বক সাদরে হস্তপ্রসারণ করিলেন ও তাঁহার করমর্দনান্তে ধন্যবাদ জানাইলেন। এতদ্ব্যতীত অনেক নগরে তাঁহাকে নিগ্রো ভাবিয়া কোন কোন শ্বেতাঙ্গ অপমান করিলেও তিনি আত্মপরিচয় প্রদানপূর্বক সে অপমান হইতে রক্ষা পাইতে চাহিতেন না। পরবর্তিকালে কেহ এই ঔদাসীন্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "কি ! অপরকে ছোট করে বড় হব ? ওজন্য তো আমি জগতে আসি নি।"

এই সময়ে তাঁহাকে বিদ্যুদ্বেগে নগর হইতে নগরান্তরে গমনাগমন করিতে হইত ; অনেক ক্ষেত্রে একসপ্তাহে দ্বাদশ, ত্রয়োদশ বা ততোধিক বক্তৃতাও দিতে হইত। বক্তৃতা প্রস্তুত করার অবকাশ তো ছিলই না, ভাবিবারও সময় ছিল না। পরন্তু অন্তরের গভীরতম স্তরে এক অপূর্ব অনুভূতি সদা জাগ্রত থাকিয়া তাঁহার চিন্তার ধারা নিয়মিত করিত। গভীর রাত্রে মনে হইত যেন, দূরাগত কোন অশরীরী বাণী তাঁহার বক্তৃতার বিষয় নির্দেশ করিয়া দিতেছে ; কিংবা আলোচনায় রত দুইটি বিদেহ আত্মা বিষয়বস্তুর উপর অভিনব আলোকপাত করিতেছে। এই-সব শব্দ অপরেরও শ্রুতিগোচর হইত এবং তাঁহারা অবাক হইয়া ভাবিতেন, স্বামীজী এই গভীর রাত্রে কাহার সহিত আলোচনায় নিরত ! ইহা ছাড়া অন্যান্য যোগজ শক্তিও এই কালে তাঁহার দেহমনে প্রকটিত হইয়াছিল। তিনি ইচ্ছামত অপরের মনোভাব বা অতীত জীবনের ইতিহাস জ্ঞাত হইয়া প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু স্বামীজী স্বয়ং এইসব

শক্তির কবলে পড়িতেন না—তিনি জানিতেন, ইহা শুধু নিম্নস্তরের লোকেরই নিকট কাম্য।

যাহা হউক, বক্তৃতা-কোম্পানির সম্পর্কত্যাগান্তে তিনি আমেরিকার আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকৃত গঠনকার্যে অগ্রসর হইলেন এবং এই জন্য তাঁহার নবীন কার্যধারার মধ্যে ব্যক্তিগত আলোচনা ও ধর্মগ্রন্থাদির ব্যাখ্যা একটি উচ্চ স্থান অধিকার করিল। এইরূপে ডেট্রয়ট, গ্রীনএকার প্রভৃতি স্থানে আলোচনাদির সহায়ে তিনি বহু বন্ধুলাভে সমর্থ হইলেন। এতদ্ব্যতীত ১৮৯৫ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে নিউইয়র্কে ধারাবাহিক বক্তৃতার সূত্রপাত হইল। অর্থের জন্য কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া সঞ্চিত অর্থই তিনি ব্যয় করিতে লাগিলেন এবং আরব্ধ কার্যে পূর্বাপেক্ষা অধিক যত্নপরায়ণ হইলেন। অবশ্য বাধাও আসিতে লাগিল প্রচুর। এমন কি, খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ এক সময়ে মিথ্যাপ্রচারের দ্বারা তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কালিমালেপনেও অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু বেদান্তকেশরী ইহাতে পশ্চাৎপদ না হইয়া সকল বাধাবিপত্তিতে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্বক আরও উদাত্তকণ্ঠে ভারতের শাশ্বত বাণী বিঘোষিত করিতে লাগিলেন এবং শেষ পর্যন্ত জয় হইল তাঁহারই—আমেরিকার শিক্ষিত সমাজ বিবেকানন্দকে লইয়া মাতিয়া উঠিল।

নিউইয়র্কে জ্ঞানযোগ ও রাজযোগ-অবলম্বনে শিক্ষাপ্রদানকালে তিনি যে-সকল বক্তৃতাদি করিতেন তাহা পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এইরূপ মৌখিক শিক্ষা ভিন্ন তিনি ধ্যানাদি-অভ্যাসও করাইতেন। বস্তুতঃ তাঁহার আবাসস্থলটি ক্রমে একটি আশ্রমে পরিণত হইয়াছিল বলিলেই চলে। কর্মকোলাহলপূর্ণ ও বিজাতীয় ভাবধারায় আপ্লুত মার্কিনদেশে এইরূপ ভারতীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি একমাত্র বিবেকানন্দের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল। নিউইয়র্কে কার্যপরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেদান্তপ্রচার-ব্যপদেশে

অন্যত্রও যাইতেন। এতাদৃশ প্রাণপণ পরিশ্রমের ফলে তিনি স্বভাবতঃই বিশেষ ক্লান্তিবোধ করিলেন। সুতরাং স্থির হইল যে, গ্রীষ্মকালে যখন পাঠাদি বন্ধ থাকিবে তখন স্বামীজী জন কয়েক অনুরাগী ভক্তের সহিত সেণ্ট্ লরেন্স্ নদীর মধ্যস্থিত সহস্রদ্বীপোদ্যানে (থাউজেণ্ড আয়লেণ্ড পার্কে) একটি রমণীয় ভবনে বাস করিবেন এবং ঐ সময়ে মাত্র কয়েকজন আগ্রহশীল ভক্তের জীবন নিবিড়ভাবে গঠনে নিযুক্ত থাকিবেন। তথায় তাঁহারা প্রায় দেড় মাস ছিলেন। প্রথমে শিষ্য-সংখ্যা ছিল দশ জন; পরে উহা দ্বাদশ জনে পরিণত হয়। এই দ্বীপোদ্যানে প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় স্বামীজী ভাবমগ্ন হইয়া বিভিন্ন ধর্মপুস্তক-অবলম্বনে যে-সকল উচ্চ ভাবগম্ভীর উপদেশ দিতেন, তাহাই মিস ওয়াল্ডো-কর্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়া পরে 'Inspired Talks' (দেববাণী) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। স্বামীজী ঐ সময়ে কিরূপ উচ্চ অধ্যাত্মভূমিতে অবস্থিত ছিলেন, তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ এই গ্রন্থের প্রতি পঙ্‌ক্তিতে বিদ্যমান।

সহস্রদ্বীপোদ্যানে কার্যাবসানে তিনি শ্রীযুক্তা মূলার ও শ্রীযুক্ত ই টি ষ্টার্ডির আমন্ত্রণে প্যারি শহর হইয়া লণ্ডন যাত্রা করিলেন। লণ্ডনে ষ্টার্ডি সাহেবের আতিথ্য গ্রহণপূর্বক কার্য আরম্ভ করিলে অচিরেই তাঁহার নাম ও যশ সর্বত্র বিস্তৃত হইল। কিন্তু ইংলণ্ডে দীর্ঘকাল বাস অসম্ভব—তথায় থাকিলে আমেরিকায় বহু কষ্টে আরব্ধ এবং সাফল্যমণ্ডিত কার্যটি বিনষ্ট হইবে; কাজেই অপর কোনও সন্ন্যাসীকে ইংলণ্ডে রাখিয়া স্বয়ং আমেরিকায় যাইবেন—এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক তিনি ভারতে নবীন সন্ন্যাসীর জন্য পত্র লিখিয়া ইংলণ্ডে তিন মাস যাপনের পর ৬ই ডিসেম্বর আমেরিকা যাত্রা করিলেন।

এই বারে আমেরিকায় আসিয়া স্বামীজী কর্মযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। উহাও যথাসময়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। স্বামীজী

লিখিয়া বক্তৃতা দিতেন না—বক্তৃতামঞ্চে উঠিয়া যেরূপ অনুপ্রেরণা পাইতেন তদনুযায়ী অনর্গল বলিয়া যাইতেন। ইহাতে তাঁহার মূল্যবান্ উপদেশ বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া ১৮৯৫-এর শেষে একজন সাঙ্কেতিক লিখনবিদ্ নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু স্বামীজীর দ্রুত বাগ্মিতার অনুসরণ করা তাঁহার সাধ্যাতীত দেখিয়া অতঃপর মিঃ গুড্উইন নামক একজন ইংরেজের উপর কার্যভার ন্যস্ত হইল। নবনিযুক্ত লেখক অচিরেই স্বামীজীর গুণে আকৃষ্ট হইয়া অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টা ত্যাগপূর্বক শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। স্বামীজীও গুডউইনের গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাই অল্পকাল পরেই ভারতে যখন শিষ্যের দেহত্যাগ হয়, তখন বলিয়াছিলেন, "আমার দক্ষিণহস্ত স্কন্ধচ্যুত হইল।" যাহা হউক, নূতন ব্যবস্থা-সাহায্যে নিউইয়র্ক নগরে সপ্তাহে সতরটি পর্যন্ত ক্লাস চালাইয়াও স্বামীজীর আধ্যাত্মিক ভাবধারা প্রবাহিত করার আকাঙ্ক্ষা যেন তৃপ্ত হইতেছিল না; তাই তিনি সুযোগ পাইলেই বষ্টন, ব্রুকলিন প্রভৃতি নগরেও বক্তৃতার জন্য যাইতেন। ফলতঃ কর্মচঞ্চল আমেরিকাও এই 'প্রভঞ্জনসদৃশ হিন্দু' (সাইক্লোনিক হিন্দু) ও 'বিদ্যুৎসদৃশ বাগ্মী'কে (লাইট্নিং ওরেটার) দর্শন করিয়া চমকিত হইল।

১৮৯৬ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার বক্তৃতার দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইলে ঐ সকল বক্তৃতাবলম্বনে 'ভক্তিযোগ' রচিত হইয়া গেল। 'মদীয় আচার্যদেব' বক্তৃতাটিও ঐকালেই প্রদত্ত হয়। পূর্ববারে আমেরিকায় অবস্থানকালে কেহ কেহ তাঁহার নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন—এই বারেও একজন সন্ন্যাস লইলেন। এইরূপে স্বামী কৃপানন্দ (হার লিঁও ল্যান্সবার্গ), স্বামী অভয়ানন্দ (ম্যাডাম মেরী লুইস্) ও স্বামী যোগানন্দ (ডাক্তার ষ্ট্রীট) তাঁহার পাশ্চাত্ত্য সন্ন্যাসী শিষ্য হইলেন। অধিকন্তু শ্রীযুক্ত ও শ্রীযুক্তা লেগেট, মিসেস্ ওলি বুল, মিস্ ম্যাক্লাউড প্রভৃতি তাঁহার আমেরিকায় কার্যের সহায় হইলেন।

১৮৯৬ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে 'নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি' স্থাপন করিয়া স্বামীজী আমেরিকার কার্য সম্বন্ধে কতক নিশ্চিন্ত হইলেন। এদিকে ইংলণ্ড হইতেও বারংবার আহ্বান আসিতেছিল। অতএব ১৫ই এপ্রিল পুনর্বার ইংলণ্ডে চলিলেন—আমেরিকায় কার্যপরিচালনার জন্য রহিলেন তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত ও বন্ধুবান্ধবগণ।

মে মাসের প্রথমাবধিই স্বামীজীর লণ্ডনের বক্তৃতাদি আরম্ভ হইয়া গেল। এতদ্ব্যতীত সপ্তাহে পাঁচটি ক্লাস ও প্রতি শুক্রবার প্রশ্নোত্তর-ক্লাস চলিতে লাগিল। এই সঙ্গে বিভিন্ন সভাসমিতির আমন্ত্রণে নগরে এবং বাহিরে অন্যান্য বক্তৃতাদিও হইতে লাগিল। তাঁহার এই লণ্ডন-জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সহিত পরিচয়। এই পরিচয়ের ফলে অধ্যাপক শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অধিকতর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন এবং পরে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী রচনা করেন। এইবারে শ্রীযুক্তা মূলার, শ্রীমতী নোবল (নিবেদিতা), সেভিয়ার-দম্পতি ও শ্রীযুক্তা ষ্টার্ডি স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অধিকন্তু ইংলণ্ডের সংবাদপত্র ও শিক্ষিতসমাজ তাঁহার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠে।

জুলাই মাসে লণ্ডনের অবকাশকাল-আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী ইউরোপ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন—সহযাত্রিরূপে চলিলেন সেভিয়ার-দম্পতি ও শ্রীমতী মূলার। তাঁহারা সুইজারলণ্ডে উপনীত হইয়া দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দর্শনে ব্যাপৃত আছেন, এমন সময়ে জার্মাণীর কীল-নগরনিবাসী দার্শনিক পণ্ডিত পল ডয়সনের পত্র আসিল যে, তিনি স্বামীজীকে আপন ভবনে পাইতে অভিলাষী; সুতরাং আপাততঃ ইউরোপের অন্যান্য স্থান ভ্রমণের সঙ্কল্প অসম্পূর্ণ রহিল। সুইজারলণ্ডের দুই-একটি স্থান দেখিয়াই স্বামীজী জার্মাণীর হাইডেলবার্গ ও বার্লিন নগর হইয়া কীলে উপনীত হইলেন। বিদ্যোৎসাহী ঋষিতুল্য অধ্যাপক স্বামীজীকে পাইয়া সদালাপে বহুক্ষণ

অতিবাহিত করিলেন এবং প্রথম পরিচয়েই বন্ধুত্বে পরিণত হইল। অধ্যাপকের ইচ্ছা ছিল, কিছুদিন স্বামীজীর সঙ্গসুখ লাভ করেন; কিন্তু স্বামীজী জানাইলেন যে, প্রায় দেড়মাস ইংলণ্ডের কার্য বন্ধ আছে—উহার পুনরারম্ভ আবশ্যক। অগত্যা অধ্যাপক তাঁহাকে তখনকার মত বিদায় দিয়া একসঙ্গে কিছুদিন ইংলণ্ডে বাস করার অভিপ্রায়ে পুনর্বার হামবার্গে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন এবং সকলে হল্যাণ্ডের রাজধানী আমষ্টার্ডাম হইয়া লণ্ডন যাত্রা করিলেন।

স্বামী সারদানন্দ ইতঃপূর্বেই লণ্ডনে আসিয়াছিলেন এবং পরে স্বামীজীর আদেশে আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারে নিরত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি স্বামী অভেদানন্দও লণ্ডনে আসিয়া সেখানকার কার্যভার লইলে স্বামীজী বুঝিতে পারিলেন যে, প্রতীচ্যে তাঁহার আরব্ধ কার্যের সুব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে—এখন তাঁহার ভারতে গমন আবশ্যক। তদনুসারে ১৬ই ডিসেম্বর (১৮৯৬) তিনি সেভিয়ার-দম্পতিকে সঙ্গে লইয়া লণ্ডন হইতে যাত্রা করিলেন। পথে ইটালির প্রাচীন সংস্কৃতির নিদর্শন দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। ভূমধ্যসাগরে নেপল্স্ ও পোর্টসৈয়দের মধ্যবর্তী স্থানে তিনি এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখিলেন—দেখিলেন, এক পক্কশ্মশ্রু বৃদ্ধ বলিতেছেন, "তুমি এক্ষণে ক্রীটদ্বীপের সন্নিকটে; এই স্থান হইতেই খ্রীষ্টধর্মের উৎপত্তি।" স্বামীজীকে উক্ত বৃদ্ধ আরও বুঝাইয়া দিলেন যে, বৌদ্ধদিগের 'থেরা-পুত্ত' ও 'আসীন' নামক শ্রমণ-সম্প্রদায়দ্বয়ই কালে 'থেরাপুটী' ও 'এসেনী' নামে খ্যাতিলাভ করে এবং উহাদেরই নিকট হইতে পরে খ্রীষ্টীয় মতের উপাদান সংগৃহীত হয়। এই স্বপ্ন বা অনুভূতি স্বামীজীর মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল এবং ভারতই যে জগতের সমস্ত ধর্মের আদিম উৎস, এই বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়াছিল। এডেনের একটি ঘটনায় দরিদ্রের ও স্বদেশবাসীর

প্রতি স্বামীজীর অনাবিল প্রীতি-দর্শনে চমৎকৃত হইতে হয়। জাহাজ এডেনে থামিলে তিনি ভ্রমণোদ্দেশ্যে তীরে নামিয়া দেখিলেন, দূরে একজন ভারতীয় পানবিক্রেতার দোকান রহিয়াছে। অমনি ইংরেজ বন্ধুদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া ঐ পানওয়ালার নিকটে গমনপূর্বক সোল্লাসে বাক্যালাপ আরম্ভ করিলেন। ইংরেজ বন্ধুরা যখন কাছে আসিলেন, তখন স্বামীজী ঐ ব্যক্তিকে বলিতেছেন, "ভাই, তোমার ছিলিমটা দাও তো", এবং উহা পাইয়া সানন্দে ধূমপান করিতেছেন। সেভিয়ার সাহেব অবস্থা দেখিয়া হাস্যসহকারে বলিলেন, "ও, বুঝেছি, এই জন্যই আপনি আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন?" ক্রমে ১৫ই জানুয়ারী 'তমালতালীবনরাজিনীলা' সিংহলের নয়নাভিরাম বেলাভূমি নয়নগোচর হইল এবং জাহাজ শীঘ্রই প্রভাতের নবারুণরাগে রঞ্জিত কলম্বো বন্দরে প্রবেশ করিতে লাগিল। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ এক বিপুল জনতার পুরোবর্তী হইয়া বন্দরেই উপস্থিত ছিলেন— তিনি জাহাজে উঠিয়া বিজয়ী গুরু-ভ্রাতাকে সাদর আলিঙ্গন ও অভ্যর্থনা জানাইলেন। স্বামীজী সন্ধ্যার প্রাক্কালে জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন।

ডেট্রয়টের কয়েকজন অনুরাগীকে স্বামীজী একদিন বলিয়াছিলেন, "এদেশের লোকের নিকট আমার কার্যের মূল্য কতটুকু, আর ইহার কতটুকুই বা তাহারা গ্রহণ করিতে পারে? বাস্তবিক বলিতে গেলে আমার কার্যের প্রকৃত আদর হইতে পারে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে।...কিছুদিন অপেক্ষা কর, দেখিবে ভারতের মর্মস্থল পর্যন্ত আলোড়িত হইবে, তাহার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিবে, বিজয়োল্লাসে ভারতবাসী আমায় বুকে তুলিয়া লইবে।" স্বামীজী তাঁহার স্বদেশকে জানিতেন, স্বদেশবাসীকে চিনিতেন; কিন্তু ভারতে অবতরণের পর যে জয়োল্লাস, সঙ্গীত, স্তবপাঠ, উৎসব, শোভাযাত্রা, নগরসজ্জা, সভাসমিতি প্রভৃতি অবলম্বনে কলম্বো হইতে কাশ্মীর পর্যন্ত সমস্ত ভারতভূমি মাতিয়া উঠিল, তাহা বোধ হয়

তিনিও মানসচক্ষে দেখিতে পান নাই। বাস্তবের নিকট কল্পনাও কোন কোন ক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া থাকে। বিদেশ হইতে প্রত্যাগত বিবেকানন্দের মুখে নব অভিযানের বার্তা শুনিবার জন্য ভারত তখন উন্মুখ। ব্যক্তির ও সমাজের জীবনে ধর্মের প্রাথম্য ও প্রাধান্য বিঘোষণ-পূর্বক পাশ্চাত্ত্যের দৃষ্টিভঙ্গীকে নবভাবে রূপায়িত করা, হিন্দুভাবধারার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজন প্রদর্শনপূর্বক তৎপ্রতি সকলকে আকৃষ্ট করা, অরণ্যের বেদান্তকে কর্মকোলাহলময় সংসারে আনয়নপূর্বক প্রতিগৃহে উহাকে 'কার্যে পরিণত বেদান্ত'রূপে প্রতিষ্ঠিত করা এবং পরস্পরবিবদমান ধর্মসমূহ ও চিন্তাপ্রণালীর সমন্বয়সাধনপূর্বক বিশ্ববাসীকে একসূত্রে গ্রথিত করা যেমন বিবেকানন্দের অমূল্য অবদান, তেমনি প্রতিভাসমুজ্জ্বল দূর-দৃষ্টি-সহায়ে জাতির গৌরবভাস্বর অতীতের প্রাণশক্তির আরাধনাপূর্বক মহাসম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের চিত্র অঙ্কিত করা, মুহ্যমান জাতির ধর্ম সমাজ শিক্ষা শিল্পকলা সাহিত্য—এক কথায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নবজাগরণের উদ্বোধনান্তে সর্বাঙ্গীণ প্রগতি-সাধনে ভারত-ভারতীকে বজ্রনির্ঘোষে প্রাণোন্মাদক আহ্বান জানানো এবং স্বীয় জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা সমস্ত পরিকল্পনাকে রূপ প্রদানপূর্বক সেই আদর্শগ্রহণে সকলকে আমন্ত্রণ করাও বিবেকানন্দ-জীবনের অন্যতর উদ্দেশ্য। কলম্বো হইতে এই নূতন অধ্যায়ের আরম্ভ।

কলম্বো, কাণ্ডি, অনুরাধাপুরম্, জাফনা প্রভৃতি সিংহলের দ্রষ্টব্য স্থানে গমন ও বক্তৃতাদি দ্বারা নবযুগের বাণী বিঘোষণান্তে স্বামীজী দক্ষিণ ভারতের পাম্বান বন্দরে পদার্পণ করিলে রামনাদাধিপতি অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা জানাইলেন। পরে সকলে ৺রামেশ্বর-দর্শনপূর্বক রামনাদে উপনীত হইলেন এবং অনন্তর পরমকুডি, মনমদুরা, কুম্ভকোণম্ হইয়া মাদ্রাজে আসিলেন। পথে অনেক স্থানেই বক্তৃতা করিতে হইল এবং

প্রায় প্রতি স্টেশনেই বহু দর্শনার্থীর আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে হইল। মাদ্রাজ তাঁহাকে রাজসম্মানে আপ্যায়িত করিল এবং মাদ্রাজের শিক্ষিতসমাজ তাঁহার উদার বাণী সর্বান্তঃকরণে গ্রহণপূর্বক উহা ভারতের সর্বত্র প্রচারে মত্ত হইল।

মাদ্রাজ হইতে জাহাজে কলিকাতার সন্নিকটে আসিয়া তিনি যখন ট্রেনে স্বীয় জন্মভূমি ও সাধনক্ষেত্র কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন (২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭), তখন অন্যান্য নগরের ন্যায় কলিকাতাও এই দেব-মানবকে সমুচিত পূজাসহকারে বরণ করিয়া লইল। অভ্যর্থনাদির পর যথাসময়ে স্বামীজী আলমবাজার মঠে গুরুভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপর মহানগরীতে সভাসমিতি ও বক্তৃতাদি চলিতে লাগিল। জনগণকে উদ্বোধিত করিবার ইহা এক অমোঘ উপায় জানিয়া স্বামীজীও নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সোৎসাহে এই সকল কার্যে যোগদানপূর্বক জনসেবায় প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন যে, ইহাতে স্থায়ী ফল হইবে না—স্থায়ী ফললাভের জন্য দৃঢ়মূল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা এবং উপযুক্ত কর্মী প্রস্তুত করা আবশ্যক। আমেরিকায় অবস্থানকালেও তিনি এই বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন এবং ঐ জন্য অর্থের আয়োজনে ও পত্রাদিতে উপযুক্ত উপদেশপ্রদানে ব্যাপৃত ছিলেন। সম্প্রতি কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া ভূমি-সংগ্রহ, প্রতিষ্ঠান-গঠন ও কর্মীদের শিক্ষায় মন দিলেন। পরি-কল্পনা বিরাট; অতএব উদ্যম-উৎসাহও হওয়া চাই বিপুল। প্রত্যুত প্রাণ চাহিলেও শরীর সর্বদা প্রাণের আবেগ মিটাইতে সক্ষম নহে। স্বামীজী বলিতেন, "আমার কার্য হইবে বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষিপ্র এবং বজ্রের ন্যায় দৃঢ়।" এদিকে অন্তর্যামী নিশ্চয়ই অজ্ঞাত ভাষায় তাঁহাকে জানাইয়া দিতেছিলেন যে, ইহলোকে তাঁহার দিন নিতান্তই সুপরিমিত। এই স্বল্পকালের মধ্যে বিশাল কার্যের সুদৃঢ় ভিত্তিস্থাপন করিতে যাইয়া তিনি স্বীয় শক্তিকে দ্রুত

নিঃশেষে ব্যয় করিতে লাগিলেন। সেই উদ্দাম ভাবধারাবহনে অপারগ দেহ তাই অল্পবয়সেই প্রতিপদে স্বীয় অক্ষমতা জানাইয়া অবশেষে কলিকাতা-আগমনের অব্যবহিত পরে আশু বিপদের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিতে লাগিল। সুতরাং স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য অচিরেই তাঁহাকে দার্জিলিং যাইতে হইল।

কর্মকে যিনি স্বেচ্ছায় জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, জীবকল্যাণে যাঁহার হৃদয় কাঁদিয়াছে, সুদৃঢ় হিমালয়ের নিভৃত ক্রোড়েই বা তাঁহার চিন্তার বিরাম কোথায়? অধিকন্তু বিশ্ববিশ্রুত বিবেকানন্দের বিশ্রাম একান্ত আবশ্যক হইলেও উহা তখন অতি দুর্লভ ছিল। তিনি যখন যেখানে যাইতেন, তাঁহার কীর্তি পূর্ব হইতেই সেখানে প্রসারিত হইয়া শত শত গুণগ্রাহীকে নিকটে আকর্ষণ করিত। অতএব আলাপ-আলোচনায় অবশিষ্ট শক্তিটুকুও ক্রমে নিঃশেষিত হইতে লাগিল। ফলতঃ শৈলনিবাসেও বিবিধ ধর্মালোচনা চলিতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে রচিত হইতে থাকিল ভাবী রামকৃষ্ণ মিশনের মানস মূর্তি। এপ্রিল মাসের শেষে মঠে ফিরিয়া স্বামীজী ১লা মে সেই কল্পনাকে রূপদানপূর্বক রামকৃষ্ণ মিশন গড়িয়া তুলিলেন। তিনি স্বয়ং সর্বসম্মতিক্রমে উহার সভাপতি হইলেন এবং স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ হইলেন যথাক্রমে উপসভাপতি ও কলিকাতা-কেন্দ্রের সভাপতি। বলরাম-মন্দিরে সমস্ত সাধু ও গৃহস্থ-ভক্তের উপস্থিতিতে ও শুভেচ্ছাক্রমে এই দীর্ঘকাল-পরিকল্পিত ও বহুজন-বাঞ্ছিত প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করিয়া স্বামীজী অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন—তিনি জানিলেন যে, গুরুদেবের হস্ত হইতে তিনি যে কর্মভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার অন্ততঃ আংশিক সূত্রপাত হইল।

এইরূপে আপাতদৃষ্টিতে একের কর্মভার বহুজনের স্কন্ধে অর্পণের ফলে স্বামীজীর কর্তব্যের লাঘব হইলেও উহাতেই তাঁহার পরিতৃপ্তি ঘটিল না; কারণ প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘকে পরিচালিত করিবে কাহারা? অতএব যুবকদের

শিক্ষাদিতে মনোনিবেশ করা আবশ্যক। এদিকে তাঁহার দেহের অধিকতর অবনতি ঘটিতে থাকায় আলমোড়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। তথাপি স্বাস্থ্যের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কর্মবীর কি নীরব থাকিতে পারেন, অথবা প্রতিকারের প্রয়োজন সর্ববাদিসম্মত হইলেও দৈবপরিচালিত মহামানবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি কেহ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারেন? ফলতঃ আলমোড়া যাত্রার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সমস্ত সময়ই কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে ব্যয়িত হইতে লাগিল—শাস্ত্রাদি-পাঠ, আলাপ-আলোচনা, নব নব পরিকল্পনা ও তদনুরূপ প্রচেষ্টা অব্যাহতই রহিল। এইকালের একটি ঘটনা অতীব স্মরণযোগ্য। একদিন তিনি স্বশিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়কে সায়ণভাষ্যসমেত বেদ অধ্যাপনা করিতেছেন, এমন সময় মহাকবি গিরিশচন্দ্র তথায় উপস্থিত হইলে স্বামীজী রহস্য করিয়া বলিলেন, "জি. সি., তুমি তো এসব কিছুই পড়লে না—শুধু কেষ্ট বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে!" গিরিশ বাবু নিজ দৈন্য জানাইয়া বেদরাশিকে প্রণামপূর্বক বলিলেন, "জয় বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জয়!" পরন্তু লোকচরিত্রবিদ্ গিরিশ বাবু জানিতেন, বিবেকানন্দ বাহিরে যতই জ্ঞানপ্রচার করুন, অন্তর তাঁহার অতীব কোমল। অতএব শিষ্যসকাশে সেই ভাব উন্মোচিত করিবার অভিলাষে ভারতের দুঃখদৈন্যের একখানি মর্মন্তুদ চিত্র স্বীয় কবিসুলভ ভাষায় অঙ্কিত করিয়া অকস্মাৎ প্রশ্ন করিলেন, "বল তো, এসব রহিত করবার কোন উপায় বেদে আছে কিনা?" স্বামীজী ততক্ষণে হৃদয়াবেগ রুদ্ধ করিতে না পারিয়া চক্ষুজলে ভাসিতেছেন। নাট্যাচার্য অমনি শিষ্যকে সেই করুণ মূর্তি দেখাইয়া বিজয়গর্বে বলিলেন, "দেখলি রে, তোর গুরুর হৃদয়টা?" স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধেও স্বামীজী এসময়ে বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং তপস্বিনী মাতার প্রতিষ্ঠিত মহাকালী পাঠশালা-দর্শনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন।

৬ই মে আলমোড়া-যাত্রা হইতে ১৮৯৯ ইং ১৬ই আগস্ট দ্বিতীয় বার আমেরিকা-গমন পর্যন্ত ঘটনাবলী আমাদিগকে সংক্ষেপেই বলিয়া যাইতে হইবে। আলমোড়া হইতে পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া কাশ্মীর-গমনকালে সর্বত্রই তাঁহাকে ইংরেজী ও হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা ও ধর্মপ্রসঙ্গাদি করিতে হইয়াছিল। কাশ্মীর হইতে ফিরিবার পথেও শিয়ালকোট ও লাহোর প্রভৃতি স্থানে তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। তন্মধ্যে লাহোরের বক্তৃতাগুলি অতি চমকপ্রদ ও ভাবগম্ভীর। লাহোর হইতে তিনি দেরাদুনে যান এবং পরে রাজপুতানাভ্রমণে নির্গত হন। অতঃপর ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

এই উত্তরভারত-ভ্রমণকালে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে দুর্ভিক্ষের করালছায়া নিপতিত হওয়ায় রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা স্বামীজীরই অনুপ্রেরণায় তাঁহাদের প্রথম সেবাকার্যে অবতীর্ণ হইলেন। স্বামীজী দূরে থাকিলেও অর্থ ও উপদেশের দ্বারা তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে থাকেন।

স্বামীজীর কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পরেই অলক্ষিতে রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবধারা আর একটি নূতন প্রবাহ-রচনায় অগ্রসর হইল। ২৮শে জানুয়ারী (১৮৯৮) স্বদেশ ও স্বগৃহের মমতা ত্যাগ করিয়া ভগিনী নিবেদিতা ভারতের সেবাকল্পে শ্রীগুরুর চরণসমীপে উপস্থিত হইলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্তা ওলি বুল, শ্রীমতী ম্যাক্‌লাউড ও সেভিয়ার-দম্পতি পূর্বেই আসিয়াছিলেন। অধুনা বিবেকানন্দের কর্তব্য হইল—ইঁহাদিগকে ভারতীয় কার্যের জন্য উপযুক্ত করিয়া তোলা। এই প্রচেষ্টা কতদূর ফলবতী হইয়াছিল আমরা তাহা যথাকালে দেখিতে পাইব।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পরেও দেখা গেল, স্বামীজীর স্বাস্থ্যের উন্নতি না হইয়া দ্রুত অবনতি হইতেছে। অতএব প্রত্যাগমনের প্রায় তিনমাস পরেই (৩০শে মার্চ) তাঁহাকে স্বাস্থ্যলাভার্থে পুনর্বার দার্জিলিং যাইতে হইল।

পরন্তু অনতিকাল পরেই কলিকাতা মহানগরীতে প্লেগ মহামারীরূপে দর্শন দিয়াছে এই সংবাদ পাইয়া স্বামীজী স্থির থাকিতে পারিলেন না—৩রা মে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনপূর্বক সেবাকার্যে নামিলেন। এরূপ কার্যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন; সে অর্থ তখন রামকৃষ্ণ মিশনের স্থায় দরিদ্র প্রতিষ্ঠানের নাই। চিন্তাক্লিষ্ট জনৈক গুরুভ্রাতা স্বামীজীকে প্রশ্ন করিলেন, "স্বামীজী, টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে?" মহাপ্রাণ মহামানব বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া উত্তর দিলেন, "কেন? যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে মঠের জন্য যে নূতন জমি ক্রয় করা হইয়াছে উহা বিক্রয় করিব।" তবে কার্যতঃ ততদূর অগ্রসর হইতে হয় নাই; কারণ দেশের বদান্য ব্যক্তিগণ মুক্তহস্তে দান করিয়া সন্ন্যাসীদের ভাণ্ডারে যথেষ্ট অর্থ তুলিয়া দেওয়ায় সেবা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে থাকিল। ইহার অল্পদিন পরেই প্লেগের প্রকোপ প্রশমিত হওয়ায় এবং সরকারের চেষ্টায় রোগীদের সেবার সুব্যবস্থা হওয়ায় স্বামীজী স্বীয় স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে ১১ই মে আলমোড়া যাত্রা করিলেন। সঙ্গে যাইলেন পাশ্চাত্ত্য শিষ্য ও শিষ্যাবৃন্দ এবং কোন কোন গুরুভ্রাতা।

আলমোড়ায় অবস্থানকালে স্বামীজীর প্রচারকার্যের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা হইল। 'প্রবুদ্ধভারত' নামক একখানি ইংরেজী সাময়িক পত্র মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত হইত; উহার সহিত তিনি বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। এই সময়ে উহার সম্পাদকের মৃত্যু হওয়ায় এবং পত্র কিছুকাল বন্ধ হইয়া যাওয়ায় উহা আলমোড়ায় আনীত হইয়া স্বামীজীর শিষ্য স্বামী স্বরূপানন্দের হস্তে ন্যস্ত হইল এবং সেভিয়ার-দম্পতি উহার বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই দম্পতিরই আনুকূল্যে পরবৎসর মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রম স্থাপিত হয় এবং প্রবুদ্ধভারতও তথায় স্থানান্তরিত হয়। যাহা হউক, এই বারে ১০ই জুন পর্যন্ত স্বামীজী আলমোড়ায় থাকিয়া সদলবলে কাশ্মীর যাত্রা করিলেন।

কাশ্মীরে ৺ক্ষীরভবানীর মন্দির-দর্শনকালে লোককল্যাণব্রতী স্বামীজীর হৃদয়ে এক নবভাবের স্ফোট উঠিল। দেবীর মন্দির বিধর্মীর হস্তে বিধ্বস্ত ও কলুষিত দেখিয়া বিবেকানন্দের মনে যেমনি অতীতের নির্বীর্যতা ও নিষ্ক্রিয়তার প্রতি ধিক্কার-ধ্বনি উত্থিত হইল, অমনি মা-ভবানীর ভৎর্সনাবাণী শুনিতে পাইলেন, "বৎস, আমি মনে করিলে কি অসংখ্য মঠ ও মন্দির স্থাপন করিতে পারি না?—এই মুহূর্তেই কি এখানে সপ্ততল মন্দির উঠিতে পারে না?" এই দৈববাণীর মর্ম উপলব্ধি করিয়া অদম্য কর্মী বিবেকানন্দ মায়ের ইচ্ছাসাগরেই আপন ইচ্ছা বিসর্জন দিলেন—তদবধি যাহা ঘটিবে, সবই মায়ের অঙ্গুলিহেলনে। এখন হইতে তিনি কর্তৃত্বাভিমানবিমুক্ত ও অধ্যাত্মভাবে বিভোর হইলেন—বাহিরের সহিত সম্পর্ক রহিল অতি অল্প। অবশেষে কাশ্মীরভ্রমণ-সমাপনান্তে তিনি ১৮ই অক্টোবর বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানে উপস্থিত হইলেন—মঠ তখন ঐ বাড়িতে।

ইত্যবসরে ১৮৯৮ ইং ৩রা ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্তা ওলি বুলের সৌজন্যে বেলুড়ে স্থায়ী মঠস্থাপনের জন্য ভূমি-ক্রয়ের বায়না হইয়া যথাসময় উহাতে নূতন গৃহাদি-নির্মাণ ও পুরাতন গৃহের সংস্কারাদি পূর্ণবেগে চলিতেছিল। নভেম্বর মাসের প্রারম্ভে উহার কার্য শেষ হইলে ৯ই ডিসেম্বর সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজাদি হইল এবং অবশিষ্ট সমস্ত আয়োজন-সমাপনান্তে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী সাধুবৃন্দ নবীন মঠবাটীতে উঠিয়া আসিলেন। বিবেকানন্দের আর একটি কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইল। ১৮৯৮ এর ১২ই নভেম্বর ৺কালীপূজার দিনে নিবেদিতার পরিকল্পিত বালিকা-বিদ্যালয়েরও সূত্রপাত হইয়াছিল। আবার ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মাঘ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সম্পাদকতা ও পরিচালনায় বঙ্গভাষায় 'উদ্বোধন'-পত্রিকা প্রকাশিত হইলে স্বামীজীর সাফল্য আর একটি স্তর ঊর্ধ্বে

উঠিল। সুতরাং দ্বিতীয় বার পাশ্চাত্ত্য-যাত্রার পূর্বে স্বামীজী নিশ্চিন্ত হইলেন যে, তাঁহার সমস্ত জীবনের আপ্রাণ পরিশ্রম দ্রুত সার্থকতার পথে চলিয়াছে—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা বিবিধরূপে শরীর পরিগ্রহ করিতেছে, আর সমস্ত দেশ তাঁহার আহ্বানে সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এ দিকে দুর্বল শরীরে বক্তৃতাদি করা ক্রমেই অসম্ভব হইয়া পড়িতেছিল। অতএব চিকিৎসকদের পরামর্শে ২০শে জুন (১৮৯৯) তিনি পশ্চিমগমন-মানসে স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত কলিকাতায় জাহাজে উঠিলেন। জাহাজ ৩১শে জুলাই লণ্ডনে পৌঁছিল এবং তাঁহারা ১৬ই আগষ্ট আমেরিকাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কলম্বো হইতে কাশ্মীর পর্যন্ত আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের জন-সাধারণকে কি বার্তা শুনাইয়া গেলেন ? প্রথমেই জানা আবশ্যক যে, পরি-প্রেক্ষিতের বিভিন্নতাবশতঃ তাঁহার বাণী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে দুইটি বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেও মূলতঃ উহা ছিল এক। স্বামীজীর ভারতীয় প্রচেষ্টা যেমন ধর্মবিহীন সমাজসেবামাত্র নহে, পাশ্চাত্ত্য প্রচারও তেমনি শুধু কর্মশূন্য মোক্ষসাধন নহে। স্থান-কাল-পাত্রানুসারে তিনি উভয় সভ্যতাকেই তাহার স্বকীয় আদর্শানুসারে পরিচালিত করিতে চাহিয়াছিলেন, আর চাহিয়া-ছিলেন উভয়ের মধ্যে সম্মানজনক আদান-প্রদান। তাঁহার মতে "অপর জাতির নিকট হইতে আমাদিগকে কিছু বহির্বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে, কিরূপে দলগঠন ও পরিচালন করিতে হয়, বিভিন্ন শক্তিকে প্রণালীবদ্ধ-ভাবে কার্যে লাগাইয়া কিরূপে অল্প চেষ্টায় অধিক ফললাভ করিতে হয়, তাহা শিখিতে হইবে।" কিন্তু প্রত্যেক জাতির এক একটি বিশেষ আদর্শ আছে—"আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম—একমাত্র ধর্ম। উহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড।" এই ভিত্তিকে অবিচল রাখিতে হইবে; অতএব "অপরের নিকট শিক্ষা করিতে গিয়া

অপরের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া নিজের স্বতন্ত্রতা হারাইও না।" ফলতঃ জড়বাদী পাশ্চাত্ত্য সমাজেরও দীর্ঘজীবী হইবার ইচ্ছা থাকিলে এই অধ্যাত্ম-ভিত্তি স্বীকার করিয়া লইতে হইবে—"যদি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয়, তবে উহা আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষের মধ্যে সমূলে বিনষ্ট হইবে।"

ধর্ম বলিতে আচারমাত্র গ্রহণীয় নহে; কারণ ধর্মের অন্তরের সত্তা অপরিবর্তনীয় হইলেও বাহিরের রূপ পরিবর্তনশীল—আচারগুলি ভিতরের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন কিছুই নহে। ভাবহীন আচার উন্নতির সহায়ক না হইয়া জাতির অধঃপতনের কারণ হয়—"আমাদের জাতিভেদ ও অন্যান্য নিয়মাবলী ধর্মের সহিত আপাততঃ সংশ্লিষ্ট বোধ হইলেও বাস্তবিক তাহা নহে। সমগ্র হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য এই সকল নিয়মের আবশ্যক ছিল। যখন এই আত্মরক্ষার প্রয়োজন থাকিবে না, তখন ঐগুলি আপনা হইতেই উঠিয়া যাইবে।" সংস্কার সাধারণতঃ এইরূপ ক্রমাভিব্যক্তিমূলক প্রাকৃতিক নিয়মেই হইয়া থাকে এবং সংস্কারককে এই নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়; নতুবা সাময়িক উত্তেজনায় অথবা পরানুকরণে কিছু করিতে গেলে হিতে বিপরীত হয়—"সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার বাহিরের চেষ্টা দ্বারা হইবে না, মনের উপর কার্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।" বিবেকানন্দ তাই আপনাকে 'আমূল সংস্কারক' বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাঁহার মতে সংস্কারের সর্বোত্তম মাধ্যম হইতেছে শিক্ষা—এমন কোনও সামাজিক ব্যাধি নাই, যাহা শিক্ষাপ্রভাবে বিদূরিত না হয়। তবে আধুনিক শিক্ষার আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়া যে শিক্ষা মানবের অন্তঃশক্তির সর্বাঙ্গীণ অভিব্যক্তির সহায়ক হয়, উহাই প্রকৃত শিক্ষা।

অকস্মাৎ সামাজিক পরিবর্তন-সাধনের বিরোধী হইলেও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, দীর্ঘকাল পরাধীনতার ফলে যুগপ্রয়োজনানুরূপ নিত্য

নূতন বিধানরচনার সমস্ত প্রাচীন ব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় হইয়া গিয়াছে এবং সমাজজীবনে বহু আবর্জনা পুঞ্জীভূত হইয়াছে। অতএব উহার দূরীকরণার্থে কতকগুলি বিষয়ে আমাদের আশু প্রচেষ্টা আবশ্যক। বর্তমানে নারী-জাতির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, নারী-জাতির অভ্যুদয় না হইলে "ভারতের কল্যাণের সম্ভাবনা নাই; এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।" আবার সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, "হে ভারত, ভুলিও না, তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী।" সতীত্ব ও মাতৃত্বের আদর্শকে সম্পূর্ণ অবিকৃত রাখিয়া নারীজাতিকে জাগিতে হইবে। এই জাগরণের ক্ষেত্রে আবার নরনারীর মধ্যে কোনও অলঙ্ঘ্য ব্যবধান স্বীকৃত হয় নাই—"এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতটা তফাৎ কেন যে করেছে তা বুঝা কঠিন। বেদান্তশাস্ত্রে তো বলেছে, একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজ করছেন।" পরন্তু বিবেকানন্দ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, নারীদের যথার্থ কল্যাণসম্পাদনে নারীরাই সমর্থ—পুরুষ এই বিষয়ে দূর হইতে যথাসম্ভব সাহায্য করিলেও কখনও তাহাদের স্বাধীনতায় যেন হস্তক্ষেপ না করে।

জনসাধারণের উন্নতি ব্যতীত জাতির উন্নতি অসম্ভব; অতএব তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর সর্বপ্রকার অভ্যুত্থানের আয়োজন অত্যাবশ্যক। কারণ "এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্‌টে দিতে পারবে; আর আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচারবল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কর্মকালে সিংহবিক্রম! ...এই সামনে

তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।" এই নূতন ভারত বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে; বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে; বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।" কিন্তু এই নিষ্কিঞ্চনদের অভ্যুত্থানের আলোড়নে ভারতের সনাতন সংস্কৃতি যেন কেন্দ্রভ্রষ্ট না হয়। আমাদের উদ্দেশ্য হইবে প্রাচীন ব্রাহ্মণ-সংস্কৃতিকে শূদ্রের স্তরে না নামাইয়া প্রত্যেক শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করা। "সত্যযুগে একমাত্র ব্রাহ্মণজাতি ছিল;" শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনে পুনঃ সেই সত্য-যুগের সূত্রপাত হইয়াছে—"তিনি যেদিন জন্মেছেন, সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষের ভেদ, ধনি-নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত-মূর্খ-ভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-ভেদ সব তিনি দূর করে দিয়ে গেলেন। আর তিনি বিবাদভঞ্জন—হিন্দু-মুসলমান-ভেদ, ক্রীশ্চান, হিন্দু ইত্যাদি সব চলে গেল।"

জাতিভেদ বর্তমানে যে আকার পরিগ্রহ করিয়াছে, উহা একসময়ে অপরিবর্জনীয় হইলেও এবং উহার মূলে যথেষ্ট সত্য নিহিত থাকিলেও আধুনিক জগতে মূল ভিত্তি অটুট রাখিয়া উহার অভিব্যক্তির পরিবর্তন আবশ্যক। ধর্মের নামে সমাজে যে নিষ্ঠুর অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা চলিতেছে তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া স্বামীজী আক্ষেপসহকারে বলিলেন—"ধর্ম কি আর ভারতে আছে, দাদা! জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গ, সব পলায়ন; এখন আছেন কেবল ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না। দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র—সহজ ব্রহ্মজ্ঞান! ভালা মোর বাপ! হে ভগবান! এখন ব্রহ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, সর্বভূতেও নাই—এখন ভাতের হাঁড়িতে।" এই সব অযৌক্তিক ও পাশবিক ব্যবস্থা দূর করিয়া তিনি আমাদিগকে অন্তসমাজসুলভ সাম্য ও সৌভ্রাত্র অবলম্বন করিতে উপদেশ দিলেন—"আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলামধর্মরূপ এই দুই মহান

মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা। ...আমার মাতৃভূমি যেন ইসলামীয় দেহ এবং বৈদান্তিক হৃদয়রূপ দ্বিবিধ আদর্শের বিকাশ করিয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়েন।"

ভারতের জনসাধারণ ধার্মিক হইলেও দারিদ্র্যের নিপীড়নে কর্মশক্তিহীন। বিশেষতঃ দীর্ঘকাল দাসত্বের ফলে তাহাদের জীবনে প্রায়শঃ সাত্ত্বিকতার ছদ্মবেশে ঘোর তামসিকতা বিরাজমান। অতএব এদেশে প্রকৃত ধর্ম-প্রচারের যথেষ্ট প্রয়োজন থাকিলেও প্রথমে রজোগুণের উদ্বোধন আবশ্যক। "যে ধর্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আর ধর্ম?" "খালিপেটে ধর্ম হয় না—প্রথমে কূর্মদেবতার পূজা" অত্যাবশ্যক। অতএব "ঐ অন্নসংস্থান করবার জন্যই আমি লোকগুলোকে রজোগুণতৎপর হতে উপদেশ দিই।" "আগে অন্নসংস্থান করার উপদেশ দে, তারপর ভাগবত পড়ে শুনাস্।"

যুগপ্রয়োজনে বিবেকানন্দ আমাদিগকে নর-নারায়ণের পূজায় আহ্বান করিয়াছেন—"প্রথমে পূজা—বিরাটের পূজা। তোমার সম্মুখে তোমার চারিদিকে যাহারা রহিয়াছে, তাহাদের পূজা। ইহাদের পূজা করিতে হইবে—সেবা নহে; সেবা বলিলে আমার অভিপ্রেত ভাবটি ঠিক বুঝাইবে না, পূজা শব্দেই ঐ ভাব ঠিক প্রকাশ করা যায়।" এই নরনারায়ণের পূজার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলেই মাত্র উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হৃদয়ে স্ফুরিত হওয়া সম্ভব।

আমাদের দেশে ধর্ম ও সাংসারিক অভ্যুদয়ের মধ্যে যে এক দুরপসরণীয় কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্ট হইয়াছে, বিবেকানন্দের মতে উহাই আমাদের অবনতির প্রধান কারণ। বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই; বরং ধর্মবৃদ্ধির স্বতঃসিদ্ধ ফলরূপে জাগতিক উন্নতি আপনিই আসিতে বাধ্য। না আসার কারণ এই যে, শাস্ত্রে যেসকল প্রাণপ্রদ ও প্রগতিমূলক উপদেশ রহিয়াছে,

আমরা সেগুলিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করি না—"আমাদের মস্তক আছে, হস্ত নাই। আমাদের বেদান্তমত আছে, কার্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের পুস্তকে মহা সাম্যবাদ আছে, আমাদের কার্যে মহা ভেদবুদ্ধি। মহা নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কর্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু কার্যে আমরা অতি নির্দয়, অতি হৃদয়হীন—নিজের মাংসপিণ্ড শরীর ছাড়া আর কিছুই বুঝিতে পারি না।" ধর্মানুভূতির যথার্থ তাৎপর্য জানিলে আমরাও বিবেকানন্দের সহিত সমস্বরে বলিব, "যে জ্ঞানে ভববন্ধন হতে মুক্তি পর্যন্ত পাওয়া যায়, তাতে আর সামান্য বৈষয়িক উন্নতি হয় না? অবশ্যই হয়।" সমাজজীবনের ন্যায় ব্যক্তিগত জীবনেও ধর্মানুষ্ঠান ও কর্মসম্পাদনের মধ্যে বর্তমানে কোনও যোগসূত্র নাই; সেই সূত্র পুনঃস্থাপনের জন্য চাই 'কর্মে পরিণত বেদান্ত'—"তোমার স্ত্রী থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু ঐ স্ত্রীর মধ্যে তোমার ঈশ্বরদর্শন করিতে হইবে। পুরুষ স্ত্রীকে এবং স্ত্রী পুরুষকে যে ভালবাসার দ্বারা প্রীত করিয়া থাকে, সেই ভালবাসা ভগবানকে অর্পণ করিতে হইবে।" সংসারে যত প্রকার সম্বন্ধ আছে, তৎসমস্তকেই এই ভাগবতদৃষ্টি-সহায়ে ঈশ্বরলাভের সহায়ক করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, জীবনের প্রতিটি কর্ম ঈশ্বরাদেশে সাধিত হওয়া আবশ্যক, কারণ বস্তুতঃ কর্ম, করণ, কর্তা, কর্মফল ইত্যাদি সমস্তই ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে।

ভারতবর্ষের অধোগতির আর এক কারণ হইল তাহার কূপমণ্ডুকসদৃশ সংকীর্ণ মনোবৃত্তি। ভারত যেদিন 'ম্লেচ্ছ' শব্দ আবিষ্কারপূর্বক আপনার জাতীয় জীবনের চারিদিকে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়া দিল, সেই দিন হইতে আরম্ভ হইল তাহার অবনতি—"কোন ব্যক্তি বা জাতি অপর জাতি হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিয়া বাঁচিতে পারে না।" বিবেকানন্দ তাই আহ্বান জানাইলেন, "নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত থেকে বাইরে এসে দেখ,

সব জাতি কেমন চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? তা হলে এস, ভাল হবার জন্তে প্রাণপণে চেষ্টা কর।" অপরের সহিত মিশিতে হইলে চাই অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা—"আমরা শুধু 'পরধর্মে বিদ্বেষ করিও না,' এই কথা প্রচার করি না—আমরা সকল ধর্মকে সত্য বলিয়া পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি। আর শুধু প্রচার নহে, আমরা ইহা কার্যেও পরিণত করিয়া থাকি।" এই আদান-প্রদানের মধ্যে আবার ভিক্ষুকের মনোবৃত্তি সর্বথা পরিত্যাজ্য—"সমাবস্থাপন্ন না হইলে কখনও বন্ধুত্ব হয় না। যদি তোমাদের ইংরেজ বা মার্কিনগণের সহিত সমান হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে তোমাদিগকে যেমন উহাদের নিকট শিখিতে হইবে, তেমন শিখাইতেও হইবে।"

সর্বশেষে মনে রাখিতে হইবে যে, বিবেকানন্দ যদিও ভারতবাসী ছিলেন এবং ভারতের অভ্যুত্থানের জন্ত আপ্রাণ চেষ্টিত ছিলেন, তথাপি তিনি রাজনীতিতে বিজড়িত হন নাই; অধ্যাত্মানুভূতিই ছিল তাঁহার সমস্ত কর্মপ্রেরণা ও প্রচারের একমাত্র উৎস। সেই বিবাদ-বিচ্ছেদহীন প্রেম-রাজ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এবং প্রতিমুহূর্তে নিখিলব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অদ্বিতীয় সত্তার সাক্ষাৎ করিয়া বিশ্বপ্রেমিক বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন, "একথা ভুলে যেয়ো না যে, সব দেশের লোকের প্রতিই আমার টান রয়েছে—শুধু ভারতের প্রতি নহে।"

ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া আমেরিকায় দ্বিতীয় বার পদার্পণানন্তর স্বামীজী পূর্বের ন্তায় পূর্ণোত্তমে কার্য আরম্ভ করিতে না পারিলেও নীরব রহিলেন না। তিনি কিয়দ্দিবস 'রিজলে ম্যানরে' লেগেট-দম্পতির সহিত অতিবাহনান্তে ৮ই নভেম্বর নিউইয়র্কে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা প্রদান করিলেন এবং নগরে ও পার্শ্ববর্তী স্থানসকলে পক্ষকাল যাবৎ এইরূপ প্রচারে ব্যাপৃত থাকিয়া আমেরিকার পশ্চিমকূলাভিমুখে চলিলেন! তথায় লস্ এঞ্জেলিস্, ওকল্যাণ্ড,

স্যান্ ফ্রান্সিস্কো প্রভৃতি স্থানে তিনি প্রায় ছয় মাস ছিলেন এবং ইহার ফলে কালিফোর্ণিয়া-অঞ্চলে বেদান্তের বীজ সুপ্রোথিত হইয়া কালক্রমে বহু মহা মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল।

কালিফোর্ণিয়ায় অবস্থানকালে লেগেট-দম্পতির নিকট হইতে সংবাদ ও আমন্ত্রণ আসিল যে, প্যারিসে একটি ধর্মেতিহাস-সম্মেলনের অধিবেশন হইবে—লেগেট-দম্পতি ঐ সময়ে তথায় থাকিবেন এবং স্বাস্থ্যোন্নতি ও ঐ সভায় যোগদানের উদ্দেশে স্বামীজীরও তথায় গমন আবশ্যক। সে আহ্বানে অবহেলা প্রদর্শন না করিয়া তিনি ফরাসী দেশে যাইবার জন্য দ্রুত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং তদনুসারে কালিফোর্ণিয়ার কার্য-সমাপনান্তে ডেট্রয়েট ও চিকাগোতে কিছুদিন বেদান্ত প্রচার করিয়া নিউইয়র্কে উপনীত হইলেন। এখানেও কিয়দ্দিবস বক্তৃতাদি করিয়া ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই ইউরোপগামী জাহাজে উঠিলেন।

মনে রাখিতে হইবে যে, স্বামীজীর দেহ তখন ভগ্নপ্রায়; তথাপি তাঁহার কার্যক্ষমতা ছিল তখনও বিপুল—বিশেষতঃ তাঁহার অমিত মনোবলের সম্মুখে সমস্ত বিঘ্ন পরাজিত হইত। ইতঃপূর্বে ফরাসী ভাষার সহিত তাঁহার স্বল্প পরিচয় ঘটিয়া থাকিলেও উহা উল্লেখযোগ্য নহে। কিন্তু সভার আলোচনায় যোগদানের সঙ্কল্প উদিত হইবামাত্র দুই মাস যাবৎ গভীর মনোনিবেশ-সহকারে উহা আয়ত্ত করিতে লাগিলেন এবং প্যারিসে উপস্থিত হইয়া শিক্ষিতসমাজের সহিত আলাপপ্রসঙ্গে উহা সম্পূর্ণ অভ্যাস করিয়া লইলেন। অনন্তর যথাসময়ে বক্তৃতাসহায়ে স্বীয় মতবাদের অবতারণাব্যপদেশে ঐ ভাষার আশ্রয় গ্রহণপূর্বক সকলকে চমৎকৃত করিলেন। সভায় খাঁটি ভারতীয় ভাব উপস্থাপনের প্রয়োজন যথেষ্ট ছিল; কিন্তু এতদপেক্ষাও অধিক লাভ হইল এই যে, বহু শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে আকৃষ্ট হইলেন। এইরূপে প্রায় তিন মাস ফরাসী দেশে ভাবের

আদান-প্রদানে কাটাইয়া স্বামীজী পূর্ব ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন—সঙ্গী হইলেন লয়জন-দম্পতি, শ্রীযুক্ত জুল বোওয়া, শ্রীমতী কালভে ও শ্রীমতী ম্যাকলাউড। ইঁহারা ভিয়েনা, হাঙ্গেরী, সার্ভিয়া, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়া কনষ্টান্টিনোপলে পৌঁছিলেন; তথা হইতে এথেন্সে গমন করিলেন এবং পরে মিশরে উপনীত হইলেন। মিশরে আসিয়া স্বামীজীর মন ভারতে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল হইল। বিশেষতঃ তাঁহার অন্তর যেন বলিয়া দিতে লাগিল যে, শ্রীযুক্ত সেভিয়ার আর ইহধামে নাই। এই চিন্তা তাঁহাকে বড়ই চঞ্চল করিল। অতএব প্রথম যে জাহাজ পাইলেন তাহাতেই আরোহণ করিয়া বোম্বাই উপস্থিত হইলেন এবং ৯ই ডিসেম্বর (১৯০০) রাত্রে বিনা সংবাদে অকস্মাৎ বেলুড় মঠে আবির্ভূত হইলেন।

ভারতে পুনরাগমনের পর তিনি সংবাদ পাইলেন যে, সেভিয়ার সাহেব সত্যসত্যই ইহলোকে নাই; অতএব সেভিয়ার-গৃহিণীকে সান্ত্বনা-দানের জন্য হিমালয়ক্রোড়ে আলমোড়া জেলার অন্তঃপাতী মায়াবতীতে যাওয়া তাঁহার প্রথম কর্তব্য বলিয়া বোধ হইল। তখন প্রচণ্ড শীত—চারিদিক তুষারাবৃত। তথাপি সমস্ত কষ্ট সহ্য করিয়া তিনি তথায় গমন-পূর্বক সেভিয়ার-পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং ৩রা জানুয়ারী হইতে ১৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত অবস্থানান্তে ২৪শে জানুয়ারী মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

মঠে দুই মাস ব্রহ্মচারীদের শিক্ষাদান, মঠপরিচালনা, অতিথি-অভ্যাগতদের সহিত সদালাপ ইত্যাদিতে অতিবাহিত হইলে স্বামীজী ১৮ই মার্চ পূর্ববঙ্গ যাত্রা করিলেন। ঢাকায় তাঁহার দুইটি বক্তৃতা হইয়াছিল। ঢাকা হইতে তিনি ৺কামাখ্যাদর্শনে যান এবং তথা হইতে শিলং-এ উপস্থিত হন। স্বামীজীর শরীর তখন বহুমূত্রাদি রোগে শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে ঐ শৈলনিবাসে কিছুদিন

অবস্থান করিলেন। দৈহিক অসুস্থতাসত্ত্বেও জনসাধারণের আগ্রহে তাঁহাকে এথানেও একটি বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। শরীরের কিন্তু বিশেষ কোন উন্নতি হইতেছে না দেখিয়া সেখানে দীর্ঘকাল না থাকিয়া তিনি মে মাসের মধ্যভাগে বেলুড় মঠে চলিয়া আসিলেন।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্বামীজীর আগ্রহে বেলুড় মঠে প্রথম প্রতিমায় ৺দুর্গাপূজা হইল। ইহাতে একদিকে যেমন স্বামীজীর মাতৃপূজার আগ্রহ চরিতার্থ হইল, অপর দিকে তেমনি নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজ জানিল যে, বিদেশ-প্রত্যাগত বিবেকানন্দ স্বধর্মচ্যুত হন নাই, কিংবা তৎপ্রতিষ্ঠিত মঠে প্রাচীন পন্থার সহিত সম্বন্ধহীন কোন অভিনব ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। ঐ বৎসরেরই শেষভাগে জাপান হইতে শ্রীযুক্ত ওডা এবং ওকাকুরা নামক দুইজন কৃতবিদ্য ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ভারতে আসিয়া স্বামীজীকে জাপানে একটি ধর্মসভায় যোগদানের জন্য অনুরোধ জানাইলেন। পরন্তু মানসিক উৎসাহ থাকিলেও শারীরিক অক্ষমতানিবন্ধন স্বামীজী সঠিক কিছু না বলিয়া আগ্রহমাত্র প্রকাশ করিলেন। ওকাকুরা তাঁহার সাহচর্যলাভের জন্য কিয়দ্দিবস মঠে বাস করিলেন এবং অতঃপর বুদ্ধগয়া-দর্শনে উৎসুক হইয়া স্বামীজীকেও সঙ্গে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। ইহার পূর্বেই স্বামীজীর কাশীধামে যাওয়া স্থির হইয়াছিল বলিয়া তিনি জাপানীদের সহিত প্রথমে গয়াধামে গেলেন এবং তথা হইতে বারাণসীক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। এথানে ওকাকুরা স্বামীজীর নিকট বিদায় লইয়া তাঁহারই ব্যবস্থানুসারে ও তন্নির্দিষ্ট সঙ্গীর সহায়তায় ভারতভ্রমণে নির্গত হইলেন।

কাশীধামে স্বামীজীর অবস্থানের সুযোগে ভাবী দুইটি আশ্রমের সূত্রপাত হয়। জনৈক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বেদান্তপ্রচারের জন্য কিছু অর্থ প্রদান করেন—উহাতেই পরে রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের আরম্ভ হয়। এতদ্ভিন্ন.

স্বামীজীর প্রেরণায় কতিপয় যুবক সামান্য অর্থাদি-সংগ্রহান্তে একটি সমিতি গঠনপূর্বক আর্তসেবায় ব্রতী হন—উহাই বর্তমান রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ভিত্তিপত্তন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবের পূর্বেই স্বামীজী মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শরীরের অবস্থা তখন ভয়াবহ; তথাপি তখনও উৎসাহ-উদ্যমের বিন্দুমাত্র হ্রাস নাই। তিনি আর চারিমাস মাত্র ইহধামে ছিলেন। কিন্তু ইহার প্রতিটি দিন স্মরণীয় ঘটনায় পরিপূর্ণ, প্রতিমুহূর্ত শিক্ষাপ্রদ, প্রতিক্ষণ এই জগদ্বরেণ্য মহামানবের সোনার কাঠি-স্পর্শে সঞ্জীবিত। দেহত্যাগের প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে ইচ্ছামৃত্যু নর-ঋষি স্বশিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দকে একখানি পঞ্জিকা আনিতে বলিলেন এবং আলোচ্য দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্জিকাখানির কয়েকটি পাতা উল্টাইয়া উহা স্বকক্ষেই রাখিয়া দিলেন। ইহার তাৎপর্য প্রথমে ভক্তদের বুদ্ধির অগোচর থাকিলেও দেহত্যাগান্তে স্মরণ হইল যে, শ্রীরামকৃষ্ণও একদা এইরূপই করিয়াছিলেন। অমরনাথ হইতে ফিরিয়া স্বামীজী সহাস্যে বলিয়াছিলেন, "বাবা ৺অমরনাথ আমায় ইচ্ছামৃত্যুর বর দিয়াছেন।" এইরূপে আরও বহুবার তিনি স্বীয় আশু দেহত্যাগের ইঙ্গিত দিলেও প্রিয়জনের বিরহচিন্তায় অপারগ ভক্ত-বৃন্দের মন তাহা অন্য অর্থেই গ্রহণপূর্বক বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিল না যে, সিদ্ধসঙ্কল্প দেবমানব আপন কার্যসমাপনান্তে সত্যই বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

৪ঠা জুলাই, শুক্রবার, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ—উত্তর আমেরিকার স্বাধীনতার পুণ্যতিথি। প্রাতে চা-পানের আসরে কতই আমোদ-আহ্লাদ চলিল। তাহার পরদিবস শনিবার ও অমাবস্যা; সুতরাং স্বামীজীর মনে সেদিন ৺শ্যামাপূজার সঙ্কল্প উদিত হইল এবং তখনই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতৃদেব তথায় আগমন করায় স্বামীজী সানন্দে তাঁহাকে ঐ অভিলাষ

জ্ঞাপনপূর্বক মঠবাসীদের পূজার আয়োজন করিতে বলিলেন। তদনন্তর ঠাকুরঘরে যাইয়া ৮টা হইতে ১১টা পর্যন্ত গভীর ধ্যানে কাটাইলেন। তথা হইতে স্বামীজীর অবতরণকালে স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহার অস্ফুট বাণী শুনিলেন—"যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকত তবে বুঝতে পারত বিবেকানন্দ কি করে গেল। কালে কিন্তু এমন শত শত বিবেকানন্দ জন্মাবে।" অতঃপর তিনি শুক্লযজুর্বেদের অংশবিশেষ ভাষ্যসহকারে স্বামী শুদ্ধানন্দকে পড়াইলেন। আহারান্তে বিশ্রামের পর পুনর্বার ব্রহ্মচারীদের গৃহে যাইয়া সংস্কৃতপাঠে যোগ দিলেন। বৈকালে স্বামী প্রেমানন্দের সহিত বেলুড়ের বাজার পর্যন্ত বেড়াইয়া আসিলেন এবং জানাইলেন যে, তাঁহার শরীরের অবস্থা উত্তম। ঐ ভ্রমণকালে একটি বেদবিদ্যালয়-স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং ঐ বিষয়ে প্রেমানন্দের সহিত সুদীর্ঘ আলোচনা করিলেন। পরে সন্ধ্যায় মঠে প্রত্যাগমনপূর্বক সকলের কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসান্তে নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং সেবকের নিকট হইতে মালা চাহিয়া লইয়া তাঁহাকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। পরে ভাগীরথীমাতার দিকে মুখ ফিরাইয়া ধ্যানে মগ্ন হইলেন। এক ঘণ্টা অতীত হইলে তিনি সেবককে ডাকিয়া বাতায়নগুলি খুলিয়া পা টিপিতে ও হাওয়া করিতে বলিলেন। এইভাবে আধ ঘণ্টা অতীত হইলে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন; এক মিনিট পরে আবার ঐরূপ নিঃশ্বাস পড়িল। তারপর তিনি ক্লান্ত শিশুর ন্যায় জগজ্জননীর ক্রোড়ে চিরসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। স্বামী প্রেমানন্দ প্রভৃতি সকলে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় ও বিস্ফারিত নেত্রদ্বয় তেজঃপূর্ণ।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সুদীর্ঘ সাধনা-সমাপনান্তে ত্যাগী ভক্তদের সঙ্গলাভের বাসনায় একদিন শ্রীশ্রীজগন্মাতার শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন, "বিষয়ী সংসারী লোকদের সঙ্গে কথা বল্‌তে বল্‌তে জিভ জ্বলে গেল।" জগন্মাতা আশ্বাস দিলেন, "ভয় নাই, ত্যাগী শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তেরা আসছে।" ফলেও দেখা গেল যে, যথাকালে ত্যাগী যুবকগণ আসিতে লাগিলেন। এই অন্তরঙ্গদের মধ্যে আবার শ্রীযুক্ত রাখালের স্থান অতি উচ্চ। তিনি স্বল্পসংখ্যক ঈশ্বরকোটিদেব অন্যতম এবং ঠাকুরের মানসপুত্র। জগন্মাতা তাঁহার আগমনের কথা পূর্ব হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণকে জানাইয়া রাখিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "রাখাল আসিবার কয়েক দিন পূর্বে দেখিতেছি, মা একটি বালককে সহসা আমার ক্রোড়ে বসাইয়া দিয়া বলিতেছেন, 'এইটি তোমার পুত্র।' শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম, 'সে কি ?—আমার আবার ছেলে ?' তিনি তাহাতে হাসিয়া বুঝাইয়া দিলেন, 'সাধারণ সংসারি ভাবে ছেলে নয়, ত্যাগী মানসপুত্র।' তখন আশ্বস্ত হই। ঐ দর্শনের পরে রাখাল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বুঝিলাম—এই সেই বালক।"

শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র ঘোষ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী (১২৬৯ বঙ্গাব্দের ৮ই মাঘ, চান্দ্রমাঘ শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে, রাত্রি প্রায় একটায়) বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত শিকরা-কুলীনগ্রামে এক অতি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আনন্দমোহন ঘোষ সঙ্গতিসম্পন্ন জমিদার ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে রাখালের মাতা কৈলাসকামিনীর দেহত্যাগ হয়।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

অতঃপর পিতা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন এবং বিমাতা হেমাঙ্গিনীর স্নেহময় ক্রোড়ে রাখালচন্দ্র মানুষ হইতে থাকেন।

উপযুক্ত বয়সে বিদ্যাভ্যাসের জন্য বাটীর নিকটে একটি বিদ্যালয় স্থাপনপূর্বক আনন্দমোহন উহাতে রাখালকে ভর্তি করিয়া দিলেন। সেখানে বালকের সৌম্য সুন্দর আকৃতি ও মাধুর্যময় কোমল প্রকৃতিতে ছাত্র ও শিক্ষক সকলেই আকৃষ্ট হইলেন। অধিকন্তু তিনি অল্পদিনেই সহপাঠীদের নেতৃত্বলাভ করিলেন। অধ্যয়নাদিতেও তাঁহার সবিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গেল। রাখাল স্বভাবতঃই বন্ধুবৎসল ছিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে শিক্ষকগণ প্রহার করিলে তিনি সমবেদনায় অভিভূত হইতেন। ইহার ফলে শিক্ষকদের অন্তরেও ক্রমে কোমলতার সঞ্চার হইল এবং তাঁহারা ঐ গর্হিত অভ্যাস ত্যাগ করিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়েও রাখালের বেশ উৎসাহ ছিল। ক্রীড়াদিতে যেমন কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল না, কুস্তিতেও তেমনি কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিত না। গ্রামের বিবিধ ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইতেন। পিতার দৃষ্টান্তে বাল্যকাল হইতেই ফলফুলের বাগানের প্রতি তাঁহার খুব আকর্ষণ লক্ষিত হইত। এতদ্ব্যতীত পুষ্করিণীর পার্শ্বে বসিয়া ছিপে মাছ ধরাও তাঁহার একটি বড় আমোদের বিষয় ছিল।

কিন্তু ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে, সাধারণ বালকদের ন্যায় তিনি কেবল এই সকল খেলাধুলায়ই মত্ত থাকিতেন। গ্রামের উপকণ্ঠে ৺কালীমন্দিরের নিকটে বোধনতলায় তিনি কখনও কখনও সঙ্গীদের লইয়া স্বরচিত শ্যামামূর্তির পূজাদিতে মগ্ন হইতেন। আবার তাঁহাদের বাটীতে প্রতিবৎসর যখন ধূমধামের সহিত শারদীয়া পূজা হইত, তখন পূজামণ্ডপে পুরোহিতের পশ্চাতে বসিয়া পূজা দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন

এবং সন্ধ্যাকালে অনিমেষনয়নে মায়ের আরাত্রিক দর্শন করিতে করিতে আপনাকে কোন্ অজ্ঞাত রাজ্যে হারাইয়া ফেলিতেন। সঙ্গীতে তাঁহার অসাধারণ প্রীতি ছিল—সময় সময় সঙ্গীদের লইয়া গ্রামের বাহিরে এক নিভৃত স্থানে মিলিতকণ্ঠে শ্যামাসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে এত তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, দেশ-কালের জ্ঞান লোপ পাইত। কাহারও মুখে নূতন শ্যামাসঙ্গীত শুনিলে তিনি তাহা শিখিয়া লইতেন এবং বৈষ্ণব ভিখারীর মুখে বৃন্দাবনের মুরলীধর রাখাল-রাজের গান শুনিয়া আত্মহারা হইতেন।

পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হইলে পিতা তাঁহাকে ইংরেজী শিক্ষার জন্য দ্বাদশবর্ষ বয়সে কলিকাতায় আনিলেন এবং বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটে দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুরগৃহে বাসস্থান নির্দেশপূর্বক নিকটবর্তী 'ট্রেনিং একাডেমী'তে ভর্তি করিয়া দিলেন (১৮৭৫ খ্রীঃ)। এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। ভাবী বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ তখন পল্লীর বালকবৃন্দের নেতা। বিদ্যালয়ে রাখাল নরেন্দ্রনাথ অপেক্ষা তিন চারি শ্রেণী নীচে পড়িলেও বয়সে উভয়ে সমান ছিলেন। রাখাল তাঁহাকে দেখিয়াই আকৃষ্ট হইলেন এবং উভয়ের মধ্যে গভীর সখ্যের উদয় হইল। দুই জনে একই সঙ্গে একই আখড়ায় কুস্তি লড়িতেন। আবার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রের আকর্ষণে একই সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজেও যাতায়াত আরম্ভ হইল। এইভাবে নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত থাকায় রাখালের অধ্যয়নে ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া চিন্তান্বিত পিতা প্রথমে অনুরোধ-উপরোধ এবং অবশেষে কঠোর শাসন-অবলম্বনে পাঠাদিতে পুত্রের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু ফল কিছুই হইল না। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে স্থির করিলেন যে, বিবাহ দেওয়াই ইহার প্রকৃষ্ট প্রতিকার।

ঘটনাক্রমে শীঘ্রই মনোমত পাত্রীও পাওয়া গেল। কোন্নগরের শ্রীযুক্ত মনোমোহন মিত্র তখন কলিকাতায় কাঁসারীপাড়ার নিকটেই সিমুলিয়া পল্লীতে বাস করিতেন। বিশ্বেশ্বরী নাম্নী সর্বসুলক্ষণা বিবাহযোগ্যা তাঁহার একটি ভগ্নী ছিল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে সম্ভ্রান্ত কায়স্থকুলোদ্ভূতা এই কন্যাটির সহিত রাখালের পরিণয় হইয়া গেল। বিশ্বেশ্বরী তখনও বালিকা—বয়স প্রায় একাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মানুষ স্বাভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য জগতে কত কিছুই না করিয়া থাকে—অথচ বিধির বিধানে ফল অন্যরূপ হইয়া যায়। রাখালের পিতা বিবাহ দিয়া পুত্রকে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাহিলেন; কিন্তু এই বিবাহই অচিরে রাখালকে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত করিল। রাখালের জ্যেষ্ঠ শ্যালক মনোমোহন পূর্ব হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ধর্মশীলা শ্বশ্রূ-মাতাও শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত অনুরক্তা ছিলেন। বিবাহের পর কোন্নগরের বাড়ি হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পথে মনোমোহন একদিন শ্বশুরগৃহে আগত রাখালকে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত করিলেন।

এই শুভ লগ্নের জন্য জগদম্বা পূর্ব হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণের মন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। একদিন ঠাকুর ভাবচক্ষে দেখিলেন, বটতলায় একটি বালক দাঁড়াইয়া আছে। মনে কেমন যেন একটু খটকা লাগিল—এইরূপ দর্শন কেন হইল? ভাগিনেয় হৃদয়কে এই সন্দেহের কথা জানাইলে হৃদয় সোল্লাসে বলিলেন, "মামা, তোমার ছেলে হবে—তাই দেখেছ!" শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ মহাপুরুষ চমকিত হইয়া বলিলেন, "সে কিরে? আমার যে মাতৃযোনি! আমার ছেলে হবে কি করে?" এই প্রশ্নের উত্তর হৃদয় দিতে পারেন নাই—দিয়াছিলেন জগদম্বা। সে কথা আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভেই উল্লেখ করিয়াছি। আলোচ্যদিনে প্রতীক্ষমাণ শুদ্ধসত্ত্ব মানসপুত্র রাখালের আগমনের প্রাক্কালে ঠাকুর ভাবচক্ষে দেখিলেন—গঙ্গাবক্ষে সহসা

শতদল পদ্ম বিকসিত হইয়াছে; তাহার দলে দলে অপূর্ব শোভা; চিরকিশোর রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণের করধারণ করিয়া অপর একটি অনুরূপ বালক নূপুরপায়ে শতদলের উপর নৃত্য করিতেছে; নৃত্যের অপূর্ব ছন্দে মাধুর্যসিন্ধু উথলিয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মহারা হইলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন রাখালচন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ণ সবিস্ময়ে দেখিলেন—এই তো তাঁহার পূর্বদৃষ্ট বটতলায় দণ্ডায়মান বালক, জগদম্বার প্রদর্শিত মানসপুত্র, কমলদলে নৃত্যপরায়ণ ব্রজকিশোর শ্রীকৃষ্ণসখা! তিনি সব দেখিলেন, সব বুঝিলেন; কিন্তু স্বপ্রতিষ্ঠ মহামানব বাহিরে কোনও আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিলেন না; গম্ভীরভাবে এক-দৃষ্টে রাখালকে নিরীক্ষণ করিয়া সঙ্গী মনোমোহনকে বলিলেন, "সুন্দর আধার!" অতঃপর অতি পরিচিতের ন্যায় তাঁহার সহিত স্নেহ-সম্ভাষণ আরম্ভ করিলেন, "তোমার নামটি কি?" "শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ।" 'রাখাল'-শব্দ শ্রবণে ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের গদ্‌গদ কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "সেই নাম! রাখাল—ব্রজের রাখাল!" পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া সাদরে বলিলেন, "আবার এসো।"

এদিকে প্রথম দর্শনেই রাখালের অন্তরে বিদ্যুৎচমকের মত কি এক উচ্ছ্বাস খেলিয়া গেল—তাঁহার সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ এককালে এই পরমপুরুষের প্রতি নিবিড় আবেশে আকৃষ্ট হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "ইনি কে? এই সৌম্য মহাপুরুষ কে? ইঁহার অনিমেষ দৃষ্টিতে যে দিব্য মাধুরী খেলিয়া বেড়াইতেছে, উহা তো ইহলোকের নহে—ইঁহার নয়নসমক্ষে নিশ্চয়ই সেই নিত্যসত্য বস্তু সদা বিদ্যমান।" পথে যাইতে যাইতে রাখালের কর্ণে সেই কোমল বাণী কুহরিত হইতে থাকিল, "আবার এসো।"

প্রেমঘনমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব আকর্ষণে রাখাল পুনর্বার দক্ষিণেশ্বরে

গমনের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং বিদ্যালয়ের ছুটির পর একদিন একাকী তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়াই মনে হইল তিনি যেন কতক্ষণ ধরিয়া তাঁহারই পথ চাহিয়া আছেন—রাখালের আগমনমাত্র অনুযোগের স্বরে কহিলেন, "তোর এখানে আসতে এত দেরি হল কেন?" রাখাল কি আর বলিবেন? উভয়ে তখন উভয়ের দিকে একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে এক অলৌকিক ভাবভূমিতে উপস্থিত হইয়া লীলাবিলাসে মগ্ন—ভাষায় তখন উত্তর দিবে কে? মাতৃহীন রাখাল ভাবঘনতনু শ্রীরামকৃষ্ণকে আপন জননীরূপে পাইলেন এবং রাখালের আকৃতি তখন যুবার ন্যায় হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহাকে ক্ষুদ্র বালক হিসাবেই গ্রহণ করিলেন। তদবধি রাখাল প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসিতে লাগিলেন এবং কখনও বা সেখানে থাকিয়া যাইতে লাগিলেন। এই কালের অপূর্ব লীলা সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "তখন রাখালের এমন ভাব ছিল, ঠিক যেন তিন-চারি বছরের ছেলে। আমাকে ঠিক মাতার ন্যায় দেখিত। থাকিত থাকিত সহসা দৌড়িয়া আসিয়া ক্রোড়ে বসিয়া পড়িত এবং মনের আনন্দে নিঃসঙ্কোচে স্তনপান করিত। বাড়ি তো দূরের কথা—এখান হইতে কোথাও এক পাও নড়িতে চাহিত না। আমাকে পাইলে আত্মহারা হইয়া রাখালের ভিতর যে কিরূপ বালকভাবের আবেশ হইত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। তখন যে-ই তাহাকে ঐরূপ দেখিত সে-ই অবাক হইয়া যাইত। আমিও ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহাকে ক্ষীর, ননী খাওয়াইতাম, খেলা দিতাম। কত সময়ে কাঁধেও উঠাইয়াছি। তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচের ভাব আসিত না।"

রাখাল সম্বন্ধে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, "রাখালের সাকারের ঘর, নরেনের নিরাকারের।" রাখাল প্রথম যখন দক্ষিণেশ্বরে আসেন, তখন নরেন্দ্রনাথের সহিত ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহারই

প্রেরণায় সমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। তদনুসারে মূর্তিপূজা বা দেবদেবী প্রভৃতিকে প্রণাম করা তাঁহার পক্ষে গর্হিত ছিল। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি ঐ সব করিতে শিখিলেন এবং উহাই তাঁহার স্বভাবানুরূপ হওয়ায় উহাতে আনন্দই পাইতেন। রাখালের আগমনের কয়েক মাস পরেই নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই রাখালের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া ঠাকুরের অসাক্ষাতে তাঁহাকে কপটাচারী বলিয়া রূঢ়ভাষায় ভৎর্সনা করেন। কোমলপ্রকৃতি রাখাল নরেন্দ্রনাথকে সমীহ করিতেন এবং তাঁহার তর্কের সম্মুখীন হইতেন না। সুতরাং এই ঘটনার পরে তিনি নরেন্দ্রনাথের নিকটে যাইতে সঙ্কুচিত হইতেন। ঠাকুর ইহা লক্ষ্য করিলেন এবং অনুসন্ধানে কারণও জানিতে পারিলেন। তখন নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "ত্যাখ্, রাখালকে আর কিছু বলিস নি। সে তোকে দেখলেই ভয়ে জড়সড় হয়। তার এখন সাকারে বিশ্বাস হয়েছে—তা কি করবে বল ? সকলেই কি একেবারে গোড়া থেকে নিরাকারে বিশ্বাস করতে পারে ?" এই সময়ে একদিন বৈষ্ণব মহাজনদের রচিত পদাবলীকীর্তন শুনিতে শুনিতে ঠাকুর গাত্রস্থ আবরণ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার সর্বাঙ্গে অশ্রু-পুলক-কম্পাদি প্রকটিত হইল। মহাভাবে তিনি বলিতে লাগিলেন, "প্রাণনাথ হৃদয়বল্লভ কৃষ্ণকে তোরা এনে দে, সুহৃদের কাজ তো বটে ! হয় এনে দে, না হয় আমায় নিয়ে চল—তোদের চিরদাসী হব।" রাখাল অপলকদৃষ্টিতে সে ভাব দেখিলেন, সাগ্রহমনে সে আর্তির অনুধাবন করিলেন—আর জানিলেন যে, সাকারোপাসনা সম্বন্ধে নরেন্দ্র যাহাই বলুন না কেন, সাকার শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসম্ভূত এই সাত্ত্বিক বিকারের পশ্চাতে এমন একটা সত্য আছে, যাহা যুক্তিতর্কের অতীত।

কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে এইরূপ অলৌকিক লীলায় ও লীলাসন্দর্শনে মগ্ন রাখাল ক্রমেই শুধু যে অধ্যয়নে অমনোযোগী হইলেন তাহাই নহে, তাঁহার

সংসার-বৈরাগ্যও স্ফুটতর হইতে থাকিল। পিতা আনন্দমোহন ইহাতে সুখী হইতে পারিলেন না। তিনি বিষয়ী লোক—পুত্রকেও সম্পত্তি-পরিচালনে সক্ষম দেখিতে চাহেন। বালক কি অবশেষে সাধুর সঙ্গে মিশিয়া সাধু হইয়া যাইবে? প্রতিকারের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা বিফল হইলে অবশেষে একদিন দক্ষিণেশ্বর হইতে প্রত্যাগত পুত্রকে গৃহে অবরুদ্ধ করিলেন। বাধা পাইয়া রাখালের মন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইলমাত্র এবং তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইবার সুযোগের অন্বেষণে রহিলেন। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহার স্নেহের দুলালকে না দেখিয়া সাশ্রুনেত্রে ভবতারিণীর মন্দিরে জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন, "মা, রাখালকে না দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। মা, আমার রাখালকে এনে দাও।" জগন্মাতা সে আর্তিতে বিচলিত হইলেন। একদিন পুত্রকে পার্শ্বে বন্দীর মত বসাইয়া আনন্দমোহন মোকদ্দমার কাগজপত্র নিবিষ্টমনে দেখিতেছেন, অন্য কোনদিকে লক্ষ্য নাই, এমন সময়ে রাখাল পলায়নের উত্তম সুযোগ বুঝিয়া মৃদুপদবিক্ষেপে কক্ষত্যাগপূর্বক দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলেন—কিছুদিন আর ফিরিলেন না। এদিকে পিতাও তখন বৈষয়িক ব্যাপারে এতই ব্যস্ত যে, দক্ষিণেশ্বরে যাইবার অবকাশ ঘটিল না। মোকদ্দমাটি বড়ই জটিল ও উহাতে জয়লাভের আশা ছিল না; কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে আনন্দমোহনেরই জয় হইল। অতএব তদনন্তর অবসর পাইয়া যেদিন তিনি পুত্রের অন্বেষণে দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন সেদিন মন আর পূর্বের ন্যায় গুরুভারে পীড়িত নহে; উহা অনেকটা উদ্বেগশূন্য ও প্রশান্ত। হয়তো তাঁহার মনে ইহাও উদিত হইয়াছিল যে, এই অপ্রত্যাশিত জয়লাভ পুত্রের সাধুসঙ্গের ফলেই হইয়া থাকিবে। বিশেষতঃ মাতৃহীন বালকের শৈশবের অসহায় স্মৃতি জাগরিত হইয়া আনন্দমোহনের মনকে সবিশেষ কোমল করিয়া তুলিল।

আনন্দমোহনকে দূর হইতে দেখিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ অনুমানে বুঝিলেন, ইনিই রাখালের পিতা হইবেন; কাজেই রাখালকে বলিলেন, "ওরে রাখাল, ঐ তোর বাপ আসছে বুঝি—দেখ্ দেখি।" দেখিয়াই ভীত-চকিত রাখাল আত্মগোপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর কিন্তু বলিলেন, "ভয় কি? বাপ-মা প্রত্যক্ষ দেবতা। তোর বাপ এলে তুই বেশ ভক্তি করে প্রণাম করবি। মার ইচ্ছা হলে কী না হতে পারে?" রাখাল বিনয়নম্রচিত্তে পিতাকে অভিবাদন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও পিতার নিকট পুত্রের অজস্র প্রশংসা করিলেন এবং আদর-আপ্যায়নে পিতাকে পরিতুষ্ট করিলেন। পুত্রের প্রতি ঠাকুরের যত্নের পরিচয় পাইয়া এবং পুত্রের উৎফুল্ল বদন ও সোল্লাস গতি দেখিয়া এই স্নেহের নীড় হইতে তাহাকে বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন করিতে আনন্দমোহনের প্রবৃত্তি হইল না। রাখালকে দক্ষিণেশ্বরে রাখিয়াই তিনি বিদায় লইলেন—শুধু প্রার্থনা করিয়া গেলেন, ঠাকুর যেন ইচ্ছামত রাখালকে গৃহে পাঠাইয়া দেন। ঠাকুর তদনুসারে রাখালকে গৃহে পাঠাইলেও রাখাল পুনঃপুনঃ দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাই আনন্দমোহনও পুত্রকে লইয়া যাইবার জন্য মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। এইরূপ এক সুযোগে রাখালের প্রতি আনন্দমোহনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ঠাকুর বলিলেন, "আহা আহা! দেখ দেখ, আজকাল রাখালের কি চমৎকার ভাব হয়েছে! ওর মুখপানে চাও, দেখতে পাবে ঠোঁট নড়ছে—অন্তরে অন্তরে সর্বদাই ভগবানের নামজপ করে কি না! যদি বল বিষয়ীর ঘরে জন্ম, জন্ম থেকে বিষয়ী লোকের সঙ্গ, তবু এমন কেমন করে হয়? তার মানে আছে। ছোলা যদি আবর্জনাতেও পড়ে, তবু সেই ছোলা-গাছই হয়। সে ছোলাতে কত ভাল কাজ হয়। তা রাখাল যে এখানে আসে তাতে কি আপনার অমত আছে?" প্রশ্ন শুনিয়া আনন্দমোহন ফাঁপরে

পড়িলেন। সাধুর বিরাগভাজন হইবেন কিরূপে? বিশেষতঃ তিনি দেখিলেন যে, ঠাকুরের নিকট অনেক গণ্যমান্ত লোকের যাতায়াত আছে। পুত্র এখানে থাকিলে ইঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতার সম্ভাবনা। এই সকল কথা ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "সে কি মশায়, রাখাল তো আপনারই ছেলে! আপনার কাছেই থাক, তবে মাঝে মাঝে দু-এক দিনের জন্ত আমার ওখানে পাঠিয়ে দেবেন।" এইরূপে মধ্যে মধ্যে স্বগৃহের সংস্পর্শ ঘটিতে থাকিলেও রাখালের মনে ধর্মানুষ্ঠানস্পৃহা ক্রমেই প্রবলতর হইতে থাকিল। একদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি পিতার উচ্ছিষ্ট কিংবা ভুক্তাবশেষ-পাত্রে খাইতে পারেন কি না। অমনি ঠাকুর বলিলেন, "সে কিরে? তোর কি হয়েছে যে তোর বাবার পাতে খাবি না? মা-বাপ কি কম জিনিস? তাঁরা প্রসন্ন না হলে ধর্ম-টর্ম কিছুই হয় না। চৈতন্তদেব তো প্রেমে উন্মত্ত—তবু সন্ন্যাসের আগে কতদিন ধরে মাকে বোঝান। বললেন—মা, আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখা দেব।"

এইভাবে প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল। এদিকে জামাতার বৈরাগ্য-দর্শনে প্রতিবেশীরা রাখালের শ্বশ্রূমাতা শ্যামাসুন্দরীকে সততই সাবধান করিয়া দিতে থাকিলেন। ঐ কারণেই হউক কিংবা কন্তাকে শ্রীরামকৃষ্ণচরণে উপস্থিত করিবার জন্তই হউক, রাখালের দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে শ্যামাসুন্দরী একদিন বিশ্বেশ্বরীর সহিত তথায় আসিলেন। কিন্তু বারংবার পীড়াপীড়ি করিলেও রাখাল দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। ঐ দিনের ঘটনা সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "রাখাল তখন ঘরের ছেলের মত আছে। জানি, আর ও আসক্ত হবে না। বলে, 'সব আলুনি লাগে।' ওর পরিবার এখানে এসেছিল—বয়স চৌদ্দ বৎসর।··· ও গেল না।" বিবাহ করিলেও রাখাল যে আবদ্ধ হইবেন না, ইহা ঠাকুর ইতঃপূর্বেই বধূকে

পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছিলেন। বিবাহের অল্প পরে সেদিনও ঠিক এই-ভাবেই শ্যামাসুন্দরী বালিকাকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলে ঠাকুর বধূকে সহজভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সহসা মনে প্রশ্ন জাগিল, "বধূর সংস্পর্শে আমার রাখালের ঈশ্বরভক্তির হানি হবে না তো?" তাই সংশয়ের নিরসনকল্পে বালিকাকে নিকটে আনাইয়া তিনি তাহার কেশ-রাশি ও গঠনভঙ্গী পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, "ভয়ের কারণ নেই—দেবীশক্তি। স্বামীর ধর্মপথের অন্তরায় কখন হবে না।" তখন হৃষ্টচিত্তে নহবতে মাতাঠাকুরানীর নিকট প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন, "টাকা দিয়ে যেন পুত্রবধূর মুখ দেখে।"

ঠাকুর জানিতেন, তাঁহার মানসপুত্র সাক্ষাৎ ব্রজের রাখাল। তিনি 'গোপাল' 'গোপাল' বলিয়া স্বহস্তে তাঁহাকে খাওয়াইতেন, আর কত ভাবেই না আদর করিতেন। অপরের অন্যায় দেখিলে ঠাকুর শাসন করিতেন। কিন্তু রাখালের অবাধ্যতায় বিরক্ত না হইয়া বরং আনন্দ করিতেন। একদিন আহারের পর ঠাকুর বলিলেন, "ওরে রাখাল, পান সাজ না, পান নেই যে!" মানসপুত্র উত্তর দিলেন, "পান সাজতে জানি নে।" "সে কিরে? পান সাজবি, তার আবার জানাজানি কি? যা, পান সেজে আন।" "পারব না, মশায়"—জবাব শুনিয়া ঠাকুর হাসিয়া আকুল। এরূপ সপ্রতিভ ব্যবহারে ঠাকুর বুঝিয়াছিলেন, রাখাল সত্যসত্যই তাঁহাকে একান্ত আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহার আচরণে কোনও কৃত্রিমতা নাই, আছে শুধু স্নেহসম্ভূত আবদার। কিন্তু এই-রূপে ক্ষেত্রবিশেষে তাঁহার ব্যবহার ঠাকুরের কৌতুক উদ্দীপিত করিলেও রাখাল যে সততই শাসনের অতীত ছিলেন তাহা নহে। একদিন ৺কালী-মন্দির হইতে প্রসাদী মাখন আসিয়াছে; রাখাল ক্ষুধিত ছিলেন, তাই অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই মাখনের ডেলাটি তুলিয়া মুখে দিলেন।

ঠাকুর অমনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুই তো ভারী লোভী! এখানে এসে কোথায় লোভত্যাগে যত্ন করবি, তা না করে আপনি নিয়ে খেলি?" লজ্জায় রাখালের মুখ আরক্তিম হইল। অপর একদিন একটি পয়সা দেখিয়া রাখাল কুড়াইয়া লইলেন—ইচ্ছা, কোন ভিক্ষুক বা অন্ধ-খঞ্জকে দিবেন। তিনি ঠাকুরকে সরলভাবে সব কথাই জানাইতেন; সুতরাং ইহাও নিবেদন করিলেন। ঠাকুর কিন্তু শুনিয়াই ভৎর্সনার সুরে বলিলেন, "যে মাছ খায় না, সে মাছের বাজারেই বা যাবে কেন? তোর যখন নিজের কোন দরকার নেই, তখন তুই কেন ঐ পয়সা ছুঁতে গেলি?"

ঠাকুর নিজে বিশেষ স্থলে শাসন বা সাবধান করিয়া দিলেও, অপরে রাখালকে কোন রূঢ় কথা বলিবে ইহা একান্ত অসহনীয় ছিল। মানসপুত্রকে অন্য কেহ শাসন করিলে স্নেহবিগলিতকণ্ঠে বলিতেন, "রাখালের দোষ ধরতে নেই, ওর গলা টিপলে দুধ বেরোয়।" আবার কেহ কোন কাজের আদেশ দিলে বলিতেন, "আহা! ও দুধের ছেলে, ওকে তোরা কোন কাজ করতে বলিস নি। ওর বড় কোমল স্বভাব!"

ঠাকুরের সঙ্গগুণে রাখাল সাধূচিত সদাচারও শিখিয়াছিলেন। একবার জনৈক অনুরাগীর গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া ঠাকুর প্রিয় পুত্রের সঙ্গে সেখানে যান। তথায় ভজনাদি শেষ হইবার পর আহারের বন্দোবস্ত হইল। গৃহকর্তা আত্মীয়-স্বজনকে লইয়া অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকায় ঠাকুরের কোন খোঁজ লইতেছেন না দেখিয়া ঠাকুর সহাস্যে রাখালকে বলিলেন, "কৈ রে, কেউ ডাকে না যে রে!" এরূপ ব্যবহারে সম্ভ্রান্তবংশসম্ভূত রাখাল অপমান বোধ করিয়া বিরক্তিসহকারে বলিলেন, "মশায়, চলে আসুন।" ঠাকুরের নিকট কিন্তু মানাপমান সমান; তিনি সহাস্যে বলিলেন, "আরে রোস, গাড়ি-ভাড়া তিন টাকা দু আনা কে দেবে? রোক করলেই হয় না। পয়সা নেই আবার ফাঁকা রোক! আর এত রাত্রে

খাই কোথা ?” অগত্যা রাখাল নীরবে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে আহারের আহ্বান আসিলে দেখা গেল যে, বসিবার স্থান পূর্ব হইতেই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং অতিকষ্টে একটা অপরিষ্কার স্থানে ঠাকুরকে বসানো হইল। আহারশেষে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার পথে তিনি রাখালকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, গৃহস্থেরা অজ্ঞানবশতঃ অনেক সময় সাধুর সহিত যথোচিত ব্যবহার করিতে পারে না; তবু সাধু তাহাদের দোষ না দেখিয়া কেবল কল্যাণচিন্তাই করিবে। কিছু না খাইয়া আসিলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়—সাধুর ঐরূপ করিতে নাই, অন্ততঃ এক গ্লাস জল চাহিয়াও খাওয়া উচিত।

ঐ সময়ে তথায় আগত ভক্তগণ ধ্যানজপাদিতে রত থাকিতেন এবং আপন অনুভূতির কথা ঠাকুরের শ্রুতিগোচর করাইতেন। শুনিতে শুনিতে রাখালেরও আগ্রহ হইল, তাঁহারও ঐরূপ অনুভূতি হউক। একদিন ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে তৈল-মর্দন করিতে করিতে ঐ বিষয়ে ধরিয়া বসিলেন এবং ঠাকুর সম্মত হইতেছেন না দেখিয়া বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তখন সেই অবাঞ্ছিত আগ্রহের নিবৃত্তির জন্য এমন এক মর্মান্তিক কথা বলিলেন যে, রাখাল তৎক্ষণাৎ দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করিয়া চলিলেন। কিন্তু উদ্যান-দ্বার অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে সহসা তাঁহার চরণদ্বয় অবশ হইল—তিনি মৌনবিস্ময়ে বসিয়া পড়িলেন। এমন সময়ে ঠাকুরের নিকট হইতে রামলাল-দাদা আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। অগত্যা তাঁহাকে ফিরিতে হইল। ঠাকুর তখন সকৌতুকে বলিলেন, “কি, গণ্ডি ছাড়িয়ে যেতে পারলি ?” সেই দিন বিকালে আবার সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, “তুই রাগ করেছিলি ? তোকে রাগালুম কেন, এর মানে আছে। ঔষধ ঠিক পড়বে বলে। পিলে মুখ তুললে পর মনসার পাতা-টাতা দিতে হয়।” আর একবার রাখাল দক্ষিণেশ্বর হইতে

যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ঐ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ঠাকুর অধর সেনের গৃহে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "এখানকার শ্রাবণ মাসের জল নয়। শ্রাবণ মাসের জল হুড় হুড় করে আসে, আবার বেরিয়ে যায়। এখানে পাতাল-ফোঁড়া শিব, বসানো শিব নয়। তুই রাগ করে দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে এলি, আমি মাকে বল্লুম—মা এর অপরাধ নিসনি।"

কিছুদিন পরেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পদসেবা করিতে করিতে রাখাল অন্তররাজ্যে ডুবিয়া বাহ্য সংজ্ঞা হারাইলেন। ঠাকুর পরে ভক্তদিগকে ঐ স্থানটি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "এইখানে বসে পা টিপতে টিপতে রাখালের প্রথম ভাব হয়েছিল। একজন ভাগবতের পণ্ডিত এই ঘরে বসে ভাগবতের কথা বলছিল। সেই সকল কথা শুনতে শুনতে রাখাল মাঝে মাঝে শিউরে উঠতে লাগল—তারপর একেবারে স্থির!"

ঠাকুরের কৃপায় বহুপ্রার্থিত অলৌকিক অনুভূতিতে অধিকারী হইলেও রাখালের মনে একটা অতৃপ্তি রহিয়া গেল। তিনি চাহেন, ইচ্ছামাত্র ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া নানাবিধ দর্শনাদিতে সময় অতিবাহিত করিবেন। অপরের এরূপ হয়, তাঁহার কেন হইবে না? সুতরাং একদিন ঠাকুরকে বলিলেন, "কৈ, আমার তো ওদের মত কোন দর্শনাদি হয় না?" ঠাকুর বলিলেন, "একটু ধ্যানজপ নিয়মিত করলে এ রকম দর্শন হয়।" তাঁহার কথায় রাখাল সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু প্রথমতঃ উহাতে কোন রসবোধ না হওয়ায় সাধনে শৈথিল্য দেখা গেল। ঠাকুর ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "খুব রোক চাই—তবে সাধনা হয়।" অতঃপর একনিষ্ঠ-সাধক রাখাল একদিন ঠাকুরের সহিত ৺কালীমন্দিরে গিয়াছেন; ঠাকুর গর্ভমন্দিরে উপবেশন করিলে তিনি নাটমন্দিরে বসিয়া জপ করিতে করিতে দেখেন, সহসা গর্ভমন্দির অপরূপ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে এবং ক্রমে সেই তীব্র স্নিগ্ধজ্যোতি মন্দিরদ্বার অতিক্রমপূর্বক

তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে। ভীত-চকিত রাখাল অমনি আসন ছাড়িয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে ঠাকুরের গৃহে চলিয়া গেলেন। ঠাকুর স্বগৃহে ফিরিয়া আনুপূর্বিক সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "তুই না বলিস্, তোর দর্শন-টর্শন কিছু হয় না? আবার কিছু দেখলেও ভয়ে পালিয়ে আসবি? তা হলে কি করবি বল?" আর একদিন রাখাল নাটমন্দিরে ধ্যানে মগ্ন আছেন; এমন সময় ঠাকুর উপনীত হইয়া বলিলেন, "এই নে তোর মন্ত্র, আর ঐ দেখ্ তোর ইষ্ট।" রাখাল সত্যসত্যই সেই ক্ষণে মন্ত্রলাভ করিয়া এবং ইষ্টমূর্তির দর্শনপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। অপর একদিন তিনি বহু চেষ্টায়ও মন স্থির করিতে না পারিয়া বিষণ্ণচিত্তে আপন দুরদৃষ্টের জন্য নিজকে ধিক্কার দিতে দিতে আসন ত্যাগ করিলেন। ঠিক তখনই ঠাকুর তথায় আগমনপূর্বক অকস্মাৎ আসন ছাড়িবার কারণ জানিতে চাহিলেন এবং সব শুনিয়া বিড় বিড় করিতে করিতে রাখালের জিহ্বায় তিনটি রেখা টানিয়া দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে রাখালের অন্তরে শান্তির নির্ঝর প্রবাহিত হইতে থাকিল।

ক্রমে সাধনানিষ্ঠ রাখালের এমন অবস্থা হইল যে, তিনি দৈনিক কার্যে পর্যন্ত মনোনিবেশ করিতে পারেন না। ঠাকুর লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "রাখালের এম্নি স্বভাব হয়ে দাড়াচ্ছে যে, তাকে আমার জল দিতে হয়; সেবা করতে পারে না।" সংসারে বৈরাগ্যও তখন এমন উচ্চ স্তরে উঠিয়াছে যে, রাখাল ঠাকুরকে বলিতেন, "সংসার আমার আলুনি লাগে—সময় সময় তোমাকেও আমার ভাল লাগে না।"

দেখিতে দেখিতে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। এই সময় রাখাল প্রায়ই জ্বরে আক্রান্ত হইতেন; তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে মাঝে মাঝে কলিকাতায় যাইয়া থাকিতে হইত। কিন্তু তিনি পিতৃগৃহে না যাইয়া বলরাম-মন্দিরে বা অধর সেনের বাটীতে অবস্থান করিতেন। এই সময়ে

তাঁহার চিত্তেও একটা আলোড়ন চলিতেছিল। ঠাকুর বলিয়াছেন, "রাখালের মনে তখন বালকের মত হিংসাও ছিল।··· তাই আমার মনে কখন কখন তার জন্য ভয় হত। কারণ মা (জগদম্বা) যাদের এখানে আনছেন, তাদের উপর হিংসা করে পাছে তার অকল্যাণ হয়।" নবাগতরা ঠাকুরের স্নেহভাগী হইবে—ইহা রাখালের সহ্য হইত না। এই অবস্থা যখন চলিতেছে, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ একদা ভাবচক্ষে দেখিলেন, মা যেন রাখালকে সরাইয়া দিতেছেন; অমনি সচকিতে মাকে ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইলেন, "মা, ওকে হৃদের মত সরাসনি; মা, ও ছেলেমানুষ, বোঝে না—তাই কখন কখন অভিমান করে। যদি তোর কাজের জন্য ওকে এখান থেকে কিছুদিনের জন্য সরিয়ে দিস্, তাহলে ভাল জায়গায় মনের আনন্দে ওকে রাখিস্।" যাহা হউক, রাখাল কলিকাতায় ভক্তগৃহে কিছুদিন আনন্দেই কাটাইলেন। কিন্তু সর্বপ্রকার যত্নসত্ত্বেও শরীর সুস্থ হইল না। ঠিক সেই সময় বলরাম বাবু বৃন্দাবনে যাইতেছিলেন। তিনি রাখালকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলে ঠাকুর সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিলেন। তদনুসারে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভে রাখাল ব্রজধামে উপস্থিত হইলেন। সৌন্দর্য-নিলয় ও ভাবগম্ভীর ব্রজধামে রাখাল বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলেন। এই সেই শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন, আর এই সেই যমুনাপুলিন! এখানে কুঞ্জে কুঞ্জে ময়ূরময়ূরী নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। এই স্বভাব-সুন্দর ধামে রাখালের মনের ন্যায় শরীরও প্রথম কিছুদিন বেশ ভালই ছিল। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে আবার জ্বর হইল। সংবাদ পাইয়া উদ্বিগ্ন-মনে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "রাখাল সত্যসত্যই ব্রজের রাখাল। যে যেখান থেকে এসে শরীরধারণ করে, সেখানে গেলে প্রায়ই তার শরীর থাকে না।" তাই আকুলকণ্ঠে মাকে জানাইলেন, "মা, কি হবে?

তাকে ভাল করে দে; সে যে ঘর-বাড়ি ছেড়ে আমার উপর সব নির্ভর করেছে!"

ঠাকুরের প্রার্থনা মা শুনিলেন। তিন মাস পরে নভেম্বরের শেষভাগে অপেক্ষাকৃত উত্তম স্বাস্থ্য লইয়া রাখাল বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক পুনঃ ঠাকুরের সেবায় রত হইলেন। কিন্তু দৈবক্রমে মাসেক পরেই তিনি আবার অসুখে পড়িতে লাগিলেন। ঠাকুরও তখন সর্দি এবং গলরোগে পীড়িত। রাখাল জানিতেন যে, ঠাকুর তাঁহার বিষয়ে সর্বদাই চিন্তিত থাকেন। রুগ্ন শরীর লইয়া দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিলে ঠাকুরের উদ্বেগবৃদ্ধি হইবে মাত্র। সেরূপ দুশ্চিন্তা যাহাতে না হয় তাহাই করা উচিত—এই ভাবিয়া তিনি ঠাকুরকে স্বীয় মনোভাব না জানাইয়াই পিতৃগৃহে চলিয়া গেলেন এবং সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভের আশায় সেখানেই রহিয়া গেলেন।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, রাখাল বাড়িতে না যাইতে চাহিলেও ঠাকুর তাঁহাকে মাঝে মাঝে গৃহে পাঠাইয়া দিয়া হৃতশাবকা বিহঙ্গীর ন্যায় ছটফট করিয়া দিন কাটাইতেন। রাখাল প্রথমে খুব আপত্তি জানাইলেও ক্রমে যাতায়াতের ও গৃহে অবস্থানের কাল বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং বিশ্বেশ্বরীর সহিত তাঁহার ব্যবহারাদিও অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া উঠে। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "তার পরিবারের কাছে তাকে আমিই পাঠিয়ে দিতাম—একটু ভোগ বাকী ছিল।" রাখালের সহজ ব্যবহার দর্শনে পরিবারস্থ লোকেরা আশ্বস্ত হইয়া রাখালকে কর্মে প্রবৃত্ত করাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। রাখাল এই সংবাদ ঠাকুরের কর্ণগোচর করাইলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরের জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছিস, একথা বরং শুনব, তবু কারুর দাসত্ব করিস, চাকরি করিস—একথা যেন না শুনি। আত্মীয়-স্বজন কিন্তু ছাড়েন নাই: তাঁহারা যুক্তি দেখাইয়াছিলেন যে,

নিজের জন্য না হইলেও পরিবারের জন্য অর্থোপার্জন করা উচিত, কারণ পরিবারের প্রতি তো একটা কর্তব্য আছে। সরলভাবে রাখাল তাই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমার পরিবারের কি হবে?" এই প্রশ্নে ঠাকুরকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া রাখাল গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন। যাহা হউক, স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া এবং হয়তো অলৌকিক বিধানে বাকী 'একটু ভোগ' শেষ করিবারই জন্য তিনি অধুনা এইরূপ সন্দেহদোলায়মান-চিত্তেই এখন গৃহে অবস্থান করিতে থাকিলেন। এদিকে ঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে ভক্তদের বলিলেন, "রাখাল এখন পেন্‌সন খাচ্ছে। বৃন্দাবন থেকে এসে এখন বাড়িতে বাস করছে।" রাখাল এইভাবে কিছুদিন স্বগৃহে বাস করিয়া সুস্থ হইবামাত্র দক্ষিণেশ্বরে পুনরাগমন করিলেন।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ চক্রবর্তী ঠাকুরের নিকট নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে ব্রহ্মচক্র রচনাপূর্বক সাধন করিতে অভিলাষ হইয়াছে। তারপর ঠাকুরের অনুমতিক্রমে তাঁহারই কক্ষে কৃষ্ণাচতুর্দশীর গভীর রাত্রে রাখাল, মাস্টার, কিশোরী প্রভৃতিকে লইয়া তিনি ধ্যানে বসিলেন। ধ্যানে রাখালের ভাবাবস্থা উপস্থিত হইলে ঠাকুর সেই রাত্রে তাঁহার বক্ষে হাত বুলাইয়া বাহ্যসংজ্ঞা ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। ইহার দিন দুই পরে ঠাকুর মৌনাবলম্বন করেন এবং মৌনভঙ্গে বলেন, "মা দেখিয়ে দিচ্ছিলেন··· ভক্তদের কার কতটা হয়েছে।" জিজ্ঞাসিত হইয়াও তিনি অধিক কিছু বলেন নাই। পরে শরৎকে বলিয়াছিলেন, "রাখালের সম্বন্ধে মা কত দেখাইয়াছেন! তাহার অনেক কথা বলিতে নিষেধ আছে।"

ইহার দুই মাস পূর্বেই ঠাকুরের গলরোগের বৃদ্ধি হইয়াছিল। যথাসময়ে তাঁহাকে চিকিৎসার্থ কাশীপুরে আনা হইলে রাখালও তথায় আসিয়া সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। সেবার সহিত ত্যাগী ভক্তদের জীবনে

এখন চলিল এক অপূর্ব সাধনা—সংসারের চিন্তা ক্রমেই তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। কাশীপুরে আসার কিছুদিন পরেই মনোমোহন ঠাকুরকে জানাইলেন যে, রাখালের একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে। রাখাল পার্শ্বেই ছিলেন, সব শুনিলেন; কিন্তু তখন মায়িক সংসারের ঘটনাবলী তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও রেখাপাত করিত না; সেজন্য এই সংবাদে তাঁহার বৈরাগ্যজনিত প্রশান্তির কোন হ্রাস লক্ষিত হইল না—তিনি পূর্বেরই ন্যায় দিবসে সেবা ও রাত্রে ধ্যানজপে মগ্ন রহিলেন। ঠাকুর ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "রাখাল-টাখাল এখন বুঝেছে, কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ; কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা। পরিবার আছে, ছেলেও হয়েছে—কিন্তু বুঝেছে যে, সেসব মিথ্যা, অনিত্য। রাখাল-টাখাল এরা সংসারে লিপ্ত হবে না।"

লীলাবসানে উন্মুখ ঠাকুর এই সময়ে ভাবী রামকৃষ্ণসঙ্ঘ-গঠনের জন্য প্রায় প্রত্যহ নরেন্দ্রকে গোপনে ডাকিয়া নানা উপদেশ দিতেন। একদিন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "রাখালের রাজবুদ্ধি আছে, ইচ্ছা করলে সে একটা রাজ্য চালাতে পারে।" কে জানে, এই বাক্যে নরেন্দ্র কিসের ইঙ্গিত পাইলেন! অনন্তর একদিন তিনি গুরুভ্রাতাদিগকে বলিলেন, "আজ হতে আমরা রাখালকে 'রাজা' বলে ডাকব।" ঠাকুরের কানে ঐ কথা উঠিলে তিনিও সানন্দে বলিলেন, "রাখালের ঠিক নাম হয়েছে।" তদবধি গুরু-ভ্রাতাদের নিকট তিনি 'রাজা' বলিয়াই পরিচিত হইলেন; কিন্তু পরে রামকৃষ্ণসঙ্ঘে তাঁহার সর্বজন-পরিচিত নাম হইয়াছিল 'মহারাজ'। আমরাও তাঁহাকে মহারাজ বলিয়াই উল্লেখ করিব।

ঠাকুরের রোগের উপশম হইতেছে না দেখিয়া মহারাজ প্রভৃতি সকলেই তখন বিশেষ চিন্তিত থাকিলেও হৃদয়ে আশা পোষণ করিতে লাগিলেন। প্রত্যূত একদিন নরেন্দ্র ও মহারাজের মুখে আদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে

স্নেহবিগলিতস্বরে তিনি তাঁহাদের ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়া বলিলেন, "শরীরটা কিছুদিন থাকত তো লোকদের চৈতন্য হত। তা রাখবে না, সরল মূর্খ দেখে লোক সব ধরে পড়ে—সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফেলে! একে কলিতে ধ্যানজপ নেই।" মহারাজ শ্রবণমাত্র মর্মভেদী কাতরস্বরে অনুনয় করিয়া বলিলেন, "আপনি বলুন, যাহাতে আপনার শরীর থাকে।" নির্বিকার মাতৃচালিত মহাপুরুষ শুধু বলিলেন, "সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

বিশ্বাস ভাঙ্গিলেও আশা যায় না; আর ভক্ত কখনও ঠাকুর-সেবায় বিরত হয় না। পূর্বোক্ত ঘটনার পরেও মহারাজ একমনে সেবা করিয়া যাইতে লাগিলেন। এমন কি, সাধনার প্রবল উচ্ছ্বাসে গুরুভ্রাতাদের কেহ কেহ তীর্থদর্শন ও তপস্যাদিতে বহির্গত হইলেও তিনি স্থিরভাবে একটানা কাশীপুরেই অবস্থান করিলেন। ঐ সময়ে ঠাকুর যুবক-ভক্তদিগকে মধ্যে মধ্যে ভিক্ষান্বেষণে বাহিরে পাঠাইতেন—বলিতেন, "ভিক্ষার অন্ন শুদ্ধ।" তদনুসারে একদিন লাটু ও মহারাজ ভিক্ষায় চলিলেন। যাইবার সময় ঠাকুর বলিয়া দিলেন, "কেউ গাল দেবে, আবার কেউ আশীর্বাদ করবে, হয়তো আবার কেউ পয়সাও দেবে—তোরা সব নিবি।" পরে তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যগুলি তাঁহাদের দ্বারা রন্ধন করাইয়া স্বয়ং সেই অন্নের আস্বাদ গ্রহণ করিলেন।

কাশীপুরের একটি ঘটনায় মহারাজের তৎকালীন উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এক পাগলী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিত। কাশীপুরেও তাহার উৎপাত আরম্ভ হইলে নিরঞ্জনাদি ভক্তেরা তাহার ঠাকুরের নিকট উপরে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। তবু সে নিষেধ মানিতে চাহে না। একদিন শশী শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখেই মহারাজকে বলিতেছিলেন, "এবার পাগলী এলে ধাক্কা মেরে তাড়াতে হবে।" অহেতুক-কৃপাসিন্ধু ঠাকুর অমনি ইঙ্গিতে বলিলেন, "না না, সে আসবে

আর দেখে চলে যাবে।" মহারাজেরও মনোভাব ছিল, "যেমন করেই হোক, পাগলী ঠাকুরের কথাই তো চিন্তা করছে; সুতরাং আমরা বিরক্ত হব কেন?" পরন্তু এপ্রকার যুক্তিতে আস্থাহীন শশী বলিলেন, "কিন্তু অসুখের সময় কেন আর ওরকম উপদ্রব!" মহারাজ প্রেমার্দ্র-হৃদয়ে উত্তর দিলেন, "উপদ্রব সবাই করে। সকলেই কি খাঁটী হয়ে ওঁর কাছে এসেছে? ওঁকে আমরা কষ্ট দিই নি? নরেন্দ্র-টরেন্দ্র আগে কি রকম ছিল! কত তর্ক করত! ডাক্তার সরকার কত কি ওঁকে বলেছে! ধরতে গেলে কেহই নির্দোষ নয়।" অতঃপর পাগলীর কথা উল্লেখ করিয়া আবার বলিলেন, "দুঃখ হয় যে, সে উপদ্রব করে। আর তার জন্য অনেকে কষ্টও পায়।"

অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসংবরণ করিলেন। মহারাজের হৃদয়ে আজ পিতার সম্পত্তি, যুবতী ভার্যা, শিশুপুত্র—কেহই স্থান পাইল না, সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া রহিল শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি এবং এক অননুবর্ণনীয় ব্যথা। কিন্তু কাল বড়ই নিষ্ঠুর, সে বর্তমানের কঠিন আঘাতে মানবকে জর্জরিত করিয়া জানাইয়া দেয় যে, অতীত সত্যই চলিয়া গিয়াছে। শীঘ্রই ঠাকুরের শেষ স্মৃতির সহিত বিজড়িত কাশীপুরের উদ্যানবাটী ত্যাগ করিয়া মহারাজকেও বলরাম-মন্দিরে আসিতে হইল। অতঃপর বরাহনগরে মঠ স্থাপিত হইলে তিনি যথাসময়ে তথায় যোগদানপূর্বক ঠাকুরের পূত স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিতে সচেষ্ট রহিলেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষে নরেন্দ্রাদি যখন আঁটপুরে যান তখন রাখাল না যাওয়ায় বাবুরামের মাতাঠাকুরানী অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হন; তাই রাখাল, বাবুরাম ও বুড়োগোপালকে লইয়া নরেন্দ্র পুনর্বার সেখানে যান। আঁটপুরের একটি যুবক খ্রীষ্টধর্মগ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছিল। সে মহারাজের ধ্যান-তন্ময়তা দেখিয়া ও তাঁহার সহিত আলাপে মুগ্ধ হইয়া ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে।

আঁটপুর হইতে ফিরিয়া সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর মহারাজের নাম হইল ব্রহ্মানন্দ। তাঁহার সন্ন্যাস যে শুধু একটা বাহ্য আড়ম্বর ছিল না, পরন্তু অন্তরের বৈরাগ্যোজ্জ্বল গৈরিক রাগের বহিঃপ্রকাশস্বরূপ ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল বরাহনগরে একদিন তাঁহার পিতার প্রতি আচরণে। আনন্দ-মোহন মধ্যে মধ্যে মঠে আসিয়া পুত্রকে গৃহে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেন। মহারাজও শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ স্মরণ করিয়া পিতার প্রতি সমুচিত সম্মান ও ভালবাসা দেখাইতেন; কিন্তু গৃহে ফিরিতেন না। ইহাতে পিতা বিরত হইতেন না দেখিয়া অবশেষে তিনি নম্রভাবে অথচ স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া দিলেন, "কেন আপনারা কষ্ট করে আসেন? আমি এখানে বেশ আছি। এখন আশীর্বাদ করুন যেন আপনারা আমায় ভুলে যান, আর আমি আপনাদের ভুলে যাই।" মায়িক সম্বন্ধ তিনি সত্যই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কারণ এই সময়ে অকস্মাৎ তাঁহার পত্নী দেহত্যাগ করিলে দেখা গেল যে, মহারাজ অবিচলিত আছেন। এমন কি, কয়েক বৎসর পরে (১৮৯৬-এর ২০শে এপ্রিল) তাঁহার একমাত্র দশমবর্ষীয় পুত্র সত্যানন্দের মৃত্যুসংবাদেও তিনি সুমেরুবৎ অচল, অটল ও নির্বিকার ছিলেন।

বরাহনগরের মঠে অবিরাম বৈরাগ্যাগ্নি প্রজ্বলিত থাকিলেও মহারাজের কেবলই মনে হইতে লাগিল, "ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর দশজনের সঙ্গে নানাবিধ কার্য ও আলাপাদিতে লিপ্ত থাকাই চিত্তবিক্ষেপের কারণ।" সুতরাং নেতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতৃতুল্য নরেন্দ্রনাথকে একদিন একান্তে জানাইলেন, "এখানে থেকে তো কিছুই হল না! তিনি যা বলেছিলেন—ভগবদ্দর্শন, কৈ হল?" গুরুভ্রাতাকে নিরুত্তর দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "চল, নর্মদায় বেরিয়ে পড়ি।" এবারে নেতা উত্তর দিলেন, "বের হয়ে কি হবে? জ্ঞান কি হয়, তাই জ্ঞান জ্ঞান করছিস?" ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, 'মুক্তি ও তাহার সাধন' বইখানিতে আছে—সন্ন্যাসীদের একসঙ্গে থাকা ভাল

নয়।” নরেন্দ্র নীরব রহিলেন; কারণ ইহাই তো ভারতের চিরন্তন ধারা যে, সন্ন্যাসী নির্জনে ভগবচ্চিন্তা করিবে। নূতন কর্মপ্রণালীর চিন্তা চকিতে তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইলেও উহা তখনও স্পষ্ট আকার ধারণ করে নাই; আর সনাতন বিশ্বাসানুযায়ী তাঁহারও প্রাণ তখন তীর্থাদিদর্শন ও নির্জনবাসাদির জন্য ব্যাকুল। কিন্তু উত্তর দিতে অসমর্থ হইলেও ঠাকুরের আদরের রাখালকে তিনি তখনই যথা-তথা যাইতে দিলেন না। অনন্তর ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শ্রীশ্রীমায়ের নীলাচল-গমনকালে রাখালও সকলের অনুমতিক্রমে তাঁহার সহিত সেখানে চলিলেন।

নীলাচলে পৌঁছিয়া শ্রীশ্রীমা অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত বলরাম বাবুদের ‘ক্ষেত্রবাসীর মঠ’ নামক বাড়িতে থাকিলেন। ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি অপরেরা অন্যত্র অবস্থানপূর্বক ভিক্ষান্নে উদরপূর্তি করিয়া ৺জগন্নাথ-দর্শন ও ধ্যান-জপাদিতে সময় কাটাইতে লাগিলেন। পরন্তু যত্নের অভাবে মহারাজের শরীর শীর্ণ হইতেছে জানিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী বিশেষ চিন্তিত রহিলেন এবং বলরাম বাবুও তাঁহাকে স্বগৃহে আনিবার জন্য আগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন। রাখাল বুঝিতে পারিলেন যে, এইরূপ অবস্থায় তাঁহার পক্ষে দীর্ঘকাল স্বেচ্ছানুসারে আহার-বিহার ও তপস্যাদি করা সম্ভব হইবে না। অতএব কয়েক মাস পরেই পুরী হইতে কটক হইয়া তিনি বরাহনগর মঠে চলিয়া আসিলেন।

মহারাজের নির্জন-তপস্যার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত না হইয়া অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং আত্মপ্রকাশের সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকিল। অবশেষে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি উত্তরাখণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহার সহচররূপে সুবোধানন্দকেও পাঠাইলেন। মহারাজ ও সুবোধানন্দ ৺বৈদ্যনাথ-দর্শনান্তে বারাণসীধামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে পিশাচমোচন-পল্লীতে

শ্রীযুক্ত প্রমদাদাস বাবুর এক নির্জন উদ্যানবাটীতে অবস্থানপূর্বক সত্রে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহারা তপস্যায় মগ্ন হইলেন। এইরূপে মাঘ মাস পর্যন্ত তথায় কাটাইয়া স্বামী সুবোধানন্দ ও অপর একজন বাঙ্গালী পরিব্রাজকের সহিত মহারাজ নর্মদা তীর্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই নর্মদাতীরে মহারাজ একাদিক্রমে ছয়দিন গভীর অতীন্দ্রিয় ভাবে নিমগ্ন থাকিয়া এককালীন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি পঞ্চবটী প্রভৃতি সুপ্রাচীন ও সুপবিত্র তীর্থাদি দর্শন ও তত্তৎস্থলে কিয়ৎকাল ধ্যানজপাদিতে অতিবাহিত করিয়া বোম্বাই হইয়া শ্রীদ্বারকাধাম যাত্রা করিলেন। এই যাত্রাকালে এবং সৌরাষ্ট্রে ভ্রমণকালে মহারাজের অপ্রতিগ্রহ ও নিঃস্পৃহা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। বোম্বাই শহরে শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত শ্রীকালীপদ ঘোষ (দানা-কালী) তাঁহাদিগকে নিজের আবাসে লইয়া যাইতে চাহিলে ব্রহ্মানন্দ উহাতে অস্বীকৃত হন এবং শ্রীশ্রীমুম্বাদেবীর মন্দিরসংলগ্ন এক নিভৃত স্থানে প্রায় সাত-আট দিন থাকিয়া দ্বারকা-গমনার্থে জাহাজে উঠেন। যাত্রাকালে তাঁহার তেজঃপুঞ্জ লাবণ্যময় ধ্যান-গম্ভীর মূর্তি-সন্দর্শনে জনৈক ভাটিয়া মহাজন তীর্থদর্শনের জন্য কিঞ্চিৎ অর্থ দিতে চাহিলে মহারাজ অস্বীকৃত হন। অগত্যা শেঠজী তিনখানি টিকেট কিনিয়া সুবোধানন্দের হস্তে অর্পণ করেন।

দ্বারকাধামে তীর্থযাত্রীরা পুণ্যতোয়া গোমতীর জলে স্নান করিয়া থাকেন; কিন্তু তজ্জন্য প্রত্যেককে রাজসরকারে দুই টাকা মাশুল দিতে হয়। নিঃসম্বল স্বামী ব্রহ্মানন্দাদির নিকটও ঐরূপ অর্থ চাহিলে তাঁহারা হতাশ-হৃদয়ে ফিরিয়া চলিলেন; অধিকন্তু জনৈক ব্যবসায়ী উপযুক্ত অর্থপ্রদানে অগ্রসর হইলে মহারাজ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "গোমতী নদীতে স্নান অপেক্ষা তীর্থরাজ সমুদ্রে স্নান অধিকতর পুণ্যপ্রদ। বৃথা অর্থব্যয়ের আবশ্যক নাই—আমরা বেটপুরী-সঙ্গমে সমুদ্রে স্নান করিব।" শেঠজী

তাঁহার এই সারগর্ভ বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে স্বগৃহে আনয়ন-পূর্বক তিন দিন তাঁহাদের সেবা করিলেন এবং প্রত্যেকের হস্তে একখানি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অর্পণ করিলেন। শেঠজী তাঁহাদের তীর্থযাত্রার সুবিধার জন্য বিভিন্ন স্থানে পত্র দিতেও চাহিলেন; কিন্তু মহারাজ উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। শুধু বলিলেন, "আমার কোন বস্তুর অভাব বা আবশ্যক নাই—সাধু-সন্ন্যাসীর ঈশ্বরই একমাত্র আশ্রয় ও ভরসা।" অতঃপর শেঠজী অর্থদানের আকাঙ্ক্ষা জানাইলে উহাও অস্বীকারপূর্বক পদব্রজে সাত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মানন্দজী বেটদ্বারকায় উপস্থিত হইলেন এবং স্নান ও মন্দিরাদি-দর্শনান্তে সুবোধানন্দকে ধর্মশালায় ভিক্ষার্থে প্রেরণ করিলেন। ধর্মশালার অধ্যক্ষ ঐ জন্য বাদাম রাখিতেন। সুবোধানন্দজী ভিক্ষাস্বরূপে প্রাপ্ত কয়েক সের বাদাম লইয়া মহারাজের সম্মুখে স্থাপন করিলে বাদামের পরিমাণ দেখিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "এত বাদাম কে দিয়েছে?" "ধর্মশালার অধ্যক্ষ।" মহারাজ বলিলেন, "আমাদের জন্য দুই ছটাক রেখে বাকীগুলো ফিরিয়ে দিয়ে এসো।" কিন্তু সুবোধানন্দ উভয় বিপদে পড়িলেন—সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দ সঞ্চয় করিতে পরাঙ্মুখ, সাধুসেবক অধ্যক্ষ প্রতিগ্রহণে অস্বীকৃত! অগত্যা ব্রহ্মানন্দের ব্যবস্থানুসারে দুই ছটাক রাখিয়া অবশিষ্ট বাদাম দরিদ্রের মধ্যে বিতরিত হইল। ভেটদ্বারকা হইতে তাঁহারা ক্রমে সুদামাপুরী ও জুনাগড়ে গির্ণার পর্বতোপরি মন্দিরাদি-দর্শনান্তে গুজরাটের মধ্য দিয়া আমেদাবাদে উপনীত হইলেন এবং তদনন্তর রাজপুতানার তীর্থগুলি-দর্শনের জন্য প্রথমে পুষ্করতীর্থে উপস্থিত হইলেন। এখানে সঙ্গের পরিব্রাজকটি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহাকে আজমীরের হাসপাতালে রাখিয়া কিছুদিন পরে (১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর প্রথমভাগে) ব্রহ্মানন্দ ও সুবোধানন্দ বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

বৃন্দাবনে মহারাজের এই দ্বিতীয়বার আগমন। স্বধামে উপস্থিত ব্রজের রাখাল ভগবদ্ভাবে বিভোর হইলেন। এইভাবে কত দিন কাটিয়া গেল, কত মহানিশার অবসান হইল—ভগবদ্ধ্যানে তন্ময় মহারাজের ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি কোন দিন সুবোধানন্দের আনীত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন, কোন দিন উহা অনাদরে পড়িয়া থাকে। কোন দিন মন্দিরে গমনপূর্বক ভাববিমুগ্ধচিত্তে অনিমেষনয়নে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন, কোন দিন বা সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারান। আর রাত্রে নিদ্রার স্থলে ধ্যানই অধিক হইয়া থাকে। এই সময়ে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন। মহারাজের কঠোর তপস্যার কথা তাঁহার শ্রুতিগোচর হইলে তিনি একদিন তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরমহংসদেব আপনাকে তো সব রকম সাধনভজন, অনুভূতি, দর্শনাদি করিয়ে দিয়েছেন; তবে আপনি এখন কেন আবার কঠোর সাধনা করছেন?" ব্রহ্মানন্দ মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, "তাঁর কৃপায় যে-সব অনুভূতি বা দর্শন হয়েছে, এখন সেগুলি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছি মাত্র।" গোঁসাইজী এইরূপ উত্তর কিভাবে লইয়াছিলেন জানি না; পরন্তু রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ইতিহাস-পর্যালোচকের দৃষ্টিতে এবংবিধ তপস্যার গূঢ় তাৎপর্য রহিয়াছে। সঙ্ঘের অধ্যাত্ম-চেতনাকে সদা সক্রিয় রাখিতে হইলে সঙ্ঘের মর্মস্থলে এমন একটি শক্তিকেন্দ্র-প্রতিষ্ঠার আবশ্যক ছিল, যাহা হইতে কর্মব্যাপৃত অপর আধারগুলি প্রয়োজনমত আপনাদিগকে পুনঃ পুনঃ পূর্ণ করিয়া লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারের ধারা অব্যাহত রাখিতে পারে। ইহারই আর এক সময়ে মহারাজের জ্বর হইলে গোঁসাইজী অচিরে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া সুবোধানন্দের নিকট জানিতে পারিলেন যে, রোগীর মশারি নাই। শ্রবণমাত্র তিনি মশারি ও ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন এবং ভগবানের কৃপায় ব্রহ্মানন্দও শীঘ্রই নিরাময় হইলেন। ইত্যবসরে সুবোধানন্দের মন পূর্ব

সংকল্পানুসারে উত্তরাখণ্ডের নিমিত্ত অতীব ব্যগ্র হইয়া পড়িল। মহারাজের নিকট উক্ত বাসনা জ্ঞাপন করিলে তিনি সানন্দে তাঁহাকে যাত্রার অনুমতি দিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং তখনও উক্ত প্রদেশে যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। সেজন্য একাই শ্রীবৃন্দাবনে রহিয়া গেলেন।

বৃন্দাবনে অবস্থানকালে তিনি একদিন দেখিলেন যে, ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত বলরাম বাবু জ্যোতির্ময়দেহে হাসিতে হাসিতে দিব্যলোকে চলিয়া যাইতেছেন। পরে যথাসময়ে পত্রে জানিতে পারিলেন যে, তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন (১৩ই এপ্রিল, ১৮৯০)। ইহার পরে আরও কয়েক মাস বৃন্দাবনে কাটাইয়া সেপ্টেম্বরের শেষে তিনি পদব্রজে হরিদ্বারে উপনীত হইলেন। অপর কয়েকজন গুরুভ্রাতা ঐ অঞ্চলে পূর্ব হইতেই তপস্যায় নিরত ছিলেন। ১৮৯১-এর জানুয়ারী মাসে একদিন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদের সমভিব্যাহারে ব্রহ্মানন্দ-সকাশে আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন। মহারাজ সেই আদেশ পালনপূর্বক মীরাটে গেলেন এবং সেখানে অখণ্ডানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। মীরাটে মার্চ পর্যন্ত অতিবাহিত হইলে স্বামীজী সকলকে বলিয়া নিঃসঙ্গ ভ্রমণে নির্গত হইলেন; এদিকে মহারাজও স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত এপ্রিল মাসে জ্বালামুখী তীর্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন। জ্বালামুখী হইতে তাঁহারা কাংড়া, পাঠানকোট, গুজরানওয়ালা, লাহোর, মণ্টগোমারী, মুলতান ও সক্কর হইয়া করাচীতে উপনীত হইলেন। করাচী হইতে জাহাজে বোম্বাই পৌঁছিলে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহাদের পুনর্মিলন ঘটিল। স্বামীজী তখন আমেরিকাগমনে উদ্যত; কিন্তু তৎপূর্বে খেতড়ীরাজের আহ্বানে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইবে। ব্রহ্মানন্দ এবং তুরীয়ানন্দও তাঁহার সহিত গমনপূর্বক পথে আবুরোড স্টেশনে নামিয়া আবু পাহাড়ে উপস্থিত হইলেন। খেতড়ী হইতে স্বামীজীর বোম্বাই প্রত্যাগমন-কালে তাঁহারা পুনর্বার আবুরোডে আসিয়া স্বল্পক্ষণের জন্য তাঁহার

সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অতঃপর কিয়দ্দিবস আবুপাহাড়ে যাপনান্তে তাঁহারা আবুরোডে নামিয়া আসিলেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের আহ্বানে অখণ্ডানন্দও বোম্বাই হইতে তথায় আসিলে তিন জনে আজমীর হইয়া জয়পুরে গেলেন। সেখানে একমাস অবস্থানের পর অখণ্ডানন্দ রাজপুতানা-ভ্রমণে নির্গত হইলেন এবং মহারাজ ও তুরীয়ানন্দ বৃন্দাবনে চলিলেন।

বৃন্দাবনে আসিয়া উভয় গুরুভ্রাতা দিব্যভাবে ভাবিত হইলেন। তুরীয়ানন্দ একদিন বলিলেন, "আজ ভিক্ষা করতে বেরুব না। দেখি, রাধারানী উপবাসী রাখেন কি না।" ধ্যানে মগ্ন গুরুভ্রাতৃদ্বয়ের একদিন একরাত্রি কোন্ দিক দিয়া কাটিয়া গেল—কিছুমাত্র জ্ঞান রহিল না। পরদিন এক তীর্থযাত্রী অযাচিতভাবে প্রচুর খাদ্যসামগ্রী দিয়া গেল। বৃন্দাবন হইতে তাঁহারা পদব্রজে নন্দগ্রাম, বর্ষাণা, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গিরিগোবর্ধন প্রভৃতি দর্শন করিয়া কুসুমসরোবরে উপনীত হইলেন এবং ঐ স্থানটি তপস্যার অনুকূল দেখিয়া তথায় রহিয়া গেলেন। এই সময়ের কঠোর জীবনের ইতিহাস আমাদের বিদিত নাই বলিলেই চলে। অন্য সময়েরই বা কতটুকু বিদিত আছে? ভাবময় ঠাকুরের মানসপুত্রের বিভিন্ন তীর্থাদিতে যে-সব সাধন, অনুভূতি বা দর্শনাদি হইয়াছিল তাহার কতটুকু আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিতে পারি, আর কতটুকুই বা ভাষায় প্রকাশ করা চলে? মহারাজ প্রায়ই বলিতেন, "নির্বিকল্প সমাধির পর ধর্মজীবন আরম্ভ হয়।" যে নির্বিকল্প সমাধি বহুজীবনের সাধনায় ক্বচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটে, উহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এবং উহার পরবর্তী অনুভূতিসম্পদে ভূষিত হইয়া যিনি বহু ভক্তকে ধর্মপথে পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের অতি স্থূল আভাসমাত্রই আমরা দিতে সক্ষম।

ইতোমধ্যে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকায় ও ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের জয়ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। ইহার ফলে মঠের কার্যবৃদ্ধির সূত্রপাত হওয়ায় মঠে চলিয়া যাইবার জন্য তাঁহাদের নিকট বারংবার আহ্বান আসিতে লাগিল। ইহার কিছু পরে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে বৃন্দাবন হইতে তাঁহারা লক্ষ্ণৌ হইয়া অযোধ্যায় যান। তথায় শিবানন্দজীর মুখে মঠে ফিরিবার জন্য স্বামীজীর নির্দেশ পাইয়া তুরীয়ানন্দ আগস্ট মাসে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন; পরন্তু মহারাজ পুনর্বার বৃন্দাবনে ফিরিলেন। এইবারে বৃন্দাবনে আসিয়া তিনি অজগর-বৃত্তি অবলম্বন করিলেন—ভিক্ষার্থে কোথাও যাইতেন না, কাহারও নিকট কিছু চাহিতেন না। কোন দিন আহার জুটিত, কোন দিন বা অনাহারে কাটিত। কখন কোন শেঠ একখানি কম্বল দিয়া যাইতেন; পরক্ষণেই চোর আসিয়া উহা লইয়া যাইত। ব্রহ্মানন্দ সাক্ষিস্বরূপ সব দেখিয়া যাইতেন মাত্র। দিব্যভাবে বিভোর হইয়া কখন তিনি বাহ্যহারা হইতেন; আবার কখন তাঁহার দেহে অশ্রুপুলকাদির সঞ্চার হইত। এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত করিয়া অগ্রহায়ণ মাসে (নভেম্বর-ডিসেম্বর) তিনি ব্রজমণ্ডল ত্যাগ করিয়া মঠাভিমুখে চলিলেন।

মহারাজের মঠে প্রত্যাবর্তনের স্বল্পকাল পরেই অসুস্থা শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানীকে কলিকাতায় আনিয়া বাগবাজারে গঙ্গার ধারে 'গুদামওয়ালা বাড়ি' নামক একটি ভাড়াটিয়া বাড়ির ত্রিতলে রাখা হয়। সেখানে তাঁহার সেবাদির জন্য গোপালের মা এবং গোলাপ-মাও বাস করিতেন। এতদ্ব্যতীত যোগানন্দ এবং দুই-একজন ব্রহ্মচারীও দ্বিতলে থাকিতেন। ব্রহ্মানন্দও সেই বাড়িতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখানে তিনি সমাগত ভক্তদের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন এবং কোন কোন ভাগ্যবানকে দীক্ষাও দিয়াছিলেন। এই সময় হইতে স্বামীজীর ভারতে প্রত্যাগমন

পর্যন্ত মহারাজ অধিকাংশ সময় কলিকাতায়ই থাকিতেন। গুদামওয়ালা বাড়ির পরে বলরাম-মন্দির ছিল তাঁহার প্রধান আবাস-স্থল।

১৮৯৭-এর প্রারম্ভে ভারতে ফিরিয়া স্বামীজী স্বাস্থ্যোদ্ধারকল্পে যখন দার্জিলিং গমন করেন, তখন ভাবী রামকৃষ্ণ মিশনের পরিকল্পনা-রচনায় সাহায্য পাইবার উদ্দেশ্যে তিনি ব্রহ্মানন্দ ও গিরিশ বাবুকে সঙ্গে লইয়া যান। পরে ১লা মে মিশন-প্রতিষ্ঠান্তে তিনি ব্রহ্মানন্দকে কলিকাতা-কেন্দ্রের কার্যভার দিলেন। ইহাই প্রকৃতপক্ষে মহারাজের কর্মজীবনের সূত্রপাত। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড়ে নূতন মঠ-নির্মাণ-কার্য আরম্ভ হইলে তাঁহাকে উহার দায়িত্ব লইতে হইল এবং পর বৎসর নূতন বাটীতে মঠ উঠিয়া আসার পর তাঁহারই হস্তে উহার পরিচালনভার ন্যস্ত হইল। অবশেষে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে স্বামীজী দলিল সম্পাদনপূর্বক সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি গুরুভ্রাতাদের হস্তে তুলিয়া দিলেন এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভে মঠ ও মিশনের সাধারণ সভাপতির আসন ত্যাগ করিয়া উহাতে মহারাজকে বসাইলেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "রাখাল একটা রাজ্য চালাতে পারে।" স্বামীজী তাহা ভুলেন নাই। আরও তাঁহার মনে ছিল যে, মহারাজ ঠাকুরের মানসপুত্র; তাই একদিন অতর্কিতে মহারাজকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলেন, "গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু।" প্রত্যুৎপন্নমতি মহারাজও ইহাতে অপ্রস্তুত না হইয়া প্রতিপ্রণাম করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা।" বস্তুতঃ ইঁহারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের স্বরূপ অবগত ছিলেন; প্রত্যুত স্বামীজীর ইহা অধিক জানা ছিল যে, বিশাল জগতে নব অনুপ্রেরণা জাগাইবার দায়িত্ব যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি দৈনন্দিন খুঁটিনাটির মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখিতে পারেন না। অতএব সংগৃহীত সমস্ত অর্থাদি মহারাজের হস্তে অর্পণান্তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, 'এতদিন যার জিনিস বয়ে বেড়িয়েছি, আজ তাকে দিয়ে

নিশ্চিন্ত হলুম।” এখন হইতে আমরা মহারাজকে সঙ্ঘাধ্যক্ষরূপেই পাইব।

যৌবনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে অবলম্বন করিয়া স্বামীজী ও মহারাজের মধ্যে যেমন একটা সুদৃঢ় সখ্যভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তেমনি তাঁহাদের মধ্যে ছিল একটা আবাল্য অকৃত্রিম দিব্য প্রেমবন্ধন। রাখাল-রাজকে সভাপতি করিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন, “রাখাল, আজ হতে সব তোর, আমি কেউ নই।” কিন্তু মহারাজ তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন—যতদিন স্বামীজী স্থূলদেহে ছিলেন, একটি কাজও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া করিতেন না। স্বামীজীর দেহত্যাগের পরও এই শ্রদ্ধা শতধা পরিস্ফুট হইত। তাঁহার প্রদত্ত একখানি গ্রন্থ ধরিবার পূর্বে মহারাজকে গঙ্গাজলে হস্ত প্রক্ষালন করিতে দেখা যাইত। স্বামীজীর প্রতিকৃতি হস্তে লইয়া তিনি কী প্রেমিকের দৃষ্টিতেই না উহা নিরীক্ষণ করিতেন! ইঁহাদের পরস্পরের প্রতি আচার-ব্যবহার যেমন বন্ধুজনসুলভ হাস্যপরিহাস-পূর্ণ, তেমনি প্রেমকলহবহুলও ছিল। দুইজনে মঠপ্রাঙ্গণে একটি কাল্পনিক রেখাপাতপূর্বক স্থির করিয়া লইয়াছিলেন, কাঁহার প্রতিপালিতদের কতটুকু গণ্ডি। এই রেখা অতিক্রমপূর্বক একের হাঁস প্রভৃতি অপরের বাগানে আসিয়া পড়িলে তুমুল প্রেমকলহ উপস্থিত হইত এবং সারা মঠ সে আমোদে মাতিয়া উঠিত। এদিকে রোগে ভুগিয়া স্বামীজীর মেজাজ সব সময়ে ঠিক থাকিত না। তাঁহার দিন অল্প; তাই পরিকল্পনাগুলি দ্রুত কার্যে পরিণত হইতেছে না দেখিয়া ধৈর্যচ্যুতি হইত; আর সে বিরক্তির অধিকাংশই আসিয়া পড়িত মঠাধ্যক্ষ মহারাজের উপর। আবার পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝিয়া তিনি বলিতেন, “রাজা, রাজা, আমায় ক্ষমা কর। আমি কি অন্যায় না করেছি, তোমায় গালাগালি করেছি—আমায় ক্ষমা কর।” আর তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতেন, “আমাকে সবাই ত্যাগ করতে পারে;

কিন্তু আমি জানি, রাজা আমাকে কখনও ছাড়বে না। আর দুনিয়ায় যদি কেউ আমার গালাগাল সহ্য করে থাকে, সে একমাত্র রাজা।" মহারাজও মনে করিতেন, "সে বকেছে তো হয়েছে কি?" আর স্বামীজীর অনুশোচনা দেখিয়া তিনি বলিতেন, "তুমি অমন করছ কেন? আমায় গালাগাল দিয়েছ তাতে হয়েছে কি? তুমি ভালবাস, তাই তো এসব বলেছ।" এই নিবিড় প্রীতির সম্বন্ধ আমরা লোকদৃষ্টিতে বুঝিব কিরূপে? মহারাজ একদিন ঠাকুরের একটি আদেশ অমান্য করিলে ঠাকুর সহাস্যে নিকটবর্তীদিগকে বলিয়াছিলেন যে, রাখাল এতদিনে সত্যসত্যই তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভালবাসিয়াছেন বলিয়াই ঐরূপ আপনার জনের ন্যায় আবদার করিতে পারিয়াছেন। মহারাজ ও স্বামীজীর সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে আমাদিগকেও ঐ অলৌকিক প্রেমের দৃষ্টিই অবলম্বন করিতে হইবে। বস্তুতঃ শুধু নেতা ও পরিচালিতের সম্বন্ধ লইয়া রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ গঠিত হয় নাই। এ প্রেমের লীলাখেলা কিন্তু অচিরেই শেষ হইয়া গেল—স্বামীজী মহা-সমাধিতে লীন হইলেন। মহারাজ সেদিন বলরাম-মন্দিরে ছিলেন—সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং প্রিয় ভ্রাতার বক্ষস্থলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে সন্তর্পণে তুলিয়া আনিলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাষ্প-গদ্‌গদ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "সাম্‌নে থেকে যেন হিমালয় পাহাড় অদৃশ্য হয়ে গেল!"

স্বামীজীর অদর্শনের পর সঙ্ঘনায়কের গুরুদায়িত্ব বহন করা যে কি দুরূহ ব্যাপার তাহা মহারাজ সুবিদিত ছিলেন। ইতঃপূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ভারত ও ভারতেতর দেশে সুপরিচিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহাদের সুনাম রক্ষা ও অধিকতর প্রসার বহু আয়াসসাধ্য—ইহা জানিয়াই মহারাজ সাবধানে অথচ সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস লইয়া কার্যে অগ্রসর হইলেন। শীঘ্রই তাঁহার অপরিসীম ভালবাসা ও আধ্যাত্মিক শক্তির আকর্ষণে দলে

দলে ভক্তগণ আসিতে লাগিলেন। অনেক ত্যাগী যুবকও মঠে যোগ দিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন। মহারাজ এই যুবকদিগকে সমুচিত শিক্ষাদি-দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণবাণী-বহনের উপযুক্ত আধার করিয়া তুলিতে লাগিলেন। ঠাকুরের শিক্ষাগুণে তিনি মানুষ চিনিতে পারিতেন এবং অধিকারানুসারে নিষ্কাম কর্ম, শাস্ত্রাধ্যয়ন, পূজা-পাঠ, ধ্যান-জপ ইত্যাদির উপদেশ দিতেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, সহজ সরল ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে সকলেই মুগ্ধ হইত—ত্যাগী বা গৃহস্থ যিনিই একবার আসিয়া পড়িতেন, তিনি আবার আসিতে বাধ্য হইতেন, এমন কি, ক্রমে তাঁহার অনুগত হইয়া যাইতেন।

শিক্ষাদান ব্যতীত তাঁহার আর একটা প্রধান কার্য ছিল, মঠ-মিশনের কেন্দ্রগুলিতে গমনপূর্বক তথায় কিছুকাল অবস্থান করা এবং সাধুদের জীবনগঠনে সাহায্যদান এবং ভক্তদিগকে আকর্ষণপূর্বক কেন্দ্র-গুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তাঁহার এই সকল প্রচেষ্টার ফলে একদিকে যেমন মঠ-মিশন জনসমাজে আদৃত ও উহাদের ভিত্তি দৃঢ়তর হইতে লাগিল, অপর দিকে তেমনি উহাদের প্রভাব ভারতেতর দেশেও প্রসারিত হইতে থাকিল। স্বামীজী বেলুড়, মাদ্রাজ ও মায়াবতীতে মঠ স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন এবং কাশীর অদ্বৈতাশ্রমের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন; অধিকন্তু ঢাকাতেও ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে একটি মঠ গড়িয়া উঠিতে-ছিল। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর আদর্শ ও উৎসাহে মিশন-বিভাগের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সারগাছি আশ্রম, ১৯০০ অব্দে কাশী সেবাশ্রম, ১৯০১ অব্দে কনখল সেবাশ্রম ও ১৯০২ অব্দে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সূত্রপাত হয়। ইহার পর মহারাজ উহাদের স্থায়িত্ব-সম্পাদন ও নূতন নূতন কেন্দ্রস্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন।

সঙ্ঘনায়করূপে তিনি হরিদ্বার, প্রয়াগ, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলির উন্নতির জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

দক্ষিণ ভারতেও নূতন নূতন কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে তাঁহার উদ্দীপনা প্রচুরপরিমাণে বর্তমান ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের এই সকল কেন্দ্রের যখন যেটিতে তিনি যাইতেন, সেইটিতে তখন আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইত।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ কাশীতে যাইয়া একমাস বাস করেন। স্বামীজীর জীবদ্দশাতেই কাশীতে জন কয়েক যুবক মিলিয়া 'হোম অব্ রিলিফ্—পুওর মেন্‌স্ রিলিফ্ এ্যাসোসিয়েশন্' (অনাথাশ্রম—দরিদ্রদুঃখ-প্রতিকার-সমিতি) নামক এক ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।[১] স্বামীজী মহারাজকে বলিয়া যান, "এ প্রতিষ্ঠানটির উপর দৃষ্টি রেখো।" এবারে মহারাজের আগমনে প্রতিষ্ঠানের উৎসাহ বর্ধিত হইল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর একটি সাধারণ সভা আহ্বানপূর্বক সকলে স্থির করিলেন যে, উহা রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। এইরূপে উহাই পরে অধুনা বিখ্যাত 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে' পরিণত হয় এবং রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের পার্শ্বেই সংগৃহীত নিজস্ব ভূমিতে গৃহাদি নির্মিত হয়। অতঃপর মহারাজ কনখলে যান। সেখানে স্বামীজীর শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দ ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে একটি আশ্রম স্থাপন করেন। তখন মাত্র তিনখানি চালাঘর ছিল। উহারই একখানিতে মহারাজ অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহার পরে মহারাজের মারফৎ কিছু অর্থের ব্যবস্থা হইলে আশ্রমের জন্য জমি সংগৃহীত হয় ও ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নির্দেশে ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দের তত্ত্বাবধানে স্থায়ী গৃহ নির্মিত হয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে কনখল হইতে মহারাজ বৃন্দাবনে গমনপূর্বক তপস্যানিরত স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত মিলিত হন।

১। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন হইতে সেবাকার্য আরম্ভ হয়। ঐ বৎসর জুলাই মাস হইতে ক্ষামেশ্বর ঘাটে 'একটি আশ্রম ও কিছু পরে জঙ্গমবাড়ির এক ভাড়াবাড়িতে সেবাকার্য চলিতে থাকে। ১৫ই সেপ্টেম্বর সমিতির নামকরণ হয়। ১৯০১এর প্রথমে সেবাকার্য দশাশ্বমেধ ঘাট রোডে এবং ২রা জুন ৩৮/১৫৩ নম্বর রামাপুরার বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়।

এই সময়ে মহারাজ রাত্রি ১২টায় উঠিয়া ধ্যান করিতেন। একদিন উঠিতে দেরি হইলে এক সূক্ষ্ম-দেহী বাবাজী তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া উঠাইয়া জপাদি করিতে ইঙ্গিত করেন। বৃন্দাবন হইতে মহারাজ এলাহাবাদে যান এবং স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর সহিত একদিন যাপন করিয়া বিন্ধ্যাচলে উপনীত হন। সেখানে তাঁহার ত্রিরাত্র বাসের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু স্থানমাহাত্ম্যে ও ঠাকুরের ভক্ত শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের অনুরোধে কয়েক সপ্তাহ থাকিয়া যান। বিন্ধ্যাচলে তিনি যেন সর্বদাই দেবীর ভাবে বিভোর থাকিতেন। কখনও গভীর নিশিতে দেবীদর্শনে গমন, কখনও জনমানবশূন্য স্থানে ধ্যান, কখনও বা মায়ের গুণগানশ্রবণ ইত্যাদিতে দিনগুলি পরমানন্দে কাটিয়া যাইত। অনন্তর নভেম্বর মাসে তিনি বেলুড়ে প্রত্যাগমন করেন। পর বৎসর মার্চ মাসে তিনি টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন এবং আরোগ্যলাভান্তে স্বামী বিরজানন্দের সহিত বায়ুপরিবর্তনের জন্য শিমুলতলায় যান। মঠে ফিরিয়া আসার কয়েক মাস পরে (১৯০৪-এর শেষভাগে) ভাগলপুরে ভীষণ প্লেগের আবির্ভাব হইলে তথায় রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য আরম্ভ হয়।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুন মহারাজের পুরী গমনকালে প্রেমানন্দজীও তাঁহার সঙ্গে যান এবং স্বামী শিবানন্দ এবং অখণ্ডানন্দ রথযাত্রার পূর্বে তথায় সম্মিলিত হন। এ বৎসর ২৩শে আগস্ট তারিখে আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত স্বামী অভেদানন্দ নীলাচলে আসিয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন; অধিকন্তু স্বামী রামকৃষ্ণানন্দও দুই দিন পরে সেখানে উপস্থিত হন। অনন্তর ডিসেম্বর মাসে মহারাজ কোঠার হইয়া বেলুড়ে ফিরিলেন—সেখানে মিসেস্ সেভিয়ার তাঁহার সাক্ষাৎকারের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনর্বার পুরীধামে গমন করেন এবং পুরী হইতে ডিসেম্বর মাসে ভদ্রকে যান। ভদ্রকে তখন বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব। ভক্তগণ

তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বলিলেও তিনি সেখানে অবস্থানপূর্বক সকলকে স্বাস্থ্যবিধিপালনে উৎসাহিত করিতে থাকেন এবং যথাসময়ে কোঠার হইয়া মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। অচিরেই কাশীধামে সেবাশ্রমের ভিত্তি-স্থাপনের জন্য তাঁহাকে তথায় যাইতে হইল। মহারাজ সকল বিষয়েই বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেন এবং তাঁহার সৎ-পরামর্শ সকলেই নতশিরে মানিয়া লইতেন। কারণ উহার সঙ্গে থাকিত তাঁহার অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা। অতএব ১৬ই এপ্রিল ভিত্তিস্থাপনকার্য-সমাপনান্তে স্বামী অচলানন্দ তাঁহারই অনুমোদিত পরিকল্পনানুসারে বাটীনির্মাণকার্যে নিরত হইলেন। অতঃপর মহারাজ বেলুড়ে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পরে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে রথযাত্রার পূর্বে তিনি পুরীধামে গমন করেন এবং সেখান হইতে অক্টোবর মাসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সহিত দাক্ষিণাত্যভ্রমণে নির্গত হন।

উত্তর ভারতের ন্যায় দক্ষিণ ভারতেও স্বামী ব্রহ্মানন্দ সর্বদা ভগবদ্ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। মাদ্রাজ মঠে একদিন সন্ধ্যারতির সময় দেখা গেল যে, তিনি আরতি শেষ হওয়ার আধ ঘণ্টা পরেও একই ভাবে সমাধিমগ্ন রহিয়াছেন। ঐ দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে মার্কিন ভক্তমহিলা দেবমাতা মাদ্রাজেই ছিলেন। মহারাজ সদলবলে তাঁহার বাসভবনে বড়দিনের উৎসব উদ্‌যাপন করেন। মাদ্রাজে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি রামকৃষ্ণা-নন্দজীর সহিত তীর্থদর্শনে নির্গত হন। সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে তিনি একশত আটটি করিয়া স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রের বিল্বপত্রে মহাদেবের পূজা করেন। মাদুরায় শ্রীশ্রীমীনাক্ষীদেবীকে দর্শন করিয়া তিনি দিব্যভাবে বিহ্বল হন এবং তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহার দেহ স্বহস্তে ধারণ করেন। এই দর্শন সম্বন্ধে পরে মহারাজ বলিয়াছিলেন, "যখন মন্দিরে বিগ্রহের সামনে দাঁড়ালাম তখন দেখলাম, জগন্মাতার বিগ্রহ যেন জীবন্ত হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন—তাইতে সংজ্ঞাহারা হয়েছিলাম।"

মাদুরা হইতে সকলে মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করেন। মাদ্রাজের ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের মধ্যে তখন প্রবল সামাজিক পার্থক্য। ইহা জানিয়াও মহারাজ একদিন একজন অব্রাহ্মণ ভক্তের আমন্ত্রণক্রমে তাঁহার গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করিতে গেলেন। সেদিন ঐ বাটীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনেকেই নিমন্ত্রিত ছিলেন। মহারাজের অনুকরণে ও অনুপ্রেরণায় তাঁহারা সকলেই পঙ্‌ক্তিভোজনে বসেন এবং ভক্তটির কন্যা এবং অন্যান্য মহিলারাও পরিবেশনে যোগদান করেন। মাদ্রাজ হইতে তিনি বাঙ্গালোরে যাইয়া ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী নবনির্মিত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকার্যে নেতৃত্ব করেন। সেখানে রামনাম-কীর্তন শুনিয়া তিনি খুবই মুগ্ধ হন এবং উহা লিখিয়া আনিয়া মঠ ও মিশনের সর্বত্র প্রচলিত করেন। এইরূপে দাক্ষিণাত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি পুরীধামে ফিরিয়া আসেন।

অতঃপর দেখা গেল যে, রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যের প্রসার হওয়ায় উহাকে আইন অনুসারে রেজেস্ট্রী করা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে মহারাজ দাক্ষিণাত্যগমনের পূর্বেই ১৯০৮ অব্দের প্রথমাংশে স্বামী শিবানন্দ ও অখণ্ডানন্দের সহিত বলরাম-মন্দিরে অবস্থান করিয়া আলোচনা চালাইতেছিলেন। স্বামী সারদানন্দও সেই আলোচনায় মধ্যে মধ্যে যোগ দিতেন। এইরূপে মিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যধারা স্থিরীকৃত হইয়া গেলে মহারাজের দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে মিশনকে রেজেস্ট্রী করা হইল।

মহারাজ দ্বিতীয় বার দাক্ষিণাত্যে গমন করেন ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে। ইতঃপূর্বে মাদ্রাজ মঠের নিজস্ব জমি হইয়া গিয়াছে। মহারাজ নূতন মঠ-বাটীর নক্সাদি দেখিয়া দিলেন এবং ৪ঠা আগস্ট মহাসমারোহে উহার ভিত্তিস্থাপন হইল। ইহার এক সপ্তাহ পরে তিনি বাঙ্গালোরে

গেলেন। সেখানকার মঠে প্রতি রবিবার অস্পৃশ্যজাতির অনেকে আসিয়া কীর্তনাদি করিত। ইহাতে মহারাজ বড়ই প্রীত হইতেন, তাহাদিগকে উৎসাহ দিতেন এবং প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিতেন। এমন কি, একদিন তাহাদের পল্লীতে তাহাদের দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া সকলকে অবাক্ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালোর হইতে তিনি মেলকোট, শিবসমুদ্রম্ ও মহীশূরের দেবস্থানাদি দর্শনে যান এবং পুনর্বার বাঙ্গালোরে প্রত্যাবর্তনান্তে কন্যাকুমারী যাত্রা করেন। পথে মন্দিরাদি দর্শন করিতে করিতে তিনি ক্রমে ত্রিবান্দ্রমে উপনীত হইলেন। এখানে আশ্রমস্থাপনের জন্য পূর্ব হইতেই ভূমি সংগৃহীত ছিল। মহারাজ ৯ই ডিসেম্বর ভিত্তিস্থাপন করিলেন। কন্যাকুমারীতে প্রায় এক সপ্তাহ অবস্থানকালে তিনি প্রতিদিন দেবীদর্শন করিতেন এবং মন্দিরে ভাবে বাহ্যহারা হইয়া অনেকক্ষণ স্থাণুবৎ বসিয়া থাকিতেন। কন্যাকুমারী হইতে বাঙ্গালোরে ফিরিয়া তিনি মাদ্রাজে গমন করেন এবং মাদ্রাজকে কেন্দ্র করিয়া দাক্ষিণাত্যের আরও কয়েকটি তীর্থ দর্শন করেন। এই সময়মধ্যে মাদ্রাজের মঠ-বাটীর কিয়দংশ সম্পূর্ণ হইলে ১৯১৭ অব্দের ২৪শে এপ্রিল শ্রীশ্রীঠাকুরকে সেখানে আনা হইল এবং ৩০শে এপ্রিল হইতে মহারাজ ঐ বাটীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। অবশেষে ৬ই মে মাদ্রাজের ছাত্রাবাসের ভিত্তিস্থাপন হইয়া গেলে ৯ই মে তিনি পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ঐ ছাত্রাবাসের দ্বারোন্মোচন উপলক্ষে ১৯২১ অব্দের ১লা এপ্রিল স্বামী শিবানন্দ ও সাধুভক্তগণের সহিত তিনি পুনর্বার মাদ্রাজ যাত্রা করেন। মে মাসের শেষে ঐ শুভকার্য সমাধান করিয়া কিছুদিন পরে তিনি বাঙ্গালোরে উপস্থিত হন এবং সেপ্টেম্বর মাসে মাদ্রাজ মঠে প্রত্যাগমনান্তে কলিকাতা হইতে মৃন্ময়ী শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমা আনাইয়া যথাবিধি ৺শারদীয়া পূজা করান। অতঃপর যথাকালে শ্রীশ্রীকালীপূজারও

অনুষ্ঠান করাইয়া ১৯শে নভেম্বর মাদ্রাজ পরিত্যাগপূর্বক ২১শে ভুবনেশ্বরে পৌঁছেন।

আমরা বর্ণনার সুবিধার জন্য দাক্ষিণাত্যভ্রমণ একই স্থানে সন্নিবদ্ধ করিলেও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অন্তর্বর্তী সময়গুলিতেও মহারাজ বিভিন্ন মঠ-মিশন-কেন্দ্র ও তীর্থাদি-দর্শনে এবং তত্তৎস্থলে উৎসাহবর্ধনে ও পুণ্যস্মৃতিস্থাপনে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৯১৬ অব্দে তিনি স্বামী প্রেমানন্দ ও বহু সাধু ভক্তের সহিত কামাখ্যাতীর্থদর্শনে গমন করেন। সেখানে তিনি কিরূপ দিব্যভাবে তন্ময় থাকিতেন তাহা তাঁহার সঙ্গিমাত্রই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ গ্রন্থাদিতে যাঁহারা ভাবঘনমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি প্রভৃতির কথা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা এই সকল দেবস্থানে তাঁহার মানসপুত্রের এবম্প্রকার ভাববিহ্বলতা দেখিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করিলেন। ৺কামাখ্যা হইতে তিনি ময়মনসিংহে যান এবং তথায় দিন কয়েক অবস্থানান্তে ঢাকায় উপস্থিত হন। সেখানে তিনি ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রামকৃষ্ণ মিশন-বাটীর ভিত্তিস্থাপন করেন। ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি একবার দেওভোগে গমনপূর্বক নাগমহাশয়ের তপস্যাপূত আশ্রম দর্শন করেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ মহারাজ বেলুড় মঠ হইতে শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দ, শিবানন্দ, রামলাল-দাদা এবং কয়েকজন সাধু ও ভক্তের সঙ্গে হরিদ্বারে গমন করেন। সেই বারে তাঁহার উপস্থিতিতে কনখল সেবাশ্রমে মহাসমারোহে প্রতিমায় ৺দুর্গাপূজা হয়। তীর্থস্থানে সাধুসেবার প্রয়োজনবোধে মহারাজ সকল সম্প্রদায়ের সাধুদিগকে পূজায় আমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহারাও আশ্রমে পদার্পণপূর্বক পরিতোষসহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এইরূপে সাধু-সমাজের সহিত রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের আত্মীয়তা স্থাপিত হয়। পূজান্তে মহারাজ প্রভৃতি সকলে কাশীতে আগমন করেন। এই সময়ে বিখ্যাত

সুগায়ক অঘোর বাবু প্রায়ই মহারাজকে ভজন শুনাইতেন এবং মহারাজও ইহাতে বিশেষ আনন্দ পাইতেন। বস্তুতঃ গুণী গায়ক ও গুণগ্রাহী শ্রোতার সমাবেশে ভগবদ্ভাবপূর্ণ সে সঙ্গীত-লহরী উপস্থিত সকলকেই মুগ্ধ করিত। তখন মাস্টার মহাশয় কাশীতে ছিলেন; শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীও ছিলেন। মাস্টার মহাশয়ের ধারণা ছিল যে, ঠাকুর ও স্বামীজীর ভাবের মধ্যে পার্থক্য আছে। একদিন শ্রীশ্রীমা সেবাশ্রম দেখিতে আসিয়া বলিলেন যে, উহা ঠাকুরেরই কাজ—ঠাকুর সেখানে প্রত্যক্ষ রহিয়াছেন। তিনি চলিয়া গেলে রহস্যপ্রিয় মহারাজের ইঙ্গিতে অল্পবয়স্ক সাধুব্রহ্মচারীরা মাস্টার মহাশয়কে প্রশ্ন করিলেন, "মাস্টার মহাশয়, মা বলেছেন সেবাশ্রম ঠাকুরের কাজ, সেখানে ঠাকুর প্রত্যক্ষ রয়েছেন; এখন আপনি কি বলেন?" ঠাকুরের শরণাগত ভক্ত মাস্টার মহাশয় সহাস্যে বলিলেন, "আর অস্বীকার করবার জো নাই।"

এই ভাবে কাশীতে সেবাশ্রমে ছয় মাস যাপনান্তে মহারাজ ১৯১৩ অব্দের এপ্রিল মাসে মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন; কিন্তু ঐ বৎসর ৺দুর্গাপূজা উপলক্ষে পুনর্বার কাশীধামে উপস্থিত হইয়া সেখানেই দুর্গোৎসব সমাধা করিলেন। কাশীতে তিনি প্রত্যহ 'কাশীখণ্ড' শ্রবণ করিতেন এবং সকলকে সাধনভজনে উৎসাহিত করিতেন। বৃক্ষাদির প্রতি তাঁহার আশৈশব প্রীতি ছিল; দেশ-বিদেশ হইতে বৃক্ষাদি আনাইয়া তিনি সেবাশ্রমের ভূমির শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। উভয় আশ্রম যাহাতে পরিষ্কার থাকে তৎপ্রতিও তাঁহার লক্ষ্য ছিল। ঐ বৎসর সেবাশ্রমের একটি বিল্ববৃক্ষে তিনি একজন সূক্ষ্মদেহীর দর্শনলাভান্তে সকলকে ঐ বৃক্ষ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেন; তবে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, ঐ বিদেহী অনিষ্টপরায়ণ নহেন। মহারাজের এইরূপ অসংখ্য অলৌকিক দর্শনের দুই-চারিটিই মাত্র লোকসমাজে প্রচারিত হইয়াছে।

অনন্তর মহারাজ ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে অযোধ্যায় গমন করেন। সেখানে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে একদিন একজন নটের সুমধুর নৃত্য ও ভজনে আত্মহারা হইয়া তিনি প্রবল বারিপাতসত্ত্বেও স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া থাকেন; অগত্যা সঙ্গীদিগকে ঐ বৃষ্টি হইতে তাঁহার রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়। বারিপাত নিবৃত্ত হওয়ার বহু পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া বাসস্থানে প্রত্যাগমন করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, মহারাজ নিজে যেমন ধর্ম-সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন, সাধুব্রহ্মচারীদিগকেও তেমনি সমবেতকণ্ঠে কালীকীর্তন, রামনামকীর্তন ও স্তোত্রাদিপাঠে উৎসাহিত করিতেন। ভজনকালে তিনি সকলের মধ্যে নীরবে এমন ভাববিভোর হইয়া বসিয়া থাকিতেন যে, তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাব সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিত এবং শ্রোতৃবৃন্দও সেই জমাট ভাবের যতটুকু সম্ভব স্বায়ত্ত করিবার অভিলাষে নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া থাকিতেন। অনেক সময়ে তাঁহার আদেশে মন্দিরাদিতেও কীর্তন হইত। এইরূপে কাশীর ৺দুর্গাবাড়ি, সঙ্কটমোচন ও ৺অন্নপূর্ণার মন্দিরাদিতে বহুবার সাধুদের কীর্তন শুনিয়া সমাগত যাত্রিগণ আনন্দে আপ্লুত হইয়াছেন। যাহা হউক, অযোধ্যাদর্শনান্তে মহারাজ কাশীতে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভারতের সুপ্রাচীন জনবিশ্রুত তীর্থসমূহে সানন্দে ভগবৎ-সম্ভোগে নিমগ্ন মহারাজের তখন অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা ছিল না; তথাপি স্বামী প্রেমানন্দের নির্বন্ধাতিশয়ে ৺কালীপূজার পরে প্রয়াগদর্শনান্তে নভেম্বর মাসে বেলুড় যাইতে হইল।

মহারাজের কাশীধামে শেষ আগমন হয় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী। ঐ সময়ে কাশী সেবাশ্রমের আভ্যন্তর অবস্থা নিরীক্ষণান্তে সারদানন্দজী ভুবনেশ্বরে যাইয়া মহারাজকে জানাইলেন যে, সেবাশ্রমের সুব্যবস্থার জন্য তাঁহার সেখানে গমন আবশ্যক। অগত্যা তিনি সারদানন্দজীর সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন এবং অদ্বৈতাশ্রমে উঠিলেন। সকলেই ভাবিয়াছিলেন যে,

সঙ্ঘাধ্যক্ষ আসিয়াই কর্মব্যস্ত হইয়া পড়িবেন ; কিন্তু ফলতঃ দেখা গেল যে, তিনি কর্মের কোন কথা উত্থাপন না করিয়া সকলের আধ্যাত্মিক জীবন আরও গভীরতর করার মানসে বিভিন্ন উপায়-উদ্ভাবনে নিরত রহিলেন। কোনদিন উদ্দীপনাময় উপদেশ, কোনদিন কীর্তন, কোনদিন প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সমস্যাসমাধান—এই ভাবেই দিন কাটিতে লাগিল এবং এই ধারার পরাকাষ্ঠা হইল সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানে। সেই বৎসর স্বামীজী ও ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে চল্লিশ জন সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করিলেন। এই অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক চিকিৎসার ফল অচিরেই পরিলক্ষিত হইল। মহারাজের প্রভাবে সেবাশ্রমের সমস্যা আপনা হইতেই মিটিয়া গেল। বস্তুতঃ মহারাজের আচরণ ও উপদেশে কর্ম অপেক্ষা ভাগবত জীবনলাভের জন্য উদ্দীপনাই অধিক প্রকটিত হইত এবং তাঁহার সংস্পর্শে যিনিই আসিতেন তিনিই বুঝিতে পারিতেন যে, রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ ধর্মহীন সমাজসেবকদের প্রতিষ্ঠানমাত্র নহে, উহা ধর্মপিপাসুবর্গের সাধনক্ষেত্র। এইরূপে তাঁহারা মূল বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া জাগতিক অসম্পূর্ণতাকে অবহেলা করিতে শিখিতেন। যাহা হউক, সেইবারেই অদ্বৈতাশ্রমে ঠাকুরের পুরাতন প্রতিকৃতি জীর্ণ হইয়া যাওয়ায় নূতন প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মহারাজের দৈনন্দিন ব্যবহারে তাঁহার ভাবগাম্ভীর্যের পরিচয় অল্পই পাওয়া যাইত—ভাবসংবরণে তিনি এতই সক্ষম ছিলেন। কিন্তু বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে সে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ভাবরাশি উথলিয়া পড়িত। অদ্বৈতাশ্রমের প্রাগুক্ত উৎসব উপলক্ষেও মহারাজ তদ্‌গতচিত্তে নিজে নাচিয়া এবং গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দ ও তুরীয়ানন্দ প্রভৃতিকে নাচাইয়া সমাগত সকলকে প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়াছিলেন।

পুরী ও ভুবনেশ্বরে মহারাজ প্রায়ই যাইতেন। পুরীতে তিনি বিশেষ আনন্দলাভ করেন এবং সেখানে একটি মঠস্থাপনেরও ঐকান্তিক ইচ্ছা পোষণ

করেন জানিয়া বলরাম বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ বসু মহাশয় ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে চক্রতীর্থে একখণ্ড সুপ্রশস্ত ভূমি দান করেন। উহাতেই পরে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে মঠ নির্মিত হয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে পুরীতে অবস্থানকালে মহারাজ ভুবনেশ্বরে মঠ-স্থাপনের সমস্ত আয়োজন করেন এবং মঠনির্মাণকার্য সমাপ্ত হইলে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৺দুর্গাপূজার সময় সাধু-ব্রহ্মচারি-সমভিব্যাহারে সানন্দে তথায় উপনীত হন। ৩১শে অক্টোবর ঐ মঠের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। ঐ সময় ভুবনেশ্বরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় সেখানে মিশনের সাহায্যকেন্দ্র খোলা হয় এবং সুচিকিৎসার অভাব লক্ষ্য করিয়া মহারাজ একটি স্থায়ী দাতব্য চিকিৎসালয়ও স্থাপন করেন। ভুবনেশ্বরের আধ্যাত্মিক মহিমা সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "ভুবনেশ্বর শিবক্ষেত্র, গুপ্তকাশী বলে জানবে। এখানে একটু সাধন করলে অনেক ফল পাওয়া যায়।" মঠের সাধুব্রহ্মচারীরা দীর্ঘকাল জনহিতকর কার্যে ব্যাপৃত থাকায় অনেক ক্ষেত্রে পরিশ্রান্ত ও ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন। তাঁহারা ভুবনেশ্বরের মুক্ত বায়ু সেবন করিয়া এবং অনুকূলস্থানে বাস করিয়া পূর্ব স্বাস্থ্য লাভ করুন—ইহাও মহারাজের ইচ্ছা ছিল। ফলতঃ শারীরিক ও আত্মিক উন্নতির সাধনক্ষেত্ররূপেই ভুবনেশ্বব মঠ স্থাপিত হয়। মহারাজ বলিয়াছিলেন, "ছেলেরা সব সাধনভজন করবে—আমি দেখে আনন্দ করব।" ভুবনেশ্বরে তিনি নিজে যেমন নিয়মিত ধ্যানজপাদিতে রত থাকিতেন, সাধু-ব্রহ্মচারীদিগকেও ঠিক তেমনি পরিচালিত করিতেন। তাঁহার যত্নে ভুবনেশ্বরের দিনগুলি আনন্দে ও ভগবদ্ভাবে পরিপূর্ণ থাকিত; আবার ফলফুলে, বৃক্ষলতায় সুসজ্জিত আশ্রমটি নয়নমনে আনন্দ ঢালিয়া দিত।

মহারাজের নিজের পক্ষে কিন্তু ঐ দিনগুলি সর্বতোভাবে সুখপ্রদ ছিল না। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে স্বামী অদ্ভুতানন্দের দেহত্যাগের পর আর এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। ৪ঠা শ্রাবণ (২১শে জুলাই) রাত্রে প্রায় একটার সময় সেবক দেখিতে পাইলেন, মহারাজ একখানি চাদরে শরীর আবৃত করিয়া

আরাম-কেদারায় গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। সেবক সে রাত্রে প্রশ্ন করিয়াও এই অস্বাভাবিক অবস্থার কারণ জানিতে পারেন নাই। পরদিন তারে সংবাদ আসিল, ঐ সময়ে শ্রীশ্রীমা মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। মহারাজ এই সংবাদে একান্ত মর্মাহত হন এবং শোকাচ্ছন্ন মাতৃহারা অবোধ শিশুর ন্যায় দ্বাদশ দিবস নগ্নপদে থাকিয়া হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন।

১৯২২ অব্দের প্রারম্ভে তিনি বেলুড় মঠেই অবস্থান করিতেছিলেন। মহারাজ যখনই অন্য স্থান হইতে মঠে প্রত্যাবর্তন করিতেন, তখনই সেখানে উৎসব লাগিয়া যাইত। তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়া নানা দিক হইতে নিত্য বহু ছাত্র, রাজকর্মচারী, ব্যবসায়ী, সাধু, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার ভক্ত ও ধর্মপিপাসুগণ ছুটিয়া আসিতেন। মহারাজ বিবিধ অধিকারীর আধ্যাত্মিক চেতনা উদ্বোধনের জন্য কত সময়ে কত যে অপূর্ব উপায় অবলম্বন করিতেন, তাহা তাঁহার সুগভীর ভাবরাজ্যের সহিত অপরিচিত নবাগন্তুক সহজে বুঝিতে পারিতেন না—অথচ প্রতি সাক্ষাতের পর স্পষ্ট বোধ করিতেন, যেন তিনি এক অজ্ঞাত সম্পদের অধিকারী হইয়া গৃহে ফিরিতেছেন। মহারাজ হয়তো গল্প করিতেছেন, হাসিতেছেন কিংবা ব্যঙ্গ-কৌতুকে রত আছেন; নবাগত ইহা দেখিয়া হয়তো অবাক হইয়া ভাবিতেন, "ইনিই কি ঠাকুরের মানসপুত্র, আর ইনিই কি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কর্ণধার?" কিন্তু ইহারই মধ্যে জিজ্ঞাসুবিশেষ নবালোক পাইয়া ধন্য হইতেন এবং শীঘ্রই পুনর্বার আসিবার সঙ্কল্প লইয়া পরিতৃপ্ত অন্তরে গৃহে ফিরিতেন। সাংসারিক চিন্তায় নিপীড়িত কত নিরাশ মনে এই অনাবিল আনন্দ এক নবলোকের সন্ধান আনিয়া দিত! গতানুগতিক গুরুশিষ্যসম্বন্ধের সহিত পরিচিত আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষ এই অসাধারণ মহামানবের নিত্যনূতন উদ্ভাবনী শক্তির ধারণা করিবে কিরূপে?

পূর্বোক্ত বিবরণ পড়িয়া যদি কেহ স্থির করিয়া ফেলেন যে, মহারাজ সর্বদা বালকসুলভ রঙ্গরসাদিতে মগ্ন থাকিতেন, তবে নিতান্তই ভুল হইবে। তাঁহার ঐ স্বাভাবিক সরলতার সহিত এমন একটি গাম্ভীর্য মিশ্রিত থাকিত যে, তাঁহার সম্মুখে সর্বপ্রকার চপলতা এককালে নিস্তব্ধ হইয়া যাইত। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, তিনি যখন একাকী পদচারণ করিতেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে তেজোদীপ্ত নরসিংহের ন্যায় মনে হইত এবং তাঁহার তাদৃশ মধুর প্রকৃতি জানিয়াও অকস্মাৎ কেহ সম্মুখে আসিতে পারিত না, কিংবা আসিয়া পড়িলেও বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া নীরবে তাঁহার কৃপাকটাক্ষের অপেক্ষা করিত। অধিকারী দুর্লভ; সুতরাং সুগভীর ধর্মতত্ত্বের আলোচনা কাহার সহিত হইবে? কিন্তু মানুষ ভালবাসার ভিখারী; তাই মহারাজের অধ্যাত্মভাব ঐ প্রণালী-অবলম্বনেই শিষ্যের অন্তরে সঞ্চারিত হইত। কিন্তু দৈবাৎ উচ্চতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ হইলে মহারাজের সাধনালব্ধ অনুভূতির দ্বারা উদ্বেলিত এবং ভাবপ্রকাশের অপূর্ব মাধুর্যে অনুস্যূত সেই আধ্যাত্মিক পীযূষধারায় দুই কূল ভাসিয়া যাইত; শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত তখনকার মত সমস্ত বিস্মৃত হইয়া সেই অপূর্ব প্লাবনে নিষ্ণাত হইত।

মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীর দেহমনের স্বাস্থ্যের প্রতিও তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মঠে ফিরিয়া তিনি কার্য-পরিচালনে নিযুক্ত স্বামী প্রেমানন্দকে বলিলেন, "ছেলেদের ধ্যান-তপস্যা, সাধন-ভজন কোথায়? আর এদের স্বাস্থ্যও তো ভাল দেখছি না।" অতঃপর তিনি একদিকে যেমন স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করিলেন, অপর দিকে তেমনি নিয়ম করিলেন যে, রাত্রি চারিটায় শয্যাত্যাগান্তে সকলে অর্ধঘণ্টার মধ্যে তাঁহার নিকটে জপধ্যানে বসিবেন এবং পরে সেখানে ভজন ও স্তবপাঠাদি হইবে। জপধ্যানান্তে আবার সমবেত সাধুব্রহ্মচারীদের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গও হইত। এদিকে মঠের কার্যের যাহাতে ক্ষতি না হয় তৎপ্রতিও

তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। একদিন কার্যের কথা ভুলিয়া সকলে উপদেশশ্রবণে মগ্ন আছেন, এমন সময়ে প্রেমানন্দজীকে উঁকি মারিতে দেখিয়া মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবুরাম-দা, কি খবর?" তিনি যুক্তকরে বলিলেন, "মহারাজ, ঠাকুরসেবা আছে যে।" মহারাজ তৎক্ষণাৎ ত্রস্তভাবে সকলকে বিদায় দিলেন। কর্ম সম্বন্ধে কেহ বিরক্তি প্রকাশ করিলে তিনি বলিতেন, "ভগবান্-লাভের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য, তোমরা বাড়ি-ঘর সব ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরের কাছে মনপ্রাণ সব সমর্পণ করেছ, তবু কর্মে বিরক্তি প্রকাশ কর?" অথবা বলিতেন, "কর্ম না করে জ্ঞানলাভ হয় না। যারা কর্ম ছেড়ে শুধু ধ্যান-জপ, সাধন-ভজন নিয়ে থাকে, তাদেরও ঝুপড়ি বাঁধতে আর ভিক্ষে করতেই সময় কেটে যায়।" আরও বলিতেন, "ঠাকুর-স্বামীজীর কর্মে কোনও বন্ধন আসে না।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ করাইয়া দিতেন, "কর্মই জীবনের উদ্দেশ্য নয়—জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ;" "বার আনা মন ভগবানের দিকে রেখে চার আনায় জগতের কাজ করলে ভেসে যায়।" তাঁহার মতে সমাজসেবকদের জীবনেও ধর্মভাব থাকা একান্ত আবশ্যক; তাই তিনি বলিয়াছিলেন, "অনেকে বলে, দেশের ও দশের কাজ করবে। আমার মনে হয়, এ ভাব ইংরেজী শিক্ষার বদ্‌হজম। নিজের চরিত্র তৈরী না হলে তার দ্বারা অপরের কল্যাণ কখনও সম্ভব হয় না। যারা তাঁকে ঠিক ঠিক আশ্রয় করেছে, তাঁর কৃপালাভ করেছে, তাদের কখন বেচাল হয় না—তাদের কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, চাল-চলন দেশের মঙ্গলের কারণ হয়।" পাঠকের মন ইহাতে সায় দিয়া সহজেই বলিবে, "ইহা শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্রেরই উপযুক্ত উপদেশ।"

মঠ-মিশনের গুরুদায়িত্ব তাঁহার স্কন্ধে অর্পিত থাকায় উহার অভাব-অনটনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাঁহার যথেষ্টই ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যেমন ত্যাগের আদর্শকে অতি উচ্চে তুলিয়া ধরিতেন, সঙ্ঘের জীবনেও

তেমনি তাঁহার দৃষ্টিতে ত্যাগের আসন ছিল অতি উর্ধ্বে। একবার পুত্রশোকে কাতর জনৈক ধনী ব্যবসায়ী কিছুদিন বেলুড় মঠের পার্শ্বে বাস করিয়া উহার ভাবধারায় মুগ্ধ হন এবং প্রস্তাব করেন যে, তাঁহার সমস্ত ব্যবসায়টি লোককল্যাণার্থে সাধুদের হস্তে তুলিয়া দিবেন। এই সংবাদটি স্বামী প্রেমানন্দ যেমনি মহারাজকে শুনাইলেন, অমনি তিনি সন্ত্রস্তভাবে করজোড়ে বলিলেন, "বাবুরাম-দা, সাধুসঙ্গ করে লোকটির মনে বৈরাগ্যের উদয় হল, আর তার সঙ্গ করে আমাদের বিষয়বুদ্ধি হবে?" বলা বাহুল্য, ঐ প্রস্তাব তখনই প্রত্যাখ্যাত হইল।

স্বভাবতঃই শান্ত ও গম্ভীর মহারাজের অন্তরের ভাবরাশি যে অকস্মাৎ কিরূপে স্বীয় ভাস্বর সৌন্দর্য বিকাশপূর্বক সকলকে বিহ্বল করিত, তাহার দুই-একটি দৃষ্টান্ত পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। বেলুড় মঠে সংঘটিত ঐরূপ আর একটি উদাহরণ দিলে পাঠক উহা আরও সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সেদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে মঠপ্রাঙ্গণে আন্দুলের কালী-কীর্তন চলিতেছিল। শ্রীশ্রীমাও মঠে আসিয়াছেন। চারিদিকে একটা অতি গম্ভীর পরিবেশ। ইহারই মধ্যে স্বামী প্রেমানন্দ আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া মহারাজকে কীর্তনস্থলে লইয়া গেলেন। মহারাজ তথায় উপস্থিত হইয়াই অনুপম নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ক্রমে বোধ হইল যেন তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা লোপ পাইয়াছে—দেহমাত্র তালে তালে অপূর্ব ভঙ্গিমায় দুলিতেছে। অমনি স্বামী সারদানন্দের ইঙ্গিতে তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে আনা হইল। ভিতরে আসিয়াও সে ভাবসমাধি দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিল। অবশেষে শ্রীশ্রীমা আসিয়া সস্নেহে আহ্বানপূর্বক তাঁহাকে সাধারণ ভূমিতে নামাইয়া আনিলেন।

সঙ্ঘের নেতা হিসাবে তিনি উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না—উপদেশ পালিত হইতেছে কিনা, ইহাও দেখিতেন। বাঙ্গালোর আশ্রমে

অবস্থানকালে তিনি রাত্রে উঠিয়া প্রতিগৃহে যাইয়া সন্ধান লইতেন, সাধুব্রহ্মচারীরা সাধন-ভজন করিতেছেন কিনা। তাঁহার মত ছিল যে, রাত্রিকাল মনঃসমাধানের পক্ষে অতি অনুকূল; আর তিনি স্মরণ করাইয়া দিতেন যে, ঠাকুরই হইবেন সমস্ত প্রচেষ্টার কেন্দ্রস্থল। মাদ্রাজ মঠে একদা জনৈক ভক্তের আনীত ফুলগুলি সেবক তাঁহার গৃহে সাজাইতেছেন দেখিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "কিছু ফুল ঠাকুরের জন্য রেখেছিস তো?" সেবক জানাইলেন যে, রাখা হয় নাই; আর মনে মনে ভাবিলেন, "ঠাকুরঘরে তো শুধু পটে পূজা হয়, শ্রীগুরুর মধ্যে জীবন্ত ভগবান আছেন।" মহারাজ মনের কথা ধরিতে পারিতেন; তাই ঐ ভাবেই প্রশ্ন করিয়া সব জানিয়া লইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, আশ্রমাধ্যক্ষ তাঁহাকে পূজা করিতে দেন না। কাজেই অধ্যক্ষকে ডাকিয়া ঐরূপ সুযোগ দিতে বলিলেন, আর সেবককে উপদেশ দিলেন, "মনকে একাগ্র করতে হলে এমন মূর্তি আর কোথায় পাবি?" সেবক ইহার পর পূজা করিয়া সত্যই আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। সেবকদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ শুধু শাসন ও উপদেশপ্রদানেই সীমাবদ্ধ ছিল না—উহার মধ্যে একটা প্রাণের স্পর্শও ছিল। একবার জনৈক সেবকের বিরুদ্ধে অপর সেবকগণ অভিযোগ জানাইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ, আমার চেয়ে অনেক বড় বড় সাধু আছেন; তোমাদের ইচ্ছা হয় তাঁদের কাছে যেতে পার—আমায় সকলকে নিয়ে থাকতে হবে।"

অপরের মধ্যে হৃদয়ের বিকাশ দেখিলে তিনি খুব সন্তুষ্ট হইতেন এবং মহাপুরুষদের জীবনে জীবের প্রতি করুণার কাহিনী তাঁহাকে অভিভূত করিত; এমন কি, স্থলবিশেষে তিনি তাঁহাদিগকে অনুকরণ পর্যন্ত করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, দীক্ষার্থীদের নির্বাচনে তিনি অতি সাবধান ও বিচারপরায়ণ হইলেও ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রামানুজাভিনয়

দেখিতে যাইয়া উক্ত আচার্যের আচণ্ডালে মন্ত্রবিতরণে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, অতঃপর তাঁহাকে ঐবিষয়ে পূর্বাপেক্ষা অধিক মুক্তহস্ত দেখা যাইত।

মহারাজের মনের আর একটা দিক সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। সর্বদা অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণশীল এই মনকে দৈনন্দিন কার্যের জন্য কোন আলোচনাসভায় নামাইয়া আনা বড় সহজ ছিল না। ঐরূপ সময়ে তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, তিনি সভায় যাইবেন না ; কারণ শরীর ভাল নহে। অথচ একবার যদি অনুনয়-বিনয় সহায়ে তাঁহাকে আলোচনাস্থলে উপস্থিত করা হইত, তবে মঠ-মিশনের সর্ব বিষয়ে তাঁহার পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান ও তত্তৎ বিষয়ে অনিন্দনীয় সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া সকলে চমৎকৃত হইতেন এবং বিনা দ্বিধায় উহা মানিয়া লইতেন। সভার বাহিরেও এই আত্মনিমগ্ন মহাপুরুষের ইঙ্গিতে বা আদেশে মঠের সমস্ত বিভাগ সুচারুরূপে পরিচালিত হইত, মঠের প্রত্যেক সাধুব্রহ্মচারীর চিত্ত উচ্চভাবে পরিপূর্ণ থাকিত এবং মঠভূমি দুর্লভ ফল-পুষ্পের বৃক্ষে সুসজ্জিত হইত।

স্বামীজীর সহিত তাঁহার প্রেমসম্বন্ধের পরিচয় পাঠক পূর্বেই পাইয়াছেন। এখন অপরদের সহিত এই সপ্রেম ব্যবহারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। স্বামী অখণ্ডানন্দ একবার মহারাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সারগাছি গমনোদ্দেশে রাত্রে রেলস্টেশনে যাইতে উদ্যত হইলে মহারাজ গোপনে পাল্কীবাহকদিগকে কি যেন বলিয়া দিলেন। ফলে তাহারা অনেকক্ষণ এদিক-সেদিক ঘুরিয়া ট্রেনের সময় অতীত হইয়া গেলে অখণ্ডানন্দকে পূর্বস্থানে উপস্থিত করিল। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে ; অখণ্ডানন্দজী চক্ষু মেলিয়া অবস্থা বুঝিলেন, আর অমনি মহারাজপ্রমুখ সকলে সেই আমোদে যোগ দেওয়ায় চারিদিকে হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল। হাস্যপরিহাসছাড়াও এই বন্ধুপ্রীতির প্রকাশ অন্যভাবে হইত। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী তুরীয়ানন্দের বহুমূত্ররোগের বৃদ্ধি হইলে মহারাজ সেবকরূপে একজন ব্রহ্মচারীকে দেরাদুনে তাঁহার নিকট

পাঠাইয়া দেন এবং চিঠিতে লিখিয়া দেন যে, একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া যেন স্বতন্ত্রভাবে থাকার ব্যবস্থা করা হয়—মহারাজ সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবেন। বেলুড় মঠের সম্মুখের পোস্তা ও ঘাট-নির্মাণকালে অনুমানাপেক্ষা অত্যধিক ব্যয় হওয়ায় কার্যনিরত স্বামী বিজ্ঞানানন্দ যখন স্বামী বিবেকানন্দের সম্মুখে পর্যন্ত যাইতে সাহস পাইতেছিলেন না, তখন মহারাজ ঐ সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন এবং অম্লানবদনে স্বামীজীর সমস্ত ভর্ৎসনা সহ্য করিলেন—যেন অপরাধ তাঁহারই। স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবায় রত হইলে তিনি উৎসাহ দিয়া লিখিয়াছিলেন, "তোমাকে কি বলিব খুঁজিয়া পাইতেছি না। তুমি এখানে আসিলে grand reception (জমকালো অভ্যর্থনা), এবং আমরা কোলে করিয়া নাচিব।"

মহারাজ অপরের মনকে কত সহজে উচ্চসুরে বাঁধিয়া দিতে পারিতেন তাহার একটি দৃষ্টান্ত মহাকবি ও ভক্তশ্রেষ্ঠ গিরিশ বাবুর জীবনে পাওয়া যায়। তখন তিনি দীর্ঘকাল রোগে ভুগিয়া বোধ করিতেছেন, তাঁহার ভক্তি যেন শুকাইয়া গিয়াছে এবং তিনি বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিতে যেসব সাধু আসিতেন, তাঁহাদের সকলকেই তিনি ইহা বলিলেও সে যন্ত্রণা একই ভাবে চলিতে থাকে। অবশেষে মহারাজকে ঐ বিষয়ে বলিলে তিনি উচ্চহাস্যসহকারে কহিলেন, "ঐ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? সমুদ্রের ঢেউ উঠে নামে—মনের স্বভাবও তাই। কাজেই ঘাবড়াবার কিছুই নেই। আপনার এখন যে এরূপ হচ্ছে, তার মানে, আপনি শীগ্‌গিরই খুব উপরে উঠবেন; মনের ঢেউ একটু শক্তি অর্জন করে নিচ্ছে মাত্র।" মহারাজ চলিয়া গেলে গিরিশ বাবুর বোধ হইল যেন, তাঁহার প্রাণের শুষ্কতা কাটিয়া গিয়াছে, বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে এবং মন উচ্চতর ভূমিতে উন্নীত হইয়াছে।

তাঁহার সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও শিষ্যরক্ষার দৃষ্টান্তও সমভাবে চমকপ্রদ। একদিন তিনি স্বামী প্রভবানন্দ ও অপর একজন শিষ্যের সহিত বেড়াইতেছেন, এমন সময় রব উঠিল, "পালাও পালাও", আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে, একটি ষাঁড় মাথা নীচু করিয়া ঐদিকে ছুটিয়া আসিতেছে। তখনই শিষ্যদ্বয় মহারাজের রক্ষার জন্য সম্মুখে যাইতে চাহিলেন ; কিন্তু তিনি দৃঢ়হস্তে উভয়কে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিয়া শান্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ষাঁড় সেখানে আসিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল এবং মাথা নাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। আর একবার তিনি স্বামী অখিলানন্দ ও একজন ভক্তের সহিত ভুবনেশ্বরের জঙ্গলে বেড়াইতেছিলেন। অকস্মাৎ একটি বাঘ তাঁহাদের সম্মুখে প্রায় একশত ফুটের মধ্যে আসিয়া পড়িলে মহারাজ অচঞ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, বাঘও থামিয়া গেল এবং কিয়ৎক্ষণ তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া পলাইয়া গেল।

যাহা হউক, মহারাজের অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে ফুটাইয়া তুলিবার উপযুক্ত এই জাতীয় দৃষ্টান্তের অভাব না থাকিলেও আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই সে প্রলোভন ত্যাগ করিয়া জীবনেতিহাসের ধারায়ই ফিরিতে হইবে।

মহারাজ মধ্যে মধ্যে বেলুড় হইতে বলরাম-মন্দিরে যাইয়া বাস করিতেন। একদিন প্রাতঃকালে রামলাল-দাদা তাঁহার সাক্ষাৎমানসে সেখানে আসিলেন। দাদাকে দেখিলেই মহারাজ আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন এবং আলাপ-আলোচনা ও হাস্যকৌতুকে মুখর হইয়া উঠিতেন। সেইদিন রামলাল-দাদাকে বলিলেন, "দাদা, আজ সন্ধ্যার পর ঢপওয়ালী সেজো—ঠাকুরের সময়কার গান সকলকে শুনাতে হবে।" বেলুড় মঠে ঐরূপ অনাবিল রঙ্গরসে দাদা সম্মত থাকিলেও পরের বাড়িতে উহা চলে কিরূপে? দাদা আপত্তি জানাইলেন ; কিন্তু মহারাজের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাকে যথাসময়ে সন্ধ্যায় অপূর্বসাজে সজ্জিত হইয়া বলরাম-মন্দিরের দ্বিতলের হলে মহারাজ

প্রভৃতির সম্মুখে আসরে নামিতে হইল। তিনি হাত নাড়িয়া নাচিতে নাচিতে ঢপ-কীর্তনের সুরে গান ধরিলেন—

"একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিনেক দুয়ের মত—
(ও তোর) মন মানে তো থাকবি সেথা, নইলে আসবি দ্রুত।
আগে ছিল একহেঁটো জল,
এখন যমুনা অতল—সাঁতার দিতে হবে ;
নৈলে যমুনার তীরে বসে ব্রজ নিরখিবে।
যদি বল ব্রজে যেতে চরণেতে ধূলা লাগিবে—
(বললে বলতেও পার, আগে রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছ)
—না হয় ব্রজনারীর নয়ননীরে চরণ পাখালিবে॥"

গান ও গানের আখর শুনিতে শুনিতে মহারাজের সহাস্য বদন সহসা গম্ভীর হইয়া গেল। গানের প্রতি চরণ কোন্ অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দিতে লাগিল, প্রতি ছন্দে কোন্ অপূর্ব লীলার আকর্ষণ অনুভূত হইতে লাগিল, প্রতি ভাবে কোন্ বিরহ সমস্ত আমোদ-প্রমোদের উপর ঘনযবনিকা টানিয়া দিতে লাগিল? ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "রাখাল যখন তার নিজের স্বরূপ জানতে পারবে, তখন তার আর দেহ থাকবে না।" আজ এই অপূর্ব সঙ্গীত কি সেই স্বরূপের পরিচয় লইয়া অবতীর্ণ হইল? তরল হাস্যকৌতুক এতটা গাম্ভীর্যে পরিণত হইবে—ইহা কে ভাবিয়াছিল?

ইহার কয়েকদিন পরে শিবরাত্রিব্রত-উদ্‌যাপনান্তে মহারাজ বেলুড়ে আসিলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা ও সাধারণ উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। অতঃপর তাঁহার পুনঃ বলরামমন্দিরে যাত্রার দিন প্রাতঃকালে সাধু-ব্রহ্মচারীদিগকে ডাকিয়া তিনি স্বামীজীর পরিকল্পিত মন্দিরের স্থান নির্দেশপূর্বক বলিলেন, "স্বামীজীর সঙ্কল্প ছিল, এখানে ঠাকুরের শ্রীমন্দির নির্মিত হয়।" অনন্তর স্বামীজীর নির্দেশানুসারে

অঙ্কিত মন্দিরের নক্সাটি আনাইয়া অভিনিবেশ-সহকারে দেখিলেন—যেন সকলকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, এই মহৎ কার্যটি অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, ইহা স্বামীজী দায়স্বরূপ সঙ্ঘের উপর অর্পণ করিয়াছেন।

বলরাম-মন্দিরে আগমনান্তে দিন কয়েক স্বাভাবিক ভাবেই অতিবাহিত হইল; কিন্তু ২৪শে মার্চ (১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি অকস্মাৎ বিসূচিকারোগে আক্রান্ত হইলেন। সকলের পরামর্শানুযায়ী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা চলিতে লাগিল এবং তিনি ক্রমে আরোগ্যলাভপূর্বক অন্নপথ্য করিলেন। এই রোগযন্ত্রণার মধ্যেও সদানন্দ জীবন্মুক্ত মহারাজের হাস্যকৌতুক সমভাবেই চলিত এবং দুশ্চিন্তার মধ্যেও ভক্ত ও সেবকদের হৃদয়ে আনন্দ আনিয়া দিত। তাঁহাকে একদিন বলরাম-মন্দিরের ক্ষুদ্র কক্ষ হইতে হল-গৃহে লইয়া যাইবার কালে তিনি সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, মরা হাতী লাখ টাকা!" মহারাজ এমনই কৌতুক-সহকারে স্বীয় রোগজীর্ণ স্থূল দেহের প্রতি সেবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন যে, এই দুঃসময়েও সেবকগণ হাস্যসংবরণ করিতে পারিলেন না। ফলতঃ রোগের উপশম ও এই রকম সকৌতুক ব্যবহারে সকলের হৃদয় ক্রমে আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু উহা বিদ্যুৎ-ঝলকের মত গভীর তিমিরাচ্ছন্ন নিদারুণ বাস্তবতাকে ক্ষণিকের জন্য দৃষ্টিবহির্ভূত করিলেও পরক্ষণেই তাঁহারা সচকিতে দেখিলেন, তাঁহারা প্রতিকারহীন ও চিত্তবিভ্রমকারী এক ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখীন। অন্নপথ্য করিবার দুই দিন পরেই মহারাজের বহুমূত্রের লক্ষণ দেখা দিল। তজ্জন্য প্রথমে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল। উহা ফলপ্রদ না হওয়ায় কবিরাজী চিকিৎসার প্রস্তাব হইল। ইহা শুনিয়া মহারাজ রহস্য করিয়া বলিলেন, "হাকিমীটা আর বাকী থাকে কেন?" নির্বিকার নিত্যসিদ্ধ পুরুষ তখন স্বদেহকে একটা পৃথক্ জড়বস্তুরূপে দেখিয়া রোগের চিকিৎসা ও উহার ফলাফল সম্বন্ধে এমনি

সম্পূর্ণ উদাসীন! যাহা হউক, কবিরাজ শ্যামাদাস বাবু আসিলেন। সদানন্দময় মহারাজ তাঁহার বিভূতিবিমণ্ডিত কপালদর্শনে বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয়, কপালে যাঁর চিহ্ন ধারণ করেছেন, সেই শিবই সত্য আর সবই মিথ্যা।" কোন্ অর্থে এই মিথ্যা শব্দের প্রয়োগ হইয়াছিল তাহা মহারাজই জানেন। ভক্তেরা দেখিলেন, তাঁহাদের এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হইল।

ক্রমে ২৫শে চৈত্র (৮ই এপ্রিল) শনিবার আসিল। সেই দিন রাত্রি নয়টার সময় সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্তদিগকে নিকটে ডাকিয়া মহারাজ একে একে সকলকে সস্নেহে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "ভয় পেও না; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।" আর উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকল সন্তানের কথা চিন্তা করিয়া তাহাদের কল্যাণকামনায় বলিলেন, "বাবারা, যে যেখানে আছ, তোমাদের সকলের কল্যাণ হোক।" সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন—ধ্যান-নিমগ্ন মহাপুরুষ যেন ক্রমশঃ অতীন্দ্রিয় রাজ্যের গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ সেই নিবিড় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তাঁহার সাগ্রহ সস্মিত বাণী উঠিল, "এই যে পূর্ণচন্দ্র! রামকৃষ্ণ! রামকৃষ্ণের কৃষ্ণটি চাই। আমি ব্রজের রাখাল; দে দে আমায় ঘুংগুর পরিয়ে দে—আমি কৃষ্ণের হাত ধরে নাচব—ঝুম্ ঝুম্, ঝুম্ ঝুম্! কৃষ্ণ এসেছ? কৃষ্ণ কৃষ্ণ! তোরা দেখতে পাচ্ছিস নে? তোদের চোখ নেই। আহা-হা, কি সুন্দর আমার কৃষ্ণ—কমলে কৃষ্ণ, ব্রজের কৃষ্ণ—এ কষ্টের কৃষ্ণ নয়। এবার খেলা শেষ হল। দেখ দেখ, একটি কচি ছেলে আমার গায়ে হাত বুলুচ্ছে আর বলছে, আয় চলে আয়।" মহারাজ নীরব হইলেন। এই ভাবে রবিবারও কাটিয়া গেল। পরদিন ১০ই এপ্রিল, ২৭শে চৈত্র, সোমবার রাত্রি পৌনে নয়টায় শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র রাখাল নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন। মঙ্গলবারে সেই শিবময় দেহ বেলুড় মঠে আনীত ও পুষ্প-চন্দন-ধূপ-অগুরু প্রভৃতির সহিত পবিত্র হোমাগ্নিতে আহুত হইল।

স্বামী যোগানন্দ

স্বামী যোগানন্দ অতি অল্প বয়সেই ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। 'লীলাপ্রসঙ্গে' আছে—"প্রথম আগমনদিবসে ঠাকুর ইঁহাকে দেখিয়া এবং ইঁহার পরিচয় পাইয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার নিকটে ধর্মলাভ করিতে আসিবে বলিয়া যে-সকল ব্যক্তিকে শ্রীশ্রীজগন্মাতা তাঁহাকে বহুপূর্বে দেখাইয়াছিলেন, যোগীন কেবলমাত্র তাঁহাদের অন্যতম নহেন, কিন্তু যে ছয়জন বিশেষ ব্যক্তিকে ঈশ্বরকোটি বলিয়া জগদম্বার কৃপায় তিনি পরে জানিতে পারিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদিগেরও অন্যতম।" স্বামীজী বলিতেন—"আমাদিগের ভিতর যদি সর্বতোভাবে কেহ কামজিৎ থাকে তো সে যোগীন।" নিরঞ্জনানন্দ একদা বলিয়াছিলেন, "যোগীন, তুমি আমাদের মাথার মণি।" বলা বাহুল্য যে, এরূপ উচ্চ প্রশংসার যিনি অধিকারী তিনি অনন্যসাধারণ মহাপুরুষ। বস্তুতঃ সরল, মহাত্যাগী, কঠোর তপস্বী, মাতৃভক্ত ও শুকদেবের ন্যায় পরম পবিত্র যোগানন্দ শুধু রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কেন, যে-কোনও সমাজ বা কালের 'মাথার মণি'।

স্বামী যোগানন্দের পূর্ব নাম যোগীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। দক্ষিণেশ্বরের সুবিখ্যাত সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ (১২৬৭ সালের ১৮ই ফাল্গুন চান্দ্র মাঘ কৃষ্ণাচতুর্থী তিথিতে) শনিবার, ইঁহার জন্ম হয়। পিতা নবীনচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় নিষ্ঠাবান্ ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পূজা ও ধ্যানাদিতে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন; সেই জন্য সমৃদ্ধিসম্পন্ন জমিদারবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও বিষয়বিমুখতার ফলে অচিরেই

স্বামী যোগানন্দ

দারিদ্র্যগ্রস্ত হন। যোগীনের তখন মাত্র কৈশোর। পিতা আশা পোষণ করিতে লাগিলেন, যোগীন বড় হইয়া সংসারের ভার গ্রহণ করিবে এবং দারিদ্র্যেরও লাঘব করিবে; কিন্তু ঐরূপ কোন লক্ষণ যোগীনের চরিত্রে দেখা গেল না। বরং বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানলাভের জন্য স্বভাবজাত আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনকে অধিকার করিয়া বসিল। তিনি নিজেই বলিতেন যে, অতি শৈশবকালে এক অভাবনীয় ভাবনায় তিনি বিভোর থাকিতেন। পাঁচ বৎসর বয়সের শিশুর ক্রীড়াচাপল্যের মধ্যেও অকস্মাৎ অনন্তের ডাক আসিয়া তাঁহাকে আনমনা করিয়া তুলিত—তিনি উদাস-প্রাণে আকাশের দিকে তাকাইয়া ভাবিতেন, "এ কোথায় এসেছি? আমি তো এখানকার লোক নই!" তাঁহার মনে হইত, তিনি ঐ সুদূর নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে তারার মালা পরিয়া বসিয়া আছেন; তাঁহার খেলার সাথী ঐ ওখানে আছে—এখানে নয়। মাঝে মাঝে সে দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইত।

ক্রমে যোগীনের উপনয়ন হইয়া গেল। এখন তিনি পূজাধ্যানাদির অধিকতর সুযোগ পাইয়া প্রাণে একটা তৃপ্তি অনুভব করিলেন এবং উহাতে অনেক সময় কাটাইতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তিনি রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পুস্তকও পাঠ করিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বাটী প্রায়ই ভাগবতপাঠ ও কীর্তনাদিতে মুখরিত থাকায় তাঁহার ও সকলের মনে সর্বদা ধর্মভাব জাগরূক থাকিত।

যথাসময়ে পিতা তাঁহাকে আগরপাড়া মিশনরী বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দিলেন। বিদ্যালয়ের পাঠে নিরত থাকিলেও দক্ষিণেশ্বরের ৺কালীমন্দির-সংলগ্ন উদ্যানের সন্নিকটেই তাঁহার গৃহ অবস্থিত থাকায় তিনি প্রায়ই তথায় ভ্রমণ করিতে আসিতেন। বিশেষতঃ ধর্মপ্রাণ পিতা পুষ্পচয়ন ও গঙ্গাস্নানাদির জন্য প্রত্যহ রাসমণির দেবালয়ে যাতায়াত

করিতেন। এইরূপে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের সহিত তাঁহার আশৈশব সম্বন্ধ ছিল বলিলেই চলে। তিনি পরমহংসদেবের নামও শুনিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছাও পোষণ করিতেন; কিন্তু স্বভাবসুলভ লজ্জা ঘনিষ্ঠতার পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিত। বিশেষতঃ আলাপীদের মধ্যে তিনি তখন পর্যন্ত পরমহংসদেব সম্বন্ধে তেমন উচ্চ ধারণার আভাস পান নাই—বরং প্রদীপের ঠিক নিম্নস্থলে অন্ধকার থাকার ন্যায় যুগাবতারের লীলাক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বরে তখন বিরুদ্ধ সমালোচনাই অধিক হইত।

ইতোমধ্যে কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত করিয়া দিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের প্রবন্ধাদি পড়িয়া যোগীন শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনে উৎসুক হইলেন; কিন্তু পরিচয় করাইয়া দিবে কে? এমন সময়ে একদা ৺কালীবাড়ির উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার একটি ফুল পাইবার আকাঙ্ক্ষা হইল এবং সম্মুখেই অতি সাধারণ পোশাক-পরিহিত একজনকে দেখিয়া ভাবিলেন, এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বাগানের মালী; সুতরাং ফুলটি তুলিয়া দিতে তাহাকে আদেশ করিলেন। আদিষ্ট পুরুষ অম্লানবদনে তুলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। ইহার পর একদিন যোগীন দেখিলেন এক গৃহে বসিয়া বহু ভদ্রলোক নিবিষ্টমনে সেই পূর্বদৃষ্ট মালীর বাণী শুনিতেছেন, আর উপদেষ্টা অবিরাম তত্ত্বকথা বলিয়া যাইতেছেন। ইহাতে তিনি যুগপৎ বিস্ময় ও লজ্জায় অভিভূত হইলেন। তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, দক্ষিণেশ্বরের লোকেরা যাঁহাকে 'পাগলা বামুন' বলে এবং কেশবচন্দ্র যাঁহাকে 'পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ' বলিয়া প্রচার করেন, ইনিই তিনি। মনে স্বতঃই প্রশ্নই উঠিল, "পাগল যদি হন, তবে এত লোক কেন?" ঔৎসুক্য জাগরিত হওয়ায় কি প্রসঙ্গ হইতেছে জানিবার জন্য তিনি আরও অগ্রসর হইয়া দ্বারের পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিলেন।

যোগীন মৌনবিস্ময়ে কাষ্ঠবৎ বাহিরে দণ্ডায়মান, এমন সময় ঠাকুর

একজনকে আদেশ করিলেন, "বাইরে যারা আছে, তাহাদের ভেতরে নিয়ে এস।" বাহিরে যোগীন ব্যতীত আর কেহ ছিল না; আহূত হইয়া তিনি ভিতরে আসিয়া বসিলেন। প্রসঙ্গান্তে দূরাগত ভক্তেরা চলিয়া গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ যোগীনের নিকট আসিলেন এবং সস্নেহে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচয় পাইয়া তিনি আনন্দের সহিত বলিলেন, "তবে তো তুমি আমাদের চেনা ঘর গো! তোমাদের বাড়িতে আমি তখন কত যেতুম, ভাগবত, পুরাণ প্রভৃতি শুনতুম—তোমাদের বাড়ির কর্তাদের ভেতর কেউ কেউ আমাকে বড় যত্ন করতেন।" তারপর উপস্থিত সকলের নিকট যোগীনের পরিচয়প্রদানসূত্রে বলিলেন, "এঁরা দক্ষিণেশ্বরের সাবর্ণ চৌধুরী। এঁদের প্রতাপে সেকালে বাঘে-গরুতে একসঙ্গে জল খেত। এঁরা লোকের জাত দিতে নিতে পারতেন। ভক্তিমানও সব খুব ছিলেন—বাড়িতে কত ভাগবত-পুরাণাদি হত। জানা-শোনা হল, বেশ হল—এখানে যাওয়া-আসা করো। মহদ্বংশে জন্ম—তোমার লক্ষণ বেশ সব আছে। বেশ আধার—খুব (ভগবদ্ভক্তি) হবে।"

তদবধি যোগীন ঘন ঘন ঠাকুরের নিকট আসিতেন, কিন্তু অতি গোপনে—অপর কাহাকেও না জানাইয়া; কারণ দক্ষিণেশ্বরের লোকের দৃষ্টিতে ঠাকুর পাগল, আর তাহাদের মতে তিনি জাতিবিচার মানিতেন না। অতএব যোগীনের ভয় ছিল যে, উচ্চবংশসম্ভূত হইয়াও সদা-সর্বদা এই পাগলের নিকট যাতায়াত করিতেছেন ইহা জানিলে বাড়ির লোকেরা শুধু আপত্তি করিবে না, হয়তো একটা অনর্থের সৃষ্টি করিয়া বসিবে। কিন্তু ক্রমে উহা প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং সমবয়স্কেরা বিদ্রূপাদিও করিতে লাগিল। যোগীন তবু পশ্চাৎপদ হইলেন না; আর সৌভাগ্যবশতঃ পিতা ও মাতা সব শুনিয়াও বাধা দিলেন না, কারণ তাঁহারা জানিতেন, সে বাধা নিষ্ফল হইবে।

এই জানাজানির পরেও স্বভাবতঃ নির্জনতাপ্রিয় যোগীন কখন আসিতেন বা কখন যাইতেন, কেহ টের পাইত না—এমন কি, ঠাকুরের ভক্তদের নিকটও উহা অজ্ঞাত থাকিত। ক্রমে ঠাকুরের সঙ্গগুণে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল; তিনি প্রবেশিকা-পরীক্ষার পরে আর পড়াশুনা করিতে চাহিলেন না। কি করিয়াই বা পড়াশুনায় মন বসিবে? ঠাকুর তাঁহাকে যে ভাবের ভাবুক করিয়াছেন, তাহার সহিত সাংসারিক শিক্ষার সামঞ্জস্য করা দুষ্কর। তিনি ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, কাম-কাঞ্চনত্যাগ ব্যতীত ঈশ্বরলাভের আশা দুরাশা মাত্র। এদিকে সংসারের অনটন তাঁহাকে বড়ই পীড়া দিতেছিল। অবশেষে অনেক ভাবিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, দারপরিগ্রহপূর্বক সংসারে লিপ্ত না হইলেও চাকরি অবলম্বনে পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক; তবে অবসরকাল তিনি নিজ সাধন ভজনেই কাটাইবেন। মনে মনে ইহা স্থির করিয়া পিতাকে জানাইলেন এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে (আনুমানিক ১৮৮৪ ইং-তে) চাকরির সন্ধানে কানপুরে তাঁহার মেসোর বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেখানে কয়েক মাস চেষ্টার ফলেও কোন কাজ জুটিল না। ইহাতে একদিকে যোগীনের সুবিধাই হইল। তিনি দীর্ঘ অবসর বৃথা নষ্ট না করিয়া ধ্যানজপের সময় বাড়াইয়া দিলেন। যোগীন যতই অন্তররাজ্যে ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন, বাহিরে ততই তাঁহার গাম্ভীর্য ও উদাসভাব স্পষ্টতর হইতে লাগিল। মেসো মহাশয় ইহা অচিরেই লক্ষ্য করিলেন এবং এতাদৃশ উচ্চ জীবনের সহিত পরিচিত না থাকায় ইহা অপ্রকৃতিস্থতার পূর্বাভাস মনে করিয়া প্রতিকারকল্পে যোগীনের পিতাকে পত্র লিখিলেন—"ছেলে বড় হয়েছে, এখন বিয়ে না দিয়ে এমন করে রাখলে একেবারে বয়ে যাবে" ইত্যাদি।

চিঠি পাইয়া পিতা বিবাহের যাবতীয় আয়োজন ঠিক করিলেন; কিন্তু

পুত্রের স্বভাব অবগত থাকায় তাহাকে কিছুই না জানাইয়া কানপুরে সংবাদ দিলেন—"যোগীনকে বাটীতে পাঠাইয়া দাও, বাটীতে অসুখ।" খবর পাইয়া যোগীন মনে করিলেন, হয়তো তাঁহার মাতা পীড়িতা হইয়াছেন। যোগীনের মনে এইরূপ আশঙ্কার উদয় হওয়ায় তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া মাতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন। পরন্তু বাড়িতে আসিয়া যাহা শুনিলেন তাহাতে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। একি? কোথায় কাহার অসুখ! কাহারও মুখে কোন ভাবনা বা উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নাই—শুধু রহিয়াছে অজ্ঞাত এক ভাবী উৎসবের ব্যস্ততা। কেহ কিছু না বলিলেও তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, এই সমস্তই তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া চলিতেছে—তাঁহার বিবাহ আসন্ন; আর দুই দিন মাত্র বাকী আছে। যোগীন আজ এক পরীক্ষার সম্মুখীন। অবিবাহিত থাকিবেন—ইহাই তো তাঁহার দৃঢ়সঙ্কল্প; কিন্তু আজ একি বিধির বিড়ম্বনা! যাহা হউক, অনেক ভাবিয়া পিতাকে স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন যে, তিনি বিবাহ করিবেন না। কিন্তু পিতা তাহা শুনিবেন কেন? পুত্রকে কৌশলে রাজী করাইবেন—ইহা ভাবিয়াই না তিনি সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন? সেই ছেলের অবিবেচনায় ও অবাধ্যতায় আজ কি তাঁহার সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইবে আর তিনি কন্যাপক্ষকে কথা দিয়া উহার রক্ষণে অসমর্থতানিবন্ধন সমাজের নিকট অপদস্থ হইবেন? পিতা এককালে ক্রোধে ও অভিমানে অধীর হইয়া পড়িলেন; তিনি বলিতে লাগিলেন যে, অবাধ্য যোগীনের মুখদর্শন করিবেন না। বাড়ির লোকেরা প্রমাদ গণিলেন। তখন যোগীনের মাতা ছেলের হাতদুখানি ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "বাবা, আমার মাথা খাও, অমত করো না; কর্তার মুখ রাখ—তিনি কন্যাকর্তাকে কথা দিয়ে ফেলেছেন। তুমি অমত করলে তাঁর অপমানের অবধি থাকবে না। তোমার ইচ্ছে না থাকলেও তুমি আমার জন্যে বে কর।" ইহা বলিতে বলিতে জননী

অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন। কোমলহৃদয় মাতৃভক্তের পক্ষে সে অনুনয় উপেক্ষা করা বড়ই কঠিন। জননীর অশ্রুধারা তাঁহার প্রতিজ্ঞার ভিত্তিকে শিথিল করিল, আর "তুমি আমার জন্য বে কর" মায়ের এই করুণ বাণী বার বার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হওয়ায় সে ভিত্তি অকস্মাৎ ধ্বসিয়া পড়িল। মাতৃভক্তির বেদীতে স্বীয় সঙ্কল্পকে বলি দিয়া যোগীন বিবাহে সম্মত হইলেন। যথাসময়ে নবপরিণীতা বধূ গৃহে আসিলেন; কিন্তু যোগীনের বৈরাগ্য অটুট রহিল—বাসরগৃহে প্রবেশকালে তাঁহার বিষাদ-গম্ভীর হৃদয় মথিত করিয়া অস্ফুটধ্বনি উঠিল, "হরিবোল, হরিবোল।"

বিবাহ করিয়া যোগীন জননীকে সুখী করিতে পারিয়াছিলেন কিনা—জানি না। কিন্তু নিজের শান্তি যে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে, ইহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা, তাঁহার উচ্চ চিন্তা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা যে একে একে আজ বিদায় লইতেছে—যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই যেন ইহা তাঁহার নিকট আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। বিবাহ করিয়াছেন—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন; সুতরাং মন্দিরোদ্যানের সেই প্রাণ-মন-হরণকারী ঠাকুরের নিকট আর তো যাওয়া চলিবে না। তিনি ভাবিলেন—"যে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারে না, তার মত হীন আর কে আছে? আমাকে তিনি কি আর ভালবাসবেন? তিনি কামকাঞ্চনত্যাগী, আর আমাকে এখন থেকে কামিনীকাঞ্চন নিয়েই জীবন-যাপন করতে হবে। এখন আমার আর তাঁর কাছে গিয়ে কি হবে?" এইরূপ নানা চিন্তার পর তিনি অবশেষে স্থির করিলেন যে, আর ৺কালী-মন্দিরে যাইবেন না।

ধীরে ধীরে যোগীনের বিবাহের সংবাদ ঠাকুরের নিকট পৌঁছিল। তিনি তাঁহাকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং বিভিন্ন লোক-দ্বারা পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন। যোগীন

তথাপি আসিলেন না, কিংবা ঠাকুরের নিকট কোন সংবাদ পাঠাইবার প্রয়োজনও বোধ করিলেন না। অনন্যোপায় হইয়া ঠাকুর অবশেষে একদিন কোন এক পরিচিত ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন—"অমুকের ছেলে কি রকম লোক? কানপুরে যাবার আগে তার নিকট এখানকার পয়সা-কড়ি কিছু ছিল, তার হিসাবও দেয় না, ডেকে পাঠালেও আসে না। বোলো তো তাকে।"

এই সংবাদ পাইয়া যোগীন বড়ই মর্মাহত হইলেন। তাঁহার মনে পড়িল, মন্দিরের খাজাঞ্চী একটা জিনিসের জন্য কিছু পয়সা তাঁহাকে দিয়াছিলেন এবং উহা হইতে উদ্বৃত্ত আনা চার পয়সা খাজাঞ্চীকে দেওয়া হয় নাই, কারণ পূর্বোক্ত নানা হাঙ্গামায় তিনি ৺কালী-মন্দিরে যাইতে পারেন নাই; পরে যখন স্থির করিলেন যে, আর ঠাকুরের নিকট যাইবেন না, অন্য উপায়ে পয়সা ফেরৎ পাঠাইয়া দিবেন, ঠিক সেই সময়েই ঠাকুরের নিকট হইতে এই অভিযোগ আসিল। তখন অভিমানে এবং লজ্জায় অভিভূত হইয়া ভাবিলেন. "আমার সকল আশা-ভরসা গেছে বটে, তথাপি এখনও এত হীন হই নি যে, চুরি করব। তিনি কি আমাকে এতদূর খারাপ ঠাওরান না কি? যাই হোক, আজই সে পয়সা ফেলে দিয়ে আসব।" বড়ই ব্যথিতহৃদয়ে যোগীন ধীরে ধীরে দক্ষিণেশ্বর-বাগানের দিকে অগ্রসর হইলেন। ঠাকুরের ঘরে আসিয়া দেখিলেন. তিনি ছোট চৌকির উপর বিবস্ত্র হইয়া বসিয়া আছেন; তাঁহাকে দেখিয়াই ছোট ছেলের মত কাপড়-খানি বগলে ফেলিয়া কাছে আসিলেন। বহুদিন-বাঞ্ছিত নিধিকে আজ একেবারে সম্মুখে পাইয়া ভাবময় পুরুষের ভাবাবেগ উথলিয়া উঠিল। কি যেন এক অদ্ভুত শক্তি আজ তাঁহার সমস্ত দেহমনকে চকিত করিয়া উঠাইল! হাত ধরিয়াই বলিলেন, "বে করেছিস—তা কি হয়েছে? এই যে আমি বে করেছি। বে করেছিস, তা ভয় কি? (নিজ বক্ষে হস্ত

রাখিয়া) এখানকার কৃপা থাকলে একটা কি, লাখটা বে-তেও তোর কিছু করতে পারবে না। তোর যদি সংসারে থাকতে ইচ্ছে হয় তো তোর স্ত্রীকে একদিন এখানে নিয়ে আসিস। তাকে এমন করে দেব যে, সে তোর ধর্মপথের সহায় ছাড়া কখনও বিঘ্ন হবে না। আর যদি সংসার করতে না ইচ্ছে হয় তো বলিস, তোর মায়া-মমতা সব খেয়ে ফেলব।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া যোগীন একেবারে বিমুগ্ধ! "বে করেছিস—তা কি হয়েছে?" এ কী নূতন কথা। যাহা শুনিলেন, স্বপ্ন না সত্য? "এখানকার কৃপা থাকলে একটা কি, লাখটা বে-তেও তোর কিছু করতে পারবে না"—দক্ষিণেশ্বরের 'পাগলা বামুন' এই বুক-ভরা আশার বাণী শুনাইয়া তাঁহার মনের গুরুভার অপসারিত করিলেন এবং চিরদিনের মত তাঁহাকে আপনার করিয়া লইলেন। চারি গণ্ডা পয়সা ফেরৎ দিবার জন্যই না তিনি সেদিন মন্দিরে আসিয়াছিলেন, মন দিতে তো আসেন নাই! কিন্তু বার বার পয়সার উল্লেখ করাতেও ঠাকুর সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিলেন না—শুধু বলিলেন, "ঐ ভাঙ্গা টিনের বাক্সে রেখে দে।" অতঃপর ঠাকুরের উদ্দেশ্য বুঝিতে তাঁহার বাকী রহিল না; শান্তমনে তিনি সেদিন গৃহে ফিরিলেন এবং তদবধি ৺কালী-মন্দিরে পুনর্বার যাতায়াত ও অধিকাংশ সময় ঠাকুরেরই কাছে যাপন করিতে লাগিলেন।

যোগীনের আত্মীয়-স্বজন, এমন কি মা পর্যন্ত এই পুনর্মিলনকে পূর্বের ন্যায় সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না; কারণ ইতোমধ্যে বিবাহের বন্ধনে পড়িয়া যোগীন এক গুরুদায়িত্ব মানিয়া লইয়াছেন—তাহা স্বেচ্ছাকৃতই হউক বা পরেচ্ছাকৃতই হউক। পুত্রকে সংসারে উদাসীন দেখিয়া জননী একদিন বলিয়াই ফেলিলেন, "যদি উপার্জনে মন দিবি না, তবে বিয়ে করলি কেন?" উত্তরে যোগীন বলিলেন, "আমি তো ঐ সময়ে তোমাদিগকে বার বার বলেছিলুম বিয়ে করব না! তোমার কান্না সহ্য

করতে না পেরেই তো শেষে ঐ কাজে রাজী হলুম।” ইহাতে ক্রুদ্ধা হইয়া মা বলিলেন, “ওটা আবার একটা কথা! ভেতরে ইচ্ছা না হলে, তুই আমার জন্য যে করেছিস—এ কি সম্ভব?” মাতার ঐ কথা শুনিয়া যোগীন মহারাজ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বড়ই মর্মাহত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, “হা ভগবান্! যাঁর কষ্ট না দেখতে পেরে তোমাকে ছাড়তে উদ্যত হলুম, তিনিই এই কথা বললেন। দূর হক! এ সংসারে মন ও মুখে মিল থাকা একমাত্র ঠাকুর ভিন্ন আর কারও নেই।” কথায় আছে ‘যার জন্য করি চুরি, সেই বলে চোর’।” তাঁহার সরল প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। ইহার পর তাঁহার বৈরাগ্য তীব্রতর হওয়ায় তিনি ঠাকুরের নিকট মাঝে মাঝে রাত্রিতেও বাস করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর স্বীয় সন্তানদিগকে তাঁহাদের নিজস্ব ভাব-অনুযায়ী গড়িয়া তুলিতেন—কাহারও ভাব নষ্ট করিতেন না। যোগীন প্রথম প্রথম আহারাদি সম্বন্ধে এত নিষ্ঠাবান ছিলেন যে, কাহারও বাটীতে জলগ্রহণ পর্যন্ত করিতেন না। ঠাকুর ইহা সবিশেষ জানিতেন। একদিন তিনি যোগীনের সঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরিয়া অবশেষে সন্ধ্যার সময় বাগবাজারে শ্রীযুক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। যোগীনের সমস্ত দিন খাওয়া হয় নাই—মাত্র জলযোগ করিয়াই বাহির হইয়াছিলেন। ঠাকুরও তাহার আচারনিষ্ঠার কথা স্মরণ করিয়া কোথাও আহারাদির বিষয় উত্থাপন করেন নাই। সেইজন্য বলরাম বাবুর বাড়িতে আসিয়াই তাহাদিগকে বলিলেন, “ওগো, এর (যোগীনকে দেখাইয়া) আজ খাওয়া হয় নি, একে কিছু খেতে দাও।” বলরাম বাবু ঠাকুরের কথায় যোগীনকে সাদরে জলযোগ করাইলেন। বলরামের প্রদত্ত দ্রব্যাদিকে ঠাকুর পবিত্র মনে করিতেন বলিয়া যোগীনের মনেও বলরামের গৃহ ও স্বয়ং বলরামের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়াছিল; তাই সেদিন নির্বিবাদে আহার করিতে পারিলেন।

এই প্রকার সহানুভূতিসম্পন্ন গুরুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিক্ষার অধীনে যোগীনের জীবন গঠিত হইতে লাগিল। একদিন তিনি ঠাকুরের সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া উহা সর্বতোভাবে গ্রহণ করিলেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পা ফুলিতে থাকিলে কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ পাল বিধান দিলেন যে, লেবু খাইতে হবে। যোগীন উহা শুনিয়া প্রত্যহ দুইটি টাটকা লেবু আনিয়া ঠাকুরকে দিতে লাগিলেন। কিন্তু একদিন ঠাকুর উহার রস খাইতে পারিলেন না। ইহাতে যোগীন আশ্চর্য হইয়া গেলেন এবং অনুসন্ধানের ফলে অবগত হইলেন যে, যে বাগান হইতে তিনি লেবু আনিতেন, উহা সেই দিন হইতে অপরকে জমা দেওয়া হইয়াছে : মালিকের অজ্ঞাতসারে আনীত লেবু সাধুভোজনে লাগিল না।

সদ্বংশে জাত ও ধার্মিক পরিবারে শিক্ষিত যোগীন সংসারসম্বন্ধে বড়ই অনভিজ্ঞ ছিলেন। এই শ্রেণীর লোককে সংসারের স্বার্থপর ব্যক্তিরা সহজেই প্রতারণা করে। ঠাকুরের কিন্তু শিক্ষা ছিল, "ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন ?" যোগীনকেও একদিন ঐ শিক্ষাদানের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। সেদিন যোগীন একখানা কড়া কিনিতে বাজারে গেলেন এবং দোকানীকে শুধু ধর্মভয় দেখাইলেই উত্তম দ্রব্য পাওয়া যায় এইরূপ বিশ্বাস থাকায় তাহার কথায় আস্থা স্থাপনপূর্বক নিজে পরীক্ষা না করিয়াই লইয়া আসিলেন। বাড়িতে আসিয়া কিন্তু দেখেন কড়াখানা ফাটা! ঠাকুর ইহা জানিয়া ভৎ'সনাপূর্বক বলিলেন, "ভক্ত হতে হবে বলে কি বোকা হতে হবে? দোকানী কি দোকান ফেঁদে ধর্ম করতে বসেছে, যে তুই তার কথায় বিশ্বাস করে কড়াখানা একবার না দেখেই নিয়ে চলে এলি ? আর কখনও ওরূপ করিস না। কোন দ্রব্য কিনতে হলে পাঁচ দোকান ঘুরে তার উচিত মূল্য জানবি, দ্রব্যটি নেবার কালে বিশেষ করে পরীক্ষা করবি, আর যে-সব দ্রব্যের ফাউ পাওয়া যায় তার ফাউটি পর্যন্ত না গ্রহণ করে চলে আসবি না।"

যোগীন ভাবুক ও শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার জানা ছিল না যে, ভাবপ্রবণ বহু সাধক মিথ্যা সাত্ত্বিকতার মোহে আপন মনের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়া জীবনে অযথা কষ্ট ডাকিয়া আনেন এবং অপরেরও কষ্টের কারণ হন। শুধু তাহাই নহে, অনেক ক্ষেত্রে এই বিষয়ে শিক্ষকের সাবধানবাণী না শুনিয়া প্রতিকারের উপায়ও বন্ধ করিয়া ফেলেন। ঠাকুর সময় বুঝিয়া যোগীনকে এই বিষয়েও সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। ঠাকুরের বস্ত্রাদি যে বাক্সে থাকিত উহার মধ্যে আরসুলা বাসা করিয়াছিল; তিনি দেখিতে পাইয়া যোগীনকে বলিলেন, "আরসুলাটাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেল।" যোগীন আরসুলাটাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া যাইলেন বটে, কিন্তু না মারিয়া ছাড়িয়া দিয়া আসিলেন। ঠাকুর এই বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন, ইহা তিনি মোটেই ভাবেন নাই। কিন্তু ফিরিয়া আসিতেই ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, "কিরে, আরসুলাটাকে মেরে ফেলেছিস তো?" যোগীন লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "না মশায়, ছেড়ে দিয়েছি।" ঠাকুর তখন তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "আমি তোকে মেরে ফেলতে বললুম—তুই কিনা সেটাকে ছেড়ে দিলি! যেমনটি করতে বলব, ঠিক তেমনটি করবি। নতুবা ভবিষ্যতে গুরুতর বিষয়সকলেও নিজের মতে চলে পশ্চাত্তাপ উপস্থিত হবে।"

কাশীপুরের উদ্যানে ঠাকুর একদিন পালো-দেওয়া ক্ষীর—যেমন কলিকাতায় নিমন্ত্রণবাটীতে খাইতে পাওয়া যায়—খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ডাক্তারদের ইহাতে অমত ছিল না; অতএব যোগীন্দ্র পরদিন ভোরে ঐরূপ ক্ষীর কিনিয়া আনিতে কলিকাতায় চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে মনে চিন্তার উদয় হইল, "বাজারের ক্ষীরে পালো ছাড়া আরো কত কি ভেজাল মিশানো থাকে—ঠাকুরের খেলে অসুখ বাড়বে না তো?" আবার ভাবিলেন, "ঠাকুরকে তো জিজ্ঞাসা করি নি; তাই কোন ভক্তের দ্বারা ক্ষীর তৈরী করিয়ে নিয়ে গেলে তিনি তো বিরক্ত হবেন

না ?" সাত-পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে বলরাম-ভবনে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বলিলে ভক্তরাও বাজারের ক্ষীরে আপত্তি জানাইয়া গৃহে উত্তম দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু সকালে ক্ষীর প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে না, তাই যোগীন্দ্রকে একবেলা সেখানে থাকিয়া আহারাদির পরে অপরাহ্ণে লইয়া যাইতে বলিলেন। যোগীনও এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বেলা প্রায় চারিটার সময় ক্ষীর লইয়া কাশীপুরে উপস্থিত হইলেন। এদিকে ঠাকুর মধ্যাহ্নেই ক্ষীর খাইবার আশায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শেষে যাহা নিত্য খাইতেন তাহাই খাইলেন ; পরে যোগীন উপস্থিত হইলে তাঁহার নিকট সব শুনিয়া বলিলেন, "তোকে বাজার থেকে কিনে আনতে বলা হল, বাজারের ক্ষীর খাবার ইচ্ছা, তুই কেন ভক্তদের বাড়ি গিয়ে তাদের কষ্ট দিয়ে এরূপ ক্ষীর নিয়ে এলি ? তারপর ও ক্ষীর ঘন, গুরুপাক ; ওকি খাওয়া চলবে ? ও আমি খাব না।" বাস্তবিকই তিনি তাহা স্পর্শ করিলেন না। শ্রীশ্রীমাকে আদেশ দিলেন, সমস্ত ক্ষীর যেন গোপালের মাকে খাওয়ানো হয় এবং বলিলেন, "ভক্তের দেওয়া জিনিস—ওর ভেতর গোপাল আছে—ও খেলেই আমার খাওয়া হবে।"

আর একদিন কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট আসিবার জন্য যোগীন অপরাপর যাত্রীদের সহিত নৌকায় উঠিয়াছেন। আরোহীদের মধ্যে একজন ঐ কথা জানিতে পারিয়া বলিতে লাগিলেন, "ঐ এক ঢং আর কি ? ভাল খাচ্ছেন, গদিতে শুচ্ছেন, আর ধর্মের ভান করে যত সব স্কুলের ছেলেদের মাথা খাচ্ছেন" ইত্যাদি। ঐ কথা শুনিয়া তিনি বড়ই দুঃখিত হইলেন। পরন্তু তাঁহার স্বভাব বড় শান্ত। সেইজন্য কোন কথার প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিলেন, ঠাকুরকে না বুঝিয়া দুনিয়ার কত অজ্ঞ ব্যক্তি কত কি মনে করে তাহাতে ঠাকুরের মত মহান্ ব্যক্তির কিছুই আসিয়া যায় না। ৺কালীমন্দিরে

পৌঁছিয়া কথাচ্ছলে তিনি ঠাকুরের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুর ঐসব কথায় কিছুই মনে করিবেন না। কিন্তু ফল অন্যরূপ হইল। তিনি বলিয়া বসিলেন, "আমায় অযথা নিন্দা করল, আর তুই কিনা তা চুপ করে শুনে এলি! শাস্ত্রে কি আছে জানিস—গুরুনিন্দা-কারীর মাথা কেটে ফেলবে, অথবা সে স্থান পরিত্যাগ করবে। তুই মিথ্যা রটনার একটাও প্রতিবাদ করলি না?"

ইহা ভাবিলে কিন্তু ভুল হইবে যে, ঠাকুর সত্যসত্যই যোগীনকে অপরের সহিত এই সব বিষয় লইয়া বিবাদ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন; তিনি মাত্র তাঁহার মনের একটি দুর্বলতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া-ছিলেন। অপর একটি অনুরূপ ক্ষেত্রে ঠাকুরের আচরণ দেখিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে। দক্ষিণেশ্বরের জনৈকা কুখ্যাতা রমণী কালীমন্দিরের ঘাটে স্নানান্তে ফিরিবার পথে ঠাকুরকে দূর হইতে প্রণাম করিত এবং কখনও বা দুই-একটি কথাও বলিত। ইহা লইয়া গ্রামে আলোচনা হইতে লাগিল। দুষ্ট লোকের মুখে দুষ্ট ইঙ্গিত পাইয়া যোগীন প্রতিবাদ জানাইয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "ঠাকুর নির্মলচরিত্র; খোঁজ নিলেই পার।" এক ব্যক্তি তাহাই করিল এবং বন্ধুদিগকে পরে জানাইল, "তোমাদের পাল্লায় পড়ে আজ আমায় অপমানিত হতে হল। সে বলে, 'আমি দেহ বিকিয়েছি, কিন্তু এতই হীন নই যে, দেবচরিত্রে দোষ দেব। তোমাদের কোন অধিকার নেই যে, আমার দেবতাকে অপমান কর' ইত্যাদি।" যোগীনের নিকট সমস্ত বিবরণটি শুনিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "কত বাজে লোক কত কিছু বলে। তুই ওসব কথায় কান দিস কেন?" বিভিন্ন ক্ষেত্রে তুল্যরূপ ঘটনায় বিচিত্র ও বিরুদ্ধ বিধান!

স্বীয় জীবনতরীর হাল ঠাকুরের হাতে তুলিয়া দিলেও যোগীন এক দিনেই তাঁহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারেন নাই। সরল প্রকৃতির

যুবক হইলেও তাঁহার মন যুগপ্রভাবে সন্দেহমুক্ত ছিল না। ইহার ফলে তিনি ঠাকুরকেও প্রতিক্ষেত্রে যাচাই করিয়া লইতেন। তবে তাঁহার আস্তিক মনে প্রতি পরীক্ষার পরে দৃঢ়তর প্রত্যয় জন্মিত, নাস্তিকদের স্থায় উহা ক্রমেই নিবিড় অন্ধকারে পথ হারাইয়া ফেলিত না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে মন্দ হইবে না।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের নিয়মানুযায়ী প্রত্যহ পূজার প্রসাদের কিয়দংশ ঠাকুরের নিকট আসিত। "একদা ৺ফলহারিণী কালীপূজার পরদিন প্রায় বেলা ৮।৯টার সময় ঠাকুর দেখিলেন যে, তাঁহার ঘরে যে প্রসাদী ফলমূলাদি পাঠাইবার বন্দোবস্ত আছে, তাহা তখনও পৌঁছায় নাই। কালীঘরের পূজারী ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে ডাকিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না; বলিলেন, 'সমস্ত প্রসাদী দ্রব্য দপ্তরখানায় খাজাঞ্চী মহাশয়ের নিকট যথারীতি প্রেরিত হইয়াছে; সেখান হইতে সকলকে যাহার যেমন পাওনা বরাদ্দ আছে বিতরিত হইতেছে; কিন্তু এখানকার (ঠাকুরের) জন্য এখনও কেন আসে নাই, বলিতে পারি না।' রামলাল-দাদার কথা শুনিয়াই ঠাকুর ব্যস্ত ও চিন্তিত হইলেন। কেন এখনও দপ্তরখানা হইতে প্রসাদ আসিল না? —ইহাকে জিজ্ঞাসা করেন, উহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আর ঐ কথাই আলোচনা করেন। এইরূপে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন তখনও আসিল না, তখন চটিজুতাটি পরিয়া নিজেই খাজাঞ্চীর নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, 'হ্যাঁগা, ওঘরে (নিজের কক্ষ দেখাইয়া) বরাদ্দ পাওনা এখনও দেওয়া হয় নি কেন? ভুল হল নাকি? চিরকেলে মামুলি বন্দোবস্ত, এখন ভুল হয়ে বন্ধ হবে—বড় অন্যায় কথা।' খাজাঞ্চী মহাশয় কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, 'এখনও আপনার ওখানে পৌঁছায় নি? বড় অন্যায় কথা। আমি এখনই পাঠাইয়া দিতেছি।'"

যোগীন তখন বালক হইলেও তাহার যথেষ্ট বংশগৌরববোধ ছিল, তাই কালী-বাড়ির খাজাঞ্চী প্রভৃতিকে একটা মানুষ বলিয়াই মনে করিতেন না। অতএব সামান্য প্রসাদের জন্য ঠাকুরের এইরূপ দৌড়াদৌড়িকে ভাল চোখে দেখিলেন না। আবার যখন বুঝিলেন যে, ঠাকুর পেটরোগা—ঐসব কিছুই খাইতে পারিবেন না, তখন স্থির করিয়া ফেলিলেন, "বুঝিয়াছি! ঠাকুর হন আর যত বড় লোকই হন, আকরে টানে আর কি! বংশানুক্রমে চাল-কলা-বাঁধা পূজারী ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিয়েছেন, সে বংশের গুণ একটু-না-একটু থাকবে তো? তাই আর কি!" "এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় ঠাকুর ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'কি জানিস, রাসমণি দেবতার ভোগ হয়ে সাধুসন্ত ভক্ত-লোকে প্রসাদ পাবে বলে এতটা বিষয় দিয়ে গেছে! এখানে যা প্রসাদী জিনিস আসে, সে-সব ভক্তেরাই খায়, ঈশ্বরকে জানবে বলে যারা সব এখানে আসে তারাই খায়। এতে রাসমণির যেজন্য দেওয়া, তা সার্থক হয়। কিন্তু তারপর ওরা (ঠাকুরবাড়ির বামুনেরা) যা-সব নিয়ে যায়, তার কি ওরূপ ব্যবহার হয়? চাল বেচে পয়সা করে। কারু কারু আবার বেশ্যা আছে; ঐ সব নিয়ে গিয়ে তাদের খাওয়ায়; এই সব করে। রাসমণির যেজন্য দান, তার কিছুও অন্ততঃ সার্থক হবে বলে এত করে ঝগড়া করি।' সামান্য একটি ক্ষুদ্র ব্যাপারে এতটা গভীর রহস্য! মুগ্ধ হইয়া যোগেন মহারাজ ভাবিলেন, 'ঠাকুরকে বুঝা দায়।'" ('লীলাপ্রসঙ্গ')।

দক্ষিণেশ্বরে আর একবার ঠাকুরের উপদেশের কার্যকারিতা সম্বন্ধে যোগীনের মনে দারুণ অবিশ্বাস উপস্থিত হইলে ঠাকুরের কৃপায় উহা দূরীভূত হইয়াছিল। ঘটনাটি 'লীলাপ্রসঙ্গের'ই ভাষায় এইরূপ—

"স্বামী যোগানন্দ, যাঁহার মত ইন্দ্রিয়জিৎ পুরুষ বিরল দেখিয়াছি,

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে একদিন ঐ (কামজয়-বিষয়ে) প্রশ্ন করেন। তাঁহার বয়স তখন অল্প, বোধ হয় ১৪।১৫ হইবে এবং অল্প দিনই ঠাকুরের নিকট গতায়াত করিতেছেন। সে সময় নারায়ণ নামে এক হঠযোগীও দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতলে কুটীরে থাকিয়া নেতি ধৌতি ইত্যাদি ক্রিয়া দেখাইয়া কাহাকেও কাহাকেও কৌতূহলাকৃষ্ট করিতেছেন। যোগেন স্বামীজী বলিতেন যে, তিনিও তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন এবং ঐ সকল ক্রিয়া দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন—ঐ সকল না করিলে বোধ হয় কাম যায় না এবং ভগবদ্দর্শনও হয় না। তাই প্রশ্ন করিয়া বড় আশায় ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুর কোন-একটা আসন-টাসন বলিয়া দিবেন, বা হরীতকী কি অন্য কিছু খাইতে বলিবেন বা প্রাণায়ামের কোন ক্রিয়া শিখাইয়া দিবেন। যোগেন স্বামীজী বলিতেন, 'ঠাকুর আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন—"খুব হরিনাম করবি, তা হলেই যাবে।" কথাটা আমার একটুও মনের মত হল না। মনে মনে ভাবলুম—উনি কোন ক্রিয়া-টিয়া জানেন না কিনা, তাই একটা যা তা বলে দিলেন। হরিনাম করলে আবার কাম যায়—তাহলে এত লোক তো কচ্ছে, যাচ্ছে না কেন? তারপর একদিন কালীবাড়ির বাগানে এসে ঠাকুরের কাছে আগে না গিয়ে পঞ্চবটীতে হঠযোগীর কাছে দাঁড়িয়ে তার কথা মুগ্ধ হয়ে শুনছি, এমন সময় দেখি, ঠাকুর স্বয়ং সেখানে উপস্থিত। আমাকে দেখেই ডেকে হাত ধরে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বলতে লাগলেন, "তুই ওখানে গিয়েছিলি কেন? ওখানে যাস নি। ওসব (হঠযোগের ক্রিয়া) শিখলে ও করলে শরীরের ওপরেই মন পড়ে থাকবে। ভগবানের দিকে যাবে না।" আমি কিন্তু ঠাকুরের কথা শুনে ভাবলুম—পাছে আমি ওঁর (ঠাকুরের) কাছে আর না আসি, তাই এই সব বলছেন। আমার বরাবরই আপনাকে বড় বুদ্ধিমান বলে ধারণা—কাজেই বুদ্ধির দৌড়ে ঐরূপ ভাবলুম আর কি!···তারপর ভাবলাম—উনি যা

বলছেন তা করেই দেখি না কেন—কি হয় ? এই বলে একমনে খুব হরিনাম করতে লাগলুম। আর বাস্তবিকই অল্পদিনেই, ঠাকুর যেমন বলেছিলেন, প্রত্যক্ষ ফল পেতে লাগলুম,' " (গুরুভাব, পূর্বার্ধ, ২৯-৩১ পৃঃ)।

যোগীনের সন্দেহ ঠাকুরের উপদেশ বা লোকব্যবহারে মাত্র সীমাবদ্ধ না থাকিয়া একদা চরিত্রের ক্ষেত্রেও ছায়াপাত করিয়াছিল। তিনি সেদিন ঠাকুরের অনুমতিক্রমে কালীবাড়িতে রাত্রিযাপন করিতেছিলেন। নানাবিধ ঈশ্বরীয় আলাপ-আলোচনাদিতে রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়া গেলে আহার-সমাপনান্তে উভয়ে একই ঘরে শয়ন করিলেন। অকস্মাৎ মধ্য রাত্রে যোগীনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে উঠিয়া দেখেন, ঠাকুর ঘরে নাই—দরজা খোলা। ঠাকুর হয়তো বাহিরে পায়চারী করিতেছেন, এই ভাবিয়া যোগীন তাঁহার সন্ধানে বাহিরে গেলেন। একে গভীর রাত্রি তাহাতে নির্জন। সুস্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে চারিদিক উদ্ভাসিত। যোগীন তথাপি ঠাকুরকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল—তবে কি তিনি পত্নীর নিকট শয়ন করিতে গিয়াছেন ? তাহা হইলে মনমুখ এক করিয়া তিনিও কি কাজ করেন না ? এই বিষয়ে তিনি পরে বলিয়াছিলেন—"ঐ চিন্তার উদয়মাত্র সন্দেহ ভয় প্রভৃতি নানা ভাবের যুগপৎ সমাবেশে এককালে অভিভূত হয়ে পড়লুম। পরে স্থির করলুম, নিতান্ত কঠোর এবং রুচিবিরুদ্ধ হলেও যা সত্য তা জানতে হবে। অনন্তর নিকটবর্তী একস্থানে দাঁড়িয়ে নবতখানার দ্বারদেশ লক্ষ্য করতে থাকলুম। কিছুকাল ওরূপ করতে না করতে পঞ্চবটীর দিক থেকে চটিজুতার চট্ চট্ শব্দ শুনতে পেলুম এবং অবিলম্বে ঠাকুর এসে সম্মুখে দাঁড়ালেন। আমাকে দেখে বললেন, 'কিরে, তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে ?' তাঁর উপরে মিথ্যা সন্দেহ করেছি বলে লজ্জা ও ভয়ে জড়সড় হয়ে অধোবদনে দাঁড়িয়ে

রইলুম, ঐ কথার কোন উত্তর দিতে পারলুম না। ঠাকুর আমার মুখ দেখেই সকল কথা বুঝতে পারলেন এবং অপরাধ গ্রহণ না করে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'বেশ, বেশ, সাধুকে দিনে দেখবি, রাত্রে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি।' " ঠাকুর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, আবার যোগীনের মন হইতেও সেদিন ঐ সময়ে আর এক অলৌকিক চিত্রদর্শনের ফলে চিরকালের মত এই সন্দেহের যবনিকা অপসারিত হইয়া তাহার স্থানে প্রকটিত হইল অটুট শ্রদ্ধা ও ততোধিক ভালবাসা। ঠাকুর যখন পঞ্চবটীর দিক হইতে আসিতেছিলেন, তখন যোগীনের দৃষ্টি নহবতের উপর দিকে সহসা আকৃষ্ট হইলে তিনি দেখিলেন, চন্দ্রালোকে মা সমাধিস্থা, আর তাঁহার এই অনুভূতি হইল যে, মা সাধারণ মানবী নহেন। সম্ভবতঃ সেই দিন হইতেই যোগীন প্রকৃত মাতৃভক্ত হইয়াছিলেন এবং ভক্তির প্রেরণায় ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে স্বীয় জীবন প্রধানতঃ মাতৃসেবায়ই নিয়োগ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরের পরে আমরা যোগীনের আবার দর্শন পাই কাশীপুরে। গুরুগতপ্রাণ যোগীন তখন নিজের দেহের কথা ভুলিয়া ঠাকুরের সেবায় রত আছেন। কিন্তু শরীরের একটা নিজস্ব ধর্ম আছে; কাজেই তিনি শীঘ্রই অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। এই কথা শুনিয়া ঠাকুর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "সবার ক্রটি হবে বলে তোমরা নিজের শরীরের যত্ন নিচ্ছ না; তোমাদের শরীর ভেঙ্গে গেলে আমার যত্ন করবে কে? তোমরা বাপু অসময়ে খাওয়া-দাওয়া করো না।" তদবধি ঠাকুর কাহাকেও অসময়ে খাইতে দিতেন না। শুধু ঠাকুরের সেবাতেই যে যোগীনের ঐকান্তিকতা দেখা যাইত তাহাই নহে; সেবার অবসরে তিনি বৃথাকর্মে বা বৃথালাপে যোগ না দিয়া আত্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। স্বামী শিবানন্দ বলিয়াছিলেন, "কাশীপুরে এক সঙ্গেই ছিলুম; যোগীন খুব ধ্যান করত"।

কাশীপুরে ঠাকুরের স্মৃতির সহিত যোগীন আর একভাবে জড়িত হইয়া আছেন। মহাসমাধির আট নয় দিন পূর্বে একদিন হঠাৎ ঠাকুর যোগীনকে পঞ্জিকা আনিয়া ২৫শে শ্রাবণ হইতে প্রতিদিনের তিথি নক্ষত্র প্রভৃতি পড়িয়া শুনাইতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে শ্রাবণ-সংক্রান্তি পর্যন্ত সব দিনের বিশেষ বিবরণী পঠিত হইল। ৩১ শ্রাবণের তিথি নক্ষত্র প্রভৃতি শুনিয়াই ঠাকুর ইঙ্গিতে পঞ্জিকা রাখিয়া দিতে বলিলেন। ঐ দিন শুভ পূর্ণিমা তিথিতে রাত্রি ১টা ৬ মিনিটের সময় (১৬ই আগস্ট, ১৮৮৬ খ্রীঃ) ঠাকুর মহাসমাধিতে দেহরক্ষা করিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসংবরণের পক্ষকাল পরেই শ্রীশ্রীমা (১৫ই ভাদ্র) বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। সঙ্গে যাইলেন যোগীন, লাটু, কালী, গোলাপ-মা, লক্ষ্মীদেবী ও নিকুঞ্জদেবী। ইঁহারা পথে বৈদ্যনাথ, কাশীধাম ও অযোধ্যা দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। পথে ট্রেনে যোগীনের ভীষণ জ্বর হয়। যতক্ষণ হুঁশ ছিল, ততক্ষণ তিনি কেবলই ভাবিতেছিলেন, "কি করে এঁদের বৃন্দাবনে নামাব।" এই সময় তিনি দেখিলেন যেন ঠাকুর স্থির হইয়া বসিয়া আছেন এবং নিকটেই বিকটাকৃতি জ্বরাসুর। সে বলিতেছে, "তোকে দেখে নিতুম; তা পারলুম না, তোর গুরু পরমহংসদেবের জন্য। তোকে এখনই ছেড়ে দিতে হচ্ছে। যাক্‌, এই বেটীকে (লাল কাপড়-পরা এক স্ত্রীমূর্তি দেখাইয়া) রসগোল্লা দিস।" ভোরেই জ্বর সারিয়া গেল। পরে জয়পুরে দেবাদি দর্শনকালে কোন এক মন্দিরে পূর্ববর্ণিত মূর্তি দেখিয়া তিনি সব কথা শ্রীযুক্তা যোগীন-মাকে জানাইলেন। সৌভাগ্যক্রমে নিকটেই রসগোল্লার দোকান ছিল—দেবীকে ভোগ দেওয়া হইল। ঐ দেবী হয়তো শীতলা; হয়তো ঠাকুরের কৃপায় সে যাত্রা যোগীন বসন্তরোগ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

বৃন্দাবনে যোগীন মহারাজকে এক বিশেষ ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষা দিবার জন্য মা ঠাকুরের নিকট আদেশ পাইলেন। তখন পর্যন্ত তিনি কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই, এমন কি, দুই-তিন জন ব্যতীত ঠাকুরের অপর সন্তানদের সহিত কথাও বলিতেন না। তাই প্রথমে ঐ আদেশকে মনের খেয়াল ভাবিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন; কিন্তু পর পর তিন দিন ঐ ভাবে আদেশ পাইলেন। তাই যোগীনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, ঠাকুর তাঁহাকে একটা কিছু বলিবেন এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু বলিয়া যান নাই। অধিকন্তু তিনিও শ্রীমায়েরই মত মন্ত্র গ্রহণের আদেশ পাইয়াছেন। তখন মা একদিন পূজাকালে ভাবাবেশে তাঁহাকে আহ্বান-পূর্বক দীক্ষা দিয়া ঠাকুরের আদেশ পালন করিলেন।

বৃন্দাবনে নিকুঞ্জদেবী একমাস থাকিয়া ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন ও কালী মহারাজের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। লাটু মহারাজও কয়েক মাস পরেই কলিকাতায় চলিয়া আসেন। সুতরাং অতঃপর মায়ের সেবার পূর্ণ দায়িত্ব যোগীন মহারাজকেই লইতে হইল। বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমা এক বৎসর বাস করেন। ইহারই মধ্যে একসময়ে তিনি পায়ে হাঁটিয়া বৃন্দাবনপরিক্রমা করেন এবং সকলকে লইয়া হরিদ্বার দেখিয়া আসেন। অতঃপর তাঁহারা ক্রমে জয়পুর, পুষ্কর ও প্রয়াগ হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন। এইবারে শ্রীশ্রীমা একপক্ষকাল কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরে থাকিয়া যোগীন মহারাজ ও গোলাপ-মার সঙ্গে কামারপুকুরে যান। মাকে কামারপুকুরে পৌঁছাইয়া দিয়া যোগীন মহারাজ অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের ন্যায় তীর্থদর্শনে বাহির হন। বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া তিনি অপর গুরুভ্রাতাদের ন্যায় সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক স্বামী যোগানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি তপস্যায় নির্গত হইলেও দীর্ঘকাল বাহিরে থাকিতে পারেন নাই— শ্রীশ্রীমা ১৮৮৮ খ্রীঃ-এর মধ্যভাগে বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানে বাস

করিতে আরম্ভ করিলে তিনিও তথায় আসিয়া মায়ের সেবাভার গ্রহণ করেন। ঐ সময় বরাহনগর মঠ হইতে অপর সাধুরাও মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেন।

১২৯৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীশ্রীমা স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, সারদানন্দ, যোগীন-মা, যোগীন-মার জননী, গোলাপ-মা ও লক্ষ্মীদেবীর সহিত পুরীধামে গমন করেন। তখনও রেললাইন প্রস্তুত হয় নাই। সুতরাং সকলে কটক পর্যন্ত স্টীমারে গিয়া তথা হইতে গো-যানে পুরীধামে উপস্থিত হন। শ্রীশ্রীমা যোগানন্দ প্রভৃতিকে লইয়া পৌষ মাস পর্যন্ত ১৮৮৮ নভেম্বর হইতে ১৮৮৯ জানুয়ারী) নীলাচলে ছিলেন। অতঃপর তাঁহারা কলিকাতায় বলরাম মন্দিরে আগমন করেন এবং তিন চারি সপ্তাহ পরে আঁটপুর হইয়া কামারপুকুর যাত্রা করেন। আঁটপুর পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দ, যোগানন্দ, প্রেমানন্দ, সারদানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, অভেদানন্দ, মাস্টার মহাশয়, বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন। ইঁহাদের অধিকাংশই আঁটপুর হইতে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু যোগানন্দ, অভেদানন্দ প্রভৃতি শ্রীশ্রীমায়ের সহিত তারকেশ্বর হইয়া কামারপুকুর যান। শ্রীশ্রীমা সেবারে প্রায় এক বৎসর কামারপুকুরে ছিলেন। ইত্যবসরে যোগানন্দ পুনবার তীর্থদর্শনে নির্গত হন।

তিনি বৈদ্যনাথ, গয়াধাম, প্রয়াগ, চিত্রকূট, ওঙ্কারনাথাদি-দর্শনান্তে প্রয়াগে আসিয়া বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। সংবাদ পাইয়া স্বামীজী প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসেন। সৌভাগ্যক্রমে অসুখ গুরুতর হয় নাই—পানি-বসন্ত মাত্র। দিন কয়েক ভুগিয়াই তিনি সুস্থ হইলেন। আরোগ্যলাভের পরেও যোগানন্দজী কিছুদিন প্রয়াগে ছিলেন।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং বিভিন্ন স্থানে বিবিধ ভাবে শ্রীশ্রীমায়ের সেবায় আত্মসমর্পণ করেন। আমরা

যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয় যে জয়রামবাটী ও কামারপুকুরে দীর্ঘকাল অবস্থানপূর্বক মায়ের সেবা না করিয়া থাকিলেও কলিকাতা ও বেলুড় প্রভৃতি অঞ্চলে শ্রীশ্রীমায়ের অবস্থানকালে অথবা তীর্থদর্শনকালে যোগানন্দজী তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতেন। এই সময়ে শ্রীশ্রীমায়ের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানাদি-সম্বন্ধে যথাসম্ভব একটি ধারাবাহিক বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইহাতে যোগানন্দ মহারাজের অজ্ঞাত জীবনের উপরও অনেকটা আলোকসম্পাত হইবে।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে (১২৯৬ বঙ্গাব্দের শেষে) মা কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া বেলুড়ে রাজু গোমস্তার ভাড়াবাড়িতে বাস করেন। পরে কম্বুলিয়াটোলায় মাস্টার মহাশয়ের বাটীতে আসেন। ১২৯৭ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে তিনি বেলুড়ে ঘুষুড়ীতে একটি ভাড়াবাড়িতে ছিলেন। যোগানন্দজী এখানে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। ভাদ্র মাস পর্যন্ত সেখানে থাকিয়া মায়ের রক্তামাশয়রোগ হইলে তাঁহাকে বরাহনগরে সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়িতে চিকিৎসার জন্য আনা হয়; যোগানন্দ তখন বরাহনগর মঠে থাকিয়া মায়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। অতঃপর মা বলরাম-মন্দিরে আসেন এবং ৺দুর্গাপূজার পরে কামারপুকুর হইয়া জয়রামবাটী যান। পর বৎসর ১৩০০ সালের (১৮৯৩ খ্রীঃ) আষাঢ় মাসে বেলুড়ে ফিরিয়া নীলাম্বর বাবুর বাড়িতে দোতলায় বাস করিতে থাকেন; সঙ্গে থাকিতেন গোলাপ-মা আর যোগীন-মা এবং বাহিরের নীচের বৈঠকখানায় তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিতেন স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। ঐ বৎসরের শেষ ভাগে মাঘ কিংবা ফাল্গুন মাসে মা যখন কৈলোয়ারে বায়ুপরিবর্তনে যান তখন যোগানন্দও সঙ্গে গিয়াছিলেন। দুই মাস পরে কৈলোয়ার হইতে ফিরিয়া শ্রীশ্রীমা ১৩০১ সালের ৺দুর্গাপূজার পূর্ব পর্যন্ত বেলুড়ে

বাস করিয়া আঁটপুরে যান এবং সেখানে পূজার কয়দিন কাটাইয়া জয়রামবাটী চলিয়া যান। ঐ বৎসরের শেষভাগে স্বীয় গর্ভধারিণী প্রভৃতি এবং যোগানন্দজীর সহিত শ্রীশ্রীমা তীর্থদর্শনে গমন করেন এবং বৃন্দাবনে প্রায় দুই মাস অতিবাহিত করেন। অতঃপর মা কলিকাতায় ফিরিয়া কিছুদিন সেখানে কাটাইয়া দেশে যান। ১৩০৩ সালের প্রথম ভাগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি বাগবাজারে 'গুদামওয়ালা' বাড়িতে পাঁচ-ছয় মাস বাস করেন। ঐ বাড়িতে সেবক যোগানন্দও থাকিতেন। ১৩০৪ বঙ্গাব্দের শেষভাগে কিংবা ১৩০৫ বঙ্গাব্দের প্রথমভাগে মা বোসপাড়া লেনের ১০।২নং ভাড়াবাড়িতে আসিলে যোগানন্দজীও তাঁহার অনুসরণ করেন।

মাতৃগতপ্রাণ যোগানন্দকে কেহ সামান্য কিছু পয়সা দিলেও তিনি তাহা তুলিয়া রাখিতেন, যাহাতে মা কখন তীর্থাদিতে গেলে ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারেন। এইরূপে দুই-চারি আনা করিয়া তিনি মায়ের জন্য ছয় শত টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ৺জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষে শ্রীশ্রীমা প্রতিবৎসর বাসনাদি মাজিবার জন্য জয়রামবাটী যাইতেন—ইহা দেখিয়া যোগানন্দ মহারাজ পূজার জন্য কাঠের বারকোশ, লট্‌কেন, সিংহাসনের চৌকি ইত্যাদি করাইয়া দিয়া মাকে বলিলেন, "তোমাকে আর বাসন মাজতে যেতে হবে না।" পূজার ব্যয়নির্বাহের জন্য তিনি তিন শত টাকা সংগ্রহ করিয়া তিন বিঘা জমিও কিনিয়া দিয়াছিলেন।

যোগীন মহারাজ যে এতখানি মনপ্রাণ ঢালিয়া মায়ের সেবা করিতে পারিতেন, ইহা শুধু তিনি মাকে দীক্ষাগুরুরূপে পাইয়াছিলেন বলিয়াই নহে। দীক্ষার পূর্বেও এই সেবা বিবিধরূপে আত্মপ্রকাশে উন্মুখ থাকিত। ঠাকুরের লীলাসংবরণের পূর্বেও শ্রীশ্রীমা যোগীনের উপর গৃহস্থালির অনেক বিষয়ে নির্ভর করিতেন। ঠাকুরের শ্যামপুকুরে বাসকালের প্রারম্ভে যোগীন

দক্ষিণেশ্বরে মায়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। কাশীপুরে থাকাকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য কিরূপ ব্যবস্থাদি হইবে তাহা মা অনেক ক্ষেত্রে যোগীনের মারফৎ সকলকে জানাইয়া দিতেন। ঠাকুরের শরীর ক্রমেই খারাপ হইতেছে দেখিয়া কোনও সেবক হতাশ হইয়া পড়িলে যোগীনকে দিয়া মা বলিয়া পাঠাইতেন, "ওকে হতাশ হতে মানা কর। তাঁর শরীর তো আজকাল একটু ভাল রয়েছে, এখন তো ঘায়ের মুখ বাইরের দিকে হয়েছে" ইত্যাদি। ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে কাশীপুরের শ্মশানে মা যখন শোকে আত্মহারা তখন যোগীন ও বাবুরামই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। এইভাবে যোগীন সর্বদাই মাতৃসেবার জন্য উন্মুখ থাকিতেন। অপরে যেখানে পশ্চাৎপদ হইত, মা সেখানে যোগীনকে পাইতেন। একদিন হয়তো লাটুকে বাজার করিতে বলিলেন; খেয়ালী লাটুর মেজাজ তখন অন্যরূপ থাকায় তিনি রাজী হইলেন না। অমনি যোগীনের ডাক পড়িল—যোগীন অম্লানবদনে কাজ সারিয়া আসিলেন।

যোগীন মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে জগজ্জননীরূপে পাইয়াছিলেন আর জানিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার শ্রীচরণে আপনাকে সম্পূর্ণ ঢালিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। মায়ের প্রতি তাঁহার কি অগাধ বিশ্বাস ছিল, তাহা একদিনকার ঘটনায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। শরৎ মহারাজ একবার তাঁহাকে বলিলেন, "যোগীন, নরেনের সব কথা তো বুঝতে পারি না; কত রকম কথা বলে—যখন যেটাকে ধরবে তখন সেটাকে এমন বড় করবে যে, অপরগুলো একেবারে ছোট হয়ে যায়।" যোগানন্দ বলিলেন, "শরৎ, তোকে একটা কথা বলে দিচ্ছি, তুই মাকে ধর; তিনি যা বলবেন তাই ঠিক।" এখানেই ক্ষান্ত না হইয়া তিনি তাঁহাকে মায়ের নিকট লইয়া গেলেন। এইরূপেই শরৎ মহারাজ ক্রমে মায়ের সেবাধিকার পর্যন্ত পাইয়া ও সেই সুযোগে মাতৃসেবার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া রামকৃষ্ণসঙ্ঘে চিরস্মরণীয় হইয়াছিলেন।

মায়ের সেবার ফলে পূতচরিত্র যোগানন্দজীর মনে এরূপ দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে, এককালে তিনি স্বামী বিবেকানন্দেরও সতর্কবাণীতে কর্ণপাত না করিয়া মায়ের কৃপায় অবিকম্পিতপদে অনন্যসাধারণ পথে চলিতে সাহস পাইয়াছিলেন। স্বামীজী প্রথম বারে বিদেশ হইতে ফিরিয়া যখন দেখিলেন যে, যোগীনের সহিত মায়ের সেবায় একজন ব্রহ্মচারীও নিযুক্ত রহিয়াছেন, তখন তিনি এই বিষয়ে স্বামী যোগানন্দের দৃষ্টি আকর্ষণান্তে জানিতে চাহিলেন, "মায়ের নিকট বহু প্রকারের লোকের আনাগোনা আছে; সেখানে ব্রহ্মচারীর মন নিম্নগামী হইলে দায়ী হইবে কে?" যোগানন্দ সদর্পে বুকে হাত রাখিয়া উত্তর দিলেন, "আমি।" সেবক যোগানন্দের এই 'আমি'র পশ্চাতে তাঁহার অদৃষ্টশক্তি প্রেরণা জাগাইয়াছিল, তাহা খুলিয়া বলিতে হইবে কি?

যোগীনের যেমন মাতৃভক্তি, মায়েরও তেমনি সন্তানবাৎসল্য। তাঁহার সম্বন্ধে মা বলিয়াছিলেন, "যোগীন কৃষ্ণসখা গাণ্ডীবী অর্জুন—ধর্মরাজ্য-সংস্থাপনের জন্য ভগবানের নরলীলার সাথী হয়েছে।" স্নেহপুত্তলী যোগীনের স্মৃতিও ছিল মায়ের নিকট আদরের। যোগানন্দ মাকে একখানি লেপ করাইয়া দিয়াছিলেন। উহা ব্যবহারের অযোগ্য হইলে জনৈক ভক্তকে তুলাটা পিঁজাইয়া ও নূতন খোল দিয়া সংস্কার করাইয়া দিতে বলিলেন; কিন্তু পরে বলিলেন, "না, লেপটা নিয়ে যেয়ে কাজ নেই। এই লেপ যোগীন দিয়েছিল—দেখলেই যোগীনকে মনে পড়ে।" আর একবার যোগানন্দের দেহত্যাগের দীর্ঘকাল পরে বলিয়াছিলেন, "যোগীনের মত আমাকে কেউ ভালবাসত না;" অধিকন্তু সকলকে জানাইয়া দিয়াছিলেন, "আমার ভার কি সকলে নিতে পারে? পারত যোগীন, আর পারে শরৎ।"

স্বামী যোগানন্দের মঠজীবনের ইতিবৃত্ত অন্যান্য সময়েরই ন্যায় প্রায়শঃ অজ্ঞাত। সুতরাং কাল ও সময়ানুযায়ী ঐ ঘটনাবলীকে সুসংবদ্ধ করিবার বৃথা

চেষ্টা না করিয়া তদবলম্বনে আমরা তাঁহার চরিত্রের বিশেষ দিকগুলি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিব। যোগীন মহারাজের চেহারা সুদীর্ঘ এবং শরীর অতি কৃশ ছিল। তাঁহার চক্ষু সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "যেন জগন্নাথের চোখ।" দক্ষিণেশ্বর ও কাশীপুরে তিনি এত ধ্যান করিতেন যে,—চক্ষু লাল হইয়া থাকিত; তাই ঠাকুর বলিতেন, "অর্জুনের চোখের মত।" মঠজীবনে তাঁহার এই 'অর্জুনচক্ষু' সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এই সময়ের চিত্র জনৈক প্রত্যক্ষদ্রষ্টার লেখনীতে এইরূপ অঙ্কিত হইয়াছে—তিনি একদিন এই লম্বা, কৃশ ও অপূর্বনয়নযুক্ত সাধুটিকে বরাহনগরের মঠের দিকে যাইতে দেখেন। সন্ন্যাসী যোগানন্দের চরণ তখন রিক্ত, আবরণ একখানি মাত্র বহির্বাস, মস্তক মুণ্ডিত। তাঁহার পিঠে একটি ঝুলিতে আনাজ-তরকারি, আর ডান হাতে একটা হাঁড়ি। ঠাকুরসেবার এই সব দ্রব্যসম্ভার লইয়া দারুণ রৌদ্রে হাঁটিয়া চলিয়াছেন সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশধর; অথচ তাঁহার মুখ স্নিগ্ধ, প্রশান্ত!

দ্বিতীয় চিত্র বলরাম-মন্দিরে। মঠ আলমবাজারে উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু মঠ-জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য এবং অনিশ্চয়তা তখনও কাটিয়া যায় নাই। এইরূপ নিরাশার দিনেও স্বামী যোগানন্দের কণ্ঠে একটা বড় আশার বাণী উত্থিত হইয়াছিল। সেই দিন বলরাম-মন্দিরের বারান্দায় পদচারণ করিতে করিতে তিনি পার্শ্বস্থ ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন, "যীশুর সময় কতকগুলো ত্যাগী (অর্থাৎ সন্ন্যাসী) বেরিয়ে জগৎকে তোলপাড় করেছিল, এইবার আর একবার কতকগুলো ত্যাগী বেরিয়ে জগৎকে তোলপাড় করবে।" ঠাকুরের বাণীতে কতখানি বিশ্বাস থাকিলে ঐ সুদূর অতীতের ঘোর তিমিরে এই রকম আশার আলোক বিচ্ছুরিত হইতে পারে, পাঠক কি একবার তাহা ভাবিয়া দেখিবেন?

স্বামী শিবানন্দের মতে যোগীন মহারাজ খুব রহস্যপ্রিয় ছিলেন;

আলমবাজারে মঠে বাসকালে তিনি একদিন ভিক্ষা হইতে ফিরিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতা ভঙ্গীসহকারে মঠবাসীদিগের নিকট বলিয়া সকলকে আমোদিত করিয়াছিলেন। তিনি কহিয়াছিলেন, "মাগীটার আছে কি? একখানা খোড়ো ঘর, দুখানা ছেঁড়া কাঁথা, আর একটি তামার ঘটি! হায়রে, বলে কিনা তারই বাড়িতে চুরি করতে গেছি!" বলা বাহুল্য যে, সন্ন্যাসী যোগানন্দ তখন মানাপমানের অতীত হইয়া সহজ আনন্দসাগরে ভাসিতেছেন।

তিনি খুব নির্জনতা ভালবাসিতেন। একটু গীতা উপনিষদ্ ইত্যাদি ছাড়া তিনি শাস্ত্রাদি পড়াশুনা বেশী করেন নাই। কিন্তু স্বেচ্ছায় বৃত তপস্যা তিনি খুবই করিয়াছিলেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সহিত প্রয়াগে তপস্যা করেন। অতঃপর ফেব্রুয়ারী মাসে কাশীতে যান এবং সীতারামের ছত্রের সম্মুখে থাকিয়া গভীর ধ্যান, ভজন ও কঠোর তপস্যায় রত হন। ঐ সময়ে বারংবার ভিক্ষার জন্য সময় নষ্ট না করিয়া একবারে প্রাপ্ত রুটিগুলি রাখিয়া দিতেন, এবং উহারই একটু একটু জলে ভিজাইয়া তিন-চারি দিন ধরিয়া খাইতেন। সম্ভবতঃ এইরূপ কঠোরতার ফলে তিনি পরে দারুণ উদরাময়ে আক্রান্ত হন এবং উহাই তাঁহার দেহত্যাগের কারণ হয়। যাহা হউক, কাশীবাসী নিঝ'ঞ্ঝাট যোগানন্দকে শ্রদ্ধা করিত; তাই ঐ বৎসর একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইলেও নিঃসঙ্কোচ-ভ্রমণশীল তাঁহাকে কেহ স্পর্শমাত্র করিত না। ইহার পর কঠোরতাসম্ভূত অজীর্ণ-রোগ লইয়া মে মাসে তিনি বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসেন এবং আগস্ট মাসে আবার কাশীধাম হইয়া প্রয়াগে যান। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবার আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসেন এবং কয়েক মাস সেখানে বাস করেন।

এইরূপ অন্তর্মুখীন হইয়া থাকিলেও জগতের দুঃখাদি সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন না। তাঁহার গ্রামের একব্যক্তি রেল-দুর্ঘটনায় মারা গেলে

ঐ ব্যক্তির পরিবার অসহায় হইয়া পড়ে। ইহাতে তাঁহার মনে দারুণ ব্যথা লাগে এবং তিনি তাহাদিগকে কিছু টাকার সংস্থান করিয়া দেন।

'কথামৃত' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া বিষয়েও তাঁহার একটু হাত ছিল। মাস্টার মহাশয় তখন অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে 'কথামৃত' ছাপাইতেছিলেন। যোগানন্দের ইচ্ছা যে, উহা বড় পুস্তকাকারে বাহির হয়; তাই তিনি শ্রীশ্রীমাকে বলিয়া সব ঠিক করিয়া রাখিলেন। অতঃপর মাস্টার মহাশয় মাকে প্রণাম করিতে আসিলে মা তাঁহাকে পুস্তকাকারে ছাপিতে উপদেশ দিলেন। মাস্টার মহাশয় সে আদেশ পালন করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের সন্তানদের প্রত্যেকের এক একটি বিশেষত্ব থাকিলেও তাঁহাদের সকলেরই যেন একটা সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল—স্থলে স্থলে উহা বিকশিত হইয়া সকলকে চমৎকৃত করিত। যোগানন্দের শাস্ত্রচর্চাও ঐরূপ এক চমকপ্রদ ব্যাপার। শ্রীশ্রীমা যখন বোসপাড়ার বাড়িতে থাকিতেন তখন যোগানন্দ গিরিশ বাবুর বাড়িতে নিয়মিতভাবে ভক্তদের লইয়া শাস্ত্রপাঠাদি করিতেন। এতদ্ব্যতীত স্বামীজী কর্তৃক রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি প্রায়ই বিবিধ আলোচনায় যোগ দিতেন ও সভাপতিত্ব করিতেন।

স্বামীজীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল বড়ই ঘনিষ্ঠ, বড়ই প্রেমপূর্ণ। পরস্পরের প্রতি ইঁহাদের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার ও সহজ বাক্যালাপ দেখিলে অপরিচিতেরা ইঁহাদের অন্তরের ভাব কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অনেক ক্ষেত্রে মনে করিতেন, বুঝিবা মনোমালিন্যেরই একটা অবাঞ্ছনীয় অভিনয় চলিতেছে। স্বামীজী আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসার পর এই অভিনয় অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, পরন্তু অচিরেই সকলে উহার মর্মার্থ বুঝিয়া ঐসব সৌহার্দ্যপূর্ণ কলহে আনন্দই পাইতেন। ঠিক এইভাবেই একদিন বলরাম বাবুর গৃহে স্বামীজীর সহিত তাঁহার তর্ক উপস্থিত হয়। স্বামীজীর আরব্ধ ও পরিকল্পিত কার্যাবলীতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া যোগানন্দজী

আপত্তি তুলিলেন, "তোমার এসব বিদেশী ভাবে কার্য করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এরূপ ছিল?" স্বামীজী উত্তর দিলেন, "তুই কি করে জানলি এসব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা বুঝি তোদের গণ্ডিতে বদ্ধ করে রাখতে চাস? আমি এ গণ্ডি ভেঙ্গে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব।" তিনি আরও বলিয়া যাইতে লাগিলেন যে, সেবাই এই যুগের সাধন হইবে, কারণ প্রাচীনমতে ঠিক ঠিক সাধন করার লোক অতি বিরল। আর সেবা করিলে সাধনের সময় পাওয়া যায় না—ইহাও ঠিক নহে; কারণ এক ঘণ্টা ঠিক ঠিক মন স্থির করিতে পারিলে ভগবানলাভের আর বিলম্ব থাকে না। এইরূপ আলোচনা সেদিন বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই, কারণ স্বামীজীকে কার্যান্তরে যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু যোগানন্দের মত অপরিবর্তিত থাকিয়া দুই বৎসর পরে আর একদিন অন্য ঘটনাবলম্বনে প্রকটিত হইল। সেদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় আসিয়া স্বামীজীর মত ও কার্যপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন। আলোচনান্তে শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "আমরা সব বিষয়েই আপনাদের সহিত একমত; শুধু আপনাদের ঐ অবতারবাদে আমরা সায় দিতে পারি না।" স্বামীজী বলেন, "আমি তো ঠাকুরকে অবতার বলে প্রচার করি না।" তখনই দেখা গেল যোগানন্দের চক্ষু লাল হইয়া উঠিয়াছে —"নরেন বলে কি?" শাস্ত্রী মহাশয় চলিয়া গেলেই তিনি এই বিষয়ে ঘোরতর আপত্তি উঠাইলেন এবং গুরুভাইদের অপর কেহ কেহ তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন। তাঁহাদের বক্তব্য এই ছিল যে, ঠাকুরই স্বামীজীকে বড় করিয়াছেন; সেইজন্য তাঁহার অবতারত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিলে অকৃতজ্ঞতা করা হয়। ইহাতে স্বামীজী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি যদি প্রচার না করতুম, তোদের ঠাকুরকে কে চিনত?" যোগানন্দজীও দমিবার পাত্র নহেন; তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তিনি না থাকলে তুমি

বড় জোর একজন ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জির মত বড় ব্যারিষ্টার হতে।" আলোচনা ক্রমেই গম্ভীর হইতে থাকিলে সেদিন স্বামীজীর হৃদয়াবেগ এতই উদ্বেলিত হইয়া উঠিল যে, তিনি অশ্রু রুদ্ধ করিতে না পারিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশপূর্বক ধ্যানে মগ্ন হইলেন এবং ঐ সমালোচনার ঐখানেই সমাপ্তি হইল। গুরুভ্রাতারা তখন সর্বদা সতর্ক থাকিতেন, যাহাতে ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া স্বামীজীর দুর্বল শরীরকে আরও দুর্বল না করিয়া ফেলে। যোগানন্দও এই বিষয়ে অবহিত ছিলেন; সেজন্য উক্ত ঘটনার এইরূপ অপ্রত্যাশিত পরিণতিতে তিনি বিশেষ দুঃখিত হইলেন এবং অপরের নিকটও তাহা প্রকাশ করিলেন। ফলতঃ কথাচ্ছলে মতভেদ প্রকাশ পাইলেও গুরুভ্রাতাদের এমন একটি প্রীতির সংযোগক্ষেত্র ছিল যেখানে সমস্ত সমস্যার সমাধান স্বতঃই হইয়া যাইত। অতএব ঐ ঘটনার পরে স্বামীজী যখন একদিন যোগীন মহারাজকে বলিলেন, "দেখ, যোগা, তোরা কি আমায় কাজ করতে দিবি না? তোরা অবতার কি বলছিস, অবতার তো ছোট কথা, ঠাকুর যে বেদমূর্তি। আমি তাঁরই আদেশে কাজে নেমেছি"- যোগানন্দ তখনই বলিয়া উঠিলেন, "আমরা তো চিরদিনই তোমার কথা মানি; তবু কি জান মাঝে মাঝে কেমন খটকা লাগে—ঠাকুরকে অন্যরূপ দেখেছি কি না?"

এইটুকু বলিলেই কিন্তু উভয়ের মনোগত ভাব কিংবা পরস্পরের সৌহার্দ্যের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় না। স্বামী যোগানন্দ সত্যই বিবেকানন্দ প্রচারিত সেবার বিরোধী ছিলেন না; বিরোধী হইলে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাকালে উহার প্রথম উপসভাপতি হইবেন কেন এবং মিশনের বহু অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়া স্বামীজীর প্রারব্ধ কার্যের সহায়তা করিবেন কেন? আর ঠাকুরের প্রতি স্বামীজীর প্রগাঢ় বিশ্বাস-ভক্তি সম্বন্ধেও তাঁহার মনে প্রকৃত কোন সন্দেহ ছিল না। তাই পূর্বোক্ত প্রথম দিনের তর্কের পরেই তিনি উপস্থিত একজনকে বলিয়াছিলেন, "আহা,

নরেনের বিশ্বাসের কথা শুনলি? বলে কিনা ঠাকুরের কৃপাকটাক্ষে লাখ বিবেকানন্দ তৈরী হতে পারে! কি গুরুভক্তি! আমাদের উহার শতাংশের একাংশ ভক্তি যদি হত, ধন্য হতুম।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "নরেন নর-ঋষির অবতার। নরেনের মধ্যে ঋষির বেদজ্ঞান, শঙ্করের ত্যাগ, বুদ্ধের হৃদয়, শুকদেবের মায়ারাহিত্য ও ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ একসঙ্গে রয়েছে।"

স্বামীজী জানিতেন এই সব ঘটনা নিতান্তই বাহিরের ব্যাপার; তাঁহাদের চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন হইলেও ঠাকুর স্বীয় কার্যসাধনের জন্য তাঁহাদিগকে যে প্রীতিসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন, ইহাতে উহার ব্যাঘাত হইতে পারে না। কার্যতঃও দেখিতে পাই যে, যোগানন্দকে রামকৃষ্ণ মিশনের উপসভাপতি করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, তিনি বহু ক্ষেত্রে তাঁহার বিচারবুদ্ধিতে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন। বেলুড় মঠের জন্য নির্বাচিত ভূমিখণ্ড ক্রয় করিবার পূর্বে স্বামীজী যোগানন্দকেই পাকাপাকি ভাবে উহা দেখিবার জন্য পাঠান। তাঁহার সঙ্গে আরও জন কয়েক ভক্ত নৌকাযোগে সেখানে যান। জমি দেখিয়া সকলেই খুব তুষ্ট হন এবং নানাকথা বলিতে থাকেন। জনৈক ভক্ত বলেন, "দুটি পুকুর আছে, এতে যে পদ্ম জন্মাবে তাতে ঠাকুরের পূজা হবে।" যোগানন্দ কোন কথায় যোগ না দিয়া ঘুরিয়া জমি দেখিতে থাকেন। তখন তাঁহার মুখে একটা সন্তোষ ও দিব্যভাবের স্ফূর্তি হইয়াছিল এবং ভূমি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "সুন্দর জমি।" মঠে ফিরিয়া তিনি স্বামীজীকে বলিলেন, "ফলাও জমি, সুন্দর; তুমি একবার দেখে এস।" কিন্তু স্বামীজী তাঁহারই কথায় বিশ্বাস করিয়া আর উহা দেখিতে যান নাই।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলে যোগানন্দজী অগ্রণী হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেন। ইহারও পূর্বে স্বামীজী

আমেরিকায় থাকাকালে কলিকাতাবাসীরা টাউন হলে যখন তাঁহার সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন, তখনও স্বামী অভেদানন্দের সহিত মিলিত হইয়া তিনি সমস্ত আয়োজন করেন। ইঁহাদের ভালবাসার আরও পরিচয় পাওয়া যায়। যোগানন্দের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না; তাই আমেরিকা হইতে স্বামীজী প্রায়ই তাঁহার সংবাদ লইতেন এবং অসুখের জন্য দুঃখ ও উদ্বেগ প্রকাশ করিতেন। ভারতে ফিরিয়া স্বামীজী যখন ১৮৯৭এর মে মাসে আলমোড়ায় যান তখন যোগানন্দকেও সঙ্গে লইয়া যান এবং ২০শে মে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিয়া পাঠান, "যোগেন আছে ভাল।" কিন্তু মাস দুই সেখানে থাকিয়াই যোগানন্দ ৯ই জুলাই নীচে নামিলেন—আলমোড়া তাঁহার সহ্য হইল না। স্বামীজী দুঃখ করিয়া লিখিলেন, "যোগেন ভায়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ভায়া একটু আরাম বোধ করিয়াই দেশে যাত্রা করিলেন।" কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি শীঘ্রই আবার অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। পীড়া ক্রমেই গুরুতর হইতেছে সংবাদ পাইয়া স্বামীজী পত্রে নির্দেশ দিলেন, "যোগেনের চিকিৎসার যেন কোনও ত্রুটি না হয়—আসল ভেঙ্গেও টাকা খরচ করিবে।"

ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়াই যোগানন্দ জীবনের শেষ কয়েকটি বৎসর কাটাইলেন। পেটরোগা লোক—ঝোল-ভাত খাইতেন। শারীরিক পরিশ্রমের ক্ষমতা তাঁহার কিছুই ছিল না। কিন্তু এই সকল সত্ত্বেও ঠাকুরের কাজে তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও উদ্যম প্রকাশ পাইত। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারই প্রেরণায়, উদ্যমে ও উদ্যোগে দক্ষিণেশ্বরে বেশ ঘটা করিয়া ঠাকুরের জন্মোৎসব হয় এবং তৎপরে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিবৎসর তিনি সেখানে উৎসব করেন। তিনি তখন প্রায়ই বলরাম-মন্দিরে থাকিতেন এবং উত্তর কলিকাতার বহু লোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। তাঁহার আকর্ষণে আহিরীটোলার অনেক স্বেচ্ছাসেবক উৎসবে যোগ দিয়া উহার সমস্ত কার্য

সুসম্পন্ন করিতেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কর্তৃপক্ষের সহিত কোনও বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় ঐ বৎসর সেখানে উৎসব করা সম্ভব হইল না। কিন্তু যোগানন্দ ইহাতে পশ্চাৎপদ না হইয়া বেলুড়ে দাঁ-দের ঠাকুর-বাড়িতে বিরাট উৎসব করাইলেন। শরীর অসুস্থ থাকায় তিনি উৎসবে যোগ দিতে পারেন নাই। ইহাই তাঁহার শেষ উৎসব; কারণ পরবর্তী উৎসবের পূর্বেই তিনি ১৩০৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে শেষ রোগশয্যা গ্রহণ করেন।

শেষ অসুখের সময় পালাক্রমে অনেকে তাঁহার সেবা করিতেন। যখন তাঁহার দাঁত দিয়া রক্ত পড়িত ও তাহাতে মুখ ভরিয়া উঠিত, তখন উহা ফেলিবার জন্য মুখের কাছে কোনও পাত্র তুলিয়া ধরিতে হইত। মুখ বন্ধ থাকায় তিনি কথা বলিতে পারিতেন না, ইঙ্গিতমাত্র করিতেন। উহা বুঝিয়া লইয়া সেবক অগ্রসর না হইতে পারিলে এইরূপ ক্ষেত্রে রোগীর বিরক্ত হওয়া স্বাভাবিক। জনৈক যুবক ভক্ত একদিন সেবাকালে ঐরূপ ইঙ্গিত বুঝিতে না পারায় যোগীন মহারাজ তাহাকে ধমক দেন; কিন্তু পরক্ষণেই তিনি সব ভুলিয়া গিয়া যুবকটিকে বলেন "আমায় মাপ কর।" বিরক্ত সকলেই হয়; কিন্তু কেবল মহাপুরুষই বিরক্তিকে অতিক্রম করিয়া দেবভাব প্রকাশ করিতে পারেন! শেষ অসুখের সময় পিতামাতা তাঁহার শয্যাপার্শ্বে আসিলে দেখা গেল যে, তিনি তখন সমস্ত মায়িক সম্বন্ধের অতীত; তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আমি আশীর্বাদ করি, তোমাদের ভক্তিলাভ হোক্।" ভগবানে বদ্ধচিত্ত যোগানন্দের তখন জাগতিক সম্বন্ধ-অবলম্বনে লৌকিকতা-প্রদর্শনের অবকাশ নাই। যোগীন মহারাজের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাইতেছে দেখিয়া স্বামীজীর মনে যে কি বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "যোগীন, তুই বেঁচে ওঠ, আমি

মরি।" কিন্তু হায়, দৈব বড়ই নিষ্ঠুর! সে কাহারও সুখ-দুঃখ বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি দৃষ্টি না ফিরাইয়া আপনমনে স্বকার্য সাধন করিয়া চলে। যোগানন্দেরও আরোগ্যের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সে বৎসর ঠাকুরের উৎসবে যোগ দেওয়া যোগানন্দের সম্ভব হইল না। তখন বেলুড় মঠ স্থাপিত হইয়া গিয়াছে, সে মঠেও বাস করা তাঁহার হইল না। স্বামীজী তাঁহাকে একদিন নৌকা করিয়া আনিয়া বেলুড় মঠ দেখাইয়া লইয়া গেলেন মাত্র।

অসুখের যখন খুব বাড়াবাড়ি, তখন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী স্বামী যোগানন্দের স্ত্রীকে বলরাম-মন্দিরে লইয়া আসেন। যোগানন্দজীর ইহাতে খুব আপত্তি ছিল এবং তিনি জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু যখন আসন্ন, তখন এই শেষ মুহূর্তে আবার স্ত্রীর সেবাগ্রহণ করা কেন? শ্রীমা পত্নীকে নিকটে আনিয়া যোগানন্দজীকে কহিয়াছিলেন, "তুমি একে দু-একটি কথা বল, একটু উপদেশ দাও। বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি যোগীন উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি ওসব পারব না, আপনি সেসব বুঝুন।" অতঃপর দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর মাতৃসেবার পর ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ (১৩০৬ সালের ১৫ই মাঘ) শেষদিন উপস্থিত হইল। সেদিন স্বামী শিবানন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "যোগীন, ঠাকুরকে মনে আছে তো?" তিনি তাহাতে বলিয়াছিলেন, "আরও খুব বেশী মনে আছে, আরও বেশী, আরও বেশী।" অতঃপর অপরাহ্ণ তিনটা দশ মিনিটের সময় রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের একটি সমুজ্জ্বল উদীয়মান নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। স্বামীজী ইহাতে বলিয়াছিলেন, "কড়ি খসলো! এবারে ধীরে ধীরে বর্গা সবও খসে পড়বে।" শ্রীশ্রীমাও ইহাতে মর্মাহত হইয়া বলিয়াছিলেন, "বাড়ির একখানি ইট খসল; এবারে সব যাবে।"

স্বামী প্রেমানন্দ

স্বামী প্রেমানন্দ

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী আঁটপুর গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাস। তাঁহাদের মধ্যে ঘোষ ও মিত্র বংশের বিশেষ প্রতিপত্তি। স্বামী প্রেমানন্দের পিতা শ্রীযুক্ত তারাপদ ঘোষ এবং মাতা শ্রীমতী মাতঙ্গিনী যথাক্রমে ঘোষ ও মিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বিবাহের পর ইঁহারা কৃষ্ণভাবিনী নাম্নী একটি কন্যার মুখদর্শন করেন এবং পরে তুলসীরাম, বাবুরাম ও শান্তিরাম নামক তিনটি পুত্র মাতঙ্গিনীর ক্রোড় অলঙ্কৃত করেন। মধ্যম পুত্র বাবুরামই আমাদের স্বামী প্রেমানন্দ। ইঁহার জন্মকাল ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৬শে অগ্রহায়ণ (১৮৬১ ইং-র ১০ই ডিসেম্বর), মঙ্গলবার, রাত্রি ১১টা ৫৫ মিনিট, চান্দ্র অগ্রহায়ণ, শুক্লা নবমী তিথি। বাবুরামের জন্মগ্রহণের কিঞ্চিৎ পূর্বে কিংবা ঐ বৎসরই তারাপদ ঘোষ মহাশয় স্বীয় দুহিতা কৃষ্ণভাবিনীকে উড়িষ্যার কোঠারের জমিদার শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করেন এবং বাবুরামের জন্মের কয়েক বৎসর পরেই স্বর্গারোহণ করেন।

বাবুরাম ছিলেন বড় বংশের বড় আদরের দুলাল। কিন্তু তিনি যে সাধারণ সংসারী জীব নহেন, ইহা অতি শৈশবকাল হইতেই তাঁহার জীবনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ যদি তাঁহাকে বিবাহের কথা বলিয়া বিরক্ত করিত, তিনি অমনি অর্ধস্ফুট ভাষায় বলিয়া উঠিতেন, "না, বিয়ে দিও না ; মরে যাব, মরে যাব।" কিশোর বয়সে নদীতীরে কোন সন্ন্যাসী দেখিলেই সময় ভুলিয়া তাঁহার সহিত আলাপে মগ্ন হইতেন। আর অষ্টম বর্ষ বয়সে তিনি কল্পনা করিতেন, কোন সন্ন্যাসীর সহিত লোকচক্ষুর অন্তরালে বৃক্ষলতাবৃত একটি ক্ষুদ্র আশ্রমে কালযাপন করিতেছেন।

আঁটপুরের ঘোষপরিবার স্বীয় কুলদেবতা ৺লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর সেবায় বিশেষ রত ছিলেন। দানধ্যানাদি সম্বন্ধেও তাঁহাদের যথেষ্ট সুযশ ছিল। এই ধর্মপরায়ণ পরিবারের পবিত্র আবহাওয়ার মধ্যে বাবুরাম শৈশব ও বাল্যের কিয়দংশ অতিবাহিত করিয়া অতঃপর গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ন-সমাপনান্তে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য কলিকাতায় আগমনপূর্বক চোরবাগানে স্বীয় খুল্লতাত শ্রীযুক্ত গুরুচরণ ঘোষ মহাশয়ের গৃহে বাস করিতে থাকেন। অনন্তর তাঁহাদের বাসস্থান কম্বুলিয়াটোলায় স্থানান্তরিত হয়। বাবুরাম প্রথমে 'এরিয়ান স্কুলে' এবং পরে 'মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনে'র শ্যামপুকুর শাখায় ভর্তি হন।[১] দ্বিতীয় বিদ্যালয়ে 'কথামৃত'-প্রণেতা শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ মাস্টার মহাশয় প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি যুগাবতারের প্রবল আকর্ষণে তাঁহার চরণে জীবন সমর্পণ করিয়াই মাত্র ক্ষান্ত ছিলেন না, সুযোগ-অনুযায়ী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকটও শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ করিতেন এবং ভক্তিমান কাহাকে কাহাকেও দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত করিতেন। বাবুরাম এইরূপেই মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনলাভ করেন। পরবর্তী কালে একদা মাস্টার মহাশয় বেলুড় মঠে আসিলে বাবুরাম মহারাজ তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে অকস্মাৎ তাঁহার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া উপস্থিত সকলকে জানাইলেন, "এই তো এঁরই কৃপায় জীবন ধন্য হয়ে গেল। ইনি যদি ঠাকুরের কাছে না নিয়ে যেতেন, তা হলে কি ঠাকুরের কৃপা পেতুম?" মাস্টার মহাশয় কিন্তু ততোধিক বিনীতভাবে আপত্তি জানাইলেন, "ও সব কি বলা হচ্ছে? শুদ্ধ-সত্ত্ব ঠাকুরের অন্তরঙ্গ—তিনিই টেনে নিয়েছিলেন।"

অবশ্য জোড়াসাঁকোর এক হরিসভায় ইতঃপূর্বেই বাবুরাম একদিন

১। 'স্বামী অভেদানন্দের জীবনকথা' (১০ পৃঃ) অনুসারে বাবুরাম ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে অভেদানন্দের সহিত আহিরীটোলার যদু পণ্ডিতের 'বঙ্গ বিদ্যালয়ে' পড়িতেন।

দৈবক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছিলেন—ঠাকুর সেখানে শ্রীমদ্ভাগবত শুনিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু বাবুরাম তখন জানিতেন না যে, ইনিই দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেব—যদিও তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত তুলসীরামের নিকট পূর্বেই শুনিয়াছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে একজন সাধু আছেন যাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গের মত মুহুর্মুহুঃ ভাবসমাধি হয়। আবার বাবুরামের দক্ষিণেশ্বরে গমনের পূর্বেই তাঁহার ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত বলরাম বসু শ্রীরামকৃষ্ণপদে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; সুতরাং বাবুরামের পরিবারে ঠাকুরের কথা অবিদিত ছিল না। বাবুরামের দক্ষিণেশ্বর-গমনের পর এই সূত্রগুলি ক্রমেই আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহাকে আরও সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ঠাকুরের মানসপুত্র রাখাল যদিও বাবুরামের সহিত একই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন এবং উভয়ের বেশ হৃদ্যতাও ছিল, তথাপি বাবুরামের অজ্ঞাতসারেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত পরিচয়ের পরে বাবুরাম ইহা অবগত হইলেন। তদবধি উভয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে বহুকাল অতিবাহিত করিতেন এবং অনেক সময় একই সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন।

প্রথম মিলনদিবসেই[২] ঠাকুর বাবুরামকে সস্নেহে আপন জনের ন্যায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাবুরামের সুঠাম সুকোমল দেহ, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ও ভক্তোচিত সুবিনীত আচরণ প্রভৃতি সদ্‌গুণ-দর্শনে তাঁহার চিনিতে বাকী রহিল না যে, মা যাঁহাদিগকে ঈশ্বরকোটি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, ইনি তাঁহাদেরই অন্যতম। বাবুরামের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি-নিরীক্ষণের ফলেও তাঁহার এই ধারণাই বদ্ধমূল হইল; কারণ শ্রীমতী শ্রীরাধিকার অংশে যাঁহার জন্ম তিনি এইরূপ সর্বপ্রকার সুলক্ষণসম্পন্নই হইয়া থাকেন। সর্বশেষে যখন জানিলেন যে, তিনি ভক্তপ্রবর বলরামের নিকট আত্মীয় এবং শ্রীমতীরই অংশে জাত কৃষ্ণভাবিনী ঠাকুরানীর ভ্রাতা তখন আর তাঁহার আনন্দের অবধি

২। সম্ভবতঃ ১৮৮২ এর শেষে ('কথামৃত' ৫।৩।২৬ দ্রঃ)।

রহিল না। বাবুরামও দক্ষিণেশ্বরে যেন স্বীয় শৈশবস্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত দেখিতে পাইলেন—এই তো শৈশবের স্বপ্নানুরূপ পূতসলিলা সাগরবাহিনী সুরধুনী, সেই নির্জন পঞ্চবটী এবং তৎসংলগ্ন বহুতপস্যাপূত সাধনভূমি—কি মনোরম, কি নিস্তব্ধ! আর এই তো সেই পরব্রহ্মে লীন লোকাতীতচরিত্র পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ।

প্রথম মিলনের তিন চারিদিন পরেই ঠাকুরের ভক্ত রামদয়াল চক্রবর্তী মহাশয়ের সহিত বাগবাজারে দেখা হইলে তিনি বাবুরামকে জানাইলেন যে, ঠাকুর তাঁহাকে ডাকিয়াছেন। দেবমানবের অপ্রাকৃত প্রেমের সহিত অপরিচিত বাবুরাম সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "আমায় ডেকেছেন? কেন?" এই প্রশ্নের উত্তর তিনি তখনই পান নাই; কিন্তু পরে দক্ষিণেশ্বরে গমনান্তে নরেন্দ্রের জন্য ঠাকুরের আকুলতা দেখিয়া অলৌকিক প্রেম যে কি বস্তু, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইলেন। সেদিন শনিবারে বিদ্যালয়ের ছুটির পর বাবুরাম দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য রাখালের সহিত হাটখোলায় নৌকায় উঠিলেন। ভক্ত রামদয়াল বাবু একই উদ্দেশ্যে সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের দলে যোগ দিলেন। রাস্তায় রাখাল বাবুরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে থাকবে কি?" তখনও দক্ষিণেশ্বর সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা না হওয়ায় বাবুরাম প্রতিপ্রশ্ন করিলেন, "সেখানে থাকবার জায়গা হবে কি?" রাখাল সব জানিয়াও একটু বোধ হয় রহস্য করিয়াই বলিলেন, "হয় তো হয়ে যাবে।" আবার প্রশ্ন হইল, "রাত্রে খাবারের কি হবে?" রাখাল উত্তর দিলেন, "যেমন করে হোক হয়ে যাবে।"

দক্ষিণেশ্বরে তাঁহারা যখন পৌঁছিলেন, তখন দিনমণি পশ্চিম দিঙ্‌মণ্ডল রক্তোজ্জ্বল করিয়া অস্তগামী হইয়াছেন। সন্ধ্যার শেষ আলোকে মন্দিরগুলি অপূর্ব শোভায় শোভিত হইয়াছে। ঐ সাক্ষাৎকারের কথা বাবুরাম স্বমুখে বর্ণনা করিয়াছেন, "ঠাকুরের ঘরে আসিয়া শুনিলাম, তিনি

মন্দিরে ৺জগদম্বাকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাদিগকে ঐ স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য মন্দিরাভিমুখে চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই তাঁহাকে অতি সন্তর্পণে ধারণ করিয়া 'এখানটায় সিঁড়ি উঠিতে হইবে, এখানটায় নামিতে হইবে' ইত্যাদি বলিতে বলিতে লইয়া আসিতেছেন, দেখিতে পাইলাম। ইতঃপূর্বে তাঁহার ভাববিভোর হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইবার কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম। এই জন্য ঠাকুরকে এখন ঐরূপে মাতালের মত টলিতে টলিতে আসিতে দেখিয়া বুঝিলাম, তিনি ভাবাবেশে রহিয়াছেন। ঐরূপে গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি ছোট তক্তাপোশখানির উপর উপবেশন করিলেন এবং অল্পক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া পরিচয়-জিজ্ঞাসান্তে আমার মুখ ও হস্ত-পদাদির লক্ষণ-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। কনুই হইতে অঙ্গুলি পর্যন্ত আমার হাতখানির ওজন পরীক্ষা করিবার জন্য কিছুক্ষণ নিজ-হস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন, 'বেশ।' ঐরূপে কি বুঝিলেন, তিনিই জানেন। উহার পরে রামদয়াল বাবুকে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের শারীরিক কল্যাণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনি ভাল আছেন জানিয়া বলিলেন, সে অনেক দিন এখানে আসে নাই; তাহাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে—একবার আসিতে বলিও।'

"ধর্মবিষয়ক নানা কথায় কয়েক ঘণ্টা বিশেষ আনন্দে কাটিল। ক্রমে দশটা বাজিবার পরে আমরা আহার করিলাম এবং ঠাকুরের ঘরের পূর্বদিকে উঠানের উত্তরে যে বারাণ্ডা আছে, তথায় শয়ন করিলাম। ঠাকুর এবং ব্রহ্মানন্দ স্বামীর জন্য ঘরের ভিতরই শয্যা প্রস্তুত হইল। শয়ন করিবার পরে এক ঘণ্টাকাল অতীত হইতে না হইতে ঠাকুর পরিধেয় বস্ত্রখানি বালকের ন্যায় বগলে ধারণ করিয়া ঘরের বাহিরে আমাদিগের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া রামদয়াল বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

'ওগো ঘুমুলে ?' আমরা উভয়ে শশব্যস্তে শয্যায় উঠিয়া বসিলাম এবং বলিলাম, 'আজ্ঞে না।' উহা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'দেখ, নরেন্দ্রের জন্ম প্রাণের ভিতরটা যেন গামছা-নিংড়াবার মত জোরে মোচড় দিচ্ছে। তাকে একবার দেখা করে যেতে বলো! সে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আধার, সাক্ষাৎ নারায়ণ, তাহাকে মাঝে মাঝে না দেখলে থাকতে পারি না।'...সে রাত্রে ঠাকুরের সেই ভাবের কিছুমাত্র উপশম হইল না। আমাদিগের বিশ্রামের অভাব হইতেছে বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে কিছুক্ষণের জন্ম নিজ শয্যায় যাইয়া শয়ন করিলেও পরক্ষণেই ঐ কথা ভুলিয়া আমাদিগের নিকট পুনরায় আগমনপূর্বক নরেন্দ্রের গুণের কথা এবং তাহাকে না দেখিয়া তাঁহার প্রাণে যে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে তাহা সকরুণভাবে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐরূপ কাতরতা দেখিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, ইঁহার কি অদ্ভুত ভালবাসা এবং যাহার জন্ম ইনি ঐরূপ করিতেছেন সে ব্যক্তি কি কঠোর! সেই রাত্রি ঐরূপে আমাদিগের অতিবাহিত হইয়াছিল" ('লীলাপ্রসঙ্গ—দিব্যভাব' ১০৫-৭ পৃঃ)। মনে রাখিতে হইবে, নরেন্দ্রের সহিত বাবুরামের তখনও পরিচয় হয় নাই।

পরদিন সকালবেলা বাবুরাম শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিলেন, অতি স্বস্থ সহজ মানুষ—রাত্রিবেলার সেই চঞ্চলতা, সেই আকুলতা, সেই গামছা-নিংড়ানো ব্যথা নাই; ভীষণ ঝড়ের পরে সমুদ্রবক্ষ যেমন শান্ত স্থির হয় তেমনি প্রশান্তবদনে ঠাকুর সম্মুখে উপস্থিত। অতঃপর তাঁহার আদেশে বাবুরাম কিয়ৎক্ষন পঞ্চবটীতে কাটাইয়া ঠাকুরকে এবং ৺কালীমন্দিরাদিতে প্রণামান্তে সেদিনকার মত বিদায় লইলেন।

ইহার পর যেদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন, সেদিন রবিবার—কয়েক জন ভক্ত ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিয়া সাদরে কহিলেন, "বেশ হয়েছে, তুমি এসেছ।

পঞ্চবটীর দিকে যাও—সেখানে তারা চড়ুইভাতি করছে। নরেনও এসেছে—গিয়ে তার সঙ্গে কথা বল।" পঞ্চবটীর নিকটে গিয়া তিনি দেখিলেন রাখাল সেখানে বসিয়া আছেন, এতদ্ব্যতীত অপরাপর যুবক ভক্তও রহিয়াছেন। নরেন্দ্রের গুণাবলী তিনি পূর্বেই শ্রবণ করিয়াছিলেন; আজ বাঞ্ছিত জনকে অতি নিকটে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

শ্রীযুক্ত বলরাম বসু আপন শ্বশ্রূমাতাকে ইহার পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। ভক্তিমতী মাতঙ্গিনী ঠাকুরানীর ঈশ্বর-নির্ভরতার পরিচয় শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্বেই পাইয়াছিলেন এবং ইষ্ট-লাভের জন্য তাঁহার অদেয় কিছুই নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই বাবুরামের আগমনের পরে একদিন মাতঙ্গিনী দেবীর নিকট প্রার্থনা করিলেন, "এই ছেলেটিকে তুমি আমায় দাও।" এই অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত যাচ্ঞায় কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত না হইয়া মাতঙ্গিনী উত্তর দিলেন, "বাবা, আপনার নিকট বাবুরাম থাকবে, এ তো অতি সৌভাগ্যের কথা।" বাবুরামের মনও যেন তখন পরমহংসদেবের আরও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের জন্য লালায়িত ছিল; অতএব ঠাকুরের আহ্বান ও গর্ভধারিণীর সম্মতি পাইয়া তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ঐ কালে পরম কারুণিক ঠাকুরের স্নেহ শতধা প্রকাশিত হইত। বাবুরাম সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "ও আমার দরদী।" আবার সুর করিয়া গাহিতেন,

"মনের কথা কইব কি সই ?—কইতে মানা।
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।"

পরবর্তী জীবনে ঠাকুরের ভালবাসার উল্লেখ করিয়া বাবুরাম মহারাজ মঠের সাধুব্রহ্মচারীদিগকে বলিতেন, "আমি কি আর তোদের ভালবাসি ? যদি ভালবাসতাম তা হলে তোরা আমার আজীবন গোলাম হয়ে থাকতিস। আহা, ঠাকুর আমাদের কত ভালবাসতেন! তার শতাংশের এক ভাগও

আমরা তোদের ভালবাসি না। কোন কোন দিন রাত্রে তাঁকে হাওয়া করতে করতে আমি ঘুমিয়ে পড়তুম; তিনি আমাকে তাঁর মশারির ভেতর নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিতেন। আমি আপত্তি করতুম, কারণ তাঁর বিছানা আমার ব্যবহার করা কি ঠিক? তাতে তিনি বলতেন, 'বাইরে তোকে মশায় কামড়াবে; যখন দরকার হবে আমি জাগিয়ে দেব।' "

বাবুরাম কলিকাতা হইতে দীর্ঘকাল না ফিরিলে ঠাকুর অস্থির হইয়া পড়িতেন এবং তাঁহার জন্য ছুটিয়া দারুণ গ্রীষ্মকালেও কলিকাতায় যাইতেন। এইরূপে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের এক চৈত্রের দিনে বলরাম-মন্দিরে আসিয়া বলিয়াছিলেন, "বলে ফেলেছি—তিনটের সময় যাব, তাই আসছি; কিন্তু বড় ধূপ!...ছোট নরেনের জন্য আর বাবুরামের জন্য এলাম।" ('কথামৃত,' ৩য় ভাগ, ১৪৩ পৃঃ)। বাবুরাম সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, "নৈকষ্য কুলীন, হাড় শুদ্ধ।" ভাবমুখে তিনি দেখিয়াছিলেন, বাবুরাম "দেবীমূর্তি, গলায় হার, সখীসঙ্গে," আর বলিয়াছিলেন, "ও স্বপ্নে কি পেয়েছে, ওর দেহ শুদ্ধ। একটু কিছু করলেই ওর হয়ে যাবে। কি জানো, দেহরক্ষার অসুবিধা হচ্ছে। ও এসে থাকলে ভাল হয়।" (ঐ, ৪র্থ ভাগ, ১১২ পৃঃ)। আর একদিন বলিয়াছিলেন, "কাল ভাবাবস্থায় একপাশে থেকে পায়ে ব্যথা হয়েছিল, তাই বাবুরামকে নিয়ে যাই—দরদী" (ঐ, ১৫২ পৃঃ)। ভাবাবস্থায় ঠাকুর সকলের স্পর্শ সহ্য করিতে পারিতেন না। পড়িয়া যাইতেছেন দেখিয়া অকস্মাৎ কেহ ধরিতে গেলে তিনি কষ্ট অনুভব করিতেন; সুতরাং ঐ সময় ধরিয়া থাকিবার জন্য 'দরদী' ও 'নৈকষ্য কুলীন' বাবুরামকে সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে হইত। ঠাকুর যদ্যপি অব্রাহ্মণের হস্তে অন্নগ্রহণ করিতে পারিতেন না, তথাপি বাবুরামের পবিত্রতা-সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র না থাকায় এক সময় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুই আমায় একদিন রেঁধে দিস, তোর হাতে খাব।" অবশ্য কার্যতঃ উহা আর ঘটিয়া উঠে নাই।

কিন্তু স্নেহ ও বিশ্বাসের কোনও ন্যূনতা না থাকিলেও ঠাকুর কাহারও ভাব নষ্ট করার বিরোধী ছিলেন বলিয়া একদিন স্নেহের দুলাল বাবুরামের অনুরোধও উপেক্ষা করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে সমাগত ভক্তদের ভাব-সমাধি হইতে দেখিয়া বাবুরাম একদিন ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলেন, "আমার ভাব-সমাধি করে দিতে হবে।" ঠাকুর যতই বলেন, "আমার ইচ্ছায় কি হয় রে! মার ইচ্ছা না হলে হয় না," ততই তিনি আবদার করেন, "আপনাকে করে দিতেই হবে।" অগত্যা ঠাকুর জগদম্বার শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন; কিন্তু উত্তর পাইলেন, "বাবুরামের ভাব হবে না, জ্ঞান হবে।"

বাবুরাম প্রভৃতিকে ঠাকুর শুধু সাধারণ ভক্ত হিসাবে দেখিতেন না, তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার ত্যাগী বার্তাবহ ও উত্তরাধিকারিরূপেই গড়িয়া তুলিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি অতিরিক্ত সাবধান ছিলেন। একবার হাজরা মহাশয় বাবুরাম প্রভৃতি অল্পবয়স্ক কয়েকটি যুবককে নানা উপদেশপ্রসঙ্গে বুঝাইতেছিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধ মহাপুরুষ—তাঁহার নিকট সিদ্ধাই প্রভৃতি নানা শক্তি প্রার্থনা করা চলে। তা না করে শুধু ভাল খাবার-দাবার খেয়ে তাঁর সঙ্গে সুখে বাস করে ফল কি?" ঠাকুর পার্শ্বেই ছিলেন—হাজরার কাণ্ড দেখিয়া বাবুরামকে নিকটে আহ্বানপূর্বক বলিলেন, "আচ্ছা, তোরা কি চাইবি? আমার যা কিছু তা সবই তো তোদেরই জন্য রয়েছে। আমার যা কিছু অনুভূতি প্রভৃতি হয়েছে, সবই তো তোদের জন্য। ভিখারীর মত ক্যাঙলামি করিস নে—ওতে মানুষকে মানুষ থেকে পৃথক করে দেয়। বরং আমার সঙ্গে তোদের সম্বন্ধ ভাল করে বুঝে নে এবং সমস্ত ধনের অধিকারী হবার চেষ্টা কর।"

বস্তুতঃ বাবুরামকে ঠাকুর স্বীয় অলৌকিক দৃষ্টিসহায়ে এক অনন্যসাধারণ জীবন এবং অচিন্তনীয় ভবিষ্যতের জন্য গড়িয়া তুলিতেছিলেন। বাবুরাম মহারাজ স্বয়ং বলিয়াছেন, "তিনি গৃহীদের এক রকম, ত্যাগীদের অন্য

রকম উপদেশ দিতেন। ঘরে যখন কোন গৃহী ভক্ত না থাকত, তখন দরজা বন্ধ করে আমাদের ত্যাগ-বৈরাগ্যের উপদেশ দিতেন—আবার মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে দেখে আসতেন, কোন বিষয়ী লোক এসেছে কি না। কামিনী-কাঞ্চনে যাতে ঘোর বিতৃষ্ণা এসে যায়, সেই জন্য সে-সব কথা উপমা দিয়ে বলতেন—যাতে আমাদের প্রাণে বিঁধে যায়।" আর ইহা যে শুধু উপদেশরূপেই হৃদয়ে মুদ্রিত হইত তাহা নহে, জগদম্বার নির্দেশে পরিচালিত ঠাকুরের প্রতিটি আচরণ তদনুরূপ আদর্শ স্থাপনপূর্বক বিশ্বাস জন্মাইয়া দিত যে, এই উপদেশের পশ্চাতে রহিয়াছে অপ্রকাশ্য অনুভূতি ও অনুপম জীবন। এক রাত্রে বাবুরাম ঠাকুরের ঘরে মেজেতে মাদুরের উপর ঘুমাইতেছেন—নিশীথে ঠাকুরের পদশব্দে জাগিয়া দেখেন, তিনি অর্ধবাহ্যদশায় বগলে পরিধানবস্ত্র রাখিয়া গৃহময় ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে 'থু থু'-শব্দে চারিদিকে মুখামৃত ছড়াইতেছেন আর বলিতেছেন, "দিস নি, মা, দিস নি।" মা যেন ধামা পুরিয়া নাম-যশ লইয়া তাঁহাকে দিতে আসিয়াছেন, আর তিনি উত্ত্যক্ত শিশুর ন্যায় মিনতিমিশ্রিত ত্রাসভরে বলিতেছেন, "দিস নি, মা, দিস নি!" অপর একদিন তিনি বাবুরামকে কামিনীর মায়া হইতে মুক্ত থাকারও উপদেশ দিলেন। ঠাকুর সেদিন বলরাম-মন্দিরে ছিলেন। শৌচান্তে বাবুরাম তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। ঐ বাটীর একটি গৃহে তখন বালিকাবিদ্যালয় ছিল। বাবুরাম যখন ঐ কার্যে ব্যাপৃত আছেন, তখন একটি বালিকা স্বীয় অঞ্চল ধরিয়া উহাতে আবদ্ধ একটি চাবির গুচ্ছকে সশব্দে বন্ বন্ করিয়া ঘুরাইতেছিল। ঠাকুর বাবুরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "দ্যাখ, মেয়েরা পুরুষদের ঐ রকম করে বেঁধে বন্ বন্ করে ঘোরায়। তুইও কি তাদের হাতে ঐ রকম করে ঘুরতে চাস?"

এই বিষয়ে দ্বিতীয় ঘটনাটিও সমভাবে শিক্ষাপ্রদ। তখনও বাবুরাম

মাস্টার মহাশয়ের বিদ্যালয়ের ছাত্র। মাস্টার মহাশয় শ্যামপুকুরে থাকিতেন। সেবারে কলিকাতায় বিসূচিকার প্রকোপ হইলে তাঁহার বাটীতে ঐ রোগ প্রবেশ করিল। বাবুরাম প্রভৃতি ছাত্রেরা তখন বাটীর মধ্যে রোগীদের দেখিতে যাইতেন। ঠাকুর এই সংবাদ পাইয়া একদিন মাস্টার মহাশয়কে সাবধান করিয়া দিলেন, "হাঁ গা, বাড়িতে তোমার যুবতী পরিবার রয়েছে—তুমি ছেলেদের অমন বাড়ির ভেতর ঢুকতে দাও কেন?" মাস্টার মহাশয় জানাইলেন যে, উহারা তাঁহার ছাত্র, সুতরাং দোষ নাই। ঠাকুর তদুত্তরে নীরব না থাকিয়া ঐ সাবধানবাণীই পুনর্বার উচ্চারণ করিলেন। মাস্টার মহাশয় হয় তো তখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, ঠাকুর সেদিন সাধারণ ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধ-অবলম্বনে কথা কহিতেছিলেন না—তিনি তাঁহার চিহ্নিত ত্যাগী সন্তানের কঠোর সাধনার প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। বাবুরামের বয়স তখন আনুমানিক ২৩ বৎসর হইবে।

এই সকল বিষয়িসুলভ দুর্বলতা হইতে বাবুরামকে পক্ষিমাতার ন্যায় স্বীয় পক্ষপুটে সর্বদা রক্ষা করিলেও ঠাকুর স্বীয় সন্তানের অন্তর্নিহিত প্রেমকে সঙ্কুচিত না করিয়া বরং সুনির্ধারিত প্রণালীতে বিবিধরূপে বিকাশের পথেই লইয়া যাইতেছিলেন। তাই ভোগ্যবস্তু হইতে তাঁহাকে সতর্কভাবে দূরে আকর্ষণ করিলেও ভক্তসেবায় সর্বদা উৎসাহিত করিতেন। বাবুরাম মহারাজ পরে একদা বলিয়াছিলেন, "দক্ষিণেশ্বরে দেখেছি, ঠাকুরের কাছে কোন ভক্ত উপস্থিত হলে তিনি তাকে কত ভাবে আপ্যায়িত করতেন। বলতেন, 'পান খাবেন?' পান না খেলে জিজ্ঞাসা করতেন, 'তামাক খাবেন?' আমাদেরও তাই অভ্যাস হয়ে গেছে।" এই ভক্তসেবার ভাব বাবুরাম মহারাজ উত্তরাধিকার-সূত্রে পূর্ণমাত্রায়ই পাইয়াছিলেন। ইহার নিদর্শন আমরা যথাস্থানে পাইব।

বাবুরাম মেধাবী ছাত্র ছিলেন না; বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য-লাভের পর ধর্মভাব বিশেষ উদ্দীপিত হওয়ায় বিদ্যালয় হইতে মন অনেকটা উঠিয়া গিয়াছিল। অতএব তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় (১৮৮৫ খ্রীঃ) উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবার কয়েকদিন পরে বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল সহ বাবুরাম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলে কথাপ্রসঙ্গে সান্ন্যাল বলিলেন, "ও পরীক্ষায় পাশ হয় নি।" শুনিয়া ঠাকুর সহাস্যে বলিলেন, "ভালই তো—ও পাশমুক্ত হল। যার যটা পাশ, তার তটা পাশ (অর্থাৎ বন্ধন)।" বাবুরাম হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন; কারণ ঠাকুর যদিও জানিতেন যে, বাবুরাম সংসারে জড়িত হইবেন না এবং সেই আশায় তাঁহাকে বৈরাগ্যেরই উপদেশ দিতেন, তথাপি আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি সে সময়ে ঐ আদর্শ বাবুরামের জীবনে তেমন পরিস্ফুট হয় নাই বলিয়াই হউক অথবা পরে মহত্তর উদ্দেশ্য সাধিত হইবে বলিয়াই হউক, ঠাকুর তখন বাবুরামের ভাব নষ্ট না করিয়া এবং অধ্যয়নে নিরুৎসাহিত না করিয়া বরং উৎসাহই দিতেন। ঐ কালে মাস্টার মহাশয়ের সহিত এক-দিনের কথোপকথন হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। শ্রীম-কে সেদিন তিনি কহিলেন, "আচ্ছা, বাবুরামের কি পড়বার ইচ্ছা আছে? বাবুরামকে বললাম, তুই লোকশিক্ষার জন্য পড়" ('কথামৃত', ৪র্থ ভাগ, ১২৯ পৃঃ)। অশেষ ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ ঠাকুরের পূর্ণ পরিচয় বাবুরাম তখনও পান নাই; তাই তাঁহার ভয় ছিল যে, পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ায় ঠাকুর বিরক্তই হইবেন। কিন্তু অন্যকার আচরণে তাঁহার ফাঁড়া কাটিয়া গেল। বস্তুতঃ অনুধাবন করিলে বাবুরাম বুঝিতে পারিতেন যে, পূর্বেও ঠাকুর তাঁহার মনে বৈরাগ্য-সঞ্চারের জন্য একবার এই বিষয়েরই অবতারণা করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোর বই কৈ? পড়াশুনা করবি না? (মাস্টারের প্রতি) ও দুদিক চায়। বড় কঠিন পথ—একটু তাঁকে জানলে কি হবে? অজ্ঞান-কাঁটা

তুলবার জন্য জ্ঞান-কাঁটা যোগাড় করতে হয়। তারপর জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যেতে হয়।"

"বাবুরাম (সহাস্যে)—আমি ঐটি চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ওরে দুদিক রাখলে কি তা হয়? তা যদি চাস তবে চলে আয়।

বাবুরাম (সহাস্যে)—আপনি নিয়ে আসুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুই দুর্বল। তোর সাহস কম।...(মাস্টারকে) আমি কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী খুঁজছি। মনে করি, এ বুঝি থাকবে। সকলেই এক একটা ওজর করে" ('কথামৃত,' ৩য় ভাগ, ১৩০ পৃঃ)।

দরদী বাবুরামের উপর ঠাকুর কতখানি নির্ভর করিতেন তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ঠাকুর একদিন 'চৈতন্য-লীলা'-অভিনয় দেখিতে যাইবেন—বাবুরামকে সঙ্গে লইলেন এবং বলিলেন, "দ্যাখ, সেখানে সমাধিস্থ হয়ে পড়লে সবাই আমার দিকে চেয়ে থাকবে, আর গোলমাল করে উঠবে! আমার ঐরূপ হবার উপক্রম দেখলে অন্য বিষয়ে খুব কথা বলবি।" এইরূপ ঠিক করিয়া তো অভিনয়দর্শনে গেলেন; কিন্তু যে মনের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল সমাধির দিকে এবং যাহাকে কৃত্রিম উপায়ে বলপূর্বক সাধারণ ভূমিতে নামাইয়া রাখিতে হইত, সে মন উদ্দীপকের সান্নিধ্যলাভ করিয়াও কিরূপে নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে? ফলে ঠাকুর অচিরেই সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন বাবুরাম নাম শুনাইতে শুনাইতে ঐ মনের গতি ব্যাবহারিক জগতের দিকে ফিরাইয়া আনিলেন। এইরূপ আরও কতবার ঘটিয়াছে; কিন্তু এই প্রকার বিশ্বস্ত সেবকরূপে ও পার্ষদরূপে দক্ষিণেশ্বরে বাস ও ঠাকুরের সহিত সর্বত্র গমনাগমন ও তাঁহার স্নেহস্পর্শলাভ করিতে থাকিলেও বাবুরাম কখনও গর্বে স্ফীত হইতেন না, বরং পরে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের কাছে তাঁর সেবার জন্য

কোন অপবিত্র লোক থাকতে পারত না। ঠাকুরের কৃপা না থাকলে আমিও তাঁর কাছে থাকতে পারতুম না। এখন ভাবি, কি করেই যে ছিলুম—একটু কিছু ভাবের উদ্রেক হলেই অমনি সমাধিস্থ!" বস্তুতঃ এরকম সৌভাগ্যের কারণরূপে তিনি ঠাকুরের কৃপার কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, নিজের আবাল্য পবিত্রতার উল্লেখমাত্র করিতেন না।

ক্রমে দক্ষিণেশ্বরের দিনগুলি নিঃশেষিত হইলে বাবুরাম ও অন্যান্য ত্যাগী যুবকদের কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় যোগদান, ঠাকুরের দেহ-ত্যাগান্তে বরাহনগর মঠ স্থাপিত হইলে তথায় তাঁহাদের আগমন এবং তদনন্তর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আঁটপুর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর সন্ন্যাসগ্রহণের কথা অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে। সন্ন্যাসকালে ঠাকুরের বাণী স্মরণ করিয়া বাবুরামের নাম রাখা হইল স্বামী প্রেমানন্দ। বরাহনগর ও পরে আলমবাজার মঠে স্বামী প্রেমানন্দ অপর গুরুভ্রাতাদের সহিত কঠোর তপস্যা ও শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণ-মননে রত হইলেন। আলমবাজারে তিনি কিরূপ শ্রীরামকৃষ্ণময় হইয়া থাকিতেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস তাঁহাকে লিখিত স্বামী তুরীয়ানন্দের একখানি পত্রে (২০।১১।১৫ ইং) পাওয়া যায়—"তোমাতে প্রভু ভিন্ন অন্য কিছুর তো আর স্থান নাই। মনে পড়ে মঠের একদিনের কথা। সে সময় মঠ আলমবাজারে ছিল। তুমি কথাচ্ছলে সেদিন দৃষ্ট সকল পদার্থ হইতেই প্রভুর স্মৃতি জাগরিত করিতে লাগিলে। সেদিন দেখিয়াছিলাম, 'যথা যথা দৃষ্টি যায়, তথা কৃষ্ণ স্ফুরে' বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল; এমন বস্তুটি দেখিলে না যাহা হইতে প্রভুর স্মরণ না করিলে! তোমার মনে আছে কি না জানি না; আমার কিন্তু উহা চিরদিনের জন্য হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে। সেদিন আমি বুঝিয়াছিলাম যে, ইহারই নাম তাঁহাতে মগ্ন ('ডাইলিউট্') হইয়া যাওয়া।" বরাহ-নগরের আর একটি দিব্য ভাবধারার পরিচয় স্বামী প্রেমানন্দের পত্রে

পাই। তিনি লিখিয়াছেন—"আমরা বরাহনগরের মঠে এক সময়ে পরস্পর কেবল গুণ দেখতুম—কেহ কাহারো দোষ দেখতে পেতুম না!" অশেষ-কল্যাণগুণাকর শ্রীভগবানে যাঁহাদের মন সতত নিমগ্ন, তাঁহাদের এই প্রকার আচরণই স্বাভাবিক—ভগবদ্‌গুণাস্বাদননিরত তাঁহারা দোষদর্শন করিবেন কখন?

স্বামী প্রেমানন্দ, সারদানন্দ ও অভেদানন্দ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরের জন্মোৎসবের পরে পদব্রজে ৺পুরীধামে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা এমার মঠে অবস্থানপূর্বক ৺জগন্নাথদেবের প্রসাদদ্বারা শরীরধারণ করিতেন। ঐ সময়েই প্রেমানন্দ টাইফয়েড-রোগে শয্যাগত হন; তবে গুরুভ্রাতাদের বিশেষ যত্নে অচিরে আরোগ্যলাভ করেন এবং ভুবনেশ্বর হইয়া ছয় মাস পরে মঠে ফিরিয়া আসেন। ৺জগন্নাথক্ষেত্র ভিন্ন অন্যান্য তীর্থেও তিনি ঐ সময়ের অব্যবহিত পরেই গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার সঠিক বা বিস্তৃত বিবরণ আমরা অবগত নহি। যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে দেখা যায় যে, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের একসময়ে তিনি ৺কাশীতে ছিলেন। স্বামীজী তখন গাজীপুরে। কাশীতে অবস্থানকালে তিনি স্বনামধন্য জীবন্মুক্ত পুরুষ ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দর্শন করেন এবং ভাস্করানন্দ স্বামীরও সাক্ষাৎলাভ করেন। পুনর্বার ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-ভারতের তীর্থাদি-দর্শনান্তে তিনি ক্রমে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া কিছুদিন 'কালাবাবুর কুঞ্জে' যাপন করেন। এখানে তিনি সারাদিন আপনভাবে তন্ময় থাকিতেন এবং অপরাহ্ণে দেব-দর্শনে যাইতেন। কিয়দ্দিবস পরে ব্রঃ কালীকৃষ্ণ (স্বামী বিরজানন্দ) তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপর ঝুলনের সময় ভক্তমাল নামক জনৈক বৈষ্ণব সাধুর সহিত উভয়ে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় নির্গত হইলেন। পথ কণ্টকাকীর্ণ, তাই ভক্তমাল পাদুকা কিনিতে বলিলেন; কিন্তু বাবুরাম ব্রজভূমিতে পাদুকা-ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন বলিয়া রিক্তপদেই চলিলেন।

এই ভ্রমণকালে সাধারণতঃ ভক্তমালই তাঁহাদের জন্য মাধুকরী করিতেন। রাধারানীর জন্মস্থান বর্ষানায় তাঁহারা কিছুদিন ছিলেন। সেখানে ব্রজ-রমণীদিগকে প্রেমানন্দজী গোপীজ্ঞানে ভূমিষ্ঠপ্রণাম করিতেন। বর্ষানায় দেড় মাস ও অন্যান্য স্থানে কিয়দ্দিবস যাপনান্তে পুনঃ বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তনের কিয়ৎকাল পরে কালীকৃষ্ণ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। প্রেমানন্দ তখন তাঁহাকে সযত্নে এটোয়ায় স্বীয় গুরুভ্রাতা হরিপ্রসন্ন বাবুর (স্বামী বিজ্ঞানানন্দের) নিকট চিকিৎসাদির জন্য পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজেও কিছুদিন এটোয়ায় কাটাইয়া আসিলেন।

ইতোমধ্যে সংবাদ আসিল যে, আচার্য বিবেকানন্দ ভারতে ফিরিতেছেন। তপস্যার ধারা বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রেমানন্দ ও কালীকৃষ্ণের মন যদিও অকস্মাৎ বৃন্দাবনত্যাগে সম্মত ছিল না, তথাপি স্বদেশপ্রত্যাগামী স্বামীজীর প্রবলতর আকর্ষণে তাঁহারা ১৮৯৬এর শেষে কলিকাতায় চলিলেন। বর্ধমানে পৌঁছিয়া মাতৃভক্ত প্রেমানন্দের মনে মাতৃদর্শনের আকুলতা জাগিল; কাজেই উভয়ে জয়রামবাটী চলিলেন। সেখানে তাঁহারা প্রায় এক পক্ষকাল ছিলেন। একদিন ভ্রমণকালে ঐ গ্রামে পুষ্করিণীতে সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কমলরাজি দর্শনে প্রেমানন্দের মনে উহা মাতৃচরণে অর্পণের অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগিল এবং তিনি স্বয়ং উহা তুলিতে জলে নামিলেন, কারণ সঙ্গী ব্রহ্মচারী সাঁতার জানিতেন না। মনের সাধে পদ্ম তুলিয়া যখন তিনি তীরে উঠিলেন, তখন উভয়ে সচকিতে দেখিলেন যে, বিষ-ত্রিশটা জোঁক তাঁহার সর্বাঙ্গে ঝুলিতেছে। অনেক চেষ্টায় ঐগুলিকে তুলিয়া ফেলা হইল বটে, কিন্তু সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইয়া গেল। শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া খুবই বিচলিত হইলেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে ইহার পুনরাবৃত্তি না হয় তদ্বিষয়ে সাবধান করিয়া দিলেন। জয়রামবাটী হইতে তাঁহারা ৺তারকেশ্বর-দর্শনান্তে আঁটপুরে

পৌঁছিলেন এবং সেখানে দুই-তিন দিন অবস্থানান্তে আলমবাজারে আসিয়া দেখিলেন যে, চার-পাঁচ দিন পূর্বেই স্বামীজী তথায় উপস্থিত হইয়াছেন।

ঐ সময়ে একটি ঘটনায় গুরুভ্রাতাদের প্রেমের সম্বন্ধ কত নিবিড় ছিল তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ তখন নিয়ম করিয়াছিলেন, প্রত্যূষে যথাসময়ে যিনি শয্যাত্যাগ না করিবেন তাঁহাকে সেইদিনই ভিক্ষান্নে উদরপূর্তি করিতে হইবে। একদিন বাবুরামের উঠিতে দেরি হইল। স্বামীজী আদেশ করিলেন, "যা. তার কানের কাছে ঘণ্টা বাজিয়ে আয়।" এইরূপ চেষ্টায় বাবুরাম উঠিলেন এবং অবস্থা বুঝিয়া কৃত অপরাধের শাস্তিগ্রহণের জন্য স্বামীজীর নিকট আগমনপূর্বক বলিলেন, "আজ উঠতে পারি নি। আমার জন্যে সকলের অসুবিধা হয়েছে বুঝতে পারছি। তা ভাই, তুমি তো নিয়ম করেছ, যে উঠতে পারবে না, তার শাস্তি হবে—আমায় শাস্তি দাও।" শ্রবণমাত্র স্বামীজী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তোকে আমি শাস্তি দেব একথা তুই ভাবতে পারলি বাবুরাম?" সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল, তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না। বাবুরামেরও অবস্থা তখন অনুরূপ। উভয়ের বিহ্বলতা দেখিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ মধ্যস্থরূপে জানাইলেন, "শাস্তির প্রশ্ন হচ্ছে না; তবে নিয়ম আছে বটে যে, ভিক্ষা করতে হবে।" তখন বাবুরাম মাধুকরীর উদ্দেশ্যে সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সঙ্ঘের প্রতি আনুগত্যের মধ্যে যেখানে সংঘর্ষ, সেখানে প্রেমই সমস্যার সমাধানে সক্ষম হয়—এই ঘটনায় এই সত্যই প্রমাণিত হইল।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজ গমন করিলে মঠের ঠাকুরপূজার দায়িত্ব স্বামী প্রেমানন্দ সানন্দে গ্রহণ করেন। অতঃপর কিয়দ্দিবস পরে তিনি তীর্থদর্শনে বহির্গত হন এবং বেলুড় মঠ স্থাপনের কিঞ্চিৎ পূর্বে পুনরায় প্রত্যাবর্তনপূর্বক গুরুভ্রাতাদের সহিত মিলিত হন। অনন্তর স্বামীজীর

ইহধাম-পরিত্যাগান্তে সঙ্ঘ পরিচালনার ভার ব্রহ্মানন্দ মহারাজের উপর পতিত হইল। প্রেমানন্দজী তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া মঠের ঠাকুরপূজা হইতে গো-সেবা পর্যন্ত সমস্ত কার্য যথাসম্ভব সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ের বাৎসল্য-প্রেমের গভীরতম উৎস এই সময় যেন শতধা বর্ধিত ও উৎসারিত হইয়া আপামর সাধারণে বিস্তৃত হইয়াছিল। সঙ্ঘের নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে তখন প্রায়ই বহুস্থানে যাইতে হইত। সেই জন্য মঠে নবাগত সাধু-ব্রহ্মচারীদের শিক্ষার ভার প্রধানতঃ বাবুরাম মহারাজের উপর ন্যস্ত ছিল। বাহির হইতেও তখন বিস্তর ভক্তসমাগম হইত। তাঁহাদের সকলকে তিনি ভালবাসায় এবং মিষ্ট কথায় আপনার করিয়া লইতেন।

স্বামী প্রেমানন্দকে কেন্দ্র করিয়াই তখন রামকৃষ্ণসঙ্ঘের প্রধান কেন্দ্র বেলুড়ের মঠজীবন পরিচালিত হইত এবং উহার প্রভাব বেলুড় হইতে উৎসারিত হইয়া এখনও পরম্পরাক্রমে সঙ্ঘের স্তরে স্তরে শতধারে প্রবাহিত রহিয়াছে—এইরূপ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। ইহা সত্য বটে যে, অধ্যাত্মক্ষেত্রে স্বামী ব্রহ্মানন্দাদি শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদবৃন্দের আদর্শও নবাগতদের জীবনে অনুপ্রেরণা জাগাইত এবং তাঁহাদের আচার এবং ভাবভঙ্গী নবপথে পদক্ষেপের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিত। কিন্তু মঠবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতি চরণবিন্যাসের সহিত বিজড়িত থাকিত স্বামী প্রেমানন্দের নির্দেশ ও প্রেমময় আকর্ষণ। কখনও ভালবাসায় বিচলিত হইয়া নবাগতরা কর্তব্যপালনে অগ্রসর হইত, কখনও তাঁহার তিরস্কার তাহাদিগকে স্বেচ্ছায় বৃত নবজীবনের দায়িত্ব-সম্বন্ধে সচেতন করিত, আবার কখনও বা তাঁহার আধ্যাত্মিক আলোকসম্পাতে তাহারা অকস্মাৎ জগদতীত সত্তার আভাস পাইয়া আনন্দে বিহ্বল হইত। তাঁহার দয়ায় কত অসাধু সাধু, কত পাপী ধার্মিক হইয়াছে, কত মায়ামুগ্ধ মানব ধর্মরাজ্যে প্রবেশাধিকার

লাভ করিয়াছে, তাহার হিসাব কে রাখে! আমরা সাধারণ ও সুবিদিত দৈনন্দিন স্তর হইতেই সামান্য দিগ্‌দর্শন করিতে পারি মাত্র।

বর্ষাকাল, শ্রাবণ কি ভাদ্র মাস হইবে। বেলুড় মঠের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে চোরকাঁটা ও আগাছা হইয়াছে। প্রেমানন্দ নবাগত কয়েকজন ব্রহ্মচারীকে এ সকলের উৎপাটনে নিযুক্ত করিয়া কার্যান্তরে চলিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, প্রাঙ্গণ প্রায় পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে—দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল। কিন্তু নিকটে আসিয়া বুঝিলেন, আগাছা উন্মূলিত হয় নাই, ছুরি দিয়া কাটিয়া প্রাঙ্গণকে সহজে পরিষ্কার করা হইয়াছে মাত্র। সহাস্য বদন অমনি গম্ভীর হইয়া গেল। এ কি? এই সব যে আবার দুই দিন পরেই বর্ধিত হইবে! বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছুরি দিয়ে কাটলে যে?" "শিকড় উঠান বড়ই হাঙ্গামা, তাই ছুরি দিয়ে কাটছি।" স্বামী প্রেমানন্দ অমনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "হাঙ্গামা! আমি ভেবেছিলাম ঠাকুরের কাজ আনন্দে করছ। হাঙ্গামা যদি মনে কর, সে কাজ আমি করতে বলি নি। আমাকে না জিজ্ঞাসা করে ছুরি দিয়ে কাটা বড় অন্যায়; কারণ তাতে আগাছার শিকড়গুলো আর সহজে উঠান যাবে না।" একটু দূরে একজন ব্রহ্মচারী ধীর-স্থিরভাবে শিকড়সমেত আগাছা উঠাইতেছে দেখিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ, তোমাদেরই মধ্যে একজন নিখুঁতভাবে কাজটি করছে—তোমাদের মত বুদ্ধি করে ছুরি দিয়ে সে কাটছে না।" একটু নীরব থাকিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "দেখ, বাবা, একটা কথা বলছি। ভবিষ্যতে তোমরা অনেক বড় বড় কাজ করবে! কিন্তু ফাঁকি দেবার বদ অভ্যাসটুকু যদি একবার জীবনের স্তরে স্তরে ঢুকে পড়ে, তা হলে রক্ষা নেই। সামান্য উঠানের ঘাস পরিষ্কার করার কথা আমি বলছি না, দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটিতে এই ফাঁকি দেবার অভ্যাসটুকু দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন করলে জীবন বিষময় হয়ে ওঠে। সুতরাং এটা করো না—এই আমার অনুরোধ।"

প্রেমানন্দ জানিতেন যে, মনোরাজ্যের চিকিৎসা শুধু বক্তৃতার দ্বারা হয় না ; শুধু উপদেশে কাজ হয় না—'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।' সুতরাং শেষদিন পর্যন্ত তিনি সর্বদাই কর্মব্যস্ত থাকিতেন, আর বলিতেন, "কাজ কথা বলুক, মুখ বন্ধ হোক।" ব্রহ্মচারীদের সহিত কাজ করিতে করিতে বলিতেন, "আমি নিজেও তো তোদের সঙ্গে গোবর দিয়ে নাড়ু পাকাচ্ছি। ভক্তদের শুধু পায়ের ধুলো দিয়ে কি নিজের পরকালটা খাব? তাই গোবরও কুড়ুই নাড়ুও দিই; গরুর সেবাও করি, আবার ঠাকুরপূজোও করি।" এই কয়টি কথার মধ্যেই বাবুরাম মহারাজের সর্বজীবনের একখানি সুন্দর ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বামীজীর নির্দেশ ছিল, 'জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত' সমস্ত কর্ম করতে হবে; বাবুরাম মহারাজও বলিতেন, "এদের সকল বিষয় শিক্ষা করতে হবে—রাঁধতে, কুটনো কুটতে, ঠাকুরঘরের কাজ, পূজা, হিসাব রাখা, বক্তৃতা দেওয়া—ইত্যাদি। সকল কাজে পারদর্শী হওয়া দরকার। এদের ঐ রকম এখানে করিয়ে নিচ্ছি ও কত ভালমন্দ গাল দিচ্ছি—ওদেরই ভালর জন্য। মনে আমার এতটুকুও কারুর প্রতি রাগ নেই। এদের কত ভালবাসি।" আর ব্রহ্মচারীদের প্রতি তাকাইয়া বলিয়া যাইতেন, "তোদের বকি-ঝকি বলে কিছু মনে করিস নি।" মনে তাহারা কিছু করিতেন না ; কারণ অল্পদিন সঙ্গলাভের ফলেই তাঁহারা প্রেমানন্দের ক্ষণিক কঠোরতার পশ্চাতে একখানি চিরস্নেহপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় পাইতেন, আর জানিতেন উহাই তাঁহার স্বরূপ।

সাধু-ব্রহ্মচারীদিগকে তিনি কাজ শিখাইতেন, প্রয়োজন মত ভৎর্সনা করিতেন ; আবার সকলকে লইয়া অবিরাম শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গাদি করিতেন এবং সকলের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। শাস্ত্রচর্চা না করিলে তিনি বিশেষ বিরক্ত হইতেন। একবার মেদিনীপুর হইতে ফিরিয়া তিনি জনৈক ব্রহ্মচারীকে বাগানের কার্যে অতিমাত্রায় লিপ্ত দেখিয়া বলিলেন,

"পড়াশুনা কিছু হচ্ছে, না কেবল কুলিগিরি ?" ব্রহ্মচারী বলিলেন, "হ্যাঁ, —দা পড়েন, আমরা শুনি।" "মূল শাস্ত্র-টাস্ত্র কিছু পড় ?" "সংস্কৃত ভাল জানি না।" স্বামী ধীরানন্দ সেখানে ছিলেন, তিনি ব্রহ্মচারীর পক্ষ লইয়া আমোদ করিয়া বলিলেন, "পড়ার ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এল ; আবার এখানেও পড়াশুনো ?" সে রসিকতায় কর্ণপাত না করিয়া প্রেমানন্দ নূতন একখানি ইংরাজী বইএর নাম করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "ওখানি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তিন মাসের মধ্যে শেষ করা চাই—নইলে আফিস থেকে চারটি পয়সা নিয়ে গঙ্গা পার হয়ে যাবে (অর্থাৎ কলিকাতা-গমনের পয়সা লইয়া মঠ ত্যাগ করিবে)।" আর ঐ সঙ্গে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, এটা বাবাজীদের আখড়া নয়—স্বামীজী সেজন্য বেলুড় মঠ নির্মাণ করেন নাই। বিবেকানন্দ চাহিতেন, আধ্যাত্মিক শক্তির সর্বতোমুখী অভিব্যক্তি—ধ্যানে, জ্ঞানে, সেবায়, ভক্তিতে। বেলুড় মঠে নবাগত জনৈক ব্রহ্মচারী এই নবীন বার্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া গতানুগতিক প্রাচীন সংস্কারের বশে যখন প্রশ্ন করিলেন, "কিরূপ ধ্যান করব ?" তখন প্রেমানন্দ সহজভাবে উত্তর না দিয়া মূল তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বলিয়া উঠিলেন, "ও সব এখন ছেড়ে স্বামীজীকেই ধ্যান কর—তা হলে তাঁর সত্তা পেলে, ঠিক ঠিক তাঁর সেবার ভাব তোর ভেতর জন্মাবে ; তাঁর কৃপাতেই ঠাকুরকে তখন বুঝতে পারবি।"

অনেক সময় আবার ব্রহ্মচারীদিগকে লইয়া স্বামী প্রেমানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের মধ্যে যে হাসি-ঠাট্টা চলিত উহার মধ্য দিয়া সদ্যঃসমাগতবৃন্দ নবীন পথের জটিলতার সহিত সুপরিচিত হইতেন। একদিন সকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রকোষ্ঠে খুব সৎপ্রসঙ্গাদি চলিতেছে—বেলা হইয়াছে, তবু সাধু-ব্রহ্মচারীরা দৈনন্দিন কার্যে যোগ দিতেছেন না। নিম্নে প্রেমানন্দের আহ্বান উত্থিত হইল, "ওরে ভক্তেরা, কে কোথায় আছিস—নেমে আয়। ঠাকুরের

রান্নার যোগাড় তো এখনও হল না।" মহারাজ তখনই সকলকে নীচে যাইতে আদেশ করিয়া কৌতুকভরে বলিলেন, "গিয়ে ওকে বলবি, মশাই, মুক্তিটে দিয়ে দিন না; তা হলে তো আর ধ্যান-ভজনের ঝঞ্ঝাট থাকে না—আপনি তো ইচ্ছে করলেই দিতে পারেন।" শুনিয়া বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "আচ্ছা, তোমরা সমাধি অভ্যাস কর, আমার কোন আপত্তি নেই—আমি নিজেই সব করে নেব। কিন্তু সমাধির নামে যদি মনের মধ্যে হাট-বাজার বসাও, তা হলে কিন্তু কান্ ধরে টেনে এনে কাজে লাগাব।"

প্রকৃতপক্ষে প্রেমানন্দের সঙ্গে কাজ করাকে ঠিক কাজ করা বলা চলে না—উহা ছিল সাধনারই রূপান্তর, যাহাকে গীতায় বলিয়াছে, "স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।" তরকারি কুটিতে বসিয়া তিনি অবিরাম ধর্মপ্রসঙ্গ করিতে থাকিতেন; ডাব কাটিতে বসিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতেন যে, ইহা ঠাকুরেরই কাজ—এইরূপ সর্বত্র। প্রতিপদে সকলের মনে এই ভাবই জাগরূক থাকিত যে, সমস্ত মঠটি ঠাকুরের—তিনি সশরীরে ইহার সর্বত্র ভ্রমণ করিতেছেন; কোথাও ধূলা-বালি পড়িয়া থাকিলে তাঁহার কষ্ট হইবে বা তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইবে। উদ্যানে উন্মিষিত পুষ্প তুলিয়া লইয়া নিজের ভোগে লাগাইলে ঠাকুরসেবায় অর্পণ না করার অপরাধ ঘটিবে—এ উদ্যান যে তাঁহার! বাগানের বিকশিত কুসুমরাজি বিরাটের পূজায়ই অর্পিত! রন্ধন সুচারুরূপে সম্পাদিত না হইলে তাঁহাকেই অবজ্ঞা করা হয়, অর্থ অযথা ব্যয় হইলে তিনি রুষ্ট হন—ইত্যাদি। এই সমস্ত শাসন ও কায়িক শ্রমের মধ্যে ফুটিয়া উঠিত প্রেমানন্দের অনাবিল প্রেম। স্বামী তুরীয়ানন্দ সত্যই তাঁহাকে একদিন লিখিয়াছিলেন, "তোমরা যেখানে শুভাগমন করিবে, সেখানেই আনন্দের স্রোত বহিবে—

নিত্যোৎসবঃ ভবেত্তেষাং নিত্যশ্রীর্নিত্যমঙ্গলং।
যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তনং হরিঃ॥"

রাত্রে কোন ব্রহ্মচারী হয়তো মশারী খাটাইতে ভুলিয়া গিয়াছেন; প্রেমানন্দ তাঁহার মশারী খাটাইয়া দিলেন। অপর কেহ হয়তো অভিমান করিয়াছেন; প্রেমানন্দ তাহার পশ্চাতে দুধের বাটি লইয়া ঘুরিতে লাগিলেন। এইরূপ ঘটনা নিত্যই ঘটিত।

প্রেমাধার প্রেমানন্দের সর্বগ্রাসী প্রেমের পূর্ণ আবেগের সম্মুখে সব ভাসিয়া যাইবে মনে করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, "তুই দীক্ষা দিস না, দিলে তোর চেলাতে আর রাখালের চেলাতে ঝগড়া হবে।" বাবুরাম সে আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া অগণিত ভক্ত আসিত এবং অনেকে দীক্ষাও প্রার্থনা করিত, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে সুবিধামত হয় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর শ্রীচরণপ্রান্তে, না হয় সঙ্ঘনেতা স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট পাঠাইয়া দিতেন।

কিন্তু স্বামীজীর সাবধানবাণী হয় তো নিষ্প্রয়োজন ছিল; কারণ জগন্মাতার অদৃশ্য সঙ্কেতে প্রেমানন্দের প্রেমধারা বিচারহীন ভাবপ্রবণতার ব্যর্থ উচ্ছ্বাসে দুই কূল ভাসাইয়া আপনাকে নিঃশেষিত ও বিস্তীর্ণ তীরভূমিকে বিপর্যস্ত না করিয়া যুগপ্রয়োজনসাধনের অনুকূলরূপেই নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হইয়াছিল। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বাবুরামের নির্বন্ধাতিশয্যে ঠাকুর যখন জগন্মাতার নিকট স্নেহাস্পদের জন্য ভাবসমাধি ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন, তখন উত্তর পাইয়াছিলেন, "বাবুরামের ভাব হবে না, জ্ঞান হবে।" জ্ঞানের আবরণে আচ্ছাদিত প্রেম লইয়াই বাবুরাম মহারাজ এই যুগে লীলাবিলাস করিয়াছিলেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পরিবারে ভক্তির সংস্কার লইয়া জাত হইলেও বাল্যকাল হইতেই ব্যায়ামাদি সহকারে তাঁহার সুঠাম দেহ সুগঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহার সর্বাঙ্গে একটি পুরুষোচিত দৃঢ়তা অঙ্কিত ছিল। আর তাঁহার সমস্ত জীবন

ছিল ক্রিয়াচঞ্চল। বেলুড় মঠে ব্রাহ্মমুহূর্তে তাঁহারই বাণী সর্বপ্রথমে সকলের কর্ণগোচর হইয়া তাহাদিগকে শয্যাত্যাগ করাইত। অতঃপর চলিত সারা-দিবসব্যাপী বিবিধ ক্রিয়াকলাপ। পূজাও তিনি অতি ভক্তিসহকারেই করিতেন; কিন্তু পূজাগৃহে গমন বা প্রত্যাবর্তনকালে তাঁহার পদক্ষেপে কোন লাস্যবিলাস প্রকটিত না হইয়া ফুটিয়া উঠিত সপ্রতিভ প্রগতি। যুগের সুখ-দুঃখের সহিত তিনি অপরিচিত ছিলেন না; কিংবা উহার প্রতি উদাসীনও ছিলেন না। পরাধীন নিপীড়িত ভারতে চারিদিকে অহরহঃ যে আর্তনাদ উঠিত তাহাতে ব্যথিত মহাপুরুষের মর্মস্থল হইতে আকুল প্রার্থনা জাগিত—"হে ভগবান্, এ অত্যাচারের আশু প্রতীকার কর।" ইহা বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষসম্ভূত বা রাজনীতির পঙ্কিলতাসঞ্জাত প্রতিক্রিয়ামাত্র নহে—ইহা সর্বভূতে বিদ্যমান ভগবানের সেবায় নিয়োজিত কোমল সপ্রেম হৃদয়ের মর্মন্তুদ হাহাকার। এক প্রকারের প্রেম আছে, যাহা সক্রিয়-ভাবে সর্বত্র আত্মপ্রকাশ করিয়া সর্বভূতাধিষ্ঠিত প্রিয়তমের প্রীতিসম্পাদনে সন্তোষপ্রাপ্ত হয়; অন্য প্রকারের প্রেম নিষ্ক্রিয় ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া প্রেমাস্পদের আলিঙ্গনলাভে আপনাকে চরিতার্থ মনে করে। স্বামী প্রেমানন্দ ছিলেন প্রথম কোটির অন্তর্ভুক্ত।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে, এই সক্রিয় পুরুষোচিত ভাবের পূর্ণতম অভিব্যক্তি হইতে থাকে স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী অধিকতর নিবিষ্টমনে অধ্যয়নের পরে। সম্ভবতঃ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন কাশীধামে ছিলেন তখন মঠের কর্মব্যস্ততা হইতে মুক্ত থাকায় স্বামীজীর বাণীর পূর্ণতর অনুধ্যানের সুযোগ ঘটিয়াছিল এবং সেই সুযোগ সর্বতোভাবে গ্রহণের ফলে তিনি এক নূতন উদ্দীপনার অধিকারী হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার প্রতিকার্যে ও প্রতিকথায় ইহার পরিচয় পাওয়া যাইত। এই ভাবধারার সোচ্ছ্বাস উন্মেষের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মালদহের বক্তৃতায়।

সেই বক্তৃতায় স্বামী প্রেমানন্দ বিবেকানন্দ-প্রচারিত দরিদ্রনারায়ণসেবার বাণীই বিঘোষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু বক্তৃতার শেষদিকে জনৈক শ্রোতা বলিলেন, "একটু প্রেম-ভক্তির কথা শুনিতে আসিয়াছিলাম।" বাবুরাম মহারাজ উহাতে কর্ণপাত না করিয়াই স্বীয় বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন; পরন্তু উক্ত ভদ্রলোক বার তিনেক ঐ একই কথার আবৃত্তি করিলে বক্তার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি সিংহের ন্যায় গর্জনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে শুনবে, কাকে বলব প্রেমভক্তির কথা? প্রেমভক্তির কথা শুনবার অধিকারী কে আছে এখানে?" অতঃপর ঐ সম্বন্ধে একটি গল্প বলিলেন। উহার মর্ম এই—এক সময়ে এক পসারী পাড়া ঘুরিয়া প্রেম ফিরি করিতেছিল, "প্রেম নেবে গো, প্রেম নেবে?" আর উহার প্রতিদানে মূল্য চাহিতেছিল ক্রেতার কাঁচা মাথা। ক্রেতা সে কাহাকেও পাইল না। গল্প শেষ হইলে প্রেমানন্দজী জলদগম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "কেউ পারবেন আপনারা মাথা দিতে?···সহজ নয় প্রেমভক্তি! এ যুগে স্বামী বিবেকানন্দ যা বলে গেছেন, তাই ধর্ম—শিবজ্ঞানে জীবসেবা।" সভা তখন নিস্তব্ধ!

প্রেমানন্দের জীবন ভাবপ্রবণ না হইলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি নিজে প্রেমে মাতিতেন, অপরকেও মাতাইতেন। বৃন্দাবন হইতে তাঁহার আনীত মালা ও তিলক পরিয়া স্বামী বিবেকানন্দ একদিন বেলুড় মঠে ভাবে কয়েক ঘণ্টা হরিনাম-সংকীর্তনে মত্ত হইয়াছিলেন। একবার মঠে মহাষ্টমীর রাত্রে খুব কালীকীর্তন জমিয়াছে। আনন্দে বিভোর বাবুরাম মহারাজ শরৎ মহারাজের পার্শ্বে বসিয়া আছেন। অকস্মাৎ ভাবাবেগে শরৎ মহারাজকে ধরিয়া বলিলেন, "ভাই, তোমায় আজ গান গাইতে হবে। দেখছ না কত আনন্দ—তোমার গান ছাড়া আনন্দ যেন পূর্ণ হচ্ছে না।" শরৎ মহারাজ যতই বলেন "অনেক দিন অভ্যাস নেই, হঠাৎ গাইব কি

করে ?”—বাবুরামের আগ্রহ ততই বাড়িয়া যায়। অগত্যা তাঁহাকে গাহিতে হইল এবং নৃত্যেও যোগ দিতে হইল। পরদিন শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, “কি করব ? বাবুরাম বুড়ো বয়সে নাচিয়ে ছাড়লে !” এমনি ছিল বাবুরামের যুক্তিতর্কহীন ভাবের আবেগ! পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণকালে তিনি দেওভোগে নাগ মহাশয়ের আবাসস্থল দর্শনের জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত নারায়ণগঞ্জ হইতে পদব্রজে কীর্তনের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়া যেমনি নাগপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন, অমনি ভাবের আতিশয্যে গাত্রবাস উন্মোচন-পূর্বক সেই পবিত্র ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন ; অতঃপর মহারাজকে কাতরস্বরে নিবেদন করিলেন, “মহারাজ, এদের একটু কৃপা”—ইহা বলিতে বলিতে তাঁহাকে ধরিয়া কীর্তনস্থলে আনিলেন। মহারাজও সেই প্রাণমাতান কীর্তনে হুঙ্কারপূর্বক নৃত্য করিতে উদ্যত হইলেন ; কিন্তু ভাবের আতিশয্যে অক্ষমতানিবন্ধন স্থাণুবৎ সমাধিমগ্ন হইলেন। পূর্ববঙ্গে প্রেমানন্দের অন্যান্য ভাববিলাসের কথা আমরা পরে বলিব। আপাততঃ আরও দুই-চারিটি বিচ্ছিন্ন ঘটনারই উল্লেখ করা যাউক।

কলিকাতার সম্ভ্রান্তবংশীয় জনৈক যুবক অসৎসঙ্গে পড়িয়া গাঁজা ভাঙ্গ ইত্যাদি সেবন করিতে শিখিল। শিক্ষিত পরিবারে এরূপ ব্যবহারে সকলেই মর্মাহত ; কিন্তু চেষ্টা করিয়াও যুবককে কেহ সুপথে আনিতে পারিলেন না। সৌভাগ্যক্রমে যুবকের এক আত্মীয় স্বামী প্রেমানন্দকে জানিতেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি একদিন সমস্ত কথা তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন এবং এই বিষয়ে তাঁহার সাহায্য চাহিলেন। প্রেমের প্রতীক স্বামী প্রেমানন্দ সমস্ত শুনিয়া যুবকটিকে দেখিবার জন্য একদিন তাহার গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং নানাবিধ প্রসঙ্গে তাহার সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া একদিন মঠে আসিতে বলিলেন। যুবক সে আকর্ষণে সত্যই মঠে উপস্থিত হইল এবং সমস্ত দিবসটি প্রেমানন্দের সহিত মঠে কাটাইল।

প্রেমানন্দের ব্যবহারে সে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখিতে পাইল—সকলেই তাহাকে ভৎর্সনা করে, তাহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে, এমন কি, তাহার সান্নিধ্য অবাঞ্ছিত মনে করে। আর এই এক জন সর্বত্যাগী শুদ্ধচিত্ত সাধু সেই সকল অসদভ্যাসের বিন্দুমাত্র উল্লেখ না করিয়া কোনও কিছু পরিত্যাগের আদেশ না দিয়া কেবলই একটি অতি লোভনীয় উচ্চাবস্থার আদর্শ জাজ্বল্যমানরূপে সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। অবহেলার পরিবর্তে যুবক পাইল আদর। একদিকে উচ্ছৃঙ্খল জীবন, আর অপর দিকে নিঃস্বার্থ প্রেম—এই প্রেমের আবেদন বড়ই প্রবল। যুবক দিনান্তে গৃহে ফিরিল; কিন্তু শীঘ্রই এক অজ্ঞাত আকর্ষণে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিল। শুধু তাহাই নহে, সে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল, সে সমস্ত বদ অভ্যাস ছাড়িয়া সাধু হইবে এবং অচিরেই উহা কার্যে পরিণত করিল।

কর্তব্যানুরোধে প্রেমানন্দ ভৎর্সনাও করিতেন ইহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু এইরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে যে, শাসন করিতে যাইয়া অকস্মাৎ তাঁহার দৃষ্টি বহির্জগৎ ছাড়িয়া স্বস্বরূপের দিকে ধাবিত হইত—আর শাসন নামিয়া আসিত নিজেরই উপর। একদিবস জনৈক ব্রহ্মচারীকে তিরস্কার করিতে করিতে সহসা তাঁহার দৃষ্টি শাসক ও শাসিতের দ্বৈত সম্বন্ধের অতীত অদ্বৈত ভূমিতে প্রসারিত হওয়ায় অপর সকলকে শুনাইয়া তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "এ আবার কিরূপ প্রেম-আনন্দ রে বাবা!" সঙ্গে সঙ্গে তিরস্কারের স্থলে বিরাজিত হইল মধুর প্রশান্তি।

দেওঘরে তিনি যখন অসুস্থ অবস্থায় বায়ুপরিবর্তনের জন্য যান, তখন জনৈক সেবকের আহারে অধিক লোভ দেখিয়া তাঁহাকে তীব্র তিরস্কার করেন। সেবকটি অভিমানে দ্বিপ্রহরে আহারে আসিলেন না। বাবুরাম ভাবিয়াই আকুল—ছেলেটির কি হইল? অনুসন্ধান করাইয়া তাঁহাকে নিকটে আনাইয়া কোলের কাছে বসাইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "বাবা,

বুড়ো হয়েছি। রোগে শরীর দুর্বল। মেজাজ সব সময়ে ঠিক রাখতে পারি না। এ অবস্থায় যদি কিছু বলে ফেলি, তার জন্য কি রাগ করতে আছে ?" বলিতে বলিতে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল—সে অশ্রুধারায় সেবকের অভিমান কোথায় ভাসিয়া গেল !

প্রেমানন্দের প্রেম ভক্তসেবায় কোন বাধা মানিত না। কেহ মঠে আসিলে প্রসাদ না পাইয়া ফিরিতে পারিত না। একদিন জনৈক ভক্ত প্রসাদ না লইয়া চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া তিনি ঠাকুর-ভাণ্ডারীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "ইনি একটুও দাঁড়ালেন না—কি করে প্রসাদ দিই ?" বিরক্ত হইয়া প্রেমানন্দ উত্তর দিলেন, "তবু ডেকে এনে দিতে হয়—যখন মঠের ভেতর এসে পড়েছে। সংসারে থাকলে না নিজে খেতে পেতিস, না বাছাদের মুখে দুটো দিতে পারতিস। এখানে ঠাকুরের এত আসছে—হাতে করে তুলে দিতে পারবি নি ?"

মঠের রাস্তায় বাবুরাম মহারাজকে স্বহস্তে চোরকাঁটা উঠাইতে দেখিয়া জনৈক ভক্ত সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি কেন এ কাজ করছেন ?" প্রেমানন্দ অমনি উত্তর দিলেন, "ভক্তেরা কষ্ট করে আসে—অসুবিধা হয় ; তাই তাদের পথের কাঁটা সরিয়ে দিচ্ছি।" কে জানে এই সামান্য চোরকাঁটার সঙ্গে তিনি কোন অজানা জগতের পথের কাঁটা সরাইতেছিলেন।

এই অপূর্ব প্রেম একদা প্রবীণ সাহিত্যিক ও সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতিরও প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। একদিন পঙ্‌ক্তিভোজনকালে অভ্যাসানুযায়ী আহারস্থলে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রেমানন্দ মহারাজ সমাজপতি-সকাশে উপস্থিত হইয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "আপনাকে অভ্যর্থনা করতে পারি তেমন সম্বল—বাক্য, ভাব, ভাষা কোথায় পাব ? রস্-টস্ তো নেই ! আপনার কলমের ডগায় রস টস্ টস্ করে।" সমাজপতি তার

মানিবেন কেন? তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "আপনার কথায় আপনিই ঠকলেন। স্বীকার করলুম আমার কলমের ডগায় রস আছে। কিন্তু আপনার রস চলায়, ফেরায়, কথায়, কাজে, দেহে, প্রাণে।"—আরও কি বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আত্মপ্রশংসায় নিপীড়িত প্রেমানন্দজী পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিলেন।

উৎসবের দিনে মঠপ্রাঙ্গণে ভদ্রলোক, মুচি, মেথর, ধনী, দরিদ্র—সর্বস্তরের নারায়ণই পঙ্‌ক্তিভোজনে বসিয়াছেন। খিচুড়ি-পরিবেশন হইতেছে। তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত স্বামী প্রেমানন্দ দেখিলেন, দূরে এক পঙ্‌ক্তি হইতে বারংবার 'খিচুড়ি দাও, খিচুড়ি দাও' এই রব উঠিতেছে। তিনি অবিলম্বে সেখানে উপস্থিত হইয়া পরিবেশককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আর কখনো পরিবেশন কর নি?" উত্তর পাইলেন, "আমি বার বার দিচ্ছি, তবু কুলাচ্ছে না; এরা দাও দাও বলে শুধু গোল করছে।" প্রেমানন্দ দেখিলেন, পঙ্‌ক্তির প্রায় সবই গরীব—ইহাদের অধিক আহার করাই অভ্যাস। তাই সমবেদনায় ব্যথিত হইয়া আবেগভরে বলিলেন, আমাদের পেটের ওজনে কি এদের পেটের ওজন করা যায়! জানি না জীবনে কদিন এরা পেটভরে খেতে পায়—এদের পেটে যে দিনরাত আগুন জ্বলছে। যাও যাও, বালতিটা এদের এক এক পাতে ঢেলে দাও। ঠাকুরের প্রসাদ পেট ভরে খেয়ে নিক।" বলিতে বলিতে স্বর শুষ্ক হইয়া আসিল, নয়নকোণে বারি ঝরিয়া পড়িল—প্রেমানন্দ আর সামলাইতে না পারিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

মঠে সমাগতদের সেবার জন্য প্রেমানন্দের হৃদয়ের দ্বার ও ঠাকুর-ভাণ্ডারের অর্গল সর্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। সকলেই যে ভক্ত হিসাবে আসিতেন, তাহা নহে; কেহ হয়তো মঠের মুক্তবায়ু-সেবনে আগমন করিতেন, কেহ হয়তো বা ঔৎসুক্য মিটাইতে আসিতেন। যিনি যে

ভাবেই আসুন না কেন, প্রেমানন্দের মিষ্ট আলাপন ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া বারংবার যাতায়াত আরম্ভ করিতেন। অনেক সময় হয়তো মঠের প্রসাদ-বিতরণের সময় অতীত হওয়ার পরে কেহ আসিয়া উপস্থিত হইতেন। অতীতপ্রৌঢ় প্রেমানন্দজী কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিজেই অভ্যাগতের আহারাদির জন্য রন্ধনশালার দিকে অগ্রসর হইতেন। দেখিতে পাইয়া অপর কেহ সাহায্যার্থে আসিলে আশীর্বাদ করিয়া বলিতেন, "দেখ, গৃহস্থদের অনেক কাজ করতে হয়, সব সময় কি তাদের সময় মত আসা সম্ভব? আমরা তাদের জন্য কি আর করতে পারি—একটুখানি তাদের সেবা বই তো নয়? তাতে আমাদের হয়তো শারীরিক একটু কষ্ট। ঠাকুরের কৃপায় এখানে তো কিছুর অভাব নেই। আমরা কি তাঁর সন্তানদের সেসব দিয়ে ধন্য হব না?" রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও তিনি ভক্ত-সেবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। অসুখবৃদ্ধির আশঙ্কায় কেহ সাবধান বাণী শুনাইতে গেলে বলিতেন, "এ আমার স্বভাব—ভক্তদের সেবা ও ঈশ্বরের পূজা এক জিনিস।" দেহত্যাগের দিন দুই পূর্বে মঠের জনৈক সেবককে ডাকিয়া বড়ই আকুলকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি একটি কাজ করতে পার?" সেবক সাগ্রহে উত্তর দিলেন, "বলুন, কি করতে হবে।" প্রেমানন্দ বলিলেন, "ভক্তদের সেবা করতে পারবে?" "খুব পারব।" প্রেমানন্দ আবার আবেগভরে বলিলেন, "এটা কিন্তু ভুলো না।" ঠাকুরের প্রসাদ পাইলে ভক্তদের পরম কল্যাণ হইবে—ইহাই ছিল তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস। আর বলিতেন, "একবার যখন পুণ্যস্থানে—ঠাকুরের স্থানে এসেছে তখন দুটো ভাল কথা শুনে যাক।" বস্তুতঃ বাবুরাম মহারাজের নিকট যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা দেহ ও মনের ক্ষুধা মিটাইয়াই গৃহে ফিরিতেন এবং সেই অমৃতের লোভে পুনঃ তাঁহাদের চরণ মঠাভিমুখে ধাবিত হইত। বয়স্ক ভক্তদের সহিত কলেজের ছাত্ররাও তাঁহার নিকট আসিত এবং তিনি

অকাতরে তাঁহার সময় ও জ্ঞান তাহাদের সেবায় ঢালিয়া দিতেন। এইরূপে কত যুবকই না তাঁহার উদ্দীপনায় সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্বক তাঁহারই অনুসৃত পথে চলিতে দৃঢ়পণ হইয়াছে।

প্রেমানন্দের অধিকতর পরিচয়লাভের জন্য অতঃপর তাঁহার চরিত্রের আরও কয়েকটি দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে মন্দ হইবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাব এবং বাবুরামের পূর্ব সংস্কারের সংঘর্ষে অনেক ক্ষেত্রে চকিতে এক অপূর্ব আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া সকলকে মুগ্ধ করিত। পুরীতে বাসকালে একদিন বাবুরাম মহারাজ দেখিলেন, মন্দিরের সম্মুখেই খ্রীষ্টান প্রচারকেরা যীশুর মহিমা ঘোষণা করিতেছে। অমনি তাঁহার জাতিগত সংস্কার সহসা ক্ষুভিত হইয়া বাধাদানে অগ্রসর হইল। তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল"—সঙ্গে সঙ্গে শত শত নরনারীর কণ্ঠে নিনাদিত হইল, "হরিবোল, হরিবোল।" সভা ভাঙ্গিয়া গেল। পাণ্ডারা বাবুরামকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল, "আমরা এতদিন ভয়েই কিছু করতে পারি নি।" প্রেমানন্দের ভাগ্যে কিন্তু আসিল বিজয়োল্লাসের পরিবর্তে গভীর বিষাদ! রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, ঠাকুর দর্শন দিয়া বলিতেছেন, "হাঁরে, ওদের সভা ভেঙ্গে দিলি কেন? ওরা তো আমার নাম, আমার কথাই প্রচার করছিল! কাল ভোরে উঠে গিয়েই ক্ষমা চাইবি ওদের কাছে।" বাবুরাম প্রত্যুষে উঠিয়াই শশব্যস্তে অন্বেষণে নির্গত হইলেন এবং বহু কষ্টে খ্রীষ্টান প্রচারকদের বাটীর সন্ধান পাইয়া ক্ষমা চাহিয়া আসিলেন।

তিনি মাছ খাইতেন না। দীর্ঘকালের সংস্কার সূক্ষ্ম ঘৃণারূপেই হয়তো হৃদয়ে লুক্কায়িত ছিল। বাহিরে উহা ভৎর্সনা ও সমালোচনার আকারে মাঝে মাঝে অভিব্যক্ত হইত। একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন, "তুই মাছ খাসনে বলে কি মনে করিস তোর সব

হয়ে গেছে?" নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গেসঙ্গেই তিনি উঠিয়া মাছের আঁশ-বাটি জিহ্বায় ঠেকাইলেন। আর অতঃপর ভর্ৎসনাদি না করিয়া বলিতেন, "যাদের ইচ্ছা তারা মাছ খাবে।" নিজে নিরামিষাশী হইলেও তিনি প্রসাদী মাছ জিহ্বায় স্পর্শ করাইতেন। একদিন কিন্তু তাঁহাকে প্রসাদী মৎস্যও ভক্ষণ করিতে হইয়াছিল। স্বামী সারদানন্দ ও প্রেমানন্দ সেদিন পাশাপাশি বসিয়া খাইতেছেন। সারদানন্দের পাতে মাছের মুড়ো পরিবেশিত হইলে তিনি হঠাৎ সবটাই প্রেমানন্দের পাতে তুলিয়া দিলেন। প্রেমানন্দ "কি কর, কি কর" বলিয়া আপত্তি জানাইলেও সারদানন্দ বিরত হইলেন না এবং প্রেমানন্দও প্রসাদ-বিবেচনায় উহা আর পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।

তারপর প্রেমানন্দের বৈরাগ্য। তাঁহার নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মধ্যে ছিল এক জোড়া কাপড়, এক জোড়া ফতুয়া, একখানি গায়ের চাদর, এক জোড়া চটিজুতা, একটি লাঠি ও ছাতা। শীতের সময় একখানি চাদর ও একটি তুলার জামা অধিক ব্যবহার করিতেন। এই সকল সামান্য দ্রব্য হইতে আবার দানও চলিত। অসুস্থ অবস্থায় দেওঘরে থাকাকালে জনৈক নাপিত চুরির অপরাধে ধরা পড়ে। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়; সুতরাং শাসন না করিয়া অভাবমোচন করাই সক্ষম ব্যক্তির কর্তব্য—এই ছিল স্বামী প্রেমানন্দের ধারণা। অতএব তিনি ধৃত ব্যক্তিকে শাস্তির পরিবর্তে একটি টাকা দিতে বলিলেন। শুধু তাহাই নহে, সেবক দূরে সরিয়া গেলে নিজের ব্যবহার্য গামছাখানিও তাহাকে দিলেন।

স্বামী প্রেমানন্দের চরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব ছিল—শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানীর প্রতি তাঁহার অসীম ভক্তি-শ্রদ্ধা। মায়ের আদেশ ভিন্ন তিনি কোন বিশেষ কার্যে অগ্রসর হইতেন না এবং মায়ের আদেশে স্বমত পরিত্যাগ করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সম্বন্ধে তিনি এক

পত্রে লিখিয়াছিলেন, "শ্রীশ্রীমা মনুষ্যদেহধারিণী হ'লেও তাঁর অপ্রাকৃত ভাগবতী তনু; জীবের কল্যাণের জন্য মনুষ্যবৎ লীলা করছেন।" আর বলিতেন, "শ্রীশ্রীমাঠাকরুনকে দেখছি ঠাকুরের চেয়েও আধার বড়—তিনি শক্তিস্বরূপিণী কি না? তাঁর চাপবার ক্ষমতা কত! ঠাকুর চেষ্টা করেও পারতেন না, বাহিরে বেরিয়ে পড়ত। মা-ঠাকরুনের ভাবসমাধি হচ্ছে; কিন্তু কাহাকেও জানতে দেন?" ১৯১৪-এর মে মাসে স্বামী প্রেমানন্দকে মালদহে লইয়া যাইবার জন্য জনৈক ভক্ত বেলুড় মঠে আসেন। তাঁহার আগ্রহে তিনি যাইতে সম্মত হন; কিন্তু বলেন যে, ব্যক্তিগত সম্মতি থাকিলেও যাত্রার পূর্বে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর অনুমতি লইতে হইবে। তদনুসারে ভক্তসহ কলিকাতায় 'উদ্বোধন'-বাটীতে উপস্থিত হইয়া প্রেমানন্দ মাতৃচরণে সমস্ত নিবেদন করিলেন। স্নেহময়ী মা যখন শুনিলেন, বাবুরামের শরীর তত ভাল নহে, উৎসবস্থানের পথ দীর্ঘ ও দুর্গম, আর উৎসবে অনিয়মাদি হইবে, তখন বলিলেন, "তবে গরমের মধ্যে এতদূর নাই বা গেলে।" বাবুরাম অবনতমস্তকে আদেশ মানিয়া লইলেন। এদিকে ভক্ত তো শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িলেন—এই অল্পক্ষণ পূর্বে যাত্রার সমস্ত আয়োজন প্রায় ঠিক হইয়া গিয়াছে, আর এখন এই! তিনিও তৎক্ষণাৎ মাতৃসকাশে উপস্থিত হইয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, মালদহ তেমন দূর নহে, আর যাতায়াত ও অবস্থানের সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত হইবে, বিশেষতঃ প্রেমানন্দ মহারাজ না গেলে ভক্তদের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিবে। সব শুনিয়া মা পুনর্বার বাবুরামকে ডাকাইয়া বলিলেন, "হাঁ বাবুরাম, এরা এত করে বলছে; তবে কি তুমি যাবে?" মাতৃভক্ত উত্তর দিলেন, "আমি কি জানি মা? —যা আদেশ করবেন তাই করব।" অবশেষে মা বলিলেন, "যাও একবার এসগে, তবে বেশীদিন থেকো না।" অমনি আবার যাওয়া স্থির হইয়া গেল।

এই আত্মসমর্পণের ভাব অন্যপ্রকারেও তাঁহার জীবনে প্রকটিত হইত। মঠে তিনি বাস করিতেন শ্রীশ্রীঠাকুরেরই নির্দেশে—তাঁহার আদেশ ভিন্ন কিছুই করিবার উপায় ছিল না। সেই আদেশ শুধু হৃদয়েই সূক্ষ্ম অনুভূতি-রূপে নামিয়া আসিত না—স্থলবিশেষে নির্দেশ দিবার জন্য বিগ্রহধারণ করিয়া ঠাকুর সম্মুখে উপস্থিত হইতেন। একবার মঠপরিচালন-সম্বন্ধে গুরুভ্রাতাদের সহিত মতান্তর হওয়ায় তিনি অন্যত্র গমনের সঙ্কল্প লইয়া মঠের ফটকের দিকে অগ্রসর হইলেন—সঙ্গে মাত্র পরিধেয় বস্ত্র, গামছা আর এক খণ্ড কাপড়। কিন্তু যাই ফটক পার হইয়া পা বাড়াইবেন, অমনি দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার স্কন্ধস্থিত গামছা ধরিয়া আকর্ষণপূর্বক বলিতেছেন, "যাচ্ছ কোথায়, চাঁদ? আমায় ফেলে যাবে কোথায়?" স্বামী প্রেমানন্দের অনির্দিষ্ট পথের যাত্রা সেখানেই সমাপ্ত হইল।

তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই মঠে অতিবাহিত হইলেও সাধুজনোচিত তীর্থদর্শনমানসে তিনি মধ্যে মধ্যে বাহিরে যাইতেন, ইহার আভাস আমরা পূর্বেই দিয়াছি। আচার্য বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর কয়েক বৎসর মঠে কাটাইয়া তিনি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে পুরীধামে যান। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও শিবানন্দ এবং অপর কয়েক জন সাধু-ব্রহ্মচারীর সহিত তিনি ৺অমরনাথদর্শনে যাত্রা করেন। তাঁহারা বেলুড় মঠ হইতে রাওলপিণ্ডি হইয়া কাশ্মীরে যান। অতঃপর ৺অমরনাথদর্শনান্তে প্রায় তিন মাস কাশ্মীরে থাকিয়া শ্রীনগরাদি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখেন। কাশ্মীর হইতে তুরীয়ানন্দ সিমলায় যান এবং প্রেমানন্দ ও শিবানন্দ চৌদ্দ-পনর দিন কনখলে থাকিয়া সেপ্টেম্বর মাসের শেষে ৺কাশীধামে উপস্থিত হন। তথায় কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া তাঁহারা বেলুড়ে ফিরিয়া আসেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে পুনর্বার কাশীধামে যাইতে হয়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৺দুর্গাপূজার পূর্বে স্বামী ব্রহ্মানন্দ তথায় গিয়াছিলেন।

তিনি পরবৎসর অক্টোবর মাস পর্যন্ত মঠে প্রত্যাবর্তন না করায় মঠবাসীরা তাঁহার অভাব তীব্রভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। অতএব তাঁহাকে আনিবার জন্য স্বামী প্রেমানন্দ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কাশীতে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ কিন্তু তখনই মঠাভিমুখে যাত্রা করিলেন না, তিনি বরং প্রয়াগে চলিয়া গেলেন। অগত্যা প্রেমানন্দজীও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। সেখানে তিন দিন কাটিয়া গেলেও মহারাজের বেলুড়ে আসিবার কোন লক্ষণ না দেখিয়া প্রেমানন্দ আর নীরব থাকিতে পারিলেন না—চতুর্থ দিবসে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, তোমায় মঠে যেতেই হবে।" বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এবম্প্রকার বিনয় ও কাতরোক্তিতে অপ্রস্তুত হইয়া ব্রহ্মানন্দ শশব্যস্তে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন, "ও কি, বাবুরাম-দা, ওকি! ওঠ, ওঠ।" বাবুরাম মহারাজ তদবস্থ থাকিয়াই পুনর্বার আকুল আবেদন জানাইলেন। অবশেষে ব্রহ্মানন্দজীকে বলিতে হইল, "বাবুরাম-দা, ওঠ, ওঠ—আমি যাব।" পরদিনই সকলে মঠে রওয়ানা হইলেন। এখানে পাই অনুপম গুরুভ্রাতৃপ্রেম, আর ততোধিক অতুলনীয় অধ্যক্ষের প্রতি আনুগত্য। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ইহাই ভিত্তিভূমি। পরবৎসর প্রেমানন্দজী নীলাচলে যাইয়া কয়েক মাস মহারাজদের সহিত কাটাইয়াছিলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষে তিনি শেষবারের মত কাশীধামে গমন করেন এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন। এতদ্ব্যতীত মঠজীবনের প্রারম্ভে কোন একসময়ে তিনি স্বীয় জননীকে লইয়া ৺রামেশ্বরাদি তীর্থ দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। এইভাবে তিনি ভারতের প্রধান তীর্থগুলির প্রায় সমস্তই দর্শনপূর্বক স্বয়ং তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় সাধুত্বের স্পর্শে তাহাদেরও তীর্থত্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন।

তীর্থভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীও প্রচার করিতেন। প্রথম প্রথম উহা ঘটনাচক্রে সকলের, এমন কি তাঁহার নিজের, অজ্ঞাতসারেই

হইয়া যাইত। কিন্তু জীবনের শেষ কয় বৎসর এই প্রচারের প্রভাব ও প্রসার দেখিয়া লোক অবাক হইয়া গিয়াছিল। যে বাবুরাম মহারাজ মঠের খুঁটিনাটি কাজেই কালক্ষেপ করিতেন এবং যিনি কখনও বিদ্যা বা বুদ্ধিমত্তার দাবী করিতেন না, তিনি যে একদিন সভাসমিতিতে উপস্থিত হইয়া স্বীয় অটুট বিশ্বাস ও প্রেমের প্রবাহে জনসমাজকে ধর্মভাবে মাতাইবেন, ইহা কে ভাবিয়াছিল? তাঁহার প্রচারশক্তি বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল পূর্ববঙ্গে। তাহারও আগে উৎসবাদি উপলক্ষে তিনি মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বহুবার গিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পূর্ববঙ্গের সঙ্গে তাঁহার কি যেন একটা অদৃশ্য যোগসূত্র ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলিয়াছিলেন, "পূর্ববঙ্গ তোর জন্য রইল।" বস্তুতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভাবে মুগ্ধ পূর্ববঙ্গের আধ্যাত্মিক সাগরে নূতন প্রেমের হিল্লোল তুলিবার উপযুক্ত শক্তি ছিল স্বামী প্রেমানন্দেরই হৃদয়ে—আপনি মাতিয়া অপরকে মাতাইতে তিনিই মাত্র পারিতেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভক্তদের আমন্ত্রণে বাড়িখাল (ঢাকা) যান। সেখানে শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীতে তাঁহাদের থাকিতে দেওয়া হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদের আগমনে সেবার উক্ত অঞ্চল প্রেমে টলটলায়মান হইয়াছিল; এমন কি, মুসলমানেরাও ঐ আনন্দে যোগ দিয়াছিলেন। স্থানবিশেষে তাঁহাদের নিকট উৎসবের চাঁদা চাহিতে না যাওয়ায় তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "উনি কি শুধু আপনাদের নাকি? উনি তো আমাদেরও পীর মশাই!" ঐ অঞ্চলে বহু গৃহে ঠাকুরের পূজা ও কীর্তনাদিতে লোকের উৎসাহ দেখিয়া প্রেমানন্দ বিস্মিত হইয়াছিলেন। উৎসবে তিনি বক্তৃতাদিও করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে, উৎসবান্তে কলিকাতা ফিরিয়া তাঁহার কলেরা হয় এবং প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়। এহেন অবস্থায় একদিন বাবুরাম মহারাজকে সংজ্ঞাহীন দেখিয়া সকলের

ধারণা হইল তিনি দেহত্যাগ করিবেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভান্তে সকলের বিমর্ষ বদন দেখিয়া তিনি বলিলেন, "ভয় নেই, এ দেহ এখন যাবে না—মা বেঁচে আছেন।" এই রহস্য অনেকে জানিতেন না, কিংবা জানিলেও ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বাবুরামের মাতার নিকট ঐ সন্তানটিকে ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন, তখন মাতা উহাতে সম্মত হইয়া বলিয়াছিলেন, "বাবা, এই ভিক্ষা দিন, ভগবানে যেন আমার ভক্তি থাকে, আর আমায় যেন পুত্রকন্যার শোক পেতে না হয়।" ঠাকুর সে বর দিয়াছিলেন। বাবুরাম মহারাজ সেই অমোঘ বাণীর কথা এখন সকলকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। যে রোগীর সম্বন্ধে চিকিৎসকগণ পর্যন্ত আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি অতঃপর দৈববলে অতি আশ্চর্যরূপে ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এই অসুখের সময় পূর্ববঙ্গের মুসলমান অনুরাগীরা 'শিরনি' মানিয়াছিলেন এবং মঠে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি শীঘ্র আরোগ্যলাভ করেন।

পরবর্তী বৎসর ব্রহ্মানন্দজীর সহিত তিনি ৺কামাখ্যাদর্শন ও পূর্ববঙ্গ-পরিভ্রমণে যাত্রা করেন। ক্রমে ময়মনসিংহে উপস্থিত হইয়া একদিন নদীতীরে পদচারণকালে তিনি দেখিলেন যে, মহারাজ ভাবস্থ। অমনি লোককল্যাণে সদা উন্মুখ প্রেমানন্দজী নিকটস্থ ছেলেদিগকে তাঁহার পদ-প্রান্তে আনিয়া বলিলেন, "মহারাজ, ছেলেদের আশীর্বাদ কর।" মহারাজও সাগ্রহে বলিলেন, "ছেলেরা দেবতা হয়ে যাবে।" ইহার পর ঢাকায় রামকৃষ্ণ মিশনের ভিত্তি-স্থাপনান্তে তাঁহারা কাশিমপুরের জমিদারবাটীতে যান। তৎপরে দেওভোগে নাগভবন-দর্শনান্তে ২৫শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় ও পর দিবস বেলুড়ে উপনীত হন।

প্রেমানন্দ শেষবারে পূর্ববঙ্গে যান ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ সময় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমনকালে এবং তাঁহার অবস্থিতিস্থলের চারি পার্শ্বে এরূপ

লোকসমাগম হইত যে, জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী পরে উহার সহিত মহাত্মা গান্ধীর আকর্ষণী শক্তির তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "মহাত্মাজীকে দেখিবার জন্যেও তেমন লোকসমাগম হয় না।" প্রেমানন্দের প্রেম শুধু হিন্দু-সমাজেই আবদ্ধ না থাকিয়া মুসলমান-সমাজেও বিস্তৃত হইতেছে দেখিয়া ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমার ঘারিন্দা গ্রামে তাঁহার অবস্থানের সুযোগে জনৈক মুসলমান মৌলবী তাঁহাকে পরীক্ষা ও পরাস্ত করিবার অভিপ্রায়ে সম্মোহিনী বিদ্যায় পারদর্শী জনৈক বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সকাশে উপস্থিত হন। কিন্তু কার্যতঃ অপারগ হইয়া আপনার ত্রুটি স্বীকার করেন। বাবুরাম মহারাজ ইহাতে বিরক্ত না হইয়া মৌলবীকে ফল মিষ্টান্নাদি আহার করিতে দিলেন; তখন মৌলবী বলিলেন, "আপনি এ যাবৎ উদার মত প্রচার করিতেছিলেন; আপনি আমার সঙ্গে এক-পাতে খাইতে পারেন?" প্রেমানন্দ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "হাঁ, পারি" এবং কার্যতঃ তাহাই করিলেন। মৌলবী তখন সঙ্গী ধীরানন্দকেও আমন্ত্রণ করিলে প্রেমানন্দ বাধা দিয়া বলিলেন, "একজন খেলেই হল; ধীরানন্দের অবস্থা এখনও ঐরূপ নহে।"

মুসলমানদের সহিত তাঁহার এরূপ প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। একবার ঢাকায় অবস্থানকালে তাঁহার উদারবাণীতে আকৃষ্ট হইয়া নবাব সলিমুল্লা তাঁহাকে স্বগৃহে আমন্ত্রণপূর্বক ধর্মগুরুর ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করেন। আর একবার মঠে আগত এক মুসলমান ভদ্রলোককে কিছু খাইতে দিবার পর কেহ উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া তিনি স্বহস্তে ঐ কার্য সম্পাদন করেন। বস্তুতঃ প্রচারক, গুরু বা সেবক যেরূপেই অপরে তাঁহাকে গ্রহণ করুক না কেন, স্বামী প্রেমানন্দের প্রেম জাতিবর্ণনির্বিশেষে বিতরিত হইত।

ঘারিন্দার পরে তিনি ঢাকায় গমন করেন এবং ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ হইয়া হাসাড়া ও সোনারগাঁ প্রভৃতি গ্রামে উৎসব করিতে যান। বহির্দৃষ্টি

অবলম্বনে যদিও আমরা 'উৎসব' শব্দ প্রয়োগ করিলাম, তথাপি মনে রাখিতে হইবে যে, ইহাতে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটিত হইল না ; কারণ তখন তিনি উৎসব উপলক্ষে জনগণের মনে নবযুগের উপযোগী এক নূতন প্রেরণা অনুসঞ্চারিত করিতে বদ্ধপরিকর। কীর্তন, উপদেশ, বক্তৃতা, দৈনন্দিন আচরণ প্রভৃতি বিবিধ চেষ্টার মধ্য দিয়া উহাই আত্মবিকাশ করিতেছিল এবং উহার প্রভাব ধর্মের ক্ষেত্র ছাড়িয়া সমাজ ও স্বাস্থ্যাদির ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইতেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতে পারা যায় যে, হাসাড়া প্রভৃতি গ্রামে তিনি দেখিলেন, জলাশয়গুলি কচুরিপানায় পূর্ণ—একটু পরিশ্রম করিলেই ঐ গুলি পরিষ্কৃত হইয়া স্বাস্থ্যের অনুকূল ও ব্যবহারোপযোগী হয় জানিয়াও গ্রামবাসীরা সম্পূর্ণ উদাসীন আছেন। ইহাতে ব্যথিত হইয়া প্রতিকারকল্পে তিনি প্রথমতঃ গ্রামবাসীদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাহাতেও সুফল না হওয়ায় আদর্শস্থাপনার্থে স্বয়ং জলে নামিয়া পানা তুলিতে লাগিলেন। তখন গ্রামবাসীরাও তাঁহার অনুকরণে ও উদ্দীপনায় ঐ কার্যে অগ্রসর হইলেন।

এই সুদীর্ঘ ভ্রমণ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমের ফলে স্বামী প্রেমানন্দ কালাজ্বরগ্রস্ত হইলেন। কলিকাতায় আগমনান্তে চিকিৎসার ফলে রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে বায়ুপরিবর্তনের জন্য তাঁহাকে বৈদ্যনাথ-ধামে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে প্রথম বেশ উপকার দেখা গেল ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তখন পৃথিবীর সর্বত্র ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-ব্যাধি মহামারীরূপে প্রসারিত হইয়া ক্রমে বৈদ্যনাথে উপস্থিত হইল এবং তাঁহার দেহেও উহা সংক্রমিত হইয়া জীবন সংশয়াপন্ন করিল। সংবাদ পাইয়া স্বামী শিবানন্দ অবিলম্বে মঠ হইতে তথায় গেলেন এবং তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। কলিকাতায় আসিলেও রোগ তখন প্রতিকারের অতীত ; অতএব সুচিকিৎসা সত্ত্বেও ফিরিয়া আসার চতুর্থ দিবসেই তিনি স্বধামে প্রস্থান করিলেন (৩০শে জুলাই, মঙ্গলবার, বিকাল ৪টা ১৫ মিঃ, ১৯১৮ খ্রীঃ)। সেই দিন সকাল

হইতেই সাধুরা নামকীর্তন করিতেছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বিমর্ষভাবে ঘর-বাহির করিতে লাগিলেন। একবার ভিতরে যাইয়া প্রেমানন্দকে বলিলেন, "ঠাকুরের কথা বেশ মনে পড়ছে তো?—তা হলে আমাদেরও ভরসা হয়।" ঠাকুরের মানসপুত্র রাখালের মনে কখনও, এমন কি মরণকালেও, বিস্মরণ উপস্থিত হইতে পারে না, বাবুরামেরও নহে—ইহা জানিয়াও ব্রহ্মানন্দ বর্তমান জড়সভ্যতার দিনে প্রমাণস্থাপনের জন্য এবং সমবেত সাধু ও ভক্তদের মনে শ্রদ্ধা জন্মাইবার জন্যই সম্ভবতঃ ঐরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকিবেন। সেজন্য উহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই যেন বাবুরামও একগাল হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন আর ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, 'কৃপা, কৃপা, কৃপা!" এই বলিয়া ঠাকুরের ছবির দিকে তাকাইয়া রহিলেন—কিন্তু বড়ই গম্ভীর!

মহাসমাধির পূর্বে একদিন তিনি স্বামী সারদানন্দকে অন্যমনস্কভাবে বলিয়াছিলেন, "চাঁপা ফুলের মত রং কাপড় পরতে ইচ্ছা করে; আর বেল-ফুলের মত ধবধবে অন্ন খেতে ইচ্ছা করে।" শুনিয়া এক পরিপক্কবুদ্ধি ব্রাহ্মণ চিন্তা করিয়াছিলেন, "আমরা গৃহস্থ, অত সব যোগাড় কি করে করব?" তিনি কি করিয়া জানিবেন যে, হ্লাদিনী শক্তি হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া যে মূর্তি মর্ত্যধামে ভগবৎকার্যসাধনের জন্য এতকাল নিয়োজিত ছিলেন, আজ তিনি স্বরূপে লীন হইতে চাহেন?—বাবুরাম মহারাজ এই দৈব ভাষায় তারই পূর্বাভাস দিলেন মাত্র।

প্রেমানন্দ স্বামী প্রেমের হাট ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেলেন। নিদারুণ সংবাদ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া সকলের মনে মর্মান্তিক আঘাত প্রদান করিল। পূজনীয় মাস্টার মহাশয় শুনিয়া বলিলেন, "ঠাকুরের প্রেমের দিকটা চলে গেল।" শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে বলিলেন, "মঠের শক্তি, ভক্তি, যুক্তি—সব আমার বাবুরামের রূপ ধরে মঠের গঙ্গাতীর আলো করে বেড়াত। হায়, ঠাকুর তাকেও নিয়ে গেলেন!"

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার যে কয়জন অন্তরঙ্গকে ঈশ্বরকোটি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীরামচন্দ্রের অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই অতি উচ্চ আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ চব্বিশ পরগণা জেলার রাজারহাট-বিষ্ণুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার জন্মের বৎসরাদি নির্ণয় করা অসম্ভব। তাঁহার পূর্ব নাম ছিল নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ। বারাসত-নিবাসী পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় তাঁহার মাতুল ছিলেন। নিরঞ্জন মাতুল মহাশয়ের কলিকাতাস্থ বাটীতে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন। বাল্যে তিনি তীরধনু ও অস্ত্রাদি লইয়া ক্রীড়া করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার চেহারা অতি সুন্দর ছিল এবং ব্যায়ামাদির ফলে শরীর সুদীর্ঘ, সবল ও সুঠাম হইয়াছিল। তাঁহার প্রকৃতিও তদনুরূপ নির্ভীক ও বীরভাবাপন্ন ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আগমনের পূর্বে তিনি আহিরীটোলানিবাসী ডাক্তার প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের বাড়িতে একটি প্রেততত্ত্বান্বেষী দলের সহিত পরিচিত হন। ইঁহারা নিরঞ্জনকে প্রেতাবতরণের মাধ্যম (মিডিয়ম) রূপে ব্যবহার করিতেন; কারণ তাঁহার উপর ভূতের আবেশ অতি সহজে হইত এবং এইরূপ প্রেতাবিষ্ট নিরঞ্জনের সাহায্যে ঐ দলটি দুরারোগ্য রোগ নিরাময় করা প্রভৃতি বহু অলৌকিক ব্যাপার সাধন করিতে পারিতেন। এই ভাবে ভূতুড়েদের দলে যাতায়াত করিতে করিতে একটি ঘটনায় নিরঞ্জনের মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। জনৈক ধনশালী ব্যক্তি সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসর অনিদ্রায় ভুগিয়া অবশেষে নিরঞ্জনের শরণাপন্ন হন।

নিরঞ্জন পরে বলিয়াছিলেন, "জানি না ঐ ব্যক্তি আমার দ্বারা কোনরূপ উপকৃত হইয়াছিল কি না; কিন্তু এইরূপ ধনকুবের হইয়াও ঐ ব্যক্তিকে দারুণ কষ্ট পাইতে দেখিয়া আমার মনে ধনসম্পত্তির অসারতা সম্বন্ধে গভীর রেখাপাত হইল।"

বৈরাগ্যসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক রাজ্যের দ্বারও তাঁহার নিকট শীঘ্রই উদ্ঘাটিত হইল। তিনি লোকমুখে শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত ভগবৎপ্রেম ও চিত্তাকর্ষক উপদেশের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে উদ্‌গ্রীব হইলেন এবং অচিরেই প্রেততত্ত্বানুসন্ধিৎসু জনকয়েক বন্ধুর সহিত দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সকাশে উপস্থিত হইলেন। নিরঞ্জনের বয়স তখন আনুমানিক অষ্টাদশ বৎসর[১]—সুদীর্ঘ সুন্দর অবয়ব, আর চক্ষে যেন জ্যোতি নির্গত হইতেছে। শুনা যায়, ঐ প্রথম দর্শনের দিনেই নিরঞ্জন ও তাঁহার বন্ধুরা শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রেতাবতরণের মাধ্যম হইতে অনুরোধ করিলে বালকের ন্যায় সরলপ্রকৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্মত হইয়া তাঁহাদের চক্রে উপবেশন করেন; কিন্তু একটু পরেই আসনত্যাগ করিয়া উঠিয়া যান।

নিরঞ্জন যখন দক্ষিণেশ্বরে আসেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তপরিবেষ্টিত ছিলেন। সন্ধ্যার সময় সকলে উঠিয়া গেলে তিনি নিরঞ্জনের পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন এবং তাঁহার পরিচয় লইলেন। আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠতর হইতে লাগিল, যেন নিরঞ্জন তাঁহার কতকালের পরিচিত। কথাপ্রসঙ্গে তিনি নিরঞ্জনকে বলিলেন, "দ্যাখ নিরঞ্জন, ভূত ভূত করলে তুই ভূত হয়ে যাবি, আর ভগবান ভগবান করলে ভগবানই হবি। তা কোনটা হওয়া ভাল?" নিরঞ্জন উত্তর দিলেন, "তা হলে ভগবান হওয়াই ভাল।" ফলতঃ এইরূপে

১। 'কথামৃত', ৩য় ভাগ, ৩০৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে—১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহার বয়স ছিল ২৫।২৬ বৎসর। অতএব জন্মবৎসর ১৮৬২, শ্রাবণ-পূর্ণিমা ধরা যাইতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তিনি সম্ভবতঃ ১৮৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দে আসেন।

ঠাকুর সেদিন নিরঞ্জনকে ভুতুড়েদের সঙ্গ ত্যাগ করিতে বলিলেন এবং নিরঞ্জনও তাহাতে সম্মত হইলেন। এই প্রথম দর্শনের সম্বন্ধে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, "নিরঞ্জন ভাই দক্ষিণেশ্বরে যেদিন প্রথম গিয়েছিল, সেদিন ঠাকুর তাকে বলেছিলেন, 'ছাখ, তুই যদি সংসারীর নিরানব্বইটি উপকার করিস আর একটা অপকার করিস, তবে লোকে আর তোকে দেখতে পারবে না। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে তুই যদি নিরানব্বইটি অপরাধ করিস আর একটা তাঁর প্রীতির কাজ করিস, তা হলে তিনি তোর সব অপরাধ মার্জনা করবেন। মানুষের ভালবাসায় আর ভগবানের ভালবাসায় এত তফাৎ জানবি" ('শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা', ৪২৮ পৃঃ)।

সেদিন এইরূপ নানা কথা চলিতে লাগিল। ঠাকুরের আপন জনের সহিত কতকাল পরে আজ দৈবক্রমে দেখা হইয়াছে—আলাপ আর শেষ হয় না! ক্রমে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে ঠাকুর বলিলেন, "সন্ধ্যা হয়ে এল, আজ বাড়ি নাইবা গেলি; এখানেই আজ থাক না।" নিরঞ্জন বাড়িতে বলিয়া আসেন নাই, রাত্রে থাকিলে মাতুল রাগ করিবেন; সুতরাং থাকিতে রাজী হইলেন না। ঠাকুর আবার বলিলেন, "ওরে, এতটা যেতে কষ্ট হবে, যাসনি, থেকে যা।" নিরঞ্জন তখনও সম্মত না হওয়ায় ঠাকুর বলিলেন, "একান্তই যাবি তো যা, কিন্তু আবার আসিস। কবে আসবি?" নিরঞ্জন শীঘ্রই আসিবেন বলিয়া পদধূলিগ্রহণান্তে বিদায় লইলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক আকর্ষণ সেই প্রথম দিনের দর্শনেই তাঁহার মর্মস্থল আলোড়িত করিয়াছিল। তাই বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে কেবলই ভাবিতে লাগিলেন, "থেকে গেলেই হত।" অমনি আবার কর্তব্যবুদ্ধি স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল, "না, মামা রাগ করবেন।" সেদিনকার মত নিরঞ্জন গৃহে ফিরিলেন।

দুই-তিন দিন পরেই তিনি আর এক সন্ধ্যায় পুনর্বার দক্ষিণেশ্বরে

ঠাকুরের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। কক্ষের দ্বারে আগমনমাত্র ঠাকুর দ্রুতপদে আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিলেন এবং আকুল-স্বরে বলিতে লাগিলেন, "ওরে নিরঞ্জন, দিন যে যায়রে—তুই ভগবান-লাভ করবি কবে? দিন যে চলে যায়, ভগবানকে লাভ না করলে সবই যে বৃথা হবে। তুই কবে তাঁকে লাভ করবি বল, কবে তাঁর পাদপদ্মে মন দিবি বল? আমি যে তাই ভেবে আকুল!" নিরঞ্জন অবাক!—"ইনি কে? আমার ভগবানলাভ হচ্ছে না বলে, দিন চলে যাচ্ছে বলে আমার জন্য এঁর এত আর্তি কেন? পরের জন্য এ কি অহৈতুকী ভালবাসা!" এ রহস্য তিনি ভেদ করিতে পারিলেন না; কিন্তু গভীর আবেগপূর্ণ সেই সুধাময় বাণীতে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল—তিনি সে রাত্রি দক্ষিণেশ্বরেই থাকিয়া গেলেন। শুধু তাহাই নহে, সে অপূর্ব প্রেম তাঁহাকে পরদিনও সেখানেই ধরিয়া রাখিল। এইরূপে তিন দিন দক্ষিণেশ্বরে অতিবাহিত হইলে চতুর্থ দিন তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন। না বলিয়া এই ভাবে তিন দিন অনুপস্থিত থাকায় মাতুল বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন এবং নানা স্থানে ভাগিনেয়ের অনুসন্ধানও করিয়াছিলেন। অতঃপর চতুর্থ দিন ফিরিয়া আসিলে বিরক্তিসহকারে তাঁহাকে তীব্র ভৎর্সনা করিয়া বাড়ির সকলের উপর আদেশ দিলেন, যেন নিরঞ্জনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়। এই ব্যবস্থা কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। দিন কয়েক পরেই মাতুলের মন কোমল হইল। এতদ্ব্যতীত বাড়ির ভৃত্যদের অনুভূতি হইত, যেন কি এক দিব্য শক্তি নিরঞ্জনকে ঘিরিয়া রহিয়াছে—উঁহার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিলে তাহাদের অমঙ্গল হইবে। সুতরাং শীঘ্রই তিনি আবার নির্বিবাদে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন।

নিরঞ্জনের সরলতা ঠাকুরকে প্রথমাবধিই বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছিল। তাই তিনি মাস্টার মহাশয়কে একদিন বলিয়াছিলেন, "তোমায় নিরঞ্জনের

সঙ্গে দেখা করতে বলছি কেন? সে সরল ইহা সত্য কি না, এইটি দেখবে বলে” (‘কথামৃত’, ৫ম ভাগ, ১৪৭ পৃঃ)। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন কাঁকুড়গাছীতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রের বাগানে এক মহোৎসবে ঠাকুর গিয়াছিলেন। কীর্তনান্তে তিনি ভক্তসঙ্গে উপবিষ্ট আছেন, “এমন সময় নিরঞ্জন আসিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়াই দাঁড়াইয়া উঠিলেন। আনন্দ-বিস্ফারিতলোচনে সস্মিতমুখে বলিয়া উঠিলেন, ‘তুই এসেছিস!’ (মাস্টারকে) ‘দেখ, এ ছোকরাটি বড় সরল। সরলতা পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা না করলে হয় না। কপটতা পাটোয়ারী এসব থাকতে ভগবানকে পাওয়া যায় না’ ” (ঐ, ১ম ভাগ, ১৪১ পৃষ্ঠা)। নিরঞ্জনের বৃদ্ধা মাতা তখন জীবিতা ছিলেন; তাই মাতার ভরণপোষণের জন্য নিরঞ্জনকে চাকরি গ্রহণ করিতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ চাহিতেন না যে, তাঁহার কোন উচ্চাধিকারী যুবক-ভক্ত কাঞ্চনের বন্ধনে পড়েন। তাই ঐ দিনই নিরঞ্জনকে বলিলেন, “দেখ তোর মুখে যেন একটা কালো আবরণ পড়েছে। তুই আফিসের কাজ করিস কিনা, তাই পড়েছে। আফিসের হিসাব-পত্র করতে হয় আরও নানা রকম কাজ আছে—সর্বদা ভাবতে হয়। সংসারী লোকেরা যেমন চাকরি করে, তুইও চাকরি করছিস; তবে একটু তফাৎ আছে। তুই মার জন্য চাকরি স্বীকার করেছিস। মা গুরুজন, ব্রহ্মময়ীস্বরূপা। যদি মাগ-ছেলের জন্য চাকরি করতিস, আমি বল্‌তুম—ধিক ধিক, শত ধিক, একশ ছি!” অতঃপর ঠাকুর মণি মল্লিককে বলিলেন, “দেখ, ছোকরাটি ভারি সরল। তবে আজকাল একটু-আধটু মিথ্যা কথা কয়—এই যা দোষ! সেদিন বলে গেল যে, আসবে; কিন্তু আর এলো না। (নিরঞ্জনের প্রতি) তাই রাখাল বলছিল—তুই এঁড়েদয়ে এসেও দেখা করিস নাই কেন?” নিরঞ্জন বলিলেন, “আমি এঁড়েদয়ে সবে দুদিন এসেছিলাম।” শ্রীরামকৃষ্ণ তারপর মাস্টার মহাশয়কে দেখাইয়া নিরঞ্জনকে বলিলেন, “ইনি হেড্‌মাস্টার। তোর

সঙ্গে দেখা করতে গিছিলেন। আমি পাঠিয়েছিলাম" (ঐ, ১ম ভাগ, ১৪১-৪২ পৃষ্ঠা)।

নিরঞ্জনের সরলতা ও বৈরাগ্যের জন্য ঠাকুর তাঁহার প্রতি কতখানি স্নেহপরায়ণ ছিলেন তাহা 'কথামৃতে'র বহুস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। পাঠকের সুবিধার জন্য আমরা কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিলাম। নিরঞ্জনের বৈরাগ্যসম্বন্ধে ঠাকুর একদিন (১৮৮৬ খ্রীঃ, ৫ই জানুয়ারী) মণিকে বলিয়াছিলেন, "দেখছ না নিরঞ্জনকে! 'তোর এই নে, আমার এই দে'—ব্যস্; আর কোন সম্পর্ক নাই। পেছু টান নাই" (৩য় ভাগ, ২৭৬ পৃঃ)। ইহারও পূর্বে একদিন (১৮৮৪ খ্রীঃ, ২০শে জুন) ঠাকুর মাস্টার মহাশয়কে বলিলেন, "বাবুরাম আর নিরঞ্জন—এদের ছাড়া কই ছোকরা? যদি আর কেউ আসে, বোধ হয় ঐ উপদেশ নেবে, চলে যাবে। ···নিরঞ্জনকে তোমার কিরূপ বোধ হয়?" মাস্টার উত্তর দিলেন, "আজ্ঞা, বেশ চেহারা।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "না, চেহারা শুধু নয়! সরল। সরল হলে ঈশ্বরকে সহজে পাওয়া যায়। সরল হলে উপদেশে শীঘ্র কাজ হয়।···নিরঞ্জন বিয়ে করবে না। তুমি কি বল—কামিনী-কাঞ্চনেই বদ্ধ করে?" মাস্টার—"আজ্ঞে হাঁ।" শ্রীরামকৃষ্ণ—"ভাবে দেখলাম, যদিও চাকরি করছে, ওকে কোন দোষ স্পর্শ করে নাই। মার জন্য কর্ম করে—ওতে দোষ নাই। ···নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, এদের ব্যাটা ছেলের ভাব" (৪র্থ ভাগ, ১১৪-১৫ পৃঃ)। বলরাম-ভবনে ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, "আলেখ্ নিরঞ্জন! নিরঞ্জন, আয় বাপ—খারে, নেরে—কবে তোরে খাইয়ে জন্ম সফল করব! তুই আমার জন্য দেহধারণ করে নররূপে এসেছিস।" আবার ঐ দিনই অন্য সময়ে বলিয়াছিলেন, "দেখ না নিরঞ্জন! কিছুতেই লিপ্ত নয়। নিজের টাকা দিয়ে গরীবদের ডাক্তারখানায় নিয়ে যায়। বিবাহের কথায় বলে, 'বাপরে, ও বিশালাক্ষীর দ!' ওকে দেখি যে,

একটা জ্যোতির উপর বসে রয়েছে” (‘কথামৃত,’ ৪র্থ ভাগ, ২৬৪-২৬৬ পৃঃ)। কাশীপুরেও (২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৮৫) এই অনুপম স্নেহ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, “তুই আমার বাপ, তোর কোলে বসব।”

এই সকল ঘটনায় ও আলাপপ্রসঙ্গে নিরঞ্জনের প্রতি ঠাকুরের অগাধ ভালবাসা ও বিশ্বাসের পরিচয় পাই; কিন্তু ঠাকুর কখনও স্নেহান্ধ ছিলেন না। প্রয়োজন হইলে শুভাকাঙ্ক্ষী পিতার ন্যায় তিনি কঠোর শাসনেও বিরত হইতেন না—“শ্রীযুক্ত নিরঞ্জনের স্বভাবতঃ উগ্রপ্রকৃতি ছিল। গহনার নৌকায় করিয়া একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কালে আরোহীসকলকে ঠাকুরের অযথা নিন্দাবাদ করিতে শুনিয়া তিনি প্রথমে উহার তীব্র প্রতিবাদে নিযুক্ত হইলেন এবং তাহাতেও উহারা নিরস্ত না হওয়াতে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া নৌকা ডুবাইয়া দিয়া উহার প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইলেন। নিরঞ্জনের শরীর বিশেষ বলিষ্ঠ ও দৃঢ় ছিল এবং তিনি বিলক্ষণ সন্তরণপটু ছিলেন। তাঁহার ক্রোধদৃপ্ত মূর্তির সম্মুখে সকলে ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল এবং অশেষ অনুনয়, বিনয় ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিন্দাকারীরা তাঁহাকে ঐ কর্ম হইতে নিরস্ত করিল” ঠাকুর ঐ কথা পরে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, “ক্রোধ চণ্ডাল, ক্রোধের বশীভূত হতে আছে? সৎ ব্যক্তির রাগ জলের দাগের মত, হয়েই মিলিয়ে যায়। হীনবুদ্ধি লোকে কত কি অন্যায়কথা বলে, তা নিয়ে বিবাদবিসংবাদ করতে গেলে ওতেই জীবনটা কাটাতে হয়। ওরূপ স্থলে ভাববি, লোক না পোক (কীট) এবং তাদের কথা উপেক্ষা করবি। ক্রোধের বশে কি অন্যায় করতে উদ্যত হয়েছিলি, ভাব দেখি—দাঁড়ি-মাঝিরা তোর কি অপরাধ করেছিল যে, সেই গরীবদের উপরও অত্যাচার করতে অগ্রসর হয়েছিলি!” (‘লীলাপ্রসঙ্গ—দিব্যভাব,’ ১৬০ পৃঃ)।

নিরঞ্জন তখন অধিক পরিমাণে ঘৃত ভোজন করিতেন জানিয়া ঠাকুর

তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, "অত ঘি খাওয়া? শেষে কি লোকের ঝি-বউ বার করবি?" ভক্তকে বিচারবুদ্ধিহীন হইতে তিনি নিষেধ করিতেন। অনুধাবন না করিয়া কিংবা আদর্শের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া কোন মতামত পোষণ বা প্রকাশ করিলে ঠাকুর তখনই সংশোধন করিয়া দিতেন। একদিন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিতেছিলেন, "এত ঐশ্বর্যভোগ করার পর যদি ঈশ্বরচিন্তা না করত, লোকে বলত, ধিক্।" নিরঞ্জন অমনি বলিয়া উঠিলেন, "দ্বারকানাথ ঠাকুরের ধার উনি সব শোধ করেছিলেন।" ঠাকুর কোন্ উচ্চ স্তর হইতে কথা বলিতেছেন তাহা নিরঞ্জনের ধারণা হয় নাই দেখিয়া তিনি বিরক্তির স্বরে বলিলেন, "রেখে দে ওসব কথা! আর জ্বালাস নে! ক্ষমতা থেকেও যে বাপের ধার শোধ করে না, সে কি আর মানুষ! তবে সংসারীরা একেবারে ডুবে থাকে, তাদের তুলনায় খুব ভাল—তাদের শিক্ষা হবে। ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত আর সংসারী ভক্ত অনেক তফাৎ। ...ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত...কামিনীকাঞ্চন স্পর্শ করবে না। কামিনীকাঞ্চন কাছে রাখবে না—পাছে আসক্তি হয়" ('কথামৃত', ৪র্থ ভাগ, ১৬৩-৬৪ পৃঃ)।

আবশ্যকক্ষেত্রে এইরূপ কঠিন শাসনাদি করিলেও ঠাকুরের কথায় ও কার্যে ভালবাসা ও বিশ্বাস শতধারে প্রবাহিত হইত। লাটু মহারাজ একদিন বলিয়াছিলেন, "নিরঞ্জন ভাইকে ঠাকুর একদিন ভাবাবেশে ছুঁয়ে দিলেন। তাতেই তিন দিন, তিন রাত্রি তার চোখের পাতা পড়ে নি, কেবল জ্যোতিঃ দেখেছে আর জপ করেছে। তিন দিন জিব থেকে তার জপ ছুটে যায় নি। ভারী ভূত নামাত কি না, তাই তিনি মস্করা করে বলেছিলেন—'এবার আর যে-সে ভূত নামে নি, একেবারে ভগবান ভূত ঘাড়ে চেপেছে। তোর সাধ্য কি যে তুই তাকে ঘাড় থেকে নামাস'" ('শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা,' ৪২৯ পৃঃ)।

দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের কোনও এক সুযোগে ঠাকুর নিরঞ্জনকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। "ভক্তদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে ঠাকুর স্পর্শ করা ভিন্ন কখন কখন আনবী বা মন্ত্রদীক্ষাও প্রদান করিতেন। ঐ দীক্ষা-প্রদানকালে তিনি সাধারণ গুরুগণের ন্যায় শিষ্যের কোষ্ঠীবিচারাদি নানাবিধ গণনা ও পূজাদিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু যোগদৃষ্টিসহায়ে তাহার জন্মজন্মাগত মানসিক সংস্কারসমূহ অবলোকনপূর্বক 'তোর এই মন্ত্র' বলিয়া মন্ত্রনির্দেশ করিয়া দিতেন। নিরঞ্জন, তেজচন্দ্র, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি কয়েকজনকে তিনি ঐরূপ কৃপা করিয়াছিলেন, একথা আমরা তাঁহাদের নিকট শ্রবণ করিয়াছি" ('লীলাপ্রসঙ্গ-দিব্যভাব,' ২১৫ পৃঃ)।

নিরঞ্জনও ঠাকুরের প্রেমে ও অধ্যাত্মস্পর্শে সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়া তাঁহাকেই জীবনের ধ্রুবতারারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ক্রমে তাঁহার স্বরূপের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাই শ্যামপুকুরে যে রাত্রে (৬ই নভেম্বর, ১৮৮৫) গিরিশাদি ভক্তগণ ঠাকুরের দেহে মা কালীর আবির্ভাব-সন্দর্শনে শ্রীপদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিলেন, সে রাত্রে নিরঞ্জনও ভক্তিগদ্‌গদ চিত্তে 'ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মময়ী' বলিয়া অঞ্জলিপ্রদানান্তে শ্রীচরণে মস্তক স্পর্শপূর্বক প্রণাম করিয়াছিলেন। কিন্তু এই স্বরূপের পরিচয় ছাড়াও বড় জিনিস ছিল, ঠাকুরের প্রতি প্রাণঢালা ভালবাসা—যাহার ফলে ত্যাগী সন্তানেরা ঠাকুরের একান্ত আপনার জন হইতে পারিয়াছিলেন। কাশীপুরে অবস্থানকালে পরীক্ষাচ্ছলে ঠাকুর একদিন (১৮৮৫ খ্রীঃ, ২৩শে ডিসেম্বর) নিরঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এই নিরঞ্জন বাড়ি গিছল। তুই বল দেখি, কি রকম বোধ হয়?" নিরঞ্জন কোন ইতস্ততঃ না করিয়া উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, আগে ভালবাসা ছিল বটে, কিন্তু এখন ছেড়ে থাকতে পারবার জো নাই" ('কথামৃত,' ৪র্থ ভাগ, ৩২৮ পৃঃ)।

নিরঞ্জন একে তো শক্তিশালী ও বীরভাবাপন্ন ছিলেন; তাহাতে

আবার ঠাকুরের শেষ অসুখের সময় তাঁহাকে সর্বতোভাবে রক্ষণ করা নিজের একান্ত কর্তব্য বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাকে অপরের অপ্রিয়-ভাজন হইতে হইত সত্য, কিন্তু সর্বদাই ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভালবাসার ঐকান্তিকতা দেখিয়া আগন্তুকগণ ক্ষুণ্ণ না হইয়া বরং মুগ্ধ হইতেন। ঠাকুরের অসুখের শেষ অবস্থায় যুবক ভক্তেরা স্থির করিয়াছিলেন যে, ঠাকুরের নিকট যখন-তখন যাহাকে-তাহাকে যাইতে দেওয়া হইবে না। বীরভক্ত নিরঞ্জন অগ্রণী হইয়া এই অত্যাবশ্যক অথচ অপ্রিয় কার্যের ভার লইয়াছিলেন। ঐ সময়ে ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় একদিন ঠাকুরের নিকট যাইতে চাহিলে নিরঞ্জন তাঁহাকে বাধা দিলেন। তখন রাম বাবু কিছু মিষ্টি ও মালা লাটুর হস্তে দিয়া বলিলেন, "ওরে, এগুলো উপর থেকে প্রসাদ করে এনে দে।" লাটু ইহাতে দুঃখিত হইয়া নিরঞ্জনকে বলিলেন, "এঁকে উপরে যেতে দাও না, ভাই। আপনা-আপনির মধ্যে এসব নিয়ম কি জারি করতে আছে?" নিরঞ্জন কিন্তু তখনও অটল। লাটু খোঁটা দিয়া বলিলেন, "শ্যামপুকুরে সেদিন দানা-কালী বিনোদিনীকে সাহেব সাজিয়ে নিয়ে এসেছিল, তুমি তাকে ছেড়ে দিতে পারলে, আর আজ এঁর মত লোককে ছাড়তে চাইছ না?" পাঠকের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে বিনোদিনী নাম্নী এক ভক্তিমতী অভিনেত্রী শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষের (দানা-কালীর) নিকট ঠাকুরকে দেখিবার জন্য বিশেষ আর্তি প্রকাশ করে। ঐ সময়ে নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তেরা নিয়ম করিয়াছিলেন যে, ঐ জাতীয় স্ত্রীলোকদিগকে ঠাকুরের নিকট যাইতে দেওয়া হইবে না; কারণ ইহাদের স্পর্শে ঠাকুরের অসুখ বৃদ্ধি পায়। দানা-কালী তখন অনন্যোপায় হইয়া বিনোদিনীকে সাহেব সাজাইয়া সঙ্গে লইয়া আসেন এবং এই ভাবে দ্বারী নিরঞ্জনকে ফাঁকি দিয়া

তাহাকে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত করেন। সেখানে গিয়া দানা-কালী অবশ্য সমস্ত খুলিয়া বলেন এবং এই প্রহসনের পর হাসি-ঠাট্টাও হয়। যাহা হউক, আলোচ্য দিবসে লাটুর কথায় নিরঞ্জনের মন গলিল এবং তিনি রাম বাবুকে বলিলেন, "আপনি উপরে যান।" অতঃপর লাটু উপরে গেলে অন্তর্যামী ঠাকুর সেই দিনকার সব জানিয়াই যেন লাটুকে বলিলেন, "দেখ, কারুর কখনও দোষ দেখবি নি, লোকের কেবল গুণ দেখবি।" ঠাকুরের কথায় লাটুর বড় দুঃখ হইল এবং তিনি নীচে নামিয়া নিরঞ্জনকে বলিলেন, "ভাই, আমার মত মুখ্যুর কথায় দুঃখ করিস নি।" বলা বাহুল্য নিরঞ্জন স্বীয় কর্তব্য পালন করিতেছিলেন; তাঁহার তখন সুখ-দুঃখের অবসর কোথায়?

এক পাগলিনী মাঝে মাঝে কাশীপুরে আসিয়া বড়ই উৎপাত করিত বলিয়া যুবক ভক্তেরা স্থির করেন যে, তাহাকে আর উপরে যাইতে দেওয়া হইবে না। একদিন দ্বিপ্রহরে আসিয়া সে জেদ করিতে লাগিল—সে উপরে যাইবেই। এদিকে নিরঞ্জনও কিছুতেই তাহাকে যাইতে দিবেন না। ইতোমধ্যে উপর হইতে খবর আসিল, ঠাকুর পাগলীকে ডাকিয়াছেন। সুতরাং শশী তাহাকে উপরে লইয়া গেলেন। পাগলী উপরে গেল বটে, কিন্তু তাহার প্রতি অধিকাংশ যুবক ভক্তদের বিরক্তি বৃদ্ধি পাইল বই হ্রাস হইল না। এই সময়ে কোমলহৃদয় রাখাল একদিন (১৮৮৬ খ্রীঃ, ১৬ই এপ্রিল) শ্রীরামকৃষ্ণের সমীপে আলাপপ্রসঙ্গে পাগলীর কথা উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, "দুঃখ হয় সে উপদ্রব করে, আর তার জন্য অনেকে কষ্টও পায়।" নিরঞ্জন অমনি বলিয়া উঠিলেন, "তোর মাগ আছে, তাই তোর মন কেমন করে। আমরা তাকে বলিদান দিতে পারি।" রাখালও বৈরাগ্যের নামে নিষ্ঠুরতা সহ্য না করিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি বাহাদুরী! ওঁর সামনে ঐ সব কথা" ('কথামৃত,'

২য় ভাগ, ২৬৬ পৃঃ)। দুইটি আদর্শের এক অপূর্ব সংঘর্ষ—একদিকে গুরুসেবা, অপর দিকে মাতৃজাতির সম্মান ও ভক্তপ্রীতি!

কর্তব্যানুরোধে ও বৈরাগ্যের প্রথমাবেগে নিরঞ্জনকে আপাততঃ একটু উগ্রপ্রকৃতির লোক মনে হইলেও তাঁহার চরিত্রে কোমলতার অভাব ছিল না। বস্তুতঃ তিনি সময়বিশেষে যেমন বজ্রাদপি কঠোর হইতেন, তেমনি কুসুমাদপি মৃদুও হইতে পারিতেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে যখন নরেন্দ্র প্রভৃতি অনেকে আঁটপুরে যান তখন নিরঞ্জনও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। সেখানে স্নান করিতে যাইয়া সারদা মহারাজ ডুবিয়া যান। তখন নিরঞ্জনই স্বীয় প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে পুষ্করিণী হইতে উদ্ধার করেন। এই সব কার্যে তাঁহার অপূর্ব তৎপরতা ও উৎসাহ ছিল। মঠের প্রথমাবস্থায় শশী মহারাজ একবার বাহিরে যাইয়া জ্বরগ্রস্ত হন। সংবাদ পাইয়া নিরঞ্জন তাঁহাকে সযত্নে মঠে লইয়া আসেন এবং শুশ্রূষাদি দ্বারা নিরাময় করেন। স্বামী যোগানন্দ যখন এলাহাবাদে বসন্তে আক্রান্ত হন, তখনও নিরঞ্জন অবিলম্বে তাঁহার রোগশয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হন। লাটু মহারাজ বলিয়াছেন, "কারুর অসুখ শুনলে, দৌড়ঝাঁপের কাজ নিরঞ্জন ভাই নিজের মাথায় নিত।" ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে লাটু মহারাজের নিউমোনিয়া হইলে নিরঞ্জন তাঁহার সেবার অনেকখানি দায়িত্বই নিজস্কন্ধে লইয়াছিলেন। বলরাম বাবুর শেষ অসুখের সময়ও স্বামী শিবানন্দ এবং সদানন্দের সহিত প্রাণ ঢালিয়া তিনি তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন।

মঠ যখন বরাহনগরে ছিল, তখন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ একদিন এক ছোট ঠোঙ্গায় করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের জন্য সন্দেশ আনিতেছিলেন। তখন কোনও দরিদ্র রমণী একটি ছোট ছেলেকে কোলে করিয়া রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। ছেলেটি নিরঞ্জনানন্দের হাতে খাবারের ঠোঙ্গা দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "আমি সন্দেশ খাব।" মা যত শাসন করে, ছেলের কান্না ততই

বাড়িয়া চলে। দেখিয়াই নিরঞ্জনানন্দ সন্দেশগুলি ছেলেটির সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "খাও বাবা, খাও।" কথা শুনিয়া রমণী বলিল, "না, বাবা, তুমি ঠাকুরসেবার জন্য সন্দেশ নিয়ে যাচ্ছ; এ খেলে ছেলের অমঙ্গল হবে।" নিরঞ্জনানন্দ বলিলেন, "না, মা, ছেলের কোন দোষ হবে না। ও খেলেই ঠাকুরের খাওয়া হবে।" এই বলিয়া ঠোঙাটি বালকের হস্তে দিয়া পুনরায় ঠাকুরের জন্য সন্দেশ সংগ্রহ করিতে চলিয়া গেলেন।

ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল—তাঁহার পূত দেহাবশেষ গঙ্গাতীরে সমাহিত হয়; কিন্তু প্রবীণগণ যখন স্থির করিলেন যে, উহা কাঁকুড়গাছিতে রামবাবুর উদ্যানে লইয়া যাওয়া হইবে, তখন কপর্দকহীন যুবক ভক্তগণ অন্য কোন পথ না দেখিয়া আপাততঃ ঠাকুরের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সযত্নে রক্ষার জন্য বলরাম-ভবনে পাঠাইয়া দিলেন এবং অতঃপর চিতাবশেষও যাহাতে হস্তচ্যুত না হয় তাহার উপায়-উদ্ভাবনে যত্নপর হইলেন। প্রবীণ ও নবীনদের এই মতদ্বৈধস্থলে মধ্যস্থ নরেন্দ্র অবশ্য প্রবীণদের দিকেই মত দিয়া তখনকার মত বিরোধের মীমাংসা করিলেন; কিন্তু ইতোমধ্যে শশী ও নিরঞ্জন গোপনে পরামর্শ করিয়া একটি নূতন পাত্রে "অর্ধেকেরও উপর ভস্মাবশেষ ও অস্থিনিচয়" সরাইয়া রাখিলেন এবং যথাকালে অবশিষ্ট অস্থিপূর্ণ পূর্বের তাম্রকলসীটি প্রবীণদের হস্তে তুলিয়া দিলেন। শশী ও নিরঞ্জনের সংরক্ষিত অস্থিই পরে 'আত্মারামের কৌটা'য় করিয়া আচার্য বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে আনেন; উহা অদ্যাপি তথায় রহিয়াছে ('উদ্বোধন' ১৭শ সংখ্যা, ৪৪০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

সম্ভবতঃ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে[১] বরাহনগরের মঠে যোগদানের পর নিরঞ্জন সন্ন্যাসগ্রহণান্তে নিরঞ্জনানন্দ নামে অভিহিত হইলেন। মঠে নিরঞ্জনানন্দের প্রধানতঃ তপস্যার দিকেই ঝোঁক দেখা যাইত। তবে

১ 'কথামৃত', ৩য় ভাগ, পরিশিষ্ট।

তিনি মঠের দৈনন্দিন শ্রমসাধ্য কার্য যথেষ্ট করিতেন এবং পূজাদিতেও অপরকে সাহায্য করিতেন। নিরবচ্ছিন্নভাবে মঠবাস তাঁহার হয় নাই; কারণ অন্যান্য গুরুভ্রাতার ন্যায় তিনিও মধ্যে মধ্যে তীর্থদর্শনে যাইতেন।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি একবার পুরীধামে যান এবং ৮ই এপ্রিল মঠে ফিরিয়া আসেন। ইহার পরে ১৮৮৯ অব্দের নভেম্বর মাসে তিনি তপস্যায় নির্গত হইয়া প্রথমে দেওঘরে ৺বৈদ্যনাথদর্শন করেন। দেওঘর হইতে তিনি কাশীতে যান এবং বংশীদত্তের বাটীতে থাকিয়া কিছুদিন তপস্যা করেন। ঐ সময়ে মাধুকরী ভিক্ষাই তাঁহার সম্বল ছিল। ইতোমধ্যে স্বামী যোগানন্দের অসুখের সংবাদ আসাতে তাঁহাকে তীর্থরাজ প্রয়াগে যাইতে হয় এবং এই সুযোগে সেখানে তাঁহার কল্পবাসও হয়। পরে তিনি উত্তর ভারতের অপরাপর তীর্থদর্শন করেন এবং কোন কোন স্থলে কিছুকাল তপস্যাও করেন।

স্বামী বিরজানন্দ যখন ১৮৯১-৯২ খ্রীষ্টাব্দে বরাহনগর মঠে যাতায়াত আরম্ভ করেন, তখন নিরঞ্জন মহারাজকে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতলায় ও ঠাকুরের ঘরে ধ্যান করিতে যাইতে দেখিতেন, বিরজানন্দও মধ্যে মধ্যে সঙ্গে যাইতেন। মঠে যোগ দিবার পূর্ববর্তী গ্রীষ্মাবকাশটি মঠে কাটাইয়া বিরজানন্দ মহারাজ আবার যখন গৃহে ফিরিয়া যান, তখন নিরঞ্জনানন্দজী মাঝে মাঝে তাঁহার বাটীতে যাইয়া তাঁহার বৈরাগ্য উদ্দীপিত করিতেন। পরে তিনি বিরজানন্দকে লইয়া কয়েকবার জয়রামবাটীতে গিয়াছিলেন। প্রথমবারে বিরজানন্দ যখন ম্যালেরিয়া লইয়া জয়রামবাটী হইতে মঠে আসেন, তখন স্নেহপরায়ণ নিরঞ্জন মহারাজ তাঁহাকে বলরাম-মন্দিরে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ঐ সময় তাঁহাকে গিরিশ বাবুর নিকট লইয়া গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাও শুনাইতেন।

অতঃপর স্বামী বিবেকানন্দের ২২।১০।৯৪ তারিখের পত্রে জানিতে

পারা যায় যে, নিরঞ্জনানন্দ তখন সিংহলে উপস্থিত। স্বামীজী লিখিতেছেন —"নিরঞ্জন সিলোনে পালিভাষা শিক্ষা কেন না করে এবং বৌদ্ধ গ্রন্থ অধ্যয়ন কেন না করে ? অনর্থক ভ্রমণে কি ফল—তা তো বুঝিতে পারি না।" স্বামী নিরঞ্জনানন্দ অবশ্য অনর্থক ভ্রমণ করিতেছিলেন না—সাধুর ভ্রমণ কখনই একেবারে ব্যর্থ হইতে পারে না। তিনি যখন যেখানে যাইতে-ছিলেন, সেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমাকীর্তন করিতেছিলেন এবং সর্বত্রই এইরূপে অনুরাগীর সংখ্যাবৃদ্ধি পাইতেছিল। স্বামীজীও যে ইহা অবগত ছিলেন না তাহা নহে ; তাই ঐ সময়েরই কিছু পূর্বে অপূর্ব পত্রে লিখিয়া-ছিলেন, "নিরঞ্জন এখন এমন কার্য করছে যে, তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে। আমি খবর রাখছি।" সিংহল হইতে ফিরিয়া আসার পরেও তাঁহার সৎকার্যের প্রশংসা করিয়া স্বামীজী লিখিয়াছিলেন, "নিরঞ্জন সিলোন প্রভৃতি স্থানে অনেক কার্য করিয়াছে।" বস্তুতঃ স্বামীজী চাহিতেন যে, তাঁহার গুরুভ্রাতারা যিনি যাহাই করুন না কেন, তাহা যেন আরও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। এই সদিচ্ছাই অনেক ক্ষেত্রে সমালোচনার রূপ ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিত। যাহা হউক, ঐ সময়ে নিরঞ্জন মহারাজ কিছু দীর্ঘকাল দক্ষিণ ভারত ও সিংহলে কাটাইয়া অবশেষে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের পূর্বেই আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসেন।

ক্রমে সংবাদ আসিল যে, স্বামীজী ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষে পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবেন। খবর পাইয়া নিরঞ্জনানন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য দ্রুত কলম্বো অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং পর বৎসর ১৫ই জানুয়ারী স্বামীজী জাহাজ হইতে অবতরণ করিলে তাঁহাকে সর্বপ্রথম অভ্যর্থনা জানাইলেন। অতঃপর তিনি স্বামীজীর সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। ঐ

বৎসর স্বামীজীর উত্তরভারত-ভ্রমণকালেও তিনি তাঁহার সহিত পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের বহু স্থানে গিয়াছিলেন। আবার ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী যখন আলমোড়ায় যান তখনও তিনি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

ঐ বৎসর তিনি আলমোড়া হইতে স্বামী শুদ্ধানন্দের সহিত কাশীতে আসিয়া বংশীদত্তের বাগানে পুনর্বার তপস্যায় রত হন। তখন তাঁহারা মাধুকরী করিয়া খাইতেন। কাশীতে অবস্থানকালে চারু বাবুর (স্বামী শুভানন্দের) সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইতঃপূর্বে চারু বাবু যখন একবার আলমবাজার মঠে যান তখন সেখানে স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সহিত পরিচিত হন। অধুনা ঠাকুরের এই অন্তরঙ্গকে সন্নিকটে পাইয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে লাগিলেন। তখন কাশীর কয়েকটি যুবক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মৌলিকদের বাড়িতে সম্মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে আলোচনাদি করিতেন। চারু বাবুর নিকট ঐ সংবাদ পাইয়া নিরঞ্জনানন্দ একদিন ঐ সভায় যোগ দিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে চারু বাবু সকলকে জানাইয়া দিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের জনৈক পার্ষদ কাশীতে আছেন এবং আগামী বৈঠকে তিনি উপস্থিত হইবেন। এই সংবাদে সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইলেন। চারু বাবু কর্তৃক আনীত শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি ছবি পূর্ব হইতেই কেদারনাথের গৃহে রক্ষিত ছিল। সেই দিবস উহা পুষ্পমাল্যে সজ্জিত হইল। পরে সায়ংকালে নিরঞ্জন মহারাজ যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্বভাবসুলভ সরল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের গুণানুকীর্তন করিতে থাকিলে ভক্তগণ তাঁহার ভাবমাধুর্যে মুগ্ধ হইলেন। ইহার কয়েক দিন পরেই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-তিথিতে তিনি কেদারনাথের গৃহে পুনর্বার উপস্থিত হইয়া স্বহস্তে পূজাদি সমাপন করিলেন। আয়োজন অল্প হইলেও সেদিন ভক্তদের উৎসাহ ছিল বিপুল; বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদের উপস্থিতি ও তাঁহার মুখে ভাবময়

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে ভক্তদের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রসাদবিতরণও হইয়াছিল। এইভাবে স্বামী নিরঞ্জনানন্দেরই পৌরোহিত্যে কাশীধামে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব প্রবর্তিত হয় এবং অতঃপর সেখানে নিত্য সন্ধ্যাকালে ঠাকুর ও স্বামীজীর কথা আলোচিত হইতে থাকে।

কাশীধামে কিছুদিন তপস্যাদিতে কাটাইয়া নিরঞ্জনানন্দ মহারাজ হরিদ্বারে চলিয়া গেলেন। এদিকে কেদারনাথের হৃদয়ে বৈরাগ্য সঞ্চিত হইতে লাগিল। ইতোমধ্যে স্বামীজীর শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দ হরিদ্বার যাইবার পথে কাশীতে নামিলেন এবং তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া কেদারনাথের বৈরাগ্য চরমে উঠিল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া চারু বাবু একদিন বলিলেন, "আর কেন, মশায়, এই বেলা বেরিয়ে পড়ুন।" কেদারনাথ প্রশ্ন করিলেন, "কোথায় যাব?" চারু বাবু বলিলেন, "হরিদ্বারে নিরঞ্জনানন্দ স্বামী আছেন। আপনি কিছুদিন তাঁর নিকটে গিয়ে থাকুন! আমি পত্র লিখে দিচ্ছি।" কেদারনাথ এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় চারু বাবু হরিদ্বারে পত্র লিখিয়া নিরঞ্জনানন্দকে কেদারনাথের গৃহত্যাগের সঙ্কল্প জানাইলেন। উত্তরে নিরঞ্জন মহারাজ অতি স্নেহপূর্ণ ভাষায় কেদারনাথকে এই পথের বিপুল বাধা-বিপত্তির কথা জানাইলেন এবং কঠোপনিষদের "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধার করিয়া ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন। কেদারনাথের হৃদয়ে কিন্তু তখন প্রবল বৈরাগ্য। তিনি অন্তরের আগ্রহ প্রতিহত করিতে অসমর্থ হইয়া চাকরি ছাড়িয়া দিলেন এবং গৃহত্যাগ করিয়া ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের একদিন হরিদ্বারে উপস্থিত হইলেন। নিরঞ্জন মহারাজ এই সময়ে একটি ছোট ভাড়াবাড়িতে থাকিতেন। কেদারনাথ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয়লাভের আশায় গৃহত্যাগ করে আপনার কাছে এসেছি!" নিরঞ্জন মহারাজ ইহাতে অত্যন্ত প্রীত

হইয়া তাঁহাকে সেখানে রাখিলেন এবং গেরুয়াবস্ত্র দিয়া কি ভাবে মাধুকরী করিতে হয় ও শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করিতে হয় ইত্যাদি সাধুচিত বৃত্তি শিখাইয়া দিলেন।

কেদারনাথের আগমনের কিছুকাল পরে স্বামী নিরঞ্জনানন্দের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হওয়ায় তিনি চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় যাইতে বাধ্য হইলেন। প্রায় আড়াই মাস পরেও শরীর সুস্থ না হওয়ায় তিনি কেদার-নাথকে লিখিলেন, "আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ এবং সেবাদির অসুবিধা হইতেছে। তুমি চলিয়া আসিলে ভাল হয়।" কেদারনাথ পত্র পাইয়াই অবিলম্বে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই সময় নিরঞ্জন মহারাজ ভবানীচরণ দত্ত লেনে মাস্টার মহাশয়ের একখানি ভাড়াবাড়িতে থাকিতেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা প্রায়ই তথায় যাইয়া তাঁহার চিকিৎসাদির ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেন। এই অসুখ দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়াছিল এবং এক সময়ে জীবনসঙ্কটও উপস্থিত হইয়াছিল।

কেদারনাথ কলিকাতায় আসিয়া একান্তমনে একাকীই দিবারাত্র নিরঞ্জন মহারাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। কিছুদিন পরে প্রয়োজনবোধে স্বামী বোধানন্দ মঠ হইতে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু স্বল্পকাল মধ্যেই উভয়ে অসুস্থ হইয়া বেলুড় মঠে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর স্বামী প্রেমানন্দ সেবার ভার লইলেন। এই সময়ে অখিল মিস্ত্রীর গলিতে অপর একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া রোগীকে সেখানে লইয়া যাওয়া হয়। জনৈক ভক্ত ঐ বাড়ির ভাড়া এবং চিকিৎসা ও পথ্যাদির সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হন। কেদারনাথ মঠে মাত্র তিন-চারি দিন থাকার পরেই স্বামী নিরঞ্জনানন্দের আহ্বানে পুনঃ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন, কিন্তু ইহাতে দুর্বল শরীর শীঘ্রই অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি কাশীতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। তথায় যাইয়া কেদারনাথ স্বীয় মানসিক

অশান্তি জানাইয়া নিরঞ্জন মহারাজকে পত্র লিখিলে তিনি উত্তরে তাঁহাকে প্রচুর উৎসাহ দিয়া লিখিলেন, জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট যাও, তথায় আমার সহিত দেখা হইবে।" নিরঞ্জনানন্দ আশা করিয়াছিলেন, তিনি শীঘ্রই সুস্থ হইবেন। কিন্তু শরীর আরও খারাপ হওয়ায় সেবারে তাঁহার আর জয়রামবাটী যাওয়া হইল না। যাহা হউক, সকলের ঐকান্তিক যত্নে ও ঠাকুরের কৃপায় তিনি দীর্ঘকাল পরে সেই যাত্রা সারিয়া উঠিলেন।

স্বামীজী দ্বিতীয়বার আমেরিকা হইতে (১৯০০ খ্রীঃ ডিসেম্বর) ভারতে ফিরিয়া আসিলে নিরঞ্জনানন্দ পুনর্বার তাঁহার সাহচর্যলাভের সুযোগ পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী যখন কাশীধামে বাস করিতে যান তখন তিনি তাঁহার জন্য বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের প্রাসাদোপম বাড়িটি সংগ্রহ করিয়া দেন। ঐ সময়েরই কিঞ্চিৎ পূর্বে প্রসিদ্ধ জাপানী শিল্পী ওকাকুরা ভারতে আসিয়া প্রাচীন স্থানগুলি দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে স্বামীজী নিরঞ্জন মহারাজকে তাঁহার সঙ্গে দেন এবং ওকাকুরা ও নিরঞ্জনানন্দ এক সঙ্গে বুদ্ধগয়া, আগ্রা, গোয়ালিয়র, অজন্তা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন করেন। ওকাকুরা নিরঞ্জন মহারাজের অমায়িক ব্যবহারে বিশেষ প্রীত হইয়া স্বামীজীকে লিখিত পত্রে অশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর শেষে কাশীধামে স্বামীজী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলে মহাপুরুষ শিবানন্দের সহিত নিরঞ্জনানন্দ তাঁহাকে বেলুড় মঠে লইয়া আসেন। মঠে আসিয়াও সেবায় নিরত নিরঞ্জন মহারাজ পাগড়ী-মাথায় যষ্টিহস্তে স্বামীজীর দ্বার রক্ষা করিতেন এবং ইহাতেই বিশেষ গৌরব অনুভব করিতেন। এই সেবাকালে একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনা হয় এবং উহাতে তাঁহার রহস্যবোধের আভাস পাওয়া যায়। স্বামীজীর কৃপাপ্রাপ্ত একজন ব্রহ্মচারী একদিন মায়াবতী হইতে আসিয়া স্বামীজীর দর্শন ভিক্ষা করেন।

দ্বারে উপস্থিত নিরঞ্জন মহারাজ তাঁহাকে চিনিতেন না; সুতরাং ভিতরে যাইতে দিলেন না। কিন্তু চতুর ব্রহ্মচারী ইহাতে নিরস্ত না হইয়া কথার অবসরে একটু সুযোগ পাইয়া দ্বাররক্ষকের পায়ের ফাঁক দিয়া গলিয়া গিয়া স্বামীজীর চরণবন্দনা করিলেন। অতঃপর স্বামীজীর নিকট হইতে ব্রহ্মচারীর পরিচয় পাইয়া নিরঞ্জনানন্দ তাঁহার উপর একটুও রাগ না করিয়া বরং অবলম্বিত কৌশলের জন্য খুব হাসিতে লাগিলেন।

এই সময়ের আর এক ঘটনায় তাঁহার নিস্পৃহতা ও চরিত্রের দৃঢ়তার পরিচয় পাই। স্বামীজী যখন কাশীতে ছিলেন, তখন কলিকাতার কোন এক ভদ্রলোক কাশীতে একটি শিবমন্দির নির্মাণ করিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া স্বামীজী মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ঐ ভদ্রলোক যদি আর্তদের জন্য সেখানে কিছু করিতেন তবে তিনি হাজার মন্দিরনির্মাণের ফল পাইতেন। লোকমুখে স্বামীজীর এই মন্তব্য শুনিয়া ভদ্রলোক তথাকার পুয়র মেনস্ রিলিফ্ এসোসিয়েশনে (পরবর্তী কালের রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে) প্রচুর অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি জানান। কিন্তু কালক্রমে তাঁহার উৎসাহ কমিয়া যাওয়ায় তিনি যখন প্রতিশ্রুত অর্থের মাত্রা-হ্রাস করিয়া অনেক কম টাকা দিতে চাহিলেন, তখন নিরঞ্জন মহারাজ বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীর দান প্রত্যাখ্যান করিলেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর প্রতি নিরঞ্জনানন্দের শ্রদ্ধা ছিল অনুপম। ইহার উল্লেখ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ একবার একখানি পত্রে তাঁহার অনন্যকরণীয় ভাষায় লিখিয়াছিলেন, "নিরঞ্জন লাঠি-বাজি করে; কিন্তু তার মায়ের উপর বড় ভক্তি। তার লাঠি হজম হয়ে যায়।" বস্তুতঃ এই ডান-পিটে মানুষটির অন্তস্তল যে কত কোমল, কত ভক্তিশ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ ছিল, তাহা কেহ বাহির হইতে বুঝিতে পারিত না। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার অনন্ত

ভাব লোকসমক্ষে প্রকটিত করিবার জন্য যেসব সাঙ্গোপাঙ্গকে লইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই চরিত্র লোকাতীত এবং বিস্ময়কর; অতএব বাহ্যতঃ কঠোরহৃদয় নিরঞ্জন মহারাজের হৃদয়ে কোথায় কোন্ দেবদুর্লভ ভাব আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহা আমরা বুঝিব কিরূপে? তাঁহার মাতৃভক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় কবি গিরিশচন্দ্রের কথায় পাওয়া যায়। তখনকার দিনে অনেক ভক্তই শ্রীশ্রীমাকে শুধু গুরুপত্নীরূপে জানিতেন—জগজ্জননীরূপে তিনি তখনও অনেকের হৃদয়েই আবির্ভূতা হন নাই। ঐ সময়ে জনৈক ভক্ত শ্রীযুক্ত দানা-কালীর গৃহে উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের বিভিন্ন প্রকারের ছবি দেখিতে পাইলেও মায়ের ছবি না দেখার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দানা-কালী ঠাকুরকে দেখাইয়া বলেন, "ইনিই আমার মা, ইনিই আমার বাবা।" এই ঘটনা উক্ত ভক্ত গিরিশচন্দ্রের নিকট নিবেদন করিলে তিনি বলেন, "আমিই কি প্রথমে মানতুম—নিরঞ্জনই আমার চোখ খুলে দিলে।" বস্তুতঃ ঐ সময় অপর কেহ কেহ মায়ের স্বরূপ অবগত হইয়া থাকিলেও প্রকাশ্যে উহা প্রচার করিতেন না—মনে মনেই ঐ ভাব পোষণ করিতেন। নিরঞ্জন মহারাজ কিন্তু সমস্ত কার্পণ্য বর্জন করিয়া ভক্তমহলে উহা বলিয়া বেড়াইতেন এবং আবশ্যক স্থলে যুক্তিতর্কের দ্বারা অপরকে স্বমতে আনিতেন। গিরিশচন্দ্র যখন পুত্রশোকে একান্ত বিহ্বল হইয়া কোনও অবলম্বন খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন নিরঞ্জন মহারাজ তাঁহাকে এই অমোঘ ঔষধের সন্ধান দেন এবং পরে স্বয়ং তাঁহাকে লইয়া গিয়া কিছুদিন জয়রামবাটীতে মাতৃভবনে বাস করেন। গিরিশবাবুকে জয়রামবাটী লইয়া যাইবার সময় স্বামী সুবোধানন্দ এবং ব্রহ্মচারী কানাই, হরিপদ প্রভৃতিও স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সঙ্গী হইয়াছিলেন এবং তিনি সানন্দে সকলের সর্বপ্রকার বন্দোবস্তের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বর্ধমানের পথে উচালন ও কামারপুকুর

হইয়া জয়রামবাটীতে উপস্থিত হন। তথায় পনর-ষোল দিন অবস্থানের পর নিরঞ্জন মহারাজ ও গিরিশ বাবু ব্যতীত সকলে ফিরিয়া আসেন ; গিরিশ বাবু ও নিরঞ্জন মহারাজ আরও কিছুদিন তথায় ছিলেন।

স্বামীজীর দেহত্যাগের পর নিরঞ্জন মহারাজ অধিকদিন ধরাধামে ছিলেন না। বেলুড় মঠ ও কলিকাতায় থাকা কালে তাঁহার পুরাতন ব্যাধি আমাশয়ের বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি হরিদ্বারে যাওয়া স্থির করিলেন। যাত্রার পূর্বে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর প্রতি তাঁহার ভক্তি শতধা উথলিয়া উঠিল। ইহার কারণ কেহ স্থির করিতে পারিলেন না—হয়তো তিনি চিরবিদায়ের আহ্বান অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন এবং উহারই এইভাবে কথঞ্চিৎ বাহিরে উন্মেষ হইয়াছিল। যাত্রার কিছুদিন পূর্ব হইতেই তিনি আবদার ধরিলেন, মা যেন তাঁহার সব করিয়া দেন। মাতৃ-হস্তে রন্ধন, মাতৃ-হস্তে আহার প্রভৃতি সমস্ত কার্যের জন্য তিনি মায়ের মুখ চাহিয়া থাকিতেন—যেন মায়ের অসহায় সন্তান মা ব্যতীত আর কাহাকেও জানে না। শেষ-মুহূর্তে যখন সত্যই বিদায় লইতে আসিলেন, তখন ধৈর্যের বাঁধন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল—অবোধ শিশুর ন্যায় নিরঞ্জন মহারাজ মায়ের দুটি চরণে লুটাইয়া পড়িয়া অধীরভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কী সেই করুণ মিনতি, আর কী সেই মাতৃচরণে আকুল প্রার্থনা! তারপর ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন—অন্তরে জানিলেন ইহাই শেষ বিদায়।

হরিদ্বারে আসিয়া তিনি এক ভাড়াবাড়িতে আশ্রয় গ্রহণপূর্বক তপস্যায় রত হইলেন। অতএব শরীরের উন্নতি না হইয়া অবনতিই হইতে লাগিল। তিনি আমাশয়ে ভুগিতেছিলেন ; তদুপরি অকস্মাৎ বিসূচিকা দেখা দিল। সেই প্রাণঘাতী রোগেই ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মে (২৭শে বৈশাখ, ১৩১১ বঙ্গাব্দ) বীরভক্ত জগজ্জননীর ক্রোড়ে বীরশয্যায় চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন—সে দৃশ্য একদিকে যেমন হৃদয়বিদারক, অপরদিকে তেমনি

বৈরাগ্যমণ্ডিত। পুণ্যতোয়া জাহ্নবীসকাশে তিনি শেষশয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন; সেবক কত অনুরোধ জানাইল শেষমুহূর্তে সান্নিধ্যলাভ ও সেবার অনুমতি পাইতে; কিন্তু নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর মন তখন সপ্তম সুরে বাঁধা, আর গীতার বাণী স্মরণ হইতেছে, "অরতির্জনসংসদি"—জনসমাজে বিরক্তি! তাই সেবককে সে অনুমতি দিলেন না; এমন কি, সেবক আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া নিকটে অগ্রসর হইলে তাঁহাকে নিরস্ত করিবার জন্ত স্বামী নিরঞ্জনানন্দের দুর্বল দেহেও কোথা হইতে যেন অমিত বলসঞ্চার হইল, চক্ষু দুইটি ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল, আর বিরক্তির সুরে বলিলেন, "তুমি কি আমায় নিশ্চিন্তমনে মরতেও দেবে না?" সন্ত্রস্ত সেবক সরিয়া গেলেন। তিনি আবার যখন ফিরিলেন, তখন অঞ্জনবিহীন, বন্ধনশূন্য নিত্যনিরঞ্জন জাগতিক সমস্ত সম্বন্ধ হইতে নির্মুক্ত হইয়া চিরসমাধিতে নিমগ্ন!

স্বামী শিবানন্দ

স্বামী শিবানন্দ যে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভূকৈলাসের রাজবংশের সহিত সম্পর্কিত তাঁহাদেরও উপাধি ছিল ঘোষাল। তাঁহার পিতা শ্রীযুত রামকানাই ঘোষাল মোক্তারি পাশ করিয়া বারাসতে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং উহাতে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা-লাভান্তে রানী রাস-মণির মোক্তার নিযুক্ত হন। কলিকাতা হইতে যশোহরগামী বড় রাস্তার উপরে রানীর একটি ছোট কাছারি-বাড়ি ছিল। ঘোষাল মহাশয় ঐ বাড়িতেই সপরিবারে বাস করিতেন এবং ঐ বাড়িতেই ১২৬১ সালের ২রা অগ্রহায়ণ (ইং ১৬ই নভেম্বর, ১৮৫৪) চান্দ্র কার্তিক, কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে, বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ১০ মিনিটে স্বামী শিবানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব নাম ছিল তারকনাথ ঘোষাল। পিতা রামকানাই এবং মাতা বামাসুন্দরী অনেককাল পুত্রমুখদর্শনে বঞ্চিত থাকায় ৺তারকেশ্বর মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া বৎসরাধিক কাল ব্যাকুলমনে পুরশ্চরণ উপবাস ও প্রার্থনাদি করিতে থাকেন। অবশেষে একরাত্রে বামাসুন্দরী স্বপ্নে দেখিলেন, বাবা ৺তারকেশ্বর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন, "তোমাদের ভক্তিতে আমি তুষ্ট হইয়াছি—তুমি সুপুত্রের জননী হইবে।" ৺তারকেশ্বরের কৃপায় লব্ধ সন্তানের নাম হইল তারক, আর তাঁহার আদরের ডাক নাম হইল ক্ষুদু। জ্যোতিষীরা জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিয়া জানাইলেন যে, পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসরে নবজাতকের সন্ন্যাসযোগ রহিয়াছে; আর যদি সে একান্তই গৃহে থাকে তবে রাজসম্মানের অধিকারী হইবে।

তারকের পিতা দেবীভক্ত ছিলেন। তিনি বাড়িতে তন্ত্রমতে পঞ্চমুণ্ডীর

স্বামী শিবানন্দ

আসন স্থাপনপূর্বক নিয়মিত উপাসনা করিতেন। প্রশস্ত তিথ্যাদিতে বিশেষ পূজায় অনেকে আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার গৃহে প্রসাদ পাইতেন। দূর দেশ হইতে সাধকগণ আসিয়া কখন কখনও ঘোষালভবনে আতিথ্য-স্বীকার করিতেন। ঘোষাল মহাশয় একদিকে যেমন প্রচুর অর্থোপার্জন করিতেন অপরদিকে তেমনি ব্যয় করিতেন মুক্তহস্তে। তিনি বারাসতের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী ছিলেন এবং উক্ত বিদ্যালয়ের পঁচিশ-ত্রিশটি ছাত্রকে বাড়িতে প্রতিপালন করিতেন। তারকের গর্ভধারিণী বামাসুন্দরী দেবী খুবই ধর্মপ্রাণা ও লক্ষ্মী ছিলেন, আর দেখিতে ছিলেন অতি সুন্দরী। ছাত্রদের ও পরিবারের সকলের রন্ধনাদি তিনিই করিতেন—রামকানাই পাচক ব্রাহ্মণ রাখিতে চাহিলেও রাজী হইতেন না। তারক ঐ পঁচিশ-ত্রিশটি ছেলেদেরই একজনের মত প্রতিপালিত হইতেন। প্রতি-বেশিনী কেহ যদি অভিযোগ করিতেন, "ছেলেটাকে একটু আদর-যত্ন করছে না", তাহাতে মাতা উত্তর দিতেন, "তাঁর ছেলে, আমার নয়। তিনি দয়া করে দিয়েছেন, তিনি ওঁকে দেখবেন।" ভক্তিমতী জননী স্নেহপুত্তলি তারককে ৺তারকনাথের হস্তে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্তমনে দৈনন্দিন কর্মে মগ্ন থাকিতেন।

কর্মোপলক্ষে ঘোষাল মহাশয় দক্ষিণেশ্বরেও যাইতেন এবং গঙ্গাস্নানান্তে লাল চেলি পরিয়া ৺মায়ের মন্দিরে ধ্যান করিতেন। তাঁহার যেমন লম্বাচওড়া চেহারা, তেমনি গৌর বর্ণ, আর বুকটা সর্বদাই লাল—দেখিয়া মনে হইত যেন সাক্ষাৎ ভৈরব। সঙ্গে একজন গায়ক থাকিত। ধ্যানে মগ্ন থাকা কালে গায়ক পশ্চাতে বসিয়া দেহতত্ত্ব ও শ্যামা-বিষয়ক গান গাহিত, আর ধ্যাননিরত সাধকের গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে থাকিত। মন্দির হইতে তিনি যখন বাহির হইতেন, তখন ভয়ে কেহ তাঁহার সম্মুখে আসিত না। দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের সময় শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত

তাঁহার পরিচয় হয়। সাধনকালে ঠাকুরের যখন অসহ্য গাত্রদাহ উপস্থিত হয়, তখন ঘোষাল মহাশয় সমস্ত শুনিয়া ইষ্টকবচ-ধারণের পরামর্শ দেন। এই কবচধারণ করা অবধি ঠাকুরের গাত্রদাহ একেবারে কমিয়া যায়।

সাধক পিতা ও ধর্মপ্রাণা জননীর একমাত্র আদরের দুলাল তারক ক্ষুদ্র শহরের গ্রামোচিত শ্যামল আবেষ্টনের মধ্যে মুক্ত আকাশের নিম্নে খেলিয়া বেড়াইতেন। বাবার বাক্স হইতে টাকা-পয়সা লইয়া পুকুরের জলে ছিনিমিনি খেলিয়া হাততালি সহকারে নাচিতেন। তিনি জিলাপি খুব ভালবাসিতেন; বাবা প্রিয়দর্শন বালকের জন্য থালার মত বড় জিলাপি করাইয়া আনিতেন। জীবজন্তুর মধ্যে কুকুর ছিল তাঁহার বড় আদরের—রাত্রে শয়নকালেও সে হইত তাঁহার সাথী। গাজনের ছড়া ছিল তাঁহার মুখস্থ, আর গাজনের সন্ন্যাসীদিগকে পরাস্ত করা ছিল এক অদ্ভুত খেয়াল। তিনি রাস্তায় গণ্ডি টানিয়া ছড়া কাটিতেন; আর সন্ন্যাসীদের ঐরূপ গণ্ডি অতিক্রম করিতে নাই বলিয়া তাঁহাদিগকে পরাজয় স্বীকারপূর্বক কাকুতি-মিনতি করিয়া নিস্তার পাইতে হইত।

তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল বারাসত মিশনারী স্কুলে। সেখানে অল্পদিন অধ্যয়নের পর তিনি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। কিন্তু মেধাবী হইলেও বালকের পাঠে মনোযোগ ছিল না—তিনি ছিলেন ভাবুক। শুনিয়া শুনিয়া তিনি অনেক ভজনগান শিখিয়াছিলেন। সুকণ্ঠ বালকের মুখে শ্যামাসঙ্গীত-শ্রবণে অনেকে মুগ্ধ হইতেন।

তারকের বয়স যখন প্রায় নয় বৎসর তখন তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। একটি তিন মাসের শিশু ভগ্নীকে রাখিয়া জননী পরলোকগমন করিলে নয় বৎসরের বালকের কোমল প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল এবং ভগ্নীটির লালনপালনে মনোনিবেশপূর্বক কথঞ্চিৎ ঐ শোকের উপশম করিতে হইল। কয়েক বৎসর পরে পিতা আবার দারপরিগ্রহ করিলে বিমাতাই মাতৃহীনা

ভগ্নার লালনভার লইলেন। বামাসুন্দরী দেবীই কিন্তু ছিলেন পরিবারের লক্ষ্মী; তাঁহার দেহত্যাগের পর ঘোষাল মহাশয়ের আয় অনেক কমিয়া গেল। অধিকন্তু দানপরায়ণ কানাই বাবু অর্থসঞ্চয় করিতে পারেন নাই; সুতরাং পরিবারে ক্রমেই অর্থাভাব দেখা দিতে লাগিল।

মাতৃবিয়োগের পর তারকনাথ ছুটির সময় নিমতা গ্রামে বড়মামার নিকট কাটাইয়া আসিতেন—মামী তাঁহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। কখনও বা তিনি পৈত্রিক গ্রাম বড়াতেও যাইতেন। এই গ্রামে ভাবী মহাপুরুষের ধ্যানপরায়ণ জীবন অনেকখানি পরিস্ফুট হইয়াছিল; শান্ত পল্লীর দীঘির ধারে একান্তে বসিয়া তিনি উদাসমনে গান গাহিতেন আর অনন্ত আকাশের পানে চাহিয়া কত কি ভাবিতেন। পল্লীর সৌন্দর্য, আকাশের অসীমতা, আর প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভাবী মহাপুরুষের ধ্যানের খোরাক যোগাইত।

তারকনাথের বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর তখন ম্যালেরিয়ার কঠিন আক্রমণে জীবনসংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। আরোগ্যলাভান্তে তিনি অন্যত্র বায়ু-পরিবর্তনের জন্য যান এবং বৎসরাধিক পরে সম্পূর্ণ সুস্থশরীরে বারাসতে ফিরিয়া পুনর্বার পাঠাভ্যাসে মন দেন। ইহার প্রায় বৎসরাধিক কালের মধ্যেই দুইটি পারিবারিক দুর্ঘটনায় তিনি খুবই ব্যথিত হন। তাঁহার দিদি চণ্ডীদেবী দুইটি সন্তানের মাতা হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং মধ্যমা ভগিনী ক্ষীরোদাও বালবিধবা হইয়া পিতৃগৃহে আশ্রয় লন। নবম বর্ষ বয়স হইতেই পরপর এইরূপ দুঃখের সম্মুখীন হইলে শুদ্ধমনে স্বভাবতঃই বৈরাগ্য আসে। স্বভাবতঃ অন্তর্মুখ তারকনাথ যে অতঃপর অন্তরের আরও নিবিড়তর প্রদেশে ডুবিয়া গিয়া প্রাণের দেবতার অমৃত স্পর্শের জন্য লালায়িত হইবেন—ইহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। প্রবেশিকা-শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতে তিনি এই অন্তর্দ্বন্দ্বের গুরুভারে

পীড়িত হইয়া অকস্মাৎ তীর্থাদিভ্রমণে বহির্গত হইলেন। পাঠাভ্যাস এইখানেই সমাপ্ত হইল; কিন্তু স্বাবলম্বী তারকনাথ নিজের পায়ে দাঁড়াইবার প্রয়োজনবোধে রেলওয়েতে চাকরি লইলেন। এই চাকরি উপলক্ষে তাঁহাকে কয়েক বৎসর পশ্চিমাঞ্চলে গাজী-আবাদ, মোগলসরাই প্রভৃতি স্থানে কাটাইতে হইয়াছিল। তৎকালীন মনোভাব সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন, "ছেলেবেলা থেকেই সংসার ভাল লাগত না। প্রাণে ধর্মভাবও ছিল; আর কখনও বিয়ে করে সংসারে বদ্ধ হব না—এ ভাবও হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। দেশভ্রমণ করব, নানা তীর্থাদি দেখে বেড়াব—এই ইচ্ছাটাও বোধ হয় জন্মগত ছিল। রেলে চাকরি করতাম আর ভগবানকে ডাকতাম।"

শৈশব হইতেই তিনি মা কালীর ভক্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার কেবলই মনে হইত, "বিরাট ভগবান—কি করে এতটুকু মূর্তির ভেতর বদ্ধ হয়ে থাকা সম্ভব?" জ্যোৎস্না রাত্রে আকাশের দিকে তাকাইয়া বা অন্ধকারে নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তিনি আপনাকে বিলাইয়া দিতে চাহিতেন এক নিরাকার সর্বব্যাপীর মধ্যে; আর আকাশে মেঘসঞ্চার হইলে তৎপশ্চাতে তিনি আভাস পাইতেন সেই অব্যক্ত অসীমের! গাজী-আবাদে বাসকালে তিনি একতারা লইয়া আপন-মনে ভজন গাহিতেন। যে উচ্চপদস্থ রেলকর্মচারীর বাটীতে তিনি থাকিতেন, তিনি হঠাৎ মারা গেলে ভাবুক তারকনাথ মৃতের সৎকারান্তে গৃহে ফিরিয়া উদাস-হৃদয়ে গাহিতে লাগিলেন—

"দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী?

সুখে দুঃখে সম বন্ধু এমন কে, শোক-তাপ-ভয়-হারী" ইত্যাদি।

গানের নেশা যখন কাটিল তখন সবিস্ময়ে দেখিলেন, শূন্যগৃহে তিনি একা—বাটীর অপর সকলে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। তারক অতঃপর যখন

মোগলসরাইয়ে ছিলেন, তখনও এইরূপ নিভৃত চিন্তায় দিন কাটিত। বস্তুতঃ ইহা ছিল তাঁহার স্বভাব। তাঁহার অন্তর্লীন মন তখন হইতেই স্থির করিয়া লইয়াছিল যে, এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের পশ্চাতে যে সত্য শিব সুন্দর আছেন, তিনিই একমাত্র ধ্যেয়; আর তাঁহার মনে চিন্তা উঠিত, "সমাধি জিনিসটা কি?" শিবের সমাধিমগ্ন মূর্তি, বুদ্ধদেবের ধ্যানমূর্তি তাঁহার খুব ভাল লাগিত। মোগলসরাইয়ে তাঁহার সঙ্গী প্রসন্ন বাবু তারকের সমাধিস্পৃহা দেখিয়া একদিন বলিলেন যে, সমাধি অতি দুর্লভ জিনিস; একমাত্র তেমন লোক আছেন দক্ষিণেশ্বরে—পরমহংসদেব—যাঁহার ঠিক ঠিক সমাধি হয়। শুনিয়া অবধি তারক সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন। কিন্তু সে সুযোগ আসিতে আরও আড়াই বৎসর কাটিয়া গেল।

মন যখন এমনি ঊর্ধ্বগামী তখনই আবার পিতার নিকট হইতে প্রস্তাব আসিল যে, তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইবে। বিবাহের প্রসঙ্গ পূর্বেও উঠিয়াছিল এবং তারক তাহা অনায়াসেই নিরাস করিয়াছিলেন। কিন্তু এবারের প্রস্তাব উপস্থিত হইল একটা জটিল সমস্যার আকারে। সংসারের অসচ্ছলতার মধ্যে কন্যা নীরদার বিবাহের জন্য চিন্তান্বিত রামকানাই বাবু বাধ্য হইয়া বরপক্ষের এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন যে, নীরদাকে যে উচ্চ বংশে পাত্রস্থা করিবেন, তারককেও তাঁহাদের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে হইবে। এই বিনিময়-বিবাহ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই দেখিয়া তারক অতীব দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। এই মাতৃহীনা স্নেহের পুত্তলি ভগিনীটিকে তিনি কত আদরে লালন-পালন করিয়াছিলেন—আজ কি তাহার প্রতি তাঁহার কোন কর্তব্য নাই? গত্যন্তর না দেখিয়া তিনি সম্মত হইলেন এবং যথাকালে উভয় বিবাহই হইয়া গেল। ঘোষাল-পরিবারে পুত্রবধূরূপে আসিলেন মহেশ্বরপুর গ্রামের ৺পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা সর্বসুলক্ষণা শ্রীমতী নিত্যকালী দেবী।

ঐ সময়ে ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জির আফিসে একটি পদ খালি হইলে তারকনাথ বন্ধুগণের পরামর্শে ঐ পদে যোগদানপূর্বক কলিকাতায় এক আত্মীয়ের বাটীতে আসিয়া উঠিলেন। বাটীটি কেশব সেনের 'লিলি কটেজের' নিকটে অবস্থিত থাকায় তারকনাথ নিয়মিতভাবে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন এবং উপাসনাদিতে যোগ দিতেন। সমাজের বিধিবদ্ধ উপাসনায় কিন্তু তিনি তৃপ্ত হইতেন না—তাঁহার মনে হইত উহা একান্তই অগভীর। তাই গৃহে ফিরিয়া রাত্রে চক্ষের জলে ভাসিয়া ভগবানের নিকট প্রাণের আকুলতা নিবেদন করিতেন, "হে প্রভু, আমায় ঠিক পথের সন্ধান দাও।" ছুটির দিনে তিনি বাড়িতে যাইতেন; কিন্তু নিত্যকালী দেবীর প্রতি ভরণ-পোষণ ব্যতীত অন্য কোন দায়িত্ব স্বীকার করিতেন না। পরিবারের এক সঙ্কট-মুহূর্তে স্বীয় কর্তব্য পালন করিয়াছেন বলিয়া তিনি আদর্শ ছাড়িতে পারেন না; তাই সহধর্মিণীকে মনের ভাব জানাইয়া নিজেকে সমস্ত মায়িক সম্পর্ক হইতে মুক্ত রাখিতেন।

যে আত্মীয়ের গৃহে তারকনাথ বাস করিতেন, কিছুদিন পরে তিনি সিমলা-পল্লীতে রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাটীর নিকটে উঠিয়া আসিলেন। ইংরেজী ১৮৮০ অব্দের শেষভাগে একদিন পরমহংসদেব রামবাবুর বাটীতে শুভ পদার্পণ করিলে সংবাদ পাইয়া তারকনাথ সেখানে উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখেন একঘর লোক উৎকর্ণ হইয়া ঠাকুরের অমৃতবাণী পান করিতেছে! ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর ভাবাবস্থ—আড়ষ্টস্বরে বলিতেছেন, "আমি কোথায়?" একজন কহিলেন, "রামের বাড়িতে।" ঠাকুর "ও ও" বলিয়া খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সমাধিতত্ত্ব বলিতে লাগিলেন। তারকের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল—যে জিনিসটা জানিবার জন্য তাঁহার এত আগ্রহ আজ প্রত্যক্ষানুভূতিসম্পন্ন ঠাকুরের আচরণে ও শ্রীমুখের বাণীতে তাহারই সবিশেষ পরিচয় পাইলেন।

কথা-শেষে তারক বাটীতে ফিরিতে উদ্যত হইলে রাম বাবু তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন এবং প্রসাদ গ্রহণ করাইলেন।

দেবমানবের প্রথম সন্দর্শনেই তারকনাথের মন-প্রাণ তাঁহার চরণে অর্পিত হইল; তিনি পুনর্বার তাঁহার দর্শনের জন্য আকুল হইয়া দক্ষিণেশ্বর-বাসী এক সহকর্মীর সহিত পরামর্শক্রমে স্থির করিলেন যে, শনিবারে আফিসের ছুটির পর সেখানে যাইবেন। চলতি নৌকায় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া প্রথমে বন্ধুর বাটীতে উঠিলেন এবং স ন্ধ্যার সময় কালীবাড়িতে গেলেন। আলোকের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে আঁধারের তরল ছায়া তখন উদ্যানের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে—কোন্ এক অজানা যেন ধীর-পদক্ষেপে অগ্রগামী। ঠাকুর তখন পশ্চিম দিকের গোল বারান্দায় গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া যেন কাহার আগমনপ্রতীক্ষায় আছেন। তারক আবিষ্টের ন্যায় তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আগে কোথাও আমায় দেখেছিলে কি?" তারক রাম বাবুর বাড়ির দর্শনের কথা বলিলে তিনি রাম বাবুর কুশল-জিজ্ঞাসান্তে তারককে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং ছোট খাটটিতে বসিলেন। ঠাকুরকে দেখিয়াই তারকের মনে হইয়াছিল যেন 'মা'; তিনি পুরুষ কি স্ত্রী—এরূপ চিন্তা মনে আসিল না। গৃহে প্রবেশ করিয়া সাক্ষাৎ জননীজ্ঞানে ঠাকুরের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া পুনর্বার প্রণাম করিলেন এবং ঠাকুরও তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন—যেন কত আপনার জন! ঠাকুরের চক্ষে করুণা ঝরিয়া পড়িতেছে! ততক্ষণে মন্দিরে মন্দিরে আরতির মধুর কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে। ভাবাবিষ্ট ঠাকুর টলিতে টলিতে মন্দিরের দিকে চলিলেন। তারকও যন্ত্রচালিতবৎ অনুসরণ করিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সাকার মান, না নিরাকার?" তারকনাথ বলিলেন, "নিরাকারই আমার ভাল লাগে।" ঠাকুর শুধু বলিলেন, "শক্তি মানতে

হয়।" মন্দিরে আসিয়া ঠাকুর মা কালীকে প্রণাম করিলেন। তারকের ব্রাহ্মসংস্কার প্রথমে বাধা দিলেও যুক্তি জানাইয়া দিল যে, ব্রহ্ম সর্বানুস্যূত হইলে তিনি প্রতিমাতেও থাকিবেন না কেন? সুতরাং তিনিও সশ্রদ্ধ প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তে ঠাকুর স্বগৃহে ফিরিলেন। অনন্তর বিদায়গ্রহণকালে তারক সেই রাত্রে ঐ স্থানেই যাপন করিতে আদিষ্ট হইয়া বলিলেন যে, পূর্ব হইতেই বন্ধুগৃহে থাকার ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর তখন প্রসন্ন-মুখে অনুমোদন করিলেন, "কথা রাখতে হয়—সত্য কথা কলির তপস্যা।" খানিক মৌন থাকিয়া আবার বলিলেন, "আচ্ছা, কাল এসো।"

শ্রীরামকৃষ্ণচরণে অর্পিতপ্রাণ তারকনাথ ভদ্রতার খাতিরে বন্ধুগৃহে পরদিবস অপরাহ্ণ পর্যন্ত কাটাইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে সস্নেহে গ্রহণ করিলেন এবং রাত্রিতে সযত্নে প্রসাদী লুচি খাওয়াইয়া দক্ষিণের বারান্দায় শয়নের স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। মনের আনন্দে সে রাত্রে তারকের ঘুম হইল না। মধ্য-রাত্রে দেখেন উলঙ্গ ঠাকুর ভাবের ঘোরে পায়চারি করিতেছেন আর আপন-মনে কি যেন বলিতেছেন। পরে বারান্দায় আসিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিলেন, "ওগো, ঘুমিয়েছ কি?" সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া তারক বলিলেন, "না তো, ঘুমুই নি।" আদেশ হইল, "একটু রাম-নাম শোনাও তো।" তারক রাম নাম গাহিতে লাগিলেন। এইরূপে দিব্য আবেশে রাত্রিযাপনান্তে সকালে বিদায় লইতে গেলে ঠাকুর বলিলেন, "আবার এসো—একলা।"

পরবর্তী দর্শনের সময় ঠাকুর আরও কৃপা করিলেন। সেই দিন হঠাৎ স্বীয় শ্রীচরণ তারকের বক্ষে তুলিয়া দিয়া দিব্যস্পর্শে তাঁহাকে এক ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিরাজ্যে লইয়া গেলেন। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কতক্ষণ ছিলেন, তারক তাহা বুঝিতে পারেন নাই; যখন জ্ঞান হইল, দেখেন ঠাকুর মাথায়

হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতেছেন, "মা, নেমে এস, নেমে এস।" সেই স্পর্শে তারক সেই দিন ঠিক ঠিক অনুভব করিলেন যে, তিনি শাশ্বত চিরমুক্ত আত্মা ; আর ঠাকুর সেই সনাতন আদিকারণ ঈশ্বর—জগতের কল্যাণের জন্য নরদেহে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অনুভূতিতে ঠাকুরকে ঐরূপে জানিলেও দৈনন্দিন ব্যবহারে উভয়ের সম্বন্ধ ছিল মাতা ও সন্তানের। 'কথামৃতে'ও (৪র্থ ভাগ, ৫ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ) ইহার আভাস পাওয়া যায়। একদিন 'কথামৃত'-কার উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, "ঠাকুর তারকের চিবুক ধরিয়া আদর করিতেছেন—তাঁহাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন।" বস্তুতঃ উভয়ের সহজ মিলনের মধ্যে ঐশ্বর্যের স্থান ছিল না। তারক বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর যে ঈশ্বর সে কথা এখন যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি। আগে ঠাকুরের ভালবাসার বন্ধনেই তাঁর কাছে ছিলাম। তিনিও ওরূপ ভালবাসতেন ; কেউ অবতার ভগবান ইত্যাদি বললে বিরক্ত হতেন—ওতে আপন-বুদ্ধি যেন একটু কমে যায়।" তারক যতই স্বাধীন, স্বাবলম্বী হউন না কেন এবং শৈশব হইতে যতই দুঃখের সহিত সুপরিচিত থাকুন না কেন, তাঁহার অন্তরটি ছিল বড়ই কোমল। কখনও বা তাঁহার মনে হইত, ঠাকুরের নিকট খুব কাঁদেন। বকুলতলায় একদিন তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "দ্যাখ্, ভগবানের কাছে কাঁদলে তাঁর ভারি দয়া হয়—জন্ম-জন্মান্তরের মনের গ্লানি অনুরাগ-অশ্রুতে ধুয়ে যায়।" আর একদিন পঞ্চবটীতে ধ্যানকালে ঠাকুরকে ঝাউতলার দিক হইতে আসিতে দেখিয়া তাঁহার হুহু করিয়া কান্না পাইল, বুকের ভিতর গুড়্‌গুড়্ করিয়া উঠিল এবং শরীর এমনি কাঁপিতে লাগিল যে, আর থামে না। বস্তুতঃ কুণ্ডলিনী-জাগরণ যেন ঠাকুরের মুঠোর মধ্যে ছিল—তিনি না ছুঁইয়া, দূরে দাঁড়াইয়া কৃপাকটাক্ষে তাহা করিতে পারিতেন।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট যাঁহারা থাকিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে রাত্রি তিনটার সময় উঠাইয়া ধ্যানে বসাইতেন। কোন দিন বা কীর্তন হইত—সঙ্গে খোল বাজিত। আবার কোনও দিন নৃত্য হইত—লাজুক কেহ বসিয়া থাকিলে ঠাকুর জোর করিয়া নাচাইতেন। ঠাকুরের সঙ্গগুণে রাত্রি তিনটায় উঠা তারকের এমনই সহজসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, শেষ বয়সেও এই অভ্যাস অটুট ছিল। দক্ষিণেশ্বরে তখন ভয়ে ভয়ে থাকিতে হইত; কারণ সদা-সতর্ক ঠাকুর চাহিতেন, তাঁহার যুবক-ভক্তগণ অনুক্ষণ ভগবদ্ভাবে বিভোর থাকেন। রাত্রে তাঁহার ঘুম বড় একটা হইত না। তারক প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিতেন, "হ্যাঁরে, তোরা কি এখানে ঘুমুতে এসেছিস? সারা রাত যদি ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিবি তবে মাকে ডাকবি কখন?" সমাগত ভক্তদের অনেকেরই ভাব হইতেছে দেখিয়া তারক একদিন ঠাকুরকে ভাবসমাধির জন্য ধরিয়া বসিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "হবে রে হবে—এত উতলা হচ্ছিস কেন? মা কৃপা করে সময়ে সব দেবেন। তবে তোর মূর্তিদর্শন এখন হবে না, পরে হবে। তোর ঘর আলাদা।" তারপর একদিন ঠাকুর অঙ্গুলি-দ্বারা তাঁহার জিহ্বায় কি যেন লিখিয়া দিলেন, অমনি তারকের বাহ্যজ্ঞান লোপ হইল। অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর ধীরে ধীরে বুকে হাত বুলাইয়া জ্ঞান ফিরাইয়া আনিলেন এবং সস্নেহে মিষ্টান্নাদি খাইতে দিয়া সাধন সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। সেই ভাবের নেশা তাঁহার অনেক দিন ছিল। সাধন-ভজন ছাড়া অপরাপর বিবিধ বিষয়েও ঠাকুর উপদেশ দিতেন। তারক গঙ্গাতেই শৌচাদি করেন শুনিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, "সে কি গো! গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি—ওতে কি শৌচ করতে আছে?" আর এক দিন বলিয়াছিলেন যে, সাধুদর্শনে শুধু হাতে যাইতে নাই—অন্ততঃ এক পয়সার পান লইয়া যাইতে হয়। তারক সে উপদেশ পালন করিতেন।

এতদ্ব্যতীত একদিন অভিমান ত্যাগ করাইবার জন্য তারকনাথকে দক্ষিণেশ্বরে ভিক্ষায় পাঠাইয়াছিলেন।

অপর একসময়ে ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "ছাখ, এখানে কত লোক আসে; কিন্তু কার বাড়ি কোথায় বা কার ছেলে, এসব কাউকে কখনও জিজ্ঞাসা করি নে, জানতে ইচ্ছাও হয় না। তোকে প্রথম দেখেই মনে হয়েছে, তুই এখানকার লোক; আর তোর বাড়ি কোথায়, বাপের নাম কি ইত্যাদি খবর জানতে ইচ্ছা হচ্ছে। কেন বল তো?" তারক পিতৃপরিচয় দিলে ঠাকুর আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "বটে! তুই কানাই ঘোষালের ছেলে? তাই তো বলি, মা কেন তোর বাড়ির খবর নেবার ইচ্ছা জাগিয়ে দিয়েছিলেন! ...তাঁকে একবার আসতে বলিস তো!" তারকনাথ বাবাকে ঠাকুরের অভিপ্রায় জানাইলে তিনি হৃষ্টচিত্তে দক্ষিণেশ্বরে আসেন। অমনি ভাবস্থ ঠাকুর তাঁহার স্কন্ধে একখানি চরণ তুলিয়া দেন এবং ঘোষাল মহাশয় আর্থিক সচ্ছলতা প্রার্থনা করেন। উত্তরে ঠাকুর বলেন, "মার ইচ্ছা হলে তাই হবে।"

তারকের মনের অন্তস্তলে তখন এক গভীর আলোড়ন চলিতেছে। তিনি বিবাহিত—স্ত্রীর ভরণ-পোষণের জন্য ধর্মতঃ দায়ী; অথচ মন এই স্বভাববিরুদ্ধ কৃত্রিম জীবনে সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ। কাজ করিতে করিতে অসহনীয় প্রাণের আবেগে চক্ষে ধারা নির্গত হয়; কাগজ-পত্র ইতস্ততঃ ফেলিয়া রাখিয়া অকস্মাৎ নৌকাযোগে তিনি ছুটেন দক্ষিণেশ্বরে। সুযোগ বুঝিয়া তারকনাথ একদিন স্বীয় বিবাহ ও অন্তর্বিপ্লবের কথা ঠাকুরের নিকট নিবেদন করিলে তিনি বলিলেন, "ভয় কিরে—আমি আছি! স্ত্রী যত দিন বেঁচে থাকবে তাকে দেখা-শুনা করতে হবে বৈ কি! একটু ধৈর্য ধর—মা সব ঠিক করে দেবেন। বাড়িতে মাঝে মাঝে যাবি, আর যেমন বলে দিচ্ছি তেমনটি করবি—তাঁর কৃপায় স্ত্রীর সঙ্গে থাকলেও কোন ক্ষতি

হবে না।" এই বলিয়া তারকের বক্ষ ও মস্তকে হাত দিয়া খুব আশীর্বাদ করিলেন। আর একবার তিনি তারককে নিদ্রার পূর্বে চিত হইয়া শুইয়া ভাবিতে বলিয়াছিলেন, যেন মা কালী বুকের উপর দাঁড়াইয়া আছেন; ঐরূপ ভাবনার ফলে ভক্তিলাভ ও কামজয় হয়। অন্যসময়ে ঠাকুর তারকের মনে স্বীয় মাতৃভাবের ছাপও দৃঢ় অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন; দক্ষিণেশ্বরে নহবতে শ্রীশ্রীমায়ের অবস্থানকালে একদিন বলিয়াছিলেন, "ঐ যে মন্দিরে মা রয়েছেন, আর এই নহবতের মা—অভেদ।" স্বভাবতঃ সংযমশীল তারকনাথ তখন হইতে আপনাকে দেবরক্ষিত জানিয়া নির্ভয় হইলেন। তিনি প্রয়োজনানুসারে বাটীতে যাইতেন এবং স্ত্রী অসুস্থ হইলে তাঁহার সেবাশুশ্রূষাদিরও ব্যবস্থা করিতেন; কিন্তু নিজে সর্বদা অনাসক্ত থাকিতেন। পররর্তী কালে এই সকল কথা উল্লেখ করিয়া তিনি রোমাঁ রোলাঁকে লিখিয়াছিলেন যে, জীবনে তিনি কখনও স্ত্রীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করেন নাই। আশ্চর্য গুরু আর আশ্চর্য তাঁহার শিষ্য!

তারকনাথ দেখেন আর শিখেন। কিন্তু ঠাকুরের তীক্ষ্ণদৃষ্টি রহিয়াছে যাহাতে তিনি নির্বিচারে যাহার-তাহার অনুকরণ না করেন। একসময়ে 'কথামৃত'-কারের দৃষ্টান্তে তিনি ঠাকুরের কথা টুকিয়া রাখিতে আরম্ভ করেন। এই কাজের সুবিধার জন্য একদিন নিবিষ্টমনে ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া সব কথা ভাল করিয়া শুনিতেছেন, এমন সময় ঠাকুর হঠাৎ বলিলেন, "কি রে, অমন করে কি শুনছিস?" অপ্রস্তুত হইয়া তারক নিরুত্তর রহিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "তোর ওসব কিছু করতে হবে না—তোদের জীবন আলাদা।" সেদিন হইতে লিখার সঙ্কল্প নষ্ট হইল এবং যাহা লিখা হইয়াছিল তাহাও গঙ্গাগর্ভে স্থান পাইল।

এই জাতীয় ঘটনা তাঁহার জীবনে আরও ঘটিয়াছিল। একবার দক্ষিণেশ্বরে এক বৈষ্ণব সাধু আসেন। তাঁহাদের সম্প্রদায় রাধা মানেন

না, কৃষ্ণ মানেন ; সাধুটির ইচ্ছা ছিল যে, তারক প্রভৃতি যুবকেরা তাঁহার নিকট যান ; কিন্তু ঠাকুর বলিলেন, "ওদের মত ভাল হতে পারে, তবে আমার প্রাণের মত নয়। ভগবানের লীলা চাই।" সুতরাং তারকের সেখানে যাওয়া বন্ধ হইল। তারকের রামবাবুর বাড়িতে থাকাকালে নিত্যগোপালও সেখানে ছিলেন। ঠাকুর নিত্যগোপালের ভগবৎপ্রেমে ভাবাবস্থাদির প্রশংসা করিতেন ; কিন্তু তারককে সাবধান করিয়া দিলেন, "ঢ্যাখ, তারক, নিত্যগোপালের সঙ্গে বেশী মিশিস নি। ওর ভাব আলাদা—ও এখানকার লোক নয়।" নিত্যগোপালের সঙ্গে ভদ্রতাহিসাবে যতটুকু মিশা প্রয়োজন তদতিরিক্ত আলাপাদি সেই দিন হইতেই বন্ধ হইল।

ঠাকুরের সেবার জন্য তারক সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন এবং সুযোগও খুঁজিয়া বেড়াইতেন। তিনি পরে বলিয়াছিলেন, "কি ভাগ্যবানই আমরা! পান সেজে, তামাক সেজে খাইয়েছি—তাঁর সেবা করেছি, আদর-ভালবাসা কত পেয়েছি।" ঠাকুর কিন্তু সর্বপ্রকার সেবা এই সেবকটির হাতে লইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ঝাউতলার দিকে গেলে উপস্থিত কেহ গাড়ু লইয়া যাইতেন। একদিন অন্যের অনুপস্থিতিতে তারকই গাড়ু লইয়া চলিলেন। ফিরিবার পথে ঠাকুর যখন দেখিলেন যে, তারক গাড়ুটি আনিয়াছেন, তখন বলিলেন, "তুই কেন জলের গাড়ুটা আনলি? তোর জল আমি কেমন করে নেব? তোর সেবা কি আমি নিতে পারি? তোর বাবাকে যে আমি গুরুর মত শ্রদ্ধা করি।"

ক্রমে তারকের বৈরাগ্যবৃদ্ধি হওয়ায় একদিন তিনি বাড়িতে গিয়া নিত্যকালী দেবীকে জানাইলেন যে, আর তাঁহার সংসারে থাকা অসম্ভব ; তবে তিনি তাঁহার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিবেন। বস্তুতঃ ঐ জন্য তিনি ইতোমধ্যেই কিছু টাকা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সে অর্থ তাঁহাকে ব্যয় করিতে হয় নাই। ইহার কিছুকাল পরেই নিত্যকালী

রোগগ্রস্ত হইয়া ইহলোক হইতে চলিয়া যান। পত্নীর মৃত্যুর পর সংসারের বন্ধন সম্পূর্ণ দূর হওয়ায় তারক পিতার নিকট বিদায় লইতে গেলেন। পিতা সেই নিদারুণ কথা শুনিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন; কিন্তু বাধা না দিয়া গৃহদেবতাকে প্রণাম করিয়া আসিতে বলিলেন এবং অতঃপর মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন, "তোমার ভগবানলাভ হোক! আমি নিজে অনেক চেষ্টা করেছি—সংসার ছাড়বারও চেষ্টা করেছিলাম; কিন্তু পারি নি। তাই তোমাকে আশীর্বাদ করছি—তোমার ভগবান লাভ হোক।" পিতার অনুমতি ও আশীর্বাদ লইয়া সংসারত্যাগ বড়ই বিরল। তারকের সে সৌভাগ্যলাভ হইয়াছে শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "খুব ভাল হয়েছে।" ইহা অনুমান ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগের কথা।

সদ্যোমুক্তবন্ধন সন্ন্যাসী তারকনাথ কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট বাস করিলেন। অনন্তর একদিন ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তকে ঠাকুর বলিলেন, "দেখ, রাম, এই তারক তোমাদের বাড়িতে থাকবে। ও সর্বদা এখানকার ভক্তদের সঙ্গে বাস করতে বড়ই উৎসুক হয়েছে।" আর তারককে বলিলেন, "ত্মাখ, তুই ব্রাহ্মণের ছেলে—তাদের অন্নটা খাসনি, আর সব খাবি।" তারক রাম বাবুর বাড়িতে স্বপাক খাইয়া ভগবানের স্মরণ-মননে কালাতিপাত করিতেন। ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ভূমিশয্যায় একাহারে সেই কঠোর তপস্যা লিখিয়া বুঝাইবার নহে। তিনি নিজে বলিয়াছিলেন, "অধিকাংশ দিনই একাহার, তাও হবিষ্যান্ন। কখনও বা আলুবেগুন বা যা হয় কিছু পুড়িয়ে তা দিয়ে দুটি খেয়ে নিতাম। দেহের আরামের জন্য সময় দিতে আদৌ ইচ্ছা হত না।" 'কথামৃতে' আছে, "তারকের অবস্থা এখন অন্তর্মুখ। তিনি লোকের সঙ্গে বেশী কথা কন না" (৫ম ভাগ, ৮১ পৃঃ)। পথ চলিতে তাঁহার দৃষ্টি পদাঙ্গুষ্ঠনিবদ্ধ থাকিত। একদিন ঐ ভাবে গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন, এমন সময় এক পরিচিত ভদ্রলোক কথা বলিবার

জন্য পশ্চাদ্ভাগ হইতে অগ্রসর হইলেন এবং নাম ধরিয়াও ডাকিলেন। তারকের কিন্তু হুঁশ নাই—আপন-মনে চলিয়া গেলেন। ভদ্রলোক ভাবিলেন, তারক দাম্ভিক। কিন্তু উভয়ের পরিচিত এক বন্ধু বুঝাইয়া দিলেন যে, উহা অন্তর্লীন অবস্থা—ইঁহার সহিত আলাপ করিতে হইলে সম্মুখ হইতে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। অপর একদিন ভদ্রলোক ঐরূপ করিলে তারক অতি বন্ধুভাবে আলাপ করিলেন এবং ভদ্রলোকের খেদ দূর হইল। আত্মনিমগ্ন ও নিঃসঙ্গ তারক প্রাণের আবেগে তখন সব সময় আবাসস্থলেও থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার নিজের কথায় জানা যায়, "এমন অনেক সময় গেছে, যখন বিডন স্কোয়ারে ও হেদোয় রাতভর ধ্যানভজন করে কাটিয়ে দেওয়া যেত। কখনও বা কালীঘাটে এবং কেওড়াতলায়ও ধ্যানভজন করেছি।" রাম বাবুর বাড়ি হইতে তিনি কাঁকুড়গাছিতে গমন করেন। তখন ঐ অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ, লোকজনের যাতায়াত বিশেষ ছিল না। বাগানে একটি মালী মাত্র থাকিত। সেখানে আমগাছ-তলায় ধুনি জ্বালাইয়া তিনি দিনরাত ধ্যানজপে কাটাইতেন; দিনে একবার ভিক্ষায় বাহির হইয়া যাহা পাইতেন তাহাতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন; পরিধানে একমাত্র কাপড় ছাড়া শরীরে অন্য আবরণ থাকিত না; আর দেহ, কেশ প্রভৃতির পরিপাটি মোটেই ছিল না।

তপস্যাকালে তিনি মধ্যে মধ্যে পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন এবং অনেক সময় রাত্রিকালে সেখানে থাকিতেন। আত্মধ্যানে নিমগ্ন তারক তখন লোকসমাগম এড়াইয়া চলিতেন, সুতরাং দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার উপস্থিতি ভক্তদের নিকট প্রায়শঃ অজ্ঞাত থাকিত। কাঁকুড়গাছিতে থাকাকালে (১৮৮৪ খ্রীঃ) তিনি একবার শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে ব্রজের রজঃ তিলকমাটি ও প্রসাদী ছোলা-ভাজা আনিয়া তৎসহ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ পূর্বে পড়িয়া

গিয়া হাত ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ডাক্তার তখন ঠাকুরের হাত বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। সাধুর এরূপ দৈহিক ক্লেশ হওয়া যুক্তিসহ কি না ইত্যাদি বিষয়ে তখন ভক্তদের মধ্যে আলোচনা চলিত। ঠাকুর তারককে সম্মুখে পাইয়া পরীক্ষাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, লোকে বলে, ইনি যদি এত (এত সাধু)—তবে রোগ হয় কেন?" তারক ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়া সরলভাবে উত্তর দিলেন, "ভগবানদাস বাবাজী অনেক দিন রোগে শয্যাগত ছিলেন।" কোন দর্শন বা মতবাদ-অবলম্বনে সত্যকে আবৃত করার বা স্বীয় সন্দেহকে ঢাকিবার চেষ্টা এই সরল উত্তরের মধ্যে নাই; কারণ সাধুজীবনের সহিত পরিচিত তারকের জানাই ছিল যে, শরীর প্রাকৃতিক নিয়মেই চলে—রোগ হওয়া বা না হওয়ার সহিত সাধুত্বের সম্পর্ক কি?

১৮৮৬ অব্দে ঠাকুর চিকিৎসার্থ কাশীপুরে আসিলে তারকও তাঁহার সেবার জন্য তথায় বাস করিতে লাগিলেন। সেবার অবসরে নরেন্দ্রের নেতৃত্বে তখন ধ্যানভজন ও শাস্ত্রালোচনা চলিত। বৌদ্ধধর্মের এবং নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের চিন্তাও যথেষ্ট হইত। সমাগত ভক্তদের সহিত নরেন্দ্র এই সব বিষয়ে তর্ক করিতেন কিংবা তারকনাথকে তর্কে লাগাইয়া দিয়া মজা দেখিতেন। ভক্তেরা ইঁহাদের ভাব বুঝিতে না পারিয়া একসময়ে ইঁহাদিগকে নাস্তিক পর্যন্ত মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু ঠাকুর বুঝাইয়া দিলেন যে, সাধকজীবনের উহা অবস্থাবিশেষ মাত্র—দুশ্চিন্তার কিছুই নাই।

তথাগতের চিন্তায় বিভোর নরেন্দ্র একদিন তারক ও কালীকে বলিলেন যে, বুদ্ধগয়ায় গিয়া তপস্যা করিতে হইবে। উভয়েই তাঁহার সঙ্গে চলিলেন; প্রত্যেকের সম্বল—গায়ে গেরুয়া বহির্বাস ও স্কন্ধে একখানি কম্বল। বুদ্ধগয়ায় পৌঁছিয়া যে বোধিদ্রুমমূলে ধ্যানমগ্ন তথাগত বুদ্ধত্ব-লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাহার নিম্নে ধ্যানে রত হইলেন। যে বজ্রাসনে শাক্যসিংহ বসিয়াছিলেন, নরেন্দ্র তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন। তিন

জনে পাশাপাশি ধ্যানে রত আছেন, এমন সময় নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ ভাবাবস্থায় কাঁদিতে কাঁদিতে তারকনাথকে জড়াইয়া ধরিলেন। মুহূর্তমধ্যে আবার সহজাবস্থা লাভ করিয়া ধ্যানে বসিলেন।[৩] পরে তারককর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন, "মনে একটা গভীর বেদনা অনুভব করেছিলুম। ...সবই তো রয়েছে—কিন্তু তিনি কোথায়?...বুদ্ধদেবের বিরহ এত তীব্র বোধ হতে লাগল যে, আর সামলাতে পারলুম না—কেঁদে উঠে আপনাকে জড়িয়ে ধরলুম।" সেই রাত্রি ধ্যানেই কাটিয়া গেল। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল বুদ্ধগয়ায় কিছুদিন থাকেন, কিন্তু ভিক্ষালব্ধ মড়ুয়ার রুটি নরেন্দ্রের পেটে সহ্য হইল না। আবার শীতবস্ত্রের অভাবে রাত্রিতে সুনিদ্রার অভাব হইতে লাগিল। সুতরাং তিন-চারি দিন পরেই তাঁহারা পুনর্বার কাশীপুরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া ঠাকুর সকৌতুকে একটি অঙ্গুলি চারিদিকে ঘুরাইয়া পরে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাড়িয়া বলিলেন, "কোথাও কিছু নেই।" অবশেষে নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "এবার সব এখানে; আর যেখানেই যাও না কেন কোথাও কিছু পাবে না। এখানকার সব দোর খোলা।" কাশীপুরে ফিরিয়া আসিয়াও তাঁহাদের ধ্যানের নেশা অনেক

৩। স্বামী অভেদানন্দের বিবরণ একটু অন্যরূপ। তাঁহার মতে এই ঘটনা হইয়াছিল পরদিন প্রত্যূষে (৮ বা ৯ই এপ্রিল, ১৮৮৬)—যখন তিন জনে সারা রাত্রি বোধিদ্রুমের নীচে ধ্যান করিয়া পুনর্বার প্রত্যূষে মন্দিরমধ্যে ধ্যানে বসিয়াছিলেন। নরেন্দ্রের বামে ছিলেন কালী (অভেদানন্দ) ও কালীর বামে তারক। এই ঘটনা সম্বন্ধে নরেন্দ্র কালীকে বলিয়াছিলেন, "বুদ্ধমূর্তি থেকে তোমার পাশে তারকদার দিক দিয়ে একটা জ্যোতি pass (বের) হয়ে গেল।" ('স্বামী অভেদানন্দের জীবনকথা')। সম্ভবতঃ এই বিবরণ শুনিয়াই স্বামী অদ্ভুতানন্দ পরে বলিয়াছিলেন, "সেখানে (বুদ্ধগয়া) তো লোরেন ভাই তারকদাদার দেহে একটা জ্যোতি প্রবেশ করতে দেখেছিল।" কে জানে, নিরাকারের চিন্তায় নিমগ্ন তারকের সহিত নির্বাণমার্গী বৌদ্ধগণের কোন অলৌকিক সম্বন্ধ ছিল কি না।

কাল ছিল। তাই তাঁহারা প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিযাপন করিতেন এবং কখনও বা সেখানে থাকিয়া যাইতেন।

তারক নরেন্দ্রের প্রতি স্বভাবতঃই বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন; তদুপরি একটি ঘটনায় ঐ শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালবাসা অধিকতর বর্ধিত হইল। কাশীপুরে একটি বড় মশারির নীচে অনেকে একত্র শয়ন করিতেন। এক-রাত্রে নিদ্রাভঙ্গে তারক দেখেন, সর্বত্র আলোকিত করিয়া নরেন্দ্রের দেহের চতুষ্পার্শে ছোট ছোট শিবমূর্তিসকল ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার স্মরণ হইল যে, নরেন্দ্রের অপর নাম বীরেশ্বর। কাশীধামে বীরেশ্বর-শিবের মূর্তি ঐরূপেই কল্পিত এবং তাহারই পূজার ফলে নরেন্দ্রের জন্ম হয়।

কাশীপুরের একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় তারকের প্রতি ঠাকুরের স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়। সেদিন পাচকের অভাবে তারক রন্ধন করিতে-ছিলেন। উপর হইতে ফোড়নের গন্ধ পাইয়া ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রাঁধছে?" তারক রাঁধিতেছেন জানিয়া তিনি একটু চচ্চড়ি আনাইয়া মুখে দিলেন।

অবশেষে যুবক ভক্তদিগকে নরেন্দ্রের অধীনে এক অবিচ্ছেদ্য প্রীতি-সূত্রে গাঁথিয়া দিয়া ঠাকুর মর্ত্যলীলা সংবরণ করিলে অনেকেই স্বগৃহে ফিরিয়া গেলেন; কিন্তু যাইবার অন্য স্থান না থাকায় বা তেমন ইচ্ছা হৃদয়ে অবকাশ না পাওয়ায় লাটু, বুড়ো গোপাল ও গৃহত্যাগী তারক বাগানবাটীতেই রহিলেন এবং সেখানে সযত্নে রক্ষিত ঠাকুরের পূত ভস্মাস্থিকে জীবন্ত ঠাকুর-জ্ঞানে পূজা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ৩১শে আগস্ট (১৮৮৬) বাড়ির ভাড়ার মেয়াদ ফুরাইয়া গেলে গৃহী ভক্তেরা আর সে বাড়ি রাখিবেন না জানিয়া অগত্যা লাটু বৃন্দাবনে গেলেন। তারকও অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন। বৃন্দাবনে তাঁহার বেশী দিন থাকা হইল না। শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথের আগ্রহে নরেন্দ্র মঠস্থাপনের জন্য একটি

বাটীর অন্বেষণে ছিলেন এবং তারককে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি যেন যে কোন মুহূর্তে ফিরিয়া আসিবার জন্য প্রস্তুত থাকেন; তদনুসারে তিনি কাশীধামে আসিয়া নরেন্দ্রের তারের অপেক্ষায় রহিলেন। অল্পদিনের মধ্যে বরাহনগরে একটি ভুতুড়ে বাড়ি ভাড়া করিয়া নরেন্দ্র তারকনাথকে তার করিলেন, আর তারকও তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিয়া কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরে নরেন্দ্রসমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি যে ঘোড়ার গাড়িতে আসিয়াছিলেন উহাতেই নরেন্দ্র ও রাখাল তাঁহার সহিত উঠিয়া পড়িলেন এবং সকলে বরাহনগরের বাড়িতে উপস্থিত হইতেন। সেই দিন হইতে রামকৃষ্ণসঙ্ঘের প্রথম মঠ আরম্ভ হইল।

ঐ খ্রীষ্টাব্দের অবিস্মরণীয় ঘটনা ডিসেম্বর মাসে সকলের দলবদ্ধ হইয়া আঁটপুরে গমন, সপ্তাহাধিক সেখানে আনন্দে ধ্যান-ভজনাদিতে কাটানো এবং বড় দিনের রাত্রে ধুনির সম্মুখে বসিয়া ঈশার ত্যাগ-বৈরাগ্যের আলোচনাকালে সন্ন্যাসের অনুপ্রেরণালাভ। পরবৎসর মাঘ মাসের প্রথম ভাগে (জানুয়ারীতে) শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদুকাসম্মুখে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস-গ্রহণানন্তর শিবপ্রায় তারক শিবানন্দ নাম প্রাপ্ত হইলেন।[৪]

শিবানন্দ মহারাজ বয়সে বড়, দীর্ঘকাল সন্ন্যাসিজীবনে অভ্যস্ত এবং মঠের অন্যতম প্রথম অধিবাসী; সেজন্য ঐ সময়ে মঠপরিচালনার দায়িত্ব স্বভাবতঃই তাঁহার উপর ছিল। তিনিও কায়িক পরিশ্রম করিয়া সকলের সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত করিতেন। কুটনা-কোটা, জলতোলা, ঝাঁট-দেওয়া, পায়খানা পরিষ্কার করা—এই সমস্তই ছিল তাঁহার নিত্যকর্ম; অথচ ব্যবহারে ছিলেন তিনি সরল, নিঃসঙ্কোচ, নম্র ও মধুরালাপী, আর মুখে তাঁহার সর্বদাই উচ্চারিত হইত 'অখণ্ড সচ্চিদানন্দ।' ভজনাদিতেও তিনি অগ্রণী ছিলেন।

৪। 'স্বামী অভেদানন্দের জীবনকথা', 'কথামৃত', ৪র্থ ভাগ, ৩৪২-৩ পৃঃ, এবং স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র।

এক শিবরাত্রির দিনে 'কথামৃত'-কার উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মঠের ভাইরা উপবাস করিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই স্বামীজীর রচিত, "তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা" ইত্যাদি গানটি ধরিয়া শিবানন্দজী নৃত্য আরম্ভ করিলেন; রাখালও সঙ্গে যোগ দিলেন এবং 'কথামৃত'-কারকেও তাঁহারা দলে টানিয়া লইলেন। ঠাকুরের অদর্শনে বিরহতাপিত স্বামী শিবানন্দ এক বর্ষাকালে আকাশ-বাতাসে বিরহ ঢালিয়া গান ধরিলেন—

"হরি গেল মধুপুরী, হাম্ কুলবালা।
বিপথ পড়ল সই! মালতীর মালা॥" ইত্যাদি

ঠাকুর তাঁহার পার্ষদবর্গকে যে প্রেমসূত্রে বাঁধিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে গৃহি-সন্ন্যাসীর ভেদ ছিল না। শিবানন্দ মহারাজও সেই প্রেমে পরিনিষ্ণাত হইয়া উহার বহিঃপ্রকাশরূপে সকলের সেবায় রত থাকিতেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগধামে যোগীন মহারাজের বসন্ত হইলে তিনি অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৮৯০ ইং-তে বলরাম বাবু কঠিন নিউমোনিয়া-রোগে আক্রান্ত হইলে অকাতরে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন; এবং ১৮৯৬ অব্দে স্বামী অদ্বৈতানন্দ পায়ে কণ্টকবিদ্ধ হইয়া উত্থানশক্তিরহিত হইলে তিনি প্রমদাদাস বাবুকে এই বৃদ্ধ স্বামীজীর সেবা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।

এই অশেষ সদ্‌গুণাবলীর জন্য তিনি স্বতঃই সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। মঠের ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে 'তারকদা' বলিয়া ডাকিতেন এবং নরেন্দ্রনাথও 'আপনি' ভিন্ন অন্যভাবে সম্বোধন করিতেন না। তাঁহার অপর লোকপ্রিয় নাম ছিল 'মহাপুরুষ'। বরাহনগরের জীবনে একবার তাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া বলরাম-ভবনে যান। সেখানে ঠাকুরের প্রসঙ্গে মগ্ন নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এক ঠাকুরই ছিলেন কামজিৎ; নইলে বিবাহিত-জীবনে কামজিৎ পুরুষ জগতে বিরল।" শুনিয়া শিবানন্দ মহারাজ বলিলেন, "তা

কেন? ঠাকুর আমার ভেতর এমন শক্তি-সঞ্চার করেছিলেন যে, তার বলে আমিও কামজয় করতে পেরেছি। তাঁর কৃপায় সবই সম্ভব।" সবিস্ময়ে নরেন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "তা হলে তো আপনি মহাপুরুষ।" তদবধি লোকসমাজে তিনি 'মহাপুরুষ' নামেই পরিচিত হইলেন।

উচ্চ আধ্যাত্মিক রাজ্যে সদা বিচরণশীল এই 'মহাপুরুষ' মানুষোচিত আনন্দরসে বঞ্চিত ছিলেন না। স্বামী অদ্ভুতানন্দ বলেন, "হামাদের মঠে তারকদা ছিল ভারী আমুদে।...কেবল লোকদের নকল করত আর বলত, 'তোদের নিয়ে একটু হাসি-ঠাট্টা করি বলে তোরা রাগ করিস নি, ভাই!'" তাঁহার হাত-পা নাড়িয়া অপরের অনুকরণ, বা পশ্‌তু ও গুজরাটী ভাষার ছন্দে বক্তৃতা ইত্যাদি দ্বারা তিনি তাঁহার ধ্যানগম্ভীর মনকে যেমন হালকা করিতেন, তেমনি অপরকেও বিমল আনন্দে ভাসাইতেন। একবার স্বামীজী 'মেঘনাদ-বধ' কাব্যের গুণাগুণ লইয়া বিচার করিতেছিলেন। ঐ কাব্যে ইচ্ছামত বিশেষ্যকে ক্রিয়ায় পরিণত করা ও ক্রিয়াপদকে সংক্ষিপ্ত করার কৌশল দেখিয়া রসিক মহাপুরুষের বড়ই আমোদ হইল। অমনি তিনি বলিতে লাগিলেন, "'ওহে আলুর দম কর' না বলে বলতে হবে 'আলুটা দমিয়ে দাও।'" গুপ্ত মহারাজকে ডাকিয়া বলিলেন, "গুপ্ত, তামাকটা তামকাইয়ে দে।" এই সব কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তর্জনী নাড়িতে নাড়িতে ও মাথা দুলাইতে দুলাইতে অপূর্ব ভঙ্গীতে আহ্লাদে গৃহময় হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—আর সকলে হাসিয়া আটখানা!

কিছুকাল মঠে বাসের পর অনেকেই এদিক-সেদিকে তীর্থভ্রমণে বাহির হইতে লাগিলেন। মহাপুরুষও ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে একবার উত্তরাখণ্ডের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু হাতরাসে পৌঁছিয়া দেখিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ সেখানে অসুস্থ। সুতরাং সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া কেবল বৃন্দাবনদর্শনান্তে স্বামীজীকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিতে চাহিলেন।

মহাপুরুষ উত্তরাখণ্ডে যাইতেছেন জানিয়া ৺কাশীধাম হইতে আর এক জন তীর্থযাত্রী তাঁহার সঙ্গ লইয়াছিলেন। তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিতে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া সহযাত্রী ব্যঙ্গ ও অনুযোগের স্বরে জানাইলেন যে, সন্ন্যাসীর পক্ষে তথাকথিত গুরুভ্রাতৃপ্রেমের বন্ধনে পড়িয়া তীর্থদর্শনে পরাঙ্মুখ হওয়া ও মায়ায় মগ্ন থাকিয়া ধর্মকর্মে বিরত হওয়া একই কথা। উত্তরে মহাপুরুষ জানাইলেন যে, তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যে শিক্ষা পাইয়াছেন তাহাতে ভ্রাতৃপ্রেমের স্থান অতি উচ্চ, লৌকিক যুক্তিতে উহা পরাস্ত হইতে পারে না। সহযাত্রী ইহাতেও উষ্মা প্রকাশ করিলে মহাপুরুষ স্থানীয় ভদ্রলোকদের নিকট কিঞ্চিৎ অর্থভিক্ষা করিয়া তাঁহার হরিদ্বার-গমনের সুব্যবস্থা করিলেন এবং স্বয়ং স্বামীজীর সহিত কলিকাতায় চলিলেন।

এই বৎসর অভিপ্রায় সিদ্ধ না হওয়ায় পর বৎসরের আরম্ভে তিনি পুনর্বার হিমালয়যাত্রা করিলেন। এবারের ভ্রমণকালে কেদারনাথের পথে শ্রীনগরে দৈবক্রমে দীর্ঘকাল পরে গঙ্গাধর মহারাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিব্বতী পোশাকে আবৃত ও তিব্বতভ্রমণের ফলে ঝলসানো-মুখ গঙ্গাধরকে তিনি প্রথমে চিনিতেই পারেন নাই। গঙ্গাধর মহারাজ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া "দাদা, দাদা' বলিয়া ডাকিতেই তিনি স্নেহবিগলিত-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কে? গঙ্গা? তুই বেঁচে আছিস!" সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

অতঃপর উভয়ে অনেকটা পথ একই সঙ্গে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কেদারনাথে শ্রীবিগ্রহদর্শনে ভাবে বিহ্বল মহাপুরুষ তাঁহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া বহুক্ষণ ধ্যানমগ্ন ছিলেন। কেদারের পর বদরী-নারায়ণ-দর্শনান্তে তিনি গঙ্গাধর মহারাজকেও সঙ্গে লইয়া আসিতে চাহিলেন; পরন্তু তিব্বতের আকর্ষণ প্রবল হওয়ায় গঙ্গাধর মহারাজ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা মহাপুরুষ মহারাজ আলমোড়া ও

কাশীধামে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া একাকী বরাহনগরে ফিরিলেন। আলমোড়ায় তিনি বদ্রী-শা নামক এক ভদ্রলোকের আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। শা-জী তাঁহার গুণে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, অতঃপর বরাহনগর মঠের যে-কোনও সাধু ঐ অঞ্চলে আসিলে শা-জী তাঁহাকে সাদরে আপন গৃহে রাখিয়া সেবা করিতেন।

১৮৯১ অব্দের অক্টোবর মাসে 'শ্রীগুরুরূপী তীর্থদেবতার' আকর্ষণে মহাপুরুষ মহারাজ দক্ষিণদেশের তীর্থগুলির অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিয়াছিলেন, "ওরে, গুরুই সব।" তাই রামেশ্বরাভিমুখে যাত্রার পূর্বে তিনি লিখিলেন, "একদিন গাঢ় ধ্যানের সময় রামেশ্বরের দর্শনাভিলাষ এত প্রবল হইয়াছিল যে, পক্ষীর ন্যায় যদি পাখা থাকিত তাহা হইলে উড়িয়া যাইতাম। ···শ্রীগুরুদেব এবার তাঁহার ৺রামেশ্বরমূর্তিতে আকর্ষণ করিতেছেন। অনন্ত তাঁহার রূপ।" পরে প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া আবার লিখিলেন, "ওঁকারনাথ, উজ্জয়িনীতে মহাকাল ও গোদাবরীতটে ত্র্যম্বকেশ্বর···ইঁহারা আকর্ষণ করিতেছেন। সকলই গুরুরূপ। রামকৃষ্ণের বোধ হয় বিশেষ ইচ্ছা যে, আমি এই সকল দর্শন করি—তাহা না হইলে এত ইচ্ছা কেন হইবে? এ মন যে তাঁর কাছে বিক্রীত।" ৺রামেশ্বরদর্শন কিন্তু তাঁহার সেই বারে হইল না। পুনায় ৺সোমেশ্বর-শিবমন্দিরে তিনি তপস্যায় রত আছেন এমন সময়ে রামেশ্বর হইতে প্রত্যাগত পীড়িত দুই জন ব্রাহ্মণ তথায় আসিয়া তাঁহাকে ঐ সময়ে অস্বাস্থ্যকর ঐ অঞ্চলে যাইতে নিষেধ করিলেন। সেজন্য পূর্ব সঙ্কল্প আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া তিনি পুনর্বার উত্তর ভারতের দিকে ফিরিলেন এবং পথে পঞ্চবটী প্রভৃতি স্থানে দেবদর্শন ও তপস্যাদি করিয়া ক্রমে প্রয়াগে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ঝুসিতে কল্পবাস, মকরসংক্রান্তি-স্নান ও মাঘ-স্নান-সমাপনান্তে তিনি কাশী-ধামে উপস্থিত হইয়া তপস্যার্থে বংশীদত্তের উদ্যানবাটীতে আশ্রয় লইলেন।

এদিকে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর কি নভেম্বর মাসে মঠ বরাহনগর হইতে আলমবাজারে স্থানান্তরিত হইয়াছে। পরবৎসর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের পূর্বেই মহাপুরুষ মহারাজ আলমবাজারে আগমনান্তে জানিলেন যে, দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে। অতএব জন্মস্থানে গমনপূর্বক পিতার শ্মশানে গড়াগড়ি দিয়া অশ্রুজলে শেষ তর্পণ করিলেন। মার্চ মাসের শেষভাগে তিনি শশী মহারাজের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের জন্মস্থানদর্শনে গেলেন। জয়রামবাটীতে অবস্থানকালে তাঁহারা একদিন শ্রীশ্রীমাকে রন্ধন করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। কামারপুকুরে মহাপুরুষের ম্যালেরিয়া জ্বর হওয়ায় তাঁহারা অবিলম্বে আরামবাগ হইয়া মঠে ফিরিয়া আসেন।

১৮৯২ অব্দে তিনি আর একবার তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া কুরুক্ষেত্র, জ্বালামুখী, বরাহ-অবতারের জন্মস্থান সারোঁ এবং সহস্রবাহু পরশুরামের জন্মস্থান দর্শন করেন। এই সময়ে তিনি নিঃসম্বলভাবে চলিতেন এবং লোকসমাগম পরিহার করিতেন। অবশেষে আলমোড়ায় পৌঁছিয়া পাতাল-দেবী প্রভৃতি নির্জন স্থানে ভিক্ষালব্ধ অন্নে শরীরধারণপূর্বক তপস্যায় নিমগ্ন হন। এই স্থানে শ্রীযুক্ত ই টি ষ্টার্ডি নামক ইংরেজ ভদ্রলোক তাঁহার গুণে মুগ্ধ হন। ইনিই পরে স্বামী বিবেকানন্দের লণ্ডনের কার্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৮৯৩ অব্দের অক্টোবর মাসে ৺রামেশ্বরদর্শনমানসে তিনি আলমোড়া পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আগ্রা, বৃন্দাবন, জয়পুর, আবু ও বোম্বাই হইয়া তিনি যখন মাদ্রাজে পৌঁছিলেন তখন স্বামী বিবেকানন্দের যশোগানে দাক্ষিণাত্য মুখর হইয়া উঠিয়াছে। অধিকন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের একজন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে আপনাদের মধ্যে পাইয়া মাদ্রাজ-বাসীর উৎসাহ দ্বিগুণ বর্ধিত হইল। মহাপুরুষও ভক্তদের নিকট লিখিত

স্বামীজীর পত্রাবলী পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। অতঃপর কাঞ্চী, চিদম্বরম্, মাদুরা, রামেশ্বর, শ্রীরঙ্গম্ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ তীর্থগুলি দর্শন করিয়া তিনি ভক্তদের আহ্বানে বাঙ্গালোরে উপস্থিত হইলেন (১৮৯৪ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী)। বাঙ্গালোর হইতে মহীশূর হইয়া তিনি যখন মাদ্রাজে ফিরিলেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব আগতপ্রায়। এই সময়ে মহাপুরুষকে পাইয়া এবং তাঁহার নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনিয়া মাদ্রাজবাসীরা চরিতার্থ হইলেন। দক্ষিণদেশে তাঁহার এই অনাড়ম্বর অথচ গভীরপ্রভাবপূর্ণ প্রচারের সংবাদ পাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ একখানি পত্রে জানাইয়াছিলেন, "তারকদা মাদ্রাজে অনেক কাজ করিয়াছেন; বড়ই আনন্দের কথা। মাদ্রাজের লোকেরা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আমাকে লিখিয়াছে।" ইহার স্বল্পকাল পরেই তিনি মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

মহাপুরুষের তীর্থদর্শনের বাসনা তখনও মিটে নাই; বিশেষতঃ হিমালয়ের আকর্ষণ ছিল বড়ই প্রবল। সুতরাং পুনর্বার তিনি উত্তরকাশীতে গমন করিলেন। পথে লক্ষ্ণৌ-এ ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ও তুরীয়ানন্দ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, স্বামীজীর ইচ্ছা তাঁহারা মঠে ফিরিয়া যান। উত্তর কাশী হইতে প্রত্যাবর্তনকালে পুনর্বার ফৈজাবাদে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহার সহিত মঠে চলিয়া আসেন। পরবর্তী বৎসরেও (১৮৯৫) মহাপুরুষজী উত্তরাভিমুখে বাহির হন এবং ব্রহ্মাবর্ত, বিঠুর ও কাশীধামে দেবদেবী-দর্শন ও তপস্যায় কিছুকাল কাটাইয়া মঠে ফিরেন। ১৮৯৬ সনেরও কিয়দংশ এইরূপে বাহিরে অতিবাহিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ তপস্যার এক অতৃপ্ত বাসনা তাঁহাকে কয়েক বৎসর যাবৎ ইতস্ততঃ পরিচালিত করিতেছিল; আর সে তপস্যার ঐকান্তিকতা ছিল অপূর্ব। পরে একসময়ে সেই সব তপস্যা সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন, "এমন অনেক সময় গেছে, যখন

একখানা কাপড়ের বেশী সঙ্গে থাকত না।…কত রাত কেটেছে গাছতলায় শুয়ে।…এখন দু'পা চলতেও কষ্ট হয়। অথচ এই শরীর, এই পা-ই তো কত পাহাড়-পর্বত চলে বেড়িয়েছে—কত কঠোরতা করেছে।" আর এই তপস্যা ও তীর্থভ্রমণের সঙ্গে ছিল আড়ম্বরহীন প্রচার, যাহার প্রশংসায় স্বামীজী লিখিয়াছিলেন, "তারকদা চমৎকার কাজ করিতেছেন—সাবাস! এই তো চাই।"

ক্রমে ১৮৯৭ আগতপ্রায়। স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশে প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় সমস্ত ভারত আগ্রহ-চঞ্চল, আর মঠের ভ্রাতৃগণের প্রাণে এক অসীম আনন্দ-হিল্লোল। শিবানন্দ মহারাজ সেই আনন্দের আলোড়নে মঠে স্থির থাকিতে না পারিয়া, স্বামীজীর সহিত সাক্ষাতের বাসনায় মাদ্রাজে উপস্থিত হইলেন এবং সেখান হইতে তাঁহার সঙ্গে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। অতঃপর স্বামীজী স্বাস্থ্যলাভের জন্য দার্জিলিং যাত্রা করিলে মহাপুরুষও তপস্যায় নিষ্ক্রান্ত হইলেন। গমনকালে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "তারকদা, আপনাকে তপস্যায় কিছুতেই যেতে দেব না।" কিন্তু তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া অগত্যা ছাড়িয়া দিলেন; তবে বলিয়া দিলেন তাঁহার গন্তব্যস্থল আলমোড়ায় যেন একটি আশ্রম স্থাপিত হয়। আমরা দেখিতে পাইব যে, সুদীর্ঘকাল পরে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাপুরুষ সে আদেশ পালন করিয়াছিলেন। দার্জিলিং হইতে স্বামীজী মে মাসে আলমোড়ায় আসিলে মহাপুরুষের সহিত পুনর্মিলন হইল।

আলমোড়া হইতে স্বামীজীর নির্দেশে মহাপুরুষজী সিংহলে বেদান্ত-প্রচারে গমন করেন। সাত-আট মাস সেখানে অক্লান্তভাবে স্বদেশী ও বিদেশীর মধ্যে বেদান্তপ্রচার করিয়া এবং বেদান্তের একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া তিনি যখন ফিরিলেন, মঠ তখন বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটীতে। মঠের পুরাতন দিনলিপি হইতে জানা যায় যে, মঠে

প্রত্যাগত মহাপুরুষ এই সময়ে সাধুদের ও সমাগত ভক্তদের লইয়া নিয়মিতভাবে শাস্ত্রালোচনাদি করিতেন। স্বল্পকাল পরেই কলিকাতায় প্লেগ-মহামারী আরম্ভ হওয়ায় শিবানন্দ-প্রমুখ অনেককেই সেবাকার্যে অগ্রসর হইতে হইল।[৫] ক্রমে রোগের প্রকোপ প্রশমিত হইলে শিবানন্দজী দার্জিলিং চলিয়া গেলেন। সেখানে আবার এক নূতন বিপদ! পাহাড়ে একটি প্রকাণ্ড ধস নামিয়া বহুলোকের সর্বনাশ হওয়ায় তাঁহাকে তাহাদের সাহায্যকার্যে নামিতে হইল। ঐ সেবাকার্য শেষ করিয়া তিনি বৎসরান্তে মঠে ফিরিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয় বার পাশ্চাত্ত্যভ্রমণান্তে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মঠে প্রত্যাবর্তনের পর ২৭শে ডিসেম্বর স্বামী শিবানন্দ ও সদানন্দকে লইয়া মায়াবতী যাত্রা করেন। পক্ষাধিককাল মায়াবতীতে কাটাইয়া ফিরিবার পথে তিনি মহাপুরুষকে প্রচার ও অর্থসংগ্রহের জন্য পিলিভিটে রাখিয়া আসিলেন। ঐ কার্য শেষ করিয়া মহাপুরুষজী ৺দুর্গোৎসবের সময় মীরাটে উপস্থিত হইলেন। এদিকে কনখল হইতে কল্যাণানন্দের আহ্বান আসায় তিনি তথায় যাইয়া নানাভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। তারপর ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে স্বামীজী বায়ুপরিবর্তনের জন্য কাশীধামে আসিতেছেন জানিয়া তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে স্বামীজীর সেবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। মাসাবধি এই ভাবে চিকিৎসাদির ফলে স্বামীজীর স্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ উন্নতি হইলে তিনি স্বামী শিবানন্দাদির সহিত বেলুড়ে আসিলেন।

কাশীতে থাকা কালে ভিঙ্গার মহারাজা কাশীতে বেদান্তপ্রচারের জন্য ৫০০৲ টাকা দিয়াছিলেন। মঠে ফিরিয়া স্বামীজী সারদানন্দজীকে ঐ

৫। "কলিকাতায় প্লেগকার্য—প্রধান-কার্যাধ্যক্ষ, স্বামী সদানন্দ। অন্যান্য কার্যকারিগণ ১। স্বামী শিবানন্দ; ২। স্বামী নিত্যানন্দ; ৩। স্বামী আত্মানন্দ।"—'উদ্বোধন', ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬। ইহা দ্বিতীয় প্লেগ-সেবাকার্য। প্রথম সেবা হয় ১৮৯৮-এর মে মাসে ভগিনী নিবেদিতার নেতৃত্বে।

জন্য কাশী যাইতে বলিলেন। তিনি সম্মত না হওয়ায় পরে শিবানন্দজীকে অনুরূপ নির্দেশ দিলেন। শিবানন্দ মহারাজ তখন একমনে স্বামীজীর সেবা করিতেছেন—উহা ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু স্বামীজী প্রথমে অনুরোধ করিয়া ফল না পাওয়ায় যখন বলিলেন, "টাকা নিয়ে কাজ না করায় আপনার জন্য আমাকে কি শেষে জোচ্চোর বনতে হবে?" তখন শিবানন্দজী আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া কাশীধামে চলিলেন (১৯০২ খ্রীঃ ২৫শে বা ২৬শে জুন)।

কাশীতে পৌঁছিয়া তিনি প্রথমে রামাপুরা-অঞ্চলে সেবাশ্রমের পুরাতন বাটীতে উঠিলেন এবং দশ টাকা ভাড়ায় অদ্বৈতাশ্রমের বর্তমান বাটীটি পাইয়া ৪ঠা জুলাই সেখানে আশ্রম স্থাপন করিলেন। ভগবানের অচিন্তনীয় বিধানে ঐ দিনই স্বামীজী দেহত্যাগ করেন এবং পরদিন তারযোগে মহাপুরুষ সেই মর্মন্তুদ সংবাদ পান। হৃদয় শোকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইলেও নেতার আদেশ পালন করিয়া তিনি কাশীতেই রহিয়া গেলেন এবং রথযাত্রার দিন বিশেষ পূজা ও হোমাদি-সমাপনান্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহারই পার্শ্বে স্বামীজীকে বসাইলেন। ইহাই 'শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের' আরম্ভ। দ্বৈত হইতে অদ্বৈত—ইহাই ছিল ঠাকুরের ভাব; আশ্রমের নাম তাহারই সাক্ষ্য দিতে লাগিল।

অদ্বৈতাশ্রমে মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দের অদৃষ্টপূর্ব তপস্যা সঙ্ঘের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত থাকিবে। প্রয়োজনানুরূপ অন্নের সংস্থান না থাকিলেও তিনি অম্লানবদনে দৈনন্দিন কার্য চালাইয়া যাইতেন। দুর্জয় শীতে খোলা হলঘরে ধুনি জ্বালাইয়া ব্যাঘ্রাজিনের উপর কম্বল মুড়ি দিয়া শয়ন করিতেন এবং রাত্রি তিনটার পূর্বেই উঠিয়া ধ্যানে বসিতেন। অতঃপর চলিত পাঠ, আবৃত্তি ও ভজন। ঠাকুর-তোলা, পূজা, ভোগের ব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্তই স্বহস্তে করিতে হইত। আবার এই দুরবস্থার মধ্যেও তাঁহাকে

একবার অধিকতর বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। ভিক্ষার রাজার টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে। অনেক দিন ভাড়া বাকী পড়ায় বাড়ি-ওয়ালা টাকার জন্য উত্ত্যক্ত করিতেছে। মহাপুরুষ কোনও প্রকারে ভাড়ার জন্য প্রায় একশত টাকা সংগ্রহ করিয়া একটি ভাঙ্গা বাক্সে রাখিয়াছিলেন। ঐ সময়ে এক অজ্ঞাতকুলশীল যুবক আশ্রমে ছিল। সে টাকার সন্ধান পাইয়া উহা লইয়া পলায়ন করিল। পরদিন তাহাকে দেখিতে না পাইয়া সকলের সন্দেহ হইল এবং সন্ধানের ফলে জানা গেল যে, একটি মাত্র পয়সা ভিন্ন সবই গিয়াছে। সেই এক পয়সা দিয়াই ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা হইল। ছেলেটির সম্বন্ধে মহাপুরুষ শুধু বলিলেন, "অভাব হয়েছিল, তাই টাকা নিয়ে চলে গেছে। কিন্তু তার একটু ধর্মবুদ্ধি ছিল, তাই একটা পয়সা রেখে গেছে ; তাতেই ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হ'ল।" ইহাই সাধুর সাধুত্ব ! তাহা হইলে কি হইবে ? নির্মম জগতে সাধুকেও লাঞ্ছনা ভুগিতে হয় ; তাই ঠিক সেই সময়েই বাড়ি-ওয়ালার দারোয়ান আসিয়া টাকা না পাওয়ায় মহাপুরুষকে মহাজনের গদীতে লইয়া গেল এবং সারাদিন সেখানেই আটকাইয়া রাখিল। অবশেষে কিস্তিবন্দিতে টাকা শোধ করিবেন এই সর্তে তাঁহাকে মুক্তি দিল !

কাশীতে তখন স্বামীজীর আদর্শে চারি প্রকার কার্য চলিতেছিল—ধর্মদান, বিদ্যাদান, প্রাণদান এবং অন্নদান। এই প্রত্যেক কার্য স্বামী শিবানন্দের অশেষ সহানুভূতি ও সাহায্য পাইত। অদ্বৈতাশ্রম, সেবাশ্রম, অদ্বৈতাশ্রমের অবৈতনিক বিদ্যালয় ইত্যাদি সর্বদা তাঁহার উপদেশ ও অর্থ-সাহায্যের আশা রাখিত ; এতদ্ব্যতীত বহু পরিবার অর্থসাহায্য পাইত। স্বামীজীর ভাবপ্রচারের জন্য তিনি হিন্দীভাষায় পুস্তক ছাপাইয়াও বিতরণ করিয়াছিলেন। কাশীর অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিতের সহিতও তাঁহার আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল।

ক্রমে আশ্রম জমিয়া উঠিতে লাগিল এবং আশ্রমবাসীর সংখ্যাও বাড়িতে লাগিল; কিন্তু নিরভিমান আশ্রমাধ্যক্ষ বামুন-চাকরদের সম্বন্ধে আশ্রমবাসীদিগকে বলিতেন, "তোমরা ওদের চাকর মনে করবে কেন? ভাববে আমাদেরই সহায়ক।" আর সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সকলেরই সম্বন্ধে বলিতেন, "এরা সব জাতসাপের বাচ্চা; ঠাকুরের আশ্রয়ে যারা এসেছে তারা কেউ কম নয়।" ১৯০৪-এর শীতের প্রত্যূষে জনৈক ব্রহ্মচারী আশ্রমে উপস্থিত হইলে মহাপুরুষ স্বহস্তে চা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলেন। অপর এক অসুস্থ ব্রহ্মচারী স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র নষ্ট করিয়া নিজের অক্ষমতা ও লজ্জায় যখন কাঁদিয়া ফেলিলেন, তখন মহাপুরুষ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া পরিষ্কার বস্ত্র পরাইয়া শোয়াইয়া দিলেন। অল্পক্ষণ পরে ব্রহ্মচারী প্রয়োজনবশে স্নানাগারের দিকে যাইয়া দেখেন মহাপুরুষজী স্বহস্তে সেই পরিত্যক্ত বস্ত্র পরিষ্কার করিতেছেন; আপত্তি করিলেও তিনি স্বকার্যে বিরত হইলেন না। তখন অদ্বৈতাশ্রমে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা মহাপুরুষের বেদান্তিসদৃশ কঠোর এবং জননীসদৃশ কোমল ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া আজও মুগ্ধ হন।

কঠিন পরিশ্রমের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তাই ১৯০৬ অব্দে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য পুরীধামে যান। পর বৎসর পরেশনাথ পাহাড়ের নীচে চিড়কিতেও কিছুদিন বাস করেন। ইহাতেও আশানুরূপ উন্নতি না হওয়ায় ১৯০৭র শেষভাগে বেলুড় মঠে চলিয়া আসেন। তখন হইতে ১৯১২র প্রথমভাগ পর্যন্ত তিনি প্রায়শঃ বেলুড়েই ছিলেন। ঐ সময়ে মঠ-পরিচালনার ভার স্বামী প্রেমানন্দের উপর অর্পিত ছিল। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে মহাপুরুষ ঠাকুর-পূজা ও মঠের কার্য পরিচালনা করিতেন।

বেলুড় মঠে তাঁহার অনেকগুলি বিশেষত্ব সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাঁহার অনপেক্ষ অনাড়ম্বর সাধু-জীবন—পরিধানে জানু পর্যন্ত

সামান্য বস্ত্র, অনাবৃত অঙ্গ ও পাদুকাশূন্যচরণে মঠে ঘুরিয়া বেড়ানো—কখন গঙ্গার ধারে বেঞ্চিতে নির্লিপ্তভাবে উদাসমনে বসিয়া থাকা, সম্মুখ দিয়া কেহ চলিয়া গেলেও দৃষ্টিতে না পড়া—সকলের প্রতি সমান প্রেম ও সেবাপরায়ণতা—এই সমস্ত মিলিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বটিকে এক অপূর্ব শ্রদ্ধা ও প্রীতির বস্তু করিয়া তুলিয়াছিল। একসময়ে স্বামীজীর ভাবে মুগ্ধ জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক মহাপুরুষের অমায়িকতা প্রভৃতিতে আকৃষ্ট হইয়া মঠে যাতায়াত করিতে থাকেন। তাঁহার আহারান্তে ভৃত্যরা উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে অসম্মত হইলে মহাপুরুষ স্বহস্তে উহা করিতেন। আর একবার একজন মাদ্রাজী খ্রীষ্টান ভদ্রলোক মহাপুরুষের ব্যবহারে অভিভূত হইয়া বলিয়াছিলেন, "এত জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু সব জায়গায়ই খ্রীষ্টান বলে আমায় অবজ্ঞা ও দূর-ছাই করেছে। এমন ভালবাসা, এত যত্ন আমি আর কোথাও পাই নি!" মহাপুরুষ একবার আমেরিকা হইতে আগত জনৈক সাধুকে নিজ গড়গড়াটি দিয়া রহস্যপূর্বক বলিয়াছিলেন, "এর ভেতর ব্যাঙ্ রয়েছে, টেনে দেখ।" মার্কিনদেশে গুরুজনের সম্মুখে তামাক খাওয়া দূষণীয় নহে। সুতরাং সাধুটি গড়গড়ার নল ধরিয়া টানিলেন; কিন্তু শব্দ না হওয়ায় মহাপুরুষ বলিলেন, "ব্যাঙ্ তোমার সঙ্গে কথা কইতে চায় না—এই দেখ সে কেমন কথা কয়"—ইহা বলিয়া কিরূপে টানিতে হয় দেখাইয়া দিলেন। অতঃপর সাধুটিও তাহাই করিলেন। ঐ সময়ে তিনি মহাপুরুষের শুধু স্নেহের পরিচয় পাইয়াই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, উহা শুধু স্নেহই নহে; পাছে নবাগতকে কেহ খ্রীষ্টান ভাবিয়া কোন প্রকার অবজ্ঞা দেখায়, এই জন্য মহাপুরুষ তাঁহাকে সেই দিন সেই ধূমপানব্যপদেশে স্বীয় অন্তরঙ্গদের মধ্যে টানিয়া লইয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগোষ্ঠীর সকলেই পরমহংসদেবকে অবতার, এমন কি স্বয়ং ভগবান, বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকিলেও বর্তমান যুগে তাঁহার অবদান

ও তাঁহার নরলীলার পূর্ণ তাৎপর্য আচার্য বিবেকানন্দ ভিন্ন তদানীন্তন অনেকেরই নিকট অস্পষ্ট ছিল। স্বামী শিবানন্দ এই বিষয়ে কতটা অবহিত ছিলেন? ঠাকুরের অসুখ সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তিপূর্ণ মনোভাবের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও তাঁহার এই অপূর্ব দৃষ্টিশক্তির পরিচয় পাই। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট বাহাদুরের পত্নী লেডি মিণ্টো মঠ দেখিতে আসিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলেন যে, এই সঙ্ঘ প্রথমে স্বামীজীই আরম্ভ করেন। অমনি শিবানন্দ সংশোধন করিয়া দিলেন, "এ সঙ্ঘ আমরা সৃষ্টি করি নি; ঠাকুরের অসুখের সময় এই সঙ্ঘ তিনি নিজেই সৃষ্টি করেন।" তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনে জগতে অপূর্ব জাগরণ আসিবে এবং উহা নবভাবে ভাবিত হইবে। সেই রূপায়ণের জন্য কোন মনুষ্যশক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে না—যদিও মানুষ সে শক্তির সহায়ক হইবে। শুধু তাহাই নহে; সে শক্তির ক্রিয়া ইতোমধ্যেই বিশ্বের পশ্চাদ্বর্তী সূক্ষ্মস্তরে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিতেন, "এবার ব্রহ্মকুণ্ডলিনী স্বয়ং জাগ্রতা হয়েছেন। যাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি লয়—সব হচ্ছে, সেই মহামায়া মহাকুণ্ডলিনীই এবার জেগেছেন ঠাকুরের আহ্বানে···তাই তো সমগ্র জগতে এক মহাজাগরণের সাড়া পড়ে গেছে।" স্বামীজীর সম্বন্ধেও তাঁহার দৃষ্টিশক্তি সমভাবে সুদূরপ্রসারিত ছিল। স্বামীজীর প্রথম সাফল্যের পর সকলেই সোৎসাহে প্রশংসামুখর হইলেও তাঁহার কার্যপ্রণালী ও উহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তখন বহু মন সংশয়ান্বিত। কিন্তু ২৩।২।৯৪ তারিখে স্বামী শিবানন্দ লিখিয়াছিলেন, "পাশ্চাত্ত্য দেশের সভ্যজাতির মধ্যে আমেরিকা প্রথমশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। ইহারা যদ্যপি হিন্দুধর্মের গৌরব ও মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে···তাহা হইলে ভারতবর্ষের যে বিশেষ কল্যাণ, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

বস্তুতঃ বাহ্যাড়ম্বরে মুগ্ধ না হইয়া স্বামী শিবানন্দের দৃষ্টি প্রতিঘটনার

অন্তঃস্থলে প্রবেশপূর্বক উহার মর্মোদ্‌ঘাটনে সমর্থ ছিল। একদিন দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির হইতে তারক যখন ঠাকুরের ঘরের দিকে ফিরিতেছিলেন, তখন ভাবমুখে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ পার্শ্ববর্তী জনৈককে বলিয়াছিলেন, "তারকের উচ্চ শক্তির ঘর—যেখান হইতে নামরূপের উৎপত্তি হইতেছে।" তাই উক্ত বিকাশোন্মুখ শক্তির প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি মহাপুরুষ মহারাজ নীরবসাধনাকে আত্মপ্রসারের ঊর্ধ্বে স্থান দিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বৈদ্যনাথধামে নূতন গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে যখন তিনি তথায় ছিলেন তখন একদিন পদচারণ করিতে করিতে অকস্মাৎ একাকী সামান্য গৃহকর্মে নিরত এক শিক্ষিত ব্রহ্মচারীর নিকট উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে সকলেই উৎসব-আনন্দে মগ্ন—শুধু স্বকার্যে নিরত ঐ ব্রহ্মচারী উহাতে বঞ্চিত। স্বামী শিবানন্দ নিকটে আসিয়া স্বতঃই বলিয়া উঠিলেন, "এখানে শক্তির বিকাশ দেখছি—এখানে কালে মস্ত বড় কাজ হবে।" রামকৃষ্ণ মিশন বন্যাপীঠের সেই শিশু অবস্থায় এরূপ অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী এতাদৃশ মহাপুরুষের পক্ষেই সম্ভবপর। আলমবাজার মঠে অবস্থানকালেও অনেকে ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মুখে এই অজ্ঞাত শক্তিতত্ত্বের অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে মহাপুরুষজী স্বামী তুরীয়ানন্দ, প্রেমানন্দ, নিশ্চয়ানন্দ ও ব্রহ্মচারী গুরুদাস (স্বামী অতুলানন্দ) সহ কাশ্মীর-ভ্রমণে যান এবং সেখানে প্রায় তিন মাস কাটাইয়া কাশীতে আসেন। কাশীতে তাঁহার আমাশয় হয়। উহা হইতে আরোগ্যলাভান্তে তিনি মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু দুই মাস পরে পুনর্বার ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় 'উদ্বোধন' বাটীতে গমন করেন। এই রোগের মধ্যেও তাঁহার আত্মনির্ভরশীলতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত—তিনি অন্যের সেবা গ্রহণ করিতেন না। আর এক অপূর্ব ব্যাপার ছিল তাঁহার আহার-সংযম।

রোগের আক্রমণের পর স্বভাবতঃ সংযমশীল মহাপুরুষজীর দৈনন্দিন আহার নিরামিষ ঝোল-ভাত মাত্রে পর্যবসিত হইল। স্বামী সারদানন্দ সেই স্বাদহীন ঝোলের নাম দিয়াছিলেন 'মহাপুরুষের ঝোল'। শেষ পর্যন্ত এই ঝোলই ছিল তাঁহার প্রিয় খাদ্য।

ইং ১৯১২ অব্দে স্বামী কল্যাণানন্দের অনুরোধে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দের সহিত মহাপুরুষ কনখলে যান। ঐ বৎসর সেখানে প্রতিমায় ৺দুর্গাপূজা হয়। ৺শ্যামাপূজার সময় তাঁহারা সকলেই কাশীতে চলিয়া আসেন। সেখানে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত থাকিয়া মহাপুরুষ ও তুরীয়ানন্দ পুনর্বার কনখলে গমন করেন। এদিকে ঠাকুরের ভক্ত পণ্টু বাবু তাঁহার রুগ্ন পুত্রকে লইয়া আলমোড়ায় বড়ই নিরানন্দে দিন কাটাইতেছিলেন। তিনি স্বামী শিবানন্দকে তথায় যাইতে সাদর আহ্বান জানাইলে তিনি জুন মাসে তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। অবশেষে পণ্টু বাবু আলমোড়া ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও মহাপুরুষ সেখানে তপস্যায় নিরত রহিলেন। তিনি কুকারে রান্না করিয়া খাইতেন আর নিজেকে প্রভুর আশ্রিত মনে করিয়া স্মরণ-মনন ও পাঠাদিতে কালাতিপাত করিতেন। বাগানের মালী তাঁহার সাথী ছিল, আর ছিল এক পাহাড়ী কুকুর। নির্জন পর্বতে এই আবেষ্টনীর মধ্যেই তাঁহার সাধকজীবনের প্রায় দেড় বৎসর কাটিয়াছিল।

১৯১৪ অব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দ কাশীতে আগমনানন্তর মহাপুরুষকেও সেখানে আসিতে অনুরোধ করিলে তিনি নভেম্বর মাসে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তখন সেখানে স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং প্রেমানন্দও ছিলেন। মহাপুরুষ কাশীতে অল্পদিন থাকিয়া তুরীয়ানন্দের সহিত মিহিজামে আসিলেন। ঐ সময়ে জামতাড়ায় আশ্রমের জন্য প্রদত্ত একখণ্ড ভূমি দেখিয়া তৎসম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থাদিও তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। অতঃপর তিনি

বেলুড়ে আসেন এবং তথা হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের উৎসব উপলক্ষে রাঁচিতে যান; রাঁচি হইতে মঠে ফিরিয়া পুনর্বার আলমোড়ায় উপস্থিত হন। তখন ১৯১৫-এর এপ্রিল মাস। স্বামী তুরীয়ানন্দ অনেক দিন যাবৎ বহুমূত্ররোগে ভুগিতেছিলেন; গুরুভ্রাতৃগতপ্রাণ শিবানন্দ তাঁহাকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

দেহত্যাগের পূর্বে স্বামীজী মহাপুরুষকে আলমোড়ায় একটি আশ্রম স্থাপন করিতে বলিয়াছিলেন। হিমালয়ের ক্রোড়ে অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বেষ্টিত নাতিশীতোষ্ণ আলমোড়া শিবানন্দের প্রিয় স্থান। ১৮৮৯ ইংরেজী হইতে তিনি সেখানে বহুবার যাতায়াত করিয়াছেন; কিন্তু আশ্রমস্থাপনের সঙ্কল্প মনে জাগে নাই। এবারে সম্ভবতঃ গুরুভ্রাতার প্রয়োজন চক্ষুর সম্মুখে থাকায় স্বামীজীর সেই বাসনা তিনি কর্মে পরিণত করিতে অগ্রসর হইলেন। ক্ষুদ্র একখণ্ড জমিসংগ্রহান্তে তাহাতে আশ্রমবাটী আরম্ভ হইল। এই সময়ে পূর্ববঙ্গের বহু স্থানে ও বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পতিত হইলে মহাপুরুষের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। পরিচিতদের নিকট লিখিত প্রতিপত্রে তিনি সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং দুর্ভিক্ষ-সাহায্যের জন্য কিছু অর্থও সংগ্রহ করিয়া বেলুড়ে পাঠাইলেন।

ঐ বৎসর ৺শ্যামাপূজায় কাশীতে উপস্থিত থাকার জন্য বারংবার অনুরোধপত্র আসিতে থাকায় স্বামী তুরীয়ানন্দকে আলমোড়ায় রাখিয়া মহাপুরুষ কাশীতে গেলেন। কিছুদিন পরে আলমোড়ায় ফিরিয়া যাওয়াই তাঁহার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ৺শ্যামাপূজার পরে অসুস্থতাবশতঃ এবং অন্যান্য কারণে আর আলমোড়া যাওয়া হইল না। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত তিনি কাশীধামে অবস্থানান্তে প্রয়াগ হইয়া বেলুড় মঠে আগমন করিলেন। ঐ বৎসর তিনি ও বাবুরাম মহারাজ মিহিজামে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং সাঁওতালদিগকে

পরিতোষপূর্বক আহার করাইয়া বিশেষ আনন্দ পাইয়াছিলেন। মিহিজাম হইতে প্রত্যাবর্তনের পর বাবুরাম মহারাজের স্বাস্থ্য তেমন ভাল ছিল না; সুতরাং মঠের কাজকর্ম অনেকটা স্বামী শিবানন্দকেই চালাইতে হইত। ঐ বৎসর শীতকালে তাঁহারা দুই জনে কাশীতেও গিয়াছিলেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া তাঁহারা পরবৎসর ঠাকুরের উৎসবের পূর্বেই মঠে ফিরিয়া আসেন। এদিকে আলমোড়ায় আশ্রমবাটীর কার্য তুরীয়ানন্দের চেষ্টায় উত্তমরূপেই অগ্রসর হইতেছিল। মহাপুরুষ সমভূমি হইতে পত্রাদিযোগে পরামর্শ দিয়া এবং বন্ধুদের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও অর্থাদি পাঠাইয়া সাহায্য করিতেছিলেন। যথাকালে (১৯১৬ ইং) কার্য শেষ হইল।

ইত্যবসরে বেলুড়ে সমাগত মহাপুরুষ মহারাজের জীবনে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অনুরোধে তিনি মঠের কাজকর্ম পরিচালনের দায়িত্ব প্রকাশ্যতঃ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সময় হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মঠ ও সংঘরূপী ঠাকুরের সেবাই তাঁহার একমাত্র কর্তব্য হইল। অতঃপর ঠাকুরের কার্য ভিন্ন অন্য কোন কারণে তিনি মঠ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যান নাই।

আমরা পূর্বে বহুবার মহাপুরুষের গাম্ভীর্য ও ঔদাসীন্যের নিম্নে যে অন্তঃসলিলা স্নেহের ফল্গুধারার পরিচয় পাইয়াছি, মঠ-পরিচালনার দায়িত্ব স্কন্ধে অর্পিত হওয়ায় সে ধারা সমস্ত আবরণ অপসারিত করিয়া পূর্ণবেগে কলকল শব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল। স্বামী শিবানন্দ জানিতেন, স্বামী প্রেমানন্দ এক অপূর্ব প্রীতির বন্ধনে সাধু ও ভক্তদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর্ধানের পর সেই অভাব অপূরণীয় জানিয়াও তিনি সে বিষয়ে যত্নপর হইলেন। এই সময়ে মহাপুরুষের দৈনন্দিন জীবন বড়ই শিক্ষাপ্রদ ছিল। পূজাপাঠ ও ধ্যানভজনের একটা জমাট ভাব গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি সর্বতোভাবে সচেষ্ট থাকিতেন। প্রতিদিন সাধু-ব্রহ্মচারীদের

সহিত সদালাপের দ্বারা তিনি একদিকে যেমন সকলের মন এক অতি উচ্চস্তরে তুলিয়া রাখিতেন, অপরদিকে তেমনি মঠের প্রত্যেকটি কার্য ও বস্তু ঠাকুরের—এইরূপ বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তৎপ্রেরণায় খুঁটিনাটি সমস্ত দেখিয়া বেড়াইতেন এবং স্বহস্তে অনেক কর্ম করিতেন। বাগানের মালী, গোয়ালের গরু, পশু-পক্ষী কেহই তাঁহার স্নেহস্পর্শে বঞ্চিত হইত না। বেলুড়ে তখন খুব ম্যালেরিয়া হইত। ভাদ্র মাসের পরে মঠ একটি ক্ষুদ্র হাসপাতালে পরিণত হইত। মহাপুরুষজী তখন রোগীদের সেবা ও তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত থাকিতেন। আবার পথ্যসংগ্রহ এবং উহা প্রস্তুত করার ভারও তাঁহাকেই লইতে হইত কিংবা কাছে দাঁড়াইয়া সযত্নে অপরকে সাগু, বার্লি, ঝোল ইত্যাদি প্রস্তুত করার প্রণালী শিখাইতে হইত।

নিয়মানুবর্তিতা তিনি পছন্দ করিতেন; কিন্তু একটি ঘটনা তাঁহাকে সেই কর্তব্যের আনুষঙ্গিক কঠোরতা হইতে মুক্তি দিল। একদিন অসময়ে আহারের পরে এক ব্রাহ্মণ অন্নভিক্ষা চাহিলে মহাপুরুষ অক্ষমতা জানাইয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই বুভুক্ষুকে নিরাশ করায় মর্ম-পীড়িত হইয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে লোক পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণকে কিন্তু আর পাওয়া গেল না। মঠত্যাগের সময় ব্রাহ্মণ অভিশাপ দিবার ভঙ্গীতে বলিয়া গিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মণকে কেউ দুটো খেতে দিলে না—এতে কি ভাল হবে?" ইহারই তিন দিন পরে গোয়ালে আগুন লাগিয়া মঠের কিছু ক্ষতি হওয়াতে মহাপুরুষের ধারণা হইল যে, ইহা সেই ব্রাহ্মণেরই অভিশাপের ফল, আর এই জন্য দায়ী তিনি। অতঃপর সম্ভবস্থলে তিনি কাহাকেও বঞ্চিত করিতেন না।

স্বামী শিবানন্দ যতদিন আপনমনে আপনভাবে ছিলেন, ততদিন লোক-ব্যবহারের প্রয়োজন বোধ করেন নাই; কিন্তু যেদিন তিনি সত্যসত্যই বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি ভক্তগোষ্ঠীর অন্যতম নেতা, সেদিন শ্রীগুরুই

স্বকার্যসাধনার্থ তাঁহার মধ্যে এক অপূর্ব পরিবর্তন আনিয়া দিলেন। মহাপুরুষ সেদিন আপনার অতীতের দিকে তাকাইয়া সরলভাবে এক শিষ্যস্থানীয় সাধুর নিকট স্বীকার করিলেন, "লোকব্যবহার তো কোন দিন শিখি নাই।" সত্য বলিতে গেলে 'লোকব্যবহার' তিনি পরেও শিখেন নাই; তবে শ্রীগুরুর সেবারই একটা বিশেষ দিক্ হিসাবে ভক্তসেবাও যথাকালে তাঁহার চরিত্রে প্রকটিত হইয়াছিল। শ্মশানবাসী শিবই আবার আশুতোষ। সংসার-বিরাগী শিবানন্দকেও আমরা যথাকালে আশুতোষরূপে দেখিতে পাই—সদানন্দময় মহাপুরুষের মুখে তখন আশীর্বাণী ভিন্ন কিছুই নাই। সঙ্ঘের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত স্বামী শিবানন্দের ইহাই শেষ পরিণতি। কিন্তু মঠের পরিচালনভার যখন তিনি প্রথম স্বীকার করেন, আমরা আপাততঃ সেই সময়েরই আলোচনা করিতেছিলাম।

মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ যখন কর্মভার লইলেন, তখন ব্যয়াধিক্যবশতঃ মঠের বৃদ্ধগণ চিন্তিত। সুতরাং তাঁহার প্রথম কার্য হইল ব্যয়হ্রাস। ইহার প্রতিকার আয়বৃদ্ধি করিয়াও হইতে পারিত; কিন্তু তিনি অকস্মাৎ আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা না দেখিয়া ব্যয়হ্রাসের পথেই চলিলেন। ইহার ফলে লোকের বিরাগভাজন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। পূর্বোক্ত ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণের ব্যবহারই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু উক্ত ঘটনাই আবার মহাপুরুষের চিত্তের স্বাভাবিক কোমলতারও পরিচয় দেয়। কারণ ব্রাহ্মণের বাক্যকে কেহ এযুগে অভিশাপ বলিয়া গ্রহণ করে না এবং অভিশাপের ফলে তিন দিন পরে গোয়াল ঘরে আগুন লাগে ইহাও আধুনিক যুক্তিবাদী মন মানিয়া লয় না।

গণনারায়ণের প্রতি তাঁহার স্বতঃপ্রণোদিত সেবাপরায়ণতার সাক্ষ্য আমরা পূর্বেই পাইয়াছি। বেলুড় মঠের অধ্যক্ষরূপে উহার পরিচয় তিনি পদে পদে দিয়াছিলেন। বিবিধ সেবাকার্যে রত কর্মিগণের উপর তাঁহার

আশীর্বাদ শতধারায় বর্ষিত হইত। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্যে রত জনৈক সাধুকে তিনি লিখিয়াছিলেন, "তোমার হৃদয়ে সদাসর্বদা প্রভুর শ্রীমূর্তি জাগরূক থাকুক এবং সেই বলে তোমরা তাঁর দীনদরিদ্র মূর্তিদের সেবা যথাসাধ্য করিতে সমর্থ হও।" এই জাতীয় উৎসাহবাণী-বিতরণ ও অর্থাদি-সংগ্রহ করিয়া সাহায্যপ্রদানের প্রচেষ্টা তাঁহার জীবনে ওতপ্রোত ছিল। বাহুল্যভয়ে আমরা আর উহার উল্লেখ করিব না।

জনকল্যাণরত স্বামী শিবানন্দের প্রাণে স্বাধীনতার আন্দোলনও সাড়া জাগাইত; কিন্তু তিনি সমস্ত ব্যাপারটিকে দেখিতেন মহাপুরুষেরই আত্মিক দৃষ্টিতে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সস্ত্রীক মহাত্মা গান্ধী যখন মতিলাল নেহেরু ও মহম্মদ আলি প্রভৃতি সহকর্মীদিগকে লইয়া বেলুড় মঠে আসেন তখন তিনি তাঁহাদিগকে সাগ্রহে সমস্ত দেখাইয়াছিলেন। পরে তিনি মহাত্মাজী সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "স্বামীজীর দেশপ্রীতিটা গান্ধীজীকে ভর করেছে। গান্ধীর চরিত্র সকলের অনুকরণীয়। দেশে দেশে ঐ রকম লোক জন্মালে তবে শান্তির একটা ব্যবস্থা হবে।" কিন্তু অনন্যসাধারণ জীবনের কথা ছাড়িয়া দিলে, ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ কুটিল রাজনীতি ও শান্ত-সমাহিত আত্ম-সাধনার মিশ্রণের বৃথা প্রচেষ্টায়, অথবা বহিঃ-স্বাধীনতাকে অন্তঃ-স্বাধীনতার পদে প্রতিষ্ঠার ভ্রান্ত প্রয়াসে সাধুজীবনকে বিড়ম্বিত করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে জনকয়েক দেশপ্রেমিকের সহিত তাঁহার এক সুদীর্ঘ আলোচনা হয়। তিনি সেদিন বিরুদ্ধ যুক্তি পর্যুদস্ত করিয়া ইহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, স্বাধীনতা-আন্দোলনকারীদের অনুসৃত পন্থা যতই উত্তম হউক না কেন, দেশের অভ্যুত্থানের পক্ষে উহাই পর্যাপ্ত নহে। মঠ-মিশন ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবাবলম্বনে যে পথে অগ্রসর হইতেছে, দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য

উহাও অত্যাবশ্যক—এমন কি, অধ্যাত্মবাদ পরিত্যাগপূর্বক দেশবাসী অন্য পথে চলিলে মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলই অবশ্যম্ভাবী।

১৯২১এর এপ্রিল মাসে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী দাক্ষিণাত্যভ্রমণে গমনকালে স্বামী শিবানন্দকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন। ঐ সুযোগে তিনি ঐ অঞ্চলের ভক্ত ও আশ্রমগুলির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের পর ভুবনেশ্বরে প্রায় দুই মাস অতিবাহিত করিয়া তাঁহারা ১২।১।২২ তারিখে বেলুড়ে ফিরিলেন। স্বামী অভেদানন্দ ইতোমধ্যে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ভক্তদের অনুরোধে মহাপুরুষ তাঁহাকে লইয়া পূর্ববঙ্গে গেলেন। মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত ভাগবতবাণীর আকর্ষণে ঐ সময়ে বহু নরনারী তাঁহার নিকট দীক্ষাপ্রার্থী হইল। প্রথমে তিনি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অসম্মতি জানাইলেন; কিন্তু আকুলপ্রাণ ভক্তবৃন্দ নিরস্ত না হওয়ায় সঙ্ঘগুরু স্বামী ব্রহ্মানন্দকে সমস্ত জানাইয়া পত্র লিখিলেন এবং তাঁহার আন্তরিক অনুমতি পাইয়া বহু ভক্তকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন।

মহাপুরুষের মধ্যে অকস্মাৎ এই গুরুভাবের আবির্ভাব একটু বিস্ময়-জনক। প্রায় আট বৎসর পূর্বে তিনি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আমার শিষ্য ত্রিজগতে কেহ নাই—আমি প্রভুর দাস। ··প্রভুই এযুগে সকল জীবের গুরু ও ইষ্ট।" এইরূপ মনোভাব লইয়া যিনি এতদিন চলিয়াছিলেন, আজ তিনি কিরূপে গুরুর আসনে বসিলেন? ইহার উত্তর পরবর্তিকালে কথাচ্ছলে তিনি নিজেই দিয়াছিলেন, "দেখ, বাবা, আমি দীক্ষা দিচ্ছি এ বুদ্ধি আমার নেই। ···তিনি ভক্তদের প্রাণে প্রেরণা দিয়ে এখানে নিয়ে আসেন; তিনিই আমার ভেতরে বসে যা বলান আমি তাই বলে দিই মাত্র। ঠাকুর হলেন আমার অন্তরাত্মা।" ইহাকে গুরুভাব বলিতে হয় বলুন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা শরণাগতিরই এক চরম পরিণতি। ফলতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে ভাবিত মহাপুরুষজীর গুরুভাব বিকশিত হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিত্ব মুছিয়া গিয়া ক্রমেই সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের অধিকাধিক প্রকাশ হইতে লাগিল। তিনি ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না। তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সত্যই লিখিয়াছেন, "মহাপুরুষ মহারাজ নিজেকে বাস্তবপক্ষে ঠাকুরের সঙ্গে এত মিলাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার আর পৃথক সত্তাই ছিল না। তিনি যাহাদিগকে কৃপা করিয়াছেন, তাহারা শ্রীশ্রীঠাকুরেরই কৃপা পাইয়াছে।"

ঢাকায় আনন্দের হাট বসিয়াছে—অকাতরে কৃপা পাইয়া বহু নরনারী শ্রীরামকৃষ্ণপদে আত্মসমর্পণ করিতেছে; এমন সময়ে কলিকাতা হইতে সংবাদ আসিল, স্বামী ব্রহ্মানন্দ অসুস্থ। কালবিলম্ব না করিয়া মহাপুরুষ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ মহারাজ অচিরেই স্বস্বরূপে লীন হইলেন। সে এক অতি বিষাদের দিন। সেই অপূরণীয় শূন্যস্থান পূর্ণ করিবে কে? মঠের কর্তৃপক্ষ অনেক ভাবিয়া অবশেষে স্বামী শিবানন্দ মহারাজজীকেই সভাপতিত্বে বরণ করিলেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী তাঁহাকে বেলুড় মঠের অন্যতম ট্রাস্টী নিযুক্ত করেন; ১৯১০এর ২৫শে আগস্ট তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ হন; অতঃপর ১৯২২এর ২রা মে তিনি মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইলেন।

আমরা পূর্বে বালক, সাধক ও কর্মী শিবানন্দকে দেখিয়াছি; বর্তমানে আমরা তাঁহাকে পাইব প্রধানতঃ সঙ্ঘনেতা, শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ, কৃপা-পরবশ মহাপুরুষরূপে—অথচ তৎসহ প্রতিপদেই তাঁহার বালকসুলভ সরলতা ও নির্ভর, সাধকসুলভ অদম্য প্রচেষ্টা ও ব্যাকুলতা এবং কর্মিসুলভ উৎসাহ ও অভিজ্ঞতা দেখিয়া অবাক হইব। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষরূপে তিনি বিভিন্ন স্থানে গিয়াছিলেন এবং বহু লোকের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের আধ্যাত্মিক জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন;

বহু আশ্রম তাঁহার প্রেরণায় আরম্ভ হইয়াছিল এবং অনেক কেন্দ্র তাঁহার শুভপদার্পণে নবজীবন পাইয়াছিল। ফলতঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর আপ্রাণ চেষ্টায় যে সঙ্ঘজীবন সুগঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত ও দৃঢ়মূল হইয়াছিল, তাহা মহাপুরুষের ঐকান্তিক সেবায় সুপ্রসারিত ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইয়া জননারায়ণের অশেষ কল্যাণে নিয়োজিত হইয়াছিল। সেই সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের পক্ষে অসম্ভব। আমরা শুধু সংক্ষেপে আভাসমাত্র দিয়া ক্ষান্ত হইব।

সঙ্ঘজীবনের মূল ভিত্তি হইতেছে—অবিরাম অধ্যাত্মসাধনা। বৃদ্ধ বয়সেও মহাপুরুষের সাধনার শেষ ছিল না। প্রবর্তকের ন্যায় প্রত্যহ শেষরাত্রে শয্যাত্যাগান্তে তিনি ঠাকুরঘরে যাইয়া দীর্ঘকাল ধ্যান করিতেন। স্তোত্র-পাঠাদিতেও তাঁহার অনেক কাল কাটিত। যতদিন ক্ষমতা ছিল, স্বয়ং ঠাকুর-সেবাদির সর্বপ্রকার সংবাদ রাখিতেন। সময়ের অসদ্ব্যবহার তিনি জানিতেন না; তাই প্রতিক্ষণ ভগবচ্চিন্তায় বা ভগবদালাপনে ব্যয়িত হইত। অনেক সময় শিষ্য ও শিষ্যস্থানীয়দিগকে স্বহস্তে পত্র লিখিয়া ধর্মোপদেশ দিতেন। আর সকলকে সর্বদা স্মরণ করাইয়া দিতেন যে, ঠাকুরই জীবনের কেন্দ্র। আরতিতে সকলকে ঠাকুর-ঘরে পাঠাইতেন; ভক্তের আনীত দ্রব্য আগে ঠাকুরঘরে পাঠাইতেন এবং ভক্ত আসিতেই আগে ঠাকুর প্রণামের আদেশ দিতেন। ইহা বলা মোটেই অত্যুক্তি নহে যে, শেষজীবনে মহাপুরুষ ছিলেন বেলুড় মঠের প্রাণ। মঠবাসীরা এবং মঠে আগত সাধুরা তাঁহাকে শুধু অধ্যক্ষরূপে দেখিতেন না, তাঁহারা পাইতেন তাঁহাকে তাঁহাদের ইহজীবন ও পরজীবনের অশেষ করুণাময় অবলম্বনরূপে। তাঁহার একটু দৃষ্টি, একটি স্নেহময় কথা, সামান্য প্রীতির দান সারা জীবনে উৎসাহ আনিয়া দিত। শেষজীবনের অধিকাংশ সময় তিনি বেলুড় মঠে কাটাইয়াছিলেন। প্রতিদিন যত ধর্মপিপাসু তাঁহার

গৃহে অবাধে সমবেত হইতেন, সকলেই আত্মিক অবদান কিছু না কিছু পাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণপদে তাঁহার মনপ্রাণ অর্পিত থাকায়, তাঁহার নিজের বলিয়া কিছু ছিল না। ভক্তদের আনীত অর্ঘ্য ঠাকুর-সেবায় বা সাধুসেবায় অকাতরে ব্যয়িত হইত। আর ভক্তদিগকে তিনি শুধু নিজের শিষ্যরূপে পাইয়াই পরিতৃপ্ত হইতেন না; ঠাকুরের প্রতি ও সঙ্ঘের প্রতি যাহাতে তাঁহাদের ভক্তি ও প্রেম বর্ধিত হয়, তদ্বিষয়ে সর্বদা দৃষ্টি রাখিতেন এবং উপদেশ ও নিজ জীবনের দৃষ্টান্তদ্বারা তাঁহাদের লক্ষ্য ঐ দিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতেন। বেলুড়ের বাহিরে যখন যাইতেন তখনও তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সর্বত্র ঠাকুর ও সঙ্ঘেরই মহিমা বিঘোষিত হইত।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একবার উত্তর ভারতের কাশী, প্রয়াগ ও কনখল দর্শন করিতে গিয়াছিলেন এবং ঐ বৎসর ঠাকুরের জন্মোৎসবের পূর্বেই মঠে ফিরিয়াছিলেন। সেই বৎসর উৎসবের দিন প্রাতে প্রকৃতি প্রলয়ঙ্করী মূর্তি ধারণ করিলে সাধু ও ভক্তেরা উৎসব সম্বন্ধে হতাশ হইয়া মহাপুরুষজীকে সব নিবেদন করিলেন। তিনি বাক্যব্যয় না করিয়া অনাথশরণ ঠাকুরের ঘরে যাইয়া অনেকক্ষণ ধ্যানে রত থাকিলেন। যখন বাহিরে আসিলেন, তখন বদনে এক দিব্য জ্যোতি, আর মুখে এই আশার বাণী উচ্চারিত হইল, "তাঁর ইচ্ছায় সব ঠিক হয়ে যাবে।" সেই বারে উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছিল। তারপর বসন্তকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দের অপরিপূর্ণ বাঞ্ছা পরিপূরণের জন্য ভুবনেশ্বরে দেবীর আরাধনা হইলে তিনি সেখানে গিয়া প্রায় দেড় মাস কাটাইয়াছিলেন। ঐ বৎসরই কলিকাতায় গদাধর আশ্রমে ৺জগদ্ধাত্রীপূজাতেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই গদাধর আশ্রমের সহিত তাঁহার বেশ একটা মধুর সম্বন্ধ ছিল। সঙ্ঘাধ্যক্ষ হইবার পূর্বে ১৯২১ ইং-র ১৭ই নভেম্বর তিনি ইহার প্রতিষ্ঠাকার্যে পৌরোহিত্য এবং আঠার দিন আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন।

১৯২৪এর ২৮শে জানুয়ারী বেলুড় মঠে সর্বজনসমক্ষে তিনি স্বামীজীর সমাধির উপরে ওঁকার-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পাদন করেন এবং ৭ই ফেব্রুয়ারী স্বামী ব্রহ্মানন্দের সমাধি-মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। পরে এপ্রিল মাসে দাক্ষিণাত্যযাত্রা করিয়া ওয়ালটেয়ার, সিংহাচলম্, মাদ্রাজ, কুন্নুর, উতকামণ্ড, নেত্রম্‌পল্লী, বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে প্রায় সাত মাস কাটাইয়া বোম্বাই গমন করেন। সেই যাত্রায় মাদ্রাজে এক ভক্তগৃহে তিনি ভোজনান্তে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় নিম্নে কলরব উত্থিত হওয়ায় বহির্ভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, বুভুক্ষা-পীড়িত অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষ ও বালক-বালিকা শৃগাল-কুকুরের ন্যায় উচ্ছিষ্ট পত্রসমূহ হইতে অন্ন কুড়াইয়া খাইতেছে। ইহাতে ব্যথিত হইয়া তিনি গৃহস্বামীকে তাহাদিগকে ভরপেট খাওয়াইতে আদেশ দিলেন এবং বলিলেন, "এ পুঞ্জীকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত যতদিন না হবে, ততদিন ভারতের কোন আশা নেই।" কুন্নুরে নীলগিরির উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবমণ্ডিত পরিবেশে তিনি বড়ই মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং ঐ পর্বতে সাধুদের সাধনোপযোগী আশ্রমস্থাপনের বাসনাও তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে স্বপ্নাদিষ্ট জনৈক ভক্ত উতকামণ্ডে কিছু ভূমি দান করায় মহাপুরুষ তথায় গমনপূর্বক ১১ই জুলাই আশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করিলেন।

বাঙ্গালোরে অবস্থানকালে ক্রীড়া করিতে করিতে এক বালক অকস্মাৎ অজ্ঞাতসারে ভ্রমণরত মহাপুরুষজীর চরণে হকি-স্টিক দ্বারা আঘাত করে। আঘাতের ফলে তিনি সাত-আট দিন গৃহে আবদ্ধ ছিলেন; কিন্তু লজ্জিত, অপ্রতিভ ও সন্ত্রস্ত সেই বালকটির অনুসন্ধান তিনি সর্বদা করিতেন এবং নিকটে ডাকাইয়া সান্ত্বনাবাক্যে তাহার সঙ্কোচাদি দূর করিয়া দিতেন। বাঙ্গালোরে তিনি অস্পৃশ্যদিগের মন্দিরে যাইয়া তাহাদিগকে অবাক করিয়াছিলেন; কারণ দেশের রীতি-অনুসারে এরূপ সম্মানিত

ব্যক্তির ঐ পল্লীতে পদার্পণ কল্পনাতীত। ১২ই ডিসেম্বর তিনি মাদ্রাজের রামকৃষ্ণ মিশনের আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন।

১৯২৫এর ১২ই জানুয়ারী মহাপুরুষ বোম্বাই পৌঁছিয়া আশ্রমের ভাড়া-বাড়িতে উঠিলে ভক্তগণ জানিতে পারিলেন যে, তিনি আশ্রমটিকে নিজস্ব ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন। তদনুসারে এক খণ্ড ভূমি সংগৃহীত হইল এবং ৬ই ফেব্রুয়ারী তিনি উহাতে ভিত্তিস্থাপন করিলেন। বোম্বাই হইতে বেলুড়ে ফিরিবার পথে তিনি নাগপুরে অবতরণ করেন এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারী সেখানে আশ্রমের জন্য নির্দিষ্ট ভূমিতে ভিত্তিস্থাপন করেন। ঐ বৎসর ভারত-পরিদর্শনে আগত বেলজিয়মের রাজা এলবার্ট বেলুড় মঠে আগমনপূর্বক মহাপুরুষজীর মধুর আলাপে আকৃষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতে তিনি এই একমাত্র স্থান দেখিয়াছেন যেখানে লোকে মানুষের সঙ্গে মানুষের মত কথা বলে।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন বিদ্যাপীঠের নবনির্মিত ছাত্রাবাসের দ্বারোদ্‌ঘাটন জন্য দেওঘরে যান, তখন ঠাণ্ডায় তাঁহার হাঁপানি বাড়িয়া রাত্রে নিদ্রা বন্ধ হইয়া যায়। এই কষ্টের মধ্যে বসিয়া রাত্রিযাপন করিতে করিতে তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন—শরীর ও আত্মা পৃথক, একের দুঃখ অপরকে স্পর্শ করে না। পরদিবস সকলকে পূর্বরাত্রির প্রাণসংশয় অবস্থা ও উহার অপূর্ব প্রতিকারের কথা জানাইতে গিয়া যখন বলিলেন, "বুড়ো বয়সের ধ্যান কি না—অল্পক্ষণেই মন (হৃদয়ের দিকে দেখাইয়া) ভিতরে ডুবে গেল," অমনি একজন প্রশ্ন করিলেন, "ওটা কি মহারাজ?" উত্তর আসিল, "ঐ তো আত্মা।" দেওঘর হইতে তিনি জামতাড়া হইয়া মঠে আসেন।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহাসম্মেলনে সভাপতিত্ব করার কিছু পরেই তিনি পুনর্বার দাক্ষিণাত্যভ্রমণে গমন করেন। পথে

পুরী ও ভুবনেশ্বরেও কিছুদিন অতিবাহিত হয়। এইবারে উতকামণ্ডে বাসকালে তাঁহার এক অত্যাশ্চর্য দর্শন হয়। নীল পর্বতের তরঙ্গায়িত শিখরশ্রেণীর প্রতি নীরবে দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার শরীর হইতে কে যেন বাহির হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন। ইহাই কি বিরাটরূপের প্রত্যক্ষানুভূতি? অতঃপর পাঁচ মাস তথায় অবস্থানান্তে ২৪শে সেপ্টেম্বর উতকামণ্ডের নবনির্মিত আশ্রম যথাবিধানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি ২০শে অক্টোবর বাঙ্গালোরে গেলেন। বাঙ্গালোর হইতে মাদ্রাজ হইয়া পুনর্বার বোম্বাই চলিলেন। এইবারে ২৬শে ডিসেম্বর নবনির্মিত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন হইল; অতঃপর ঐ আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয় ও অবৈতনিক বিদ্যালয়েরও ভিত্তিস্থাপনের পর মঠে ফিরিবার পথে তিনি পুনর্বার নাগপুরে অবতরণ করিলেন। তখন আশ্রমের জমি হইয়াছে; কিন্তু বাড়ি হয় নাই। মহাপুরুষ সেই জমিতেই তাঁবু খাটাইয়া বাস করিয়াছিলেন।

পরবৎসর (১৯২৭) ১৯শে আগস্ট স্বামী সারদানন্দের দেহত্যাগে মঠ-মিশনের একটি প্রধান স্তম্ভ খসিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বামী শিবানন্দের গুরুদায়িত্ব বহুল পরিমাণে বর্ধিত হইল। কিন্তু সে গুরুভার-স্বীকারের মনোভাব তখন তাঁহার নাই। তিনি জানিতেন, তাঁহার 'ডান অঙ্গ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।' সেই নিদারুণ আঘাতে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া তাঁহাকে বায়ুপরিবর্তনের জন্য মধুপুরে যাইতে হইল। মধুপুরে স্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ উন্নতি হইলে তিনি কাশীধামে গমন করিলেন। কাশীতে এক দিব্য দর্শনের ফলে তাঁহার মন আবার কর্মভূমিতে নামিবার আদেশ পাইল। একরাত্রে তাঁহার অনাবৃত চক্ষের সম্মুখে জটাজূটধারী শুভ্রদেহ ত্রিনয়ন দেবাদিদেব মহাদেব উপস্থিত হইলেন—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মন উচ্চ হইতে উচ্চতর ভূমিতে উঠিয়া ক্রমে যেন কোন্ অসীমে বিলীন হইতে চলিল; এমন সময়ে শিবমূর্তির

স্থলে অকস্মাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া নির্দেশ দিলেন, "তোর এখন থাকতে হবে, আরও কিছু কাজ আছে।" আর একদিন তিনি সেবাশ্রমের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ভ্রমণকালে বিভূতিমণ্ডিত তুষারধবল বিশ্বনাথের দর্শন পাইয়াছিলেন। উহার পর হইতে তিনি সর্বদা এক উচ্চ ভাবভূমিতে বিচরণ করিতেন এবং ঐ সময়ে আহারাদি সম্বন্ধেও উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফলতঃ সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক শক্তিকে অধিকতর প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যেন এখন হইতে স্বামী শিবানন্দের দেহ-মনকে একদিকে যেমন কার্যের জন্য প্রস্তুত করিতেছিলেন, অপর দিকে তেমনি উহাকে এক অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক সুরে বাঁধিতেছিলেন। কাশী হইতে তিনি পাটনা হইয়া স্বীয় কর্মকেন্দ্র বেলুড়ে ফিরিলেন। ইহার পর তিনি কিঞ্চিদধিক ছয় বৎসর মর্ত্যধামে ছিলেন।

এই শেষ কয়টি বৎসর বড়ই মধুর, বড়ই অনুপ্রেরণায় পরিপূর্ণ। বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এবং উৎসাহ জাগাইয়া তিনি ক্ষুদ্রকেও মহৎ করিতে পারিতেন। তিনি বলিতেন, "দেখ, ঠাকুর বলতেন, 'বিন্দুতে সিন্ধু দেখতে হয়।' " কাহাকেও শাসন করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে বলিতেন, "সকলেই নির্দোষ হতে এসেছে; নির্দোষ হয়ে তো কেউ আসে নি!...খালি ধমকালে মানুষের দোষ শোধরায় না। পার তো নিজের আধ্যাত্মিক শক্তিদ্বারা লোকের মনের গতি ফিরিয়ে দাও।" সর্বক্ষেত্রেই তিনি ভগবানের উপর নির্ভর করিতে বলিতেন। মঠের অর্থকৃচ্ছ্রতা যথেষ্টই ছিল। ব্যয়-সঙ্কোচের কথা তুলিলে বলিতেন, "দেখ, আমাদের তো কিছু অপব্যয় হচ্ছে না। কি আর খরচ কমাবে? ...তাঁকে জানাও। ঠাকুর আমাদের পরীক্ষা করছেন।" ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে জনকয়েক স্বার্থপর ব্যক্তি সঙ্ঘের সমূহ ক্ষতিসাধনে বদ্ধপরিকর হইলে এবং সকলেই একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় সংশয়-দোলায়মান হইলে তিনি বিশ্বাস জাগাইয়া বলিয়াছিলেন, "সত্যের

জয় নিশ্চয়। সত্যাশ্রয়ী প্রভুর গড়া সঙ্ঘের কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না—তোমরা নিশ্চিত জেনো।" আর একদিন তিনি ঐ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "এই যুগপ্রবর্তনের কাজ বহু শতাব্দী ধরে অবাধে চলবে। কেউ এর গতি রোধ করতে পারবে না। এ, বাবা, ত্রিকালজ্ঞ ঋষি স্বয়ং স্বামীজীর কথা।" সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে তিনি যেমন ঐ কালে নিশ্চিত ছিলেন, শত্রুদের মঙ্গলের জন্যও তেমনি প্রার্থনা জানাইয়া বলিতেন, "প্রভু, এদের ক্ষমা করো, এদের রক্ষা করো—তোমারই আশ্রিত —এদের মনের গতি ঘুরিয়ে দাও, সুবুদ্ধি দাও। আর যাই কর, ঠাকুর, এদের ত্যাগ করো না।"

তিনি নিজে যেমন স্বীয় পদগৌরবের অভিমান করিতেন না, অপরেরও তেমনি বংশমর্যাদা, সামাজিক অবস্থা, বয়স ইত্যাদির প্রশ্ন তুলিতেন না—লক্ষ্য রাখিতেন শুধু ভক্তের আগ্রহের প্রতি। জনৈকা দীক্ষাপ্রার্থিনী বিধবা দীক্ষাকালে দেয় দক্ষিণাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "কিছু না। কেবল চাই প্রাণ—প্রাণ আনতে পারবে, মা? আর দক্ষিণা? তা একটা হরীতকী আনলেই চলবে। ঠাকুরের দরবারে ওসব কিছু নেই—চাই কেবল প্রাণ।" ঠাকুরের দরবারে উচ্চতম আসনে বসিয়াও ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া নিরভিমান আত্মভোলা মহাপুরুষ বলিতেন, "আমার বিদ্যা নেই, বুদ্ধি নেই, কোন ক্ষমতা নেই—তুমি বসিয়েছ, তাই বসেছি।" আর পতিতপাবনী ভাগীরথীর ন্যায় নির্বিচারে জীবোদ্ধারে নিরত থাকিয়া বলিতেন, "আমি এখন মা-গঙ্গা হয়ে গেছি।" তাঁহার শরীর তখন বিশেষ অসুস্থ—হাঁপানির টান প্রায়ই হয়; কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি নাই, আর কৃপারও বিরাম নাই। তিনি বলিতেন, "কেন আছি? খেয়ে সুখ নেই, বসে সুখ নেই—তবু তাঁর ইচ্ছা।... এ শরীর থাকলে যদি লোকের কল্যাণ হয়, আর তাই যদি মায়ের ইচ্ছা হয়,

তো হোক। ···শরীর যে আছে, তাই অনেক সময় মনে হয় না। ·· এ শরীরকে তিনি তাঁর যুগধর্মপ্রচারের যন্ত্রস্বরূপ করেছেন।"

দেহবোধহীন বিদেহ মহাপুরুষের এই সুর সর্বদা চড়িয়াই থাকিত। প্রণামান্তে একদিন একজন চরণধূলি চাহিলে বলিলেন, "পা-ই নেই, তো পায়ের ধূলো।" কিন্তু তাই বলিয়া তিনি শরীরের অযত্ন করিতেন না—ডাক্তারের কথা শুনিয়া চলিতেন। উহার কারণ তাঁহার নিজের উক্তিতেই পাওয়া যায়—"এ দেহ তো সাধারণ দেহের মত নয়। এর একটা বিশেষত্ব আছে। এ শরীরে ভগবান-উপলব্ধি হয়েছে। এ শরীর ভগবানকে স্পর্শ করেছে, তাঁর সঙ্গে বাস করেছে, তাঁকে সেবা করেছে,··· তাই এত।" সদা আত্মমগ্ন মহাপুরুষ কথনও বা সবই চিন্ময় দেখিতেন। যে সম্মুখে আসিত, তাহাকেই নির্বিচারে প্রথমেই প্রণাম করিয়া বসিতেন। একটি বিড়াল মেঝের উপর মিউ মিউ করিয়া ডাকিতেই তাহাকে প্রণামান্তে নিকটস্থ সেবককে বলিলেন, "দেখ্, ঠাকুর আমায় এমন অবস্থায় রেখেছেন যে, সবই দেখছি চিন্ময়; ঘর-দোর, খাট-বিছানা এবং সব প্রাণীর ভেতরেই সেই এক চৈতন্যের খেলা।"

সর্বভূতে তখন তাঁহার অসীম প্রীতি; আর সাংসারিক অভাব মিটাইতে তিনি মুক্তহস্ত। এই ব্যক্তির ঘরে অন্ন নাই—"দাও একে দশ টাকা।" উহার কন্যার বিবাহ হইতেছে না—"দিয়ে দাও কুড়ি টাকা"—এই ছিল তাঁহার নিত্য কর্ম। মঠের প্রাঙ্গণে বসিয়া মুচি কাজ করিতেছে। দ্বিপ্রহরে সকলে আহারান্তে বিশ্রামে চলিয়া গিয়াছেন—তখনও মুচির কাজের বিরাম নাই। দেখিয়া তাঁহার প্রাণে বাজিল। অমনি তাহাকে খাওয়াইবার আদেশ দিলেন, আর উপর হইতে মুচির অজ্ঞাতসারে একটি আধুলি ছুড়িয়া দিলেন। গঙ্গার উপরের বারান্দা হইতে দেখিয়া অনুসন্ধানে জানিয়াছেন, বৃদ্ধ জেলে পূর্ণ হালদার মাছ ধরিয়াও

অন্নসংস্থান করিতে পারে না। কায়েমী হুকুম হইল, উহার মাছ দরদস্তুর না করিয়া কিনিতে হইবে। হালদার আট আনার জায়গায় দুই টাকা এবং সময়ে সময়ে নূতন বস্ত্রাদিও পাইতে লাগিল।

এইরূপে দুই হাতে সমস্ত বিলাইয়া তিনি বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ১৯৩৩ ইং-র ২৫শে এপ্রিল দীক্ষান্তে আহার শেষ করিতেছেন, এমন সময়ে দারুণ পক্ষাঘাতে তাঁহার বাক্‌শক্তি ও দক্ষিণাঙ্গের ক্রিয়া রুদ্ধ হইল। এই অবস্থায় তিনি এক বৎসর ছিলেন। তখনও প্রতিদিন বাক্‌শক্তি ও চলচ্ছক্তিরহিত মহাপুরুষের চক্ষের চাহনি বা বাম হস্তের ইঙ্গিতে যে স্নেহের ভাষা প্রকটিত হইত তাহা শত শত প্রাণে শান্তি সঞ্চারিত করিত। তখনও ঠাকুরের সেবাদি সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় তাঁহাকে জানাইতে হইত। কাশীতে একদিন তিনি ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন, "আমার জিব কেটে নিলেও আমি তাঁরই কথা ভাবব, আর তাঁরই নাম করব। আমার কাছ থেকে কেউ তাঁকে বা তাঁর নাম কেড়ে নিতে পারবে না।" কে সেদিন ভাবিয়াছিল যে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী আজ এমনি নিষ্ঠুরভাবে পরিপূর্ণ হইবে?

অবশেষে শেষদিন আসিয়া পড়িল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী আশু বিষাদের ঘন ছায়াপাতের মধ্যেও শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব মহাসমারোহে যথাবিধি সমাপ্ত হইয়া গেল। ২০শে মঙ্গলবার অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলিল। অপরাহ্ন ৫টা ৩৬ মিনিটে তাঁহার বদনমণ্ডল এক অপূর্ব আনন্দজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল এবং মস্তকের কেশ ও অঙ্গের লোমরাজি কদম্বপুষ্পের কেশরবৎ দণ্ডায়মান হইয়া উঠিল। সেই আনন্দপুলকের মধ্যেই অন্তিম নিঃশ্বাস নির্গত হইল—মহাসমাধিতে মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ হৃদয়দেবতার শ্রীপাদপদ্মে চিরমিলিত হইলেন।

স্বামী সারদানন্দ

স্বামী সারদানন্দ

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন পদচারণ করিতে করিতে সহসা এক যুবকের ক্রোড়ে উপবিষ্ট হন এবং কয়েক মুহূর্ত ঐ ভাবে থাকিয়া উঠিয়া যান। উপস্থিত ভক্তদের ঐ বিষয়ে কৌতূহলদর্শনে তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখলাম, ও কতটা ভার সইতে পারবে।" এই যুবককেই স্বামী বিবেকানন্দ যথাকালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদকপদে বরণ করিয়াছিলেন এবং তিনিও সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর এই গুরুভার বহনপূর্বক স্বীয় ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। "স্বামীজীর আদেশ"—ইহাই ছিল তাঁহার কর্মপ্রেরণার অন্যতম প্রধান উৎস। ইনিই আমাদের স্বামী সারদানন্দ।

সারদানন্দের পূর্বনাম ছিল শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁহার পিতামহ সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। পত্নীবিয়োগের পর তিনি হুগলী জেলার জনাই গ্রামে বসতিস্থাপন ও টোলপ্রতিষ্ঠা করিয়া বহু অন্তে-বাসীকে শিক্ষা দিতে থাকেন। শরতের পিতা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী কিন্তু গ্রাম পরিত্যাগপূর্বক কলিকাতায় আসেন এবং একটি ঔষধের দোকানের অংশীদাররূপে বহু অর্থ উপার্জন করেন। সঙ্গতিসম্পন্ন হইলেও গিরিশচন্দ্র ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং কর্মব্যপদেশে তাঁহার বহু সময় কাটিলেও নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনা, পূজা-পাঠ ও জপধ্যানের ব্যতিক্রম হইত না। মাতা শ্রীযুক্তা নীলমণি দেবীও অনুরূপ ভক্তিমতী ছিলেন। তিন কন্যার পর শরৎচন্দ্র এই ধর্মপ্রাণ দম্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যার পরে ৬টা ৩২ মিনিটে (৯ই পৌষ, ১২৭২ সাল, শুক্লা ষষ্ঠীতিথি) ভূমিষ্ঠ হন! শনিবারে জন্ম হওয়ায়

পরিবারের সকলে একটু চিন্তাকুল হইয়াছিলেন। কিন্তু শিশুর পিতৃব্য ঈশ্বরচন্দ্র জ্যোতির্বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন; তিনি কোষ্ঠীবিচারের পর সকলকে অভয়দানপূর্বক জানাইলেন যে, এই শিশু গণ্যমান্য হইয়া ভবিষ্যতে পরিবারের মুখোজ্জ্বল করিবে।

শৈশব হইতেই শরতের স্বভাব বড় শান্ত ছিল—বয়সোচিত চঞ্চলতা তাঁহাতে মোটেই পরিলক্ষিত হইত না। তাই পরবর্তী জীবনে তাঁহার কার্যকুশলতার অপূর্ব বিকাশদর্শনে শৈশবের অভিভাবকদিগকে বলিতে শোনা যাইত, "এর ভেতর এত ছিল তা তো জানতুম না।" বিদ্যালয়ের পরীক্ষাদিতে তিনি প্রথম কিংবা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেন। ছাত্রদের আলোচনাসভায়ও তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেন এবং ব্যায়ামাদিসহায়ে স্বীয় দেহকে সুগঠিত করিয়াছিলেন। স্বগৃহে শান্ত স্বভাব ও ধর্মপ্রাণতা একত্রে মিলিত হইয়া শরৎচন্দ্রের বাল্যকালকে বড় মধুর করিয়া তুলিয়াছিল। জননী যখন গৃহদেবতার পূজায় ব্যাপৃত থাকিতেন, কিশোর শরৎ তখন পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিয়া সমস্ত লক্ষ্য করিতেন এবং যথাসময়ে সমবয়স্কদের সহিত ক্রীড়াচ্ছলে উহার পুনরাবৃত্তি করিতেন। এতদ্ব্যতীত দেব-দেবীর স্তোত্রাদি তিনি অনর্গল মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারিতেন। পূজা-পাঠে সন্তানের আগ্রহদর্শনে স্নেহময়ী জননী তাঁহাকে পূজার যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। শরৎ ঐ সমস্ত পাইয়া ক্রীড়া ভুলিয়া দেবারাধনায় নিরত হইলেন। অবশেষে ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে উপনয়নের পর যখন গৃহদেবতার অর্চনার অধিকার পাইলেন, তখন তিনি অতি আগ্রহসহকারে বিধিপূর্বক নিয়মিত পূজা-পাঠ ও জপ-ধ্যানে মগ্ন হইলেন।

এই বয়সেই গরীব-দুঃখীর জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত এবং পাঠশালায় জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া তিনি দরিদ্র ছাত্রদিগকে সাহায্য করিতেন। পয়সা এমন কিছু অধিক ছিল না—দিনে দুই-চারি আনা মাত্র। সৎকার্যে

ব্যয়ের আশায় উহা হইতেই কিছু কিছু তুলিয়া রাখিতেন এবং কার্যক্ষেত্রে উক্ত অর্থ প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট না হইলে অনেক স্থলে নিজের ছাতা কিংবা বস্ত্রাদি বিক্রয় করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। সেবার স্পৃহাও সমভাবেই জাগ্রত ছিল। একবার এক প্রতিবেশীর গৃহে একটি পরিচারিকা বিসূচিকারোগে আক্রান্ত হইলে পরিবারের অপর সকলের নিরাপত্তার জন্য গৃহকর্তা উক্ত স্ত্রীলোকটিকে বাড়ির ছাদের এক পার্শ্বে বিনা যত্নে ফেলিয়া রাখিলেন। এই নিদারুণ সংবাদ শরতের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি রোগিণীর সেবা-শুশ্রূষা ও ঔষধ-পথ্যাদির যাবতীয় ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার জীবনরক্ষা হইল না। নিষ্ঠুর প্রতিবেশী তখনও শবদাহের কোন ব্যবস্থা করিতেছেন না দেখিয়া শরৎচন্দ্র পেশাদার বৈষ্ণব-দিগকে ডাকিয়া আনিয়া মৃতসংকারের সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এইরূপ ঘটনায় শরতের বাল্য ও যৌবন পরিপূর্ণ। বস্তুতঃ রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদকরূপে তিনি আর্ত ও দরিদ্রের সেবায় ভবিষ্যতে যে বিপুল মহানুভবতা ও কর্মনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার সূচনা আমরা তাঁহার জীবনপ্রভাতেই দেখিতে পাই।

ক্রমে বিদ্যালয়ের আলোচনাসভায় সভ্যদের নিকট ব্রাহ্মসমাজের সংবাদ পাইয়া শরৎ সেখানে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন এবং কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় আকৃষ্ট অপর অনেক যুবকের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের গ্রন্থাদি-পাঠ ও ধ্যানাভ্যাসাদিতে রত হইলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পর বৎসরের প্রারম্ভে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হইলেন। এই কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার লাফঁ শরতের ধর্মভাব লক্ষ্য করিয়া স্বয়ং তাঁহাকে বাইবেল পড়াইতে আরম্ভ করেন। নিষ্ঠাবান শাক্ত পরিবারে জাত এবং ভক্তিমতী মাতার ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়াও ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত এবং বাইবেল-অধ্যয়ন যুগপৎপ্রভাবেই

হইয়াছিল সত্য ; কিন্তু এইরূপ করিয়াও নিজ ব্যক্তিত্ব প্রভাবে শরৎ কখনও স্বধর্মে আস্থাশূন্য হন নাই।

পাঠাভ্যাসের ন্যায় শরৎ অন্যান্য কার্যেও উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় সৎ-চর্চা, আর্ত-সেবা ও ব্যায়ামাদির জন্য পল্লীতে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল। একবার এই সমিতির বার্ষিক আনন্দোৎসব উপলক্ষে তিনি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে যাইয়া ঘটনাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পান। কিন্তু তাঁহার মহিমা সম্বন্ধে তখন তেমন ধারণা না থাকায় ঐ দর্শন তাঁহার মনে কোন স্থায়ী রেখাপাত করে নাই। অতঃপর কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি শশী ও অন্যান্য সমবয়স্কদের সহিত ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একদিন পরমহংসদেব-সমীপে উপস্থিত হইয়া শ্রীমুখকথিত বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্যের উপদেশলাভে কৃতার্থ হন। ইহার সবিশেষ বিবরণ রামকৃষ্ণানন্দ-প্রসঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে।

এই তীব্র বৈরাগ্যের উপদেশ শরৎ ও শশীর ধর্মজীবনে এক অভিনব আলোক-সম্পাত করিল। বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের সপ্রেম ব্যবহার তাঁহাদিগকে আরও দৃঢ়তররূপে দক্ষিণেশ্বরের দিকে টানিতে লাগিল। দুই ভ্রাতার অবসর একই সময়ে হইত না বলিয়াই হউক কিংবা একাকী যাইবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ স্মরণ করিয়াই হউক অতঃপর দুই জনে পরস্পরের অজ্ঞাতসারেই দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজ প্রতি বৃহস্পতিবারে বন্ধ থাকিত ; সুতরাং বিশেষ প্রতিবন্ধ না ঘটিলে শরৎ ঐ দিনই ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইতেন। কোন কোন দিন আবার দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়াও যাইতেন। তখন গভীর রাত্রে ঠাকুর তাঁহাকে জাগাইয়া দিয়া পঞ্চবটী, বেলতলা বা শ্রীশ্রীভবতারিণীর নাটমন্দিরে ধ্যান করিতে পাঠাইতেন। একদিন শরৎ নিবেদন করিলেন, কিছুতেই মন স্থির হইতেছে না। ঠাকুর স্বীয় তর্জনীর নখাগ্রদ্বারা শরতের

ভ্রূদ্বয়মধ্যে আঘাত করিয়া সেখানে মনকে ধারণ করিতে বলিলেন—অমোঘ বিধানে শীঘ্রই উহা নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় তথায় স্থির হইয়া গেল।

অপর একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে উপবিষ্ট আছেন—শ্রীশ্রীগণপতি সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। ঠাকুর গণেশের চরিত্র, মাতৃভক্তি প্রভৃতি কথার অবতারণপূর্বক উচ্চ প্রশংসা করিতে থাকিলে শরৎ সহসা বলিয়া উঠিলেন, "আমি গণেশের চরিত্র পছন্দ করি; তিনিই আমার জীবনের আদর্শ।" ঠাকুর অমনি সংশোধন করিয়া বলিলেন, "না, তোমার আদর্শ গণেশ নন, তোমার আদর্শ শিব—শিবের গুণরাজি তোমাতে বিদ্যমান।" তিনি আরও বলিলেন, "নিজেকে সর্বদাই শিব এবং আমাকে শক্তি বলে ভাববে।" সাধারণবুদ্ধি আমাদের পক্ষে এই সমস্ত রহস্যের মর্মভেদ করা অসম্ভব। তবে পরবর্তী কালে আমরা দেখিতে পাইব যে, সুদীর্ঘ কর্মজীবনে শরৎ যে অদ্ভুত তিতিক্ষা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা নীলকণ্ঠ শিবের পক্ষেই সম্ভবপর—গরল পান করিয়াও অম্লানবদনে আশীর্বাদ করা, নিজের সুখ-সুবিধা বিসর্জন দিয়াও অপরের সেবায় আত্মনিয়োগ করা শুধু আশুতোষেরই সাধ্যায়ত্ত। আর শরতের সমস্ত শক্তির উৎস ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীমা—তিনি ছিলেন তাঁহাদের শক্তিপ্রকাশের অস্বতন্ত্র যন্ত্র।

আর একদিনের ঘটনাসম্বন্ধে শরৎচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "কল্পতরু হওয়ার সময় ছাড়াও ঠাকুর অনেক সময়ে অনেকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। ঐরূপ একদিন আমি কাছে দাঁড়িয়ে আছি দেখে ঠাকুর বললেন, 'কিরে, তুই যে কিছু চাইলি না?' সে সময় আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'কি আর চাইব? আমি যেন সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করি—এই করে দিন।' উত্তরে ঠাকুর বলেছিলেন, 'ও যে শেষকালের কথা রে!' আমি বললাম, 'তা

আমি জানি না, মশায়!' তখন ঠাকুর বললেন, 'তা তোর হবে।' " এই ঘটনার উল্লেখান্তে শরৎচন্দ্র ইহাও বলিয়াছিলেন, "তিনি যা বলেছিলেন, এখন তাঁর কৃপায় সেটা বেশ অনুভব করছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত পরিচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শ্রীমুখে নরেন্দ্রনাথের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া শরৎ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। অবশ্য ঠাকুরের নিকট আগমনের পূর্বেও ঘটনাক্রমে নরেন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; কিন্তু তখন এক ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি আলাপ-পরিচয় করিতে অগ্রসর হন নাই। সেই সময়ে শরৎচন্দ্র সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার এক বাল্যবন্ধুর স্বভাব উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে। সত্যনির্ধারণের জন্য তিনি একদিন বন্ধুগৃহে উপস্থিত হইয়া এক কক্ষে বন্ধুর আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে জনৈক যুবক অতি পরিচিতের মত সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশপূর্বক আপনমনে গুন্‌গুন্ স্বরে একটি হিন্দী গান গাহিতে লাগিল। যুবকের ব্যবহারাদি শরতের মনঃপূত হয় নাই; আবার বন্ধু আসিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না দিয়া যুবকটির সহিত আলোচনায় রত হইলে বিরক্তির কারণও ঘটিল। তবু তিনি ভদ্রতা হিসাবে বসিয়া বসিয়া আলোচনা শুনিতে শুনিতে সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন যে, এই যুবকের সঙ্গদোষেই বন্ধু বিপথে চলিয়াছে; কারণ এই শ্রেণীর অন্যান্য যুবকের ন্যায় এই ব্যক্তিরও কথা এবং কার্যের সামঞ্জস্য নাই—সে মুখে অতি উচ্চভাব প্রকাশ করিলেও, তাহার ব্যবহার নিশ্চয়ই উহার বিপরীত। মাস কয়েক পরে ঠাকুরের নিকট নরেন্দ্রনাথের প্রশংসা-শ্রবণান্তে তিনি তাঁহার গৃহে যাইয়া নির্বাক বিস্ময়ে দেখিলেন, এই তো সেই যুবক! অমূলক ভুল ভাঙ্গিবার পর নরেন্দ্রনাথ শরতের প্রিয়তম বন্ধুতে পরিণত হইলেন এবং তাঁহাদের সৌহার্দ্য-স্থাপনে প্রয়াসী শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় যত্ন সফল হইয়াছে দেখিয়া সহাস্যে বলিলেন, "গিন্নী জানে, কোন্

হাঁড়ির মুখে কোন্ সরা রাখতে হয়।" উভয়ের প্রীতির বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

শরৎচন্দ্র একদিন নরেন্দ্রনাথের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গান গাহিতে বলিলেন। নরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া তানপুরায় সুর বাঁধিতে বাঁধিতে বলিলেন, "তুই বাঁয়াটা নে।" শরৎ জানাইলেন, তিনি ঐ বিদ্যায় পারদর্শী নহেন। "খুব সোজা" বলিয়া নরেন্দ্রনাথ মুখে বোল বলিতে বলিতে হাতে বাজাইয়া তাঁহাকে কয়েকটি ঠেকা শিখাইয়া দিলেন এবং তারপর গান ও বাদ্য চলিতে লাগিল। শুধু গান-অবলম্বনেই যে উভয়ের মিলন হইত তাহা নহে; অনেক ক্ষেত্রে উচ্চ বিষয়ের আলোচনায় তাঁহারা এতই মগ্ন হইতেন যে, স্থানকাল ভুলিয়া যাইতেন। একবার এইরূপ আলোচনায় ব্যাপৃত দুই বন্ধু পরস্পরকে তত্তৎ গৃহে পৌঁছাইয়া দিতে গিয়া উভয়গৃহের মধ্যবর্তী পথটুকু একাধিক বার অতিক্রম করিয়াছিলেন; স্বগৃহে পৌঁছিলেও আলোচনা শেষ হয় নাই দেখিয়া নরেন্দ্র শরৎকে লইয়া শরতের গৃহে চলিলেন, আবার অনুরূপভাবে শরৎও স্বগৃহ হইতে নরেন্দ্রকে লইয়া নরেন্দ্র-ভবনে চলিলেন—এইরূপ ক্রমাগত কয়েকবার যাতায়াতের পর সেই দিনের ব্যাপার শেষ হইয়াছিল। আর একদিনের একটি আশ্চর্য ঘটনা। তখন ১৮৮৪ অব্দের শীতকাল। শশী ও শরৎ দ্বিপ্রহরের পূর্বে নরেন্দ্রের গৃহে যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গে এত মগ্ন হইলেন যে, ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া গেল। তখন তিন জনে হেদুয়া পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইতে গেলেন। সেখানেও নরেন্দ্রের সেই চিত্তাকর্ষক কাহিনী চলিতে লাগিল। হঠাৎ ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজিল। অগত্যা নরেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে চলিলেন। সেখানে পৌঁছিয়াও গল্পের শেষ নাই। ক্রমে রাত্রি গভীর হইতেছে দেখিয়া শরৎ স্থির করিলেন যে, নরেন্দ্রকে জলযোগ করাইয়া দেওয়া উচিত। অনুরোধক্রমে নরেন্দ্র গৃহাভ্যন্তরে চলিলেন; কিন্তু

প্রবেশ করিতে না করিতে অকস্মাৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এ বাড়ি যে আমি পূর্বেই দেখেছি! এর কোথা দিয়ে কোথা যেতে হয়, কোথায় কোন্ ঘর আছে, সে সবই যে আমার পরিচিত—কি আশ্চর্য!" জল-যোগান্তে নরেন্দ্র স্বগৃহে ফিরিলেন। শরৎ শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথমে সিদ্ধ ব্যক্তি বা ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষ বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু নরেন্দ্রের সহিত এরূপ আলোচনার ফলে তাঁহাকে অবতার বলিয়া জানিলেন। শুধু তাহাই নহে; নরেন্দ্রের ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলি জ্বলন্ত ভাষায় ব্যক্ত হইয়া ক্রমে শাস্ত্রোল্লিখিত রহস্যের দ্বার তাঁহার নিকট উদ্‌ঘাটিত করিল—তিনি ভক্তিতে আপ্লুত ও শ্রদ্ধায় নতশির হইলেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এফ. এ. পরীক্ষা পাশ করার পর শরতের পিতা তাঁহাকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করিতে চাহিলেন। কিন্তু ঠাকুর ডাক্তার ও উকিলের অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন না—এই কথা ভাবিয়া শরৎ সন্দেহাকুল হইলেন। অতঃপর বিশ্বস্ত বন্ধু নরেন্দ্রনাথের পরামর্শে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষায়ই অগ্রসর হইলেন। এই ভাবে নরেন্দ্রনাথকে শুধু বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিয়াই শরৎ ক্ষান্ত হন নাই, তিনি ক্রমে তাঁহাকে নেতার আসনও প্রদান করিয়াছিলেন। এমন কি, অনেক বিষয়ে তিনি নরেন্দ্রের অনুকরণ করিতেন। স্বামীজীর নিকট সঙ্গীতশিক্ষার ফলে শরৎ তাঁহার গানের ঢং অনেকটা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। শেষ বয়সেও তিনি উহা ভুলেন নাই।

ঠাকুরের কাশীপুরে আগমনের পর সেবকের অভাব হইতেছে দেখিয়া শরৎ ঐ কার্যে সানন্দে অগ্রসর হইলেন। প্রথমতঃ তিনি সর্বদা থাকিতে পারিতেন না; কিন্তু অবশেষে ঠাকুরের অসুখ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে দিবারাত্র কাশীপুরেই কাটাইতেন। এই সময়ে তাঁহার জীবনের গতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পিতার মনে ভয়সঞ্চার হইল; সুতরাং পুত্রকে গৃহে

ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য একদিন স্বনামধন্য পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত কাশীপুরে উপনীত হইলেন—মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিলেন, এমন পণ্ডিতের সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরের দৈন্য উন্মোচিত হইয়া পড়িলে বুদ্ধিমান পুত্র নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সলজ্জ-ভাবে আপনা হইতেই গৃহে ফিরিবে। ঘটনা কিন্তু অন্যরূপ দাঁড়াইল। শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া পণ্ডিত গোপনে শরতের পিতাকে জানাইলেন যে, পুত্রের ভাগ্যে এই প্রকার গুরুলাভ হওয়া অতি আনন্দের বিষয়। আর একদিন শরতের পিতা শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিলেন, "আপনি একটু বললেই ও বিয়ে করবে।" শরৎচন্দ্র শুনিয়াই বলিলেন, "উনি বললেই আমি বিয়ে করব কি না! যা কর্তব্য মনে করেছি, উনি বললেও তার অন্যথা হবে না।" শুনিয়া ঠাকুর সহাস্যে বলিলেন, "শুনেছ ও কি বলে? আমি আর কি করব?"

ক্রমে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী আসিল। সেদিন কল্পতরু হইয়া ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশায় সমবেত ভক্তবৃন্দের মধ্যে যে যাহা চাহিতেছে তাহাই অকাতরে দান করিতেছেন। উদ্যানপথে এই অলৌকিক লীলা চলিতেছে, এদিকে দ্বিতলে লাটু ও শরৎ অবকাশ বুঝিয়া ঠাকুরের শয্যাদি রৌদ্রে দিয়া ঘরখানির সংস্কারে নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা দ্বিতলের ছাদ হইতে ভক্তদের আনন্দধ্বনি শুনিলেন, মত্তপ্রায় তাঁহাদের আচরণও কিঞ্চিৎ লক্ষ্য করিলেন; কিন্তু অর্ধনিষ্পন্ন হাতের কাজ ফেলিয়া গেলে ঠাকুরের অসুবিধা হইবে মনে করিয়া মনঃশক্তিপ্রভাবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ার অদম্য বাসনা রোধ করিলেন। পরে তাঁহাকে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রথমে প্রকৃতিসুলভ সঙ্কোচবশতঃ উত্তর দিতেন, "তখন যে ঠাকুরের বিছানা-পত্র রোদে দিচ্ছিলাম—কখন তিনি উঠে আসবেন, তাড়াতাড়ি বিছানা করতে হবে।" প্রশ্নকর্তার ঔৎসুক্য

ইহাতেও না থামিলে বলিতেন, "পাবার ইচ্ছা তো মনে আসে নি, তা ছাড়া তিনি যে আমাদেরই ছিলেন।" "আমাদেরই ছিলেন" বলিতে তাঁহার বদনখানি আবেগে আরক্তিম হইয়া উঠিত।

ঠাকুর কখন কখন স্বীয় সন্তানদিগকে ভিক্ষায় পাঠাইতেন। প্রথম ভিক্ষার দিনের কথা শরৎচন্দ্র সকৌতুকে এইভাবে বর্ণনা করিতেন, "আমি এক ছোট গ্রামের ভেতর গিয়ে 'নারায়ণ হরি' বলে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়ালুম। ডাক শুনে একজন বয়স্কা রমণী বেরিয়ে এলেন। এমন সুস্থদেহ ভদ্রলোকের ছেলেকে ভিক্ষা করতে দেখে তিনি ঘৃণার সহিত বলে উঠলেন, 'এমন গতর রয়েছে, ভিক্ষা করে খাচ্ছ কেন? ট্রামের কণ্ডাক্টরি করতে পার না?' —এই বলে দরজা বন্ধ করে দিলেন।"

ঠাকুরের মহাসমাধির পর তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক অভিভাবকের আদেশে পুনর্বার অধ্যয়নে মন দিলেন। পিতা ভাবিলেন, এরূপে পুত্রের মন গৃহেই আবদ্ধ রাখিবেন। কিন্তু বরাহনগরে মঠ স্থাপনের পরে নরেন্দ্রাদি মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের গৃহে আসিয়া প্রাণস্পর্শী ভাষায় ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা শুনাইতে এবং স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন যে, ঠাকুর তাঁহার সন্তানদের নিকট অনেক কিছু আশা করেন। পিতার শাসনে থাকিয়া শরৎ রুদ্ধদ্বার গৃহে অধ্যয়নে বসিতেন; কিন্তু নরেন্দ্রের করাঘাতে সে দ্বার উদ্ঘাটিত হইত। এইরূপে নরেন্দ্রের প্রেরণায় শরতের বরাহনগর মঠে যাতায়াত আরম্ভ হইলে পিতা প্রথমে অনুনয়-বিনয় করিলেন; কিন্তু উহা ফলপ্রদ না হওয়ায় তাঁহাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া দরজায় চাবি দিলেন। এইভাবে তাঁহাকে অধিক দিন কাটাইতে হয় নাই; কারণ একটি ছোট ভাই পিতার অজ্ঞাতসারে দ্বার খুলিয়া দিল এবং মুক্তি পাইয়াই তিনি পূর্ববৎ চলিতে লাগিলেন। অতঃপর আঁটপুর হইতে ফিরিয়া তিনি সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্বক সারদানন্দ নামে পরিচিত হইলে এবং গৃহের সহিত সর্বপ্রকার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে পিতামাতা

বুঝিলেন যে, আর পুত্রের উপর অভিমান করা বৃথা ; বরং এক্ষণে তাঁহার ধর্মপথের সমস্ত কণ্টক দূর করার জন্য তাঁহাকে সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করাই যুক্তিযুক্ত। অতএব তাঁহারা একদিন বরাহনগরে আগমনপূর্বক তাঁহাকে জানাইয়া গেলেন যে, আর তাঁহাদের মনে কোনও খেদ নাই ; তাঁহারা তাঁহার নবজীবনে সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই কামনা করেন।

বরাহনগরে স্বামী সারদানন্দ অপর তপস্বীদেরই ন্যায় সাধনায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন। দিনে তিনি সকলের সহিত আধ্যাত্মিক আলোচনায় যোগ দিতেন ; আর গভীর নিশীথে কোন দিন স্বামীজীর সহিত, কোন দিন বা একাকী কাশীপুর-শ্মশানে কিংবা দক্ষিণেশ্বর-পঞ্চবটীতে ধ্যানজপে রত হইতেন। এইরূপে কত রাত্রি যে তিনি অনিদ্রায় কাটাইয়া অপরের অজ্ঞাতসারে বরাহনগরে প্রত্যাবর্তনপূর্বক দৈনন্দিন কার্যে যোগদান করিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে? একদিকে নিষ্ঠাপূর্বক গভীর ধ্যান এবং অপর দিকে আশ্রমের যাবতীয় কার্য যথাবিহিত সম্পাদন—ইহা অল্প লোকের পক্ষেই সম্ভবপর। আবার গুরুভ্রাতাদের কাহারও অসুখ হইলে কোমলস্বভাব শরৎ মহারাজ সহানুভূতি ও সেবাপরায়ণতা লইয়া তাঁহার রোগশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইতেন।

তাঁহার গলার স্বর নারীজনোচিত কোমল ছিল। তিনি যখন গান গাহিতেন তখন দূর হইতে সহসা বামাকণ্ঠ বলিয়া ভ্রম হইত। একদা রাত্রে তিনি বরাহনগর মঠে সুকণ্ঠে গান ধরিয়াছেন, এমন সময়ে পল্লীর কেহ কেহ স্থির করিলেন যে, মঠে নিশ্চয়ই নারীর আগমন হইয়াছে। এহেন কঠিন সত্য আবিষ্কার করিয়া মঠের ভণ্ড সন্ন্যাসীদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার মানসে তাঁহারা সেদিকে অগ্রসর হইলেন ও বহির্দ্বার রুদ্ধ থাকায় উল্লম্ফনপূর্বক প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলেন। কিন্তু সঙ্গীতসভায় উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহারা লজ্জায় অধোবদন হইলেন।

অবশেষে নিজেদের ত্রুটি স্বীকারপূর্বক তাঁহারা সাধুদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। শরৎ মহারাজের স্তোত্রাদি-পাঠও বিশেষ চিত্তাকর্ষক ছিল। তিনি যখন বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ সুকণ্ঠে চণ্ডীপাঠ করিতেন তখন শ্রোতৃবৃন্দের মন স্বতঃই ভক্তিরসে আপ্লুত হইত।

অতঃপর তাঁহার অন্তরে তীর্থভ্রমণের আহ্বান ধ্বনিত হওয়ায় ১৮৮৭ অব্দের মার্চ মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবান্তে তিনি স্বামী প্রেমানন্দ ও অভেদানন্দের সহিত পদব্রজে নীলাচলে যান। সেখানে কয়েক মাস তপস্যা করিয়া তিনি বরাহনগরে ফিরিলেন এবং স্বল্প বিশ্রামান্তে উত্তরভারতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি গয়া, কাশী, অযোধ্যা প্রভৃতি তীর্থস্থান-দর্শনান্তে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষে সান্ন্যাল মহাশয়ের সহিত হরিদ্বার হইয়া হিমালয়ের পাদদেশে পবিত্র তপোভূমি হৃষীকেশে উপস্থিত হইলেন এবং অনুকূল স্থান পাইয়া ভিক্ষাবৃত্তি-অবলম্বনে সাধনায় নিমগ্ন হইলেন। ইহারই এককালে স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত তিনি দুর্গম তীর্থ নীলকণ্ঠেশ্বর দেখিতে যান। ফিরিবার সময় অন্ধকারে পথভ্রষ্ট হইয়া তাঁহারা সাতিশয় চিন্তাকুল হইলেন—কারণ জনমানবহীন শ্বাপদবহুল এই পার্বত্য অরণ্যে প্রতিপদে জীবনসংশয়। অবশেষে স্বামী সারদানন্দ বলিলেন যে, একসঙ্গে মৃত্যুর মুখে আগাইয়া যাওয়া অপেক্ষা প্রত্যেকে বিভিন্ন পথে যাইয়া প্রাণরক্ষার চেষ্টা করা অধিক যুক্তিসঙ্গত। তদনুসারে চলিয়া তুরীয়ানন্দজী দৈবক্রমে এক নির্জন আশ্রমে স্থান পাইলেন। রাত্রে সারদানন্দের খোঁজ করা সম্ভব না হওয়ায় প্রভাতে আশ্রয়দাতার সহিত তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইয়া তিনি দেখেন, সারদানন্দজী দূরে এক অত্যুচ্চ শিলাপৃষ্ঠে ধ্যানমগ্ন। ঐরূপ করার কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিলেন, "মৃত্যু যেখানে নিশ্চিত সেখানে ত্রস্ত না হয়ে ভগবানের নাম করতে করতে মরাই উচিত।"

পর বৎসর (১৮৯০) বৈশাখ মাসে স্বামী সারদানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও সান্ন্যাল মহাশয় একত্রে ৺গঙ্গোত্রী এবং ৺কেদারনাথ ও ৺বদরীনারায়ণ-দর্শনে যাত্রা করিলেন। তখন পাহাড়ে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় সরকার বাহাদুর সদর রাস্তায় পাহারা বসাইয়া যাত্রীদিগকে ঐ অঞ্চলে যাইতে নিষেধ করিতেছিলেন। সারদানন্দ প্রভৃতির কিন্তু তীর্থদর্শনের আকাঙ্ক্ষা অতি প্রবল—নিঃস্ব, নিঃসহায় সন্ন্যাসীর ভাগ্যে এইরূপ সুযোগ সর্বদা উপস্থিত হয় না। সুতরাং তাঁহারা সদর রাস্তা পরিত্যাগপূর্বক মুশুরী হইয়া নগ্নপদে বনপথে অগ্রসর হইলেন। তখনকার দিনে পদব্রজে হিমালয়ভ্রমণ অধিকতর কষ্টসাধ্য ছিল—সব সময়ে আহারাদিও পাওয়া যাইত না। বিবিধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চিত্তহারী হইলেও শ্বাপদাধ্যুষিত ও বিপদসঙ্কুল জনবিরল পথে চলিতে অনভ্যস্ত নবীন সন্ন্যাসীরা প্রতিপদে বহু কষ্ট সহ্য করিতে করিতে ক্রমে গঙ্গোত্রীতে উপনীত হইলেন এবং হিন্দুর এই বহুপ্রার্থিত দুর্গম তীর্থসলিলে অবগাহন ও মন্দিরে দেবীকে দর্শন করিয়া পথক্লেশ সার্থক মনে করিলেন। গঙ্গোত্রী হইতে ৺কেদার যাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা পুনর্বার বনপথে চলিয়া ভাটোয়ারী গ্রামের প্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং সেখান হইতে এক দুর্গম ও নির্জন পাকদণ্ডী ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। সে পথে প্রথম দিন ভিক্ষায় নির্গত হইয়া তাঁহারা রিক্তহস্তে ফিরিলেন; কারণ গ্রাম জনমানবশূন্য। দ্বিতীয় দিনও অপর এক গ্রামে ঐরূপ ঘটিল। তৃতীয় দিন আর একটি গ্রামে অকস্মাৎ এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে বুঝাইয়া দিল যে, ঐ অঞ্চলে ভিক্ষা করিতে হয় সকালে কিংবা সন্ধ্যায়—দিনে গ্রামবাসীরা অন্যত্র কাজে চলিয়া যায়। এদিকে দুই-তিন দিনের অনাহারে সকলেই ক্লান্ত ও ক্ষুধিত। স্বামী তুরীয়ানন্দ একপ্রকার ঘাস দেখিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য উহাই ভক্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু উহা উদরস্থ হইবামাত্র বমনের সহিত নির্গত হইয়া গেল। ইহার ফলে তিনি

আরও দুর্বল হইয়া পড়িলেন। ভাগ্যক্রমে তখন একজন পাণ্ডার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহারা তাঁহার নির্দেশে চলিয়া এক গ্রামে পৌঁছিলেন এবং তাঁহার সাহায্যে আহারসংগ্রহ করিয়া অনেকটা সুস্থ হইলেন।

এই ভ্রমণকালে শরৎ মহারাজ তাঁহার সৎসাহস ও পরদুঃখকাতরতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। একদিন তিন জনে এক খাড়া পাহাড় হইতে নামিতেছেন—অপর দুই জন সম্মুখে এবং সারদানন্দ পশ্চাতে চলিয়াছেন। সকলের পশ্চাতে যে পাহাড়ীরা চলিতেছিল তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধার হস্তে যষ্টি না থাকায় তাহার পক্ষে পর্বতাবরোহণ বড়ই কষ্টসাধ্য হইতেছিল। স্বামী সারদানন্দ জানিতেন যে, এইরূপ পার্বত্য পথে যষ্টি একটি প্রধান অবলম্বন ; তথাপি বৃদ্ধার অসহায় অবস্থা দেখিয়া তিনি নিজ যষ্টি তাহাকে দিয়া অম্লানবদনে শূন্যহস্তে চলিলেন। রিক্তহস্তে চলার ফল তিনি শীঘ্রই পাইলেন ; কারণ অচিরে এক পার্বত্য নির্ঝরিণী অতিক্রমণকালে তাঁহার পদস্খলন হইল এবং তিনি অসহায়ভাবে জলমধ্যে পড়িয়া গেলেন। ঐ অবস্থা হইতে অপর সঙ্গীরা তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। পরবর্তী গ্রাম অতিক্রম করিয়া যাইতে যাইতে তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "যদি এই ক্ষুধার সময় এখানে লুচি ও হালুয়া খেতে পাই, তবে বুঝব ঠাকুর সত্যই আছেন।" তাঁগার মনে তাদৃশ ইচ্ছার উদয় হওয়ার অল্প পরেই এক ব্যক্তি একটি জলপূর্ণ ঘটি ও কিছু গরম হালুয়া ও লুচি লইয়া তাঁহার নিকটে আসিল। সঙ্গীদিগকে বঞ্চিত করিয়া একা ঐ সকল গ্রহণ করা সারদানন্দের অভিপ্রেত না হইলেও সঙ্গীরা বহু দূরে চলিয়া যাওয়ায় ও দাতা আগ্রহ দেখাইতে থাকায় তাঁহাকে একাই খাইতে হইল।

ভাটোয়ারীর বনপথ-অতিক্রমান্তে স্বামী তুরীয়ানন্দ একাকী অন্যপথে চলিয়া গেলেন। স্বামী সারদানন্দ ও সান্ন্যাল মহাশয় অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে

৺কেদারনাথ দর্শন এবং পরে ৺বদরীনারায়ণ-দর্শনান্তে জুলাই মাসে আলমোড়ায় আসিলেন। তথা হইতে তাঁহারা স্বামীজীর সহিত ৫ই সেপ্টেম্বর হিমালয়ভ্রমণে নির্গত হইলেন এবং টিহিরী, দেরাডুন, হৃষীকেশ, কনখল ও মীরাট ঘুরিয়া দিল্লীতে পৌঁছিলেন। দিল্লীতে আসিয়া স্বামীজী নিঃসঙ্গভ্রমণে বাহির হইলেন। তাঁহার আমেরিকাগমনের পূর্বে সারদানন্দের সহিত এই শেষ দেখা (ফেব্রুয়ারী, ১৮৯১)।

দিল্লী পরিত্যাগের পর স্বামী সারদানন্দ মথুরা, বৃন্দাবন ও প্রয়াগক্ষেত্র দর্শনপূর্বক কাশীধামে আসিয়া ভেলুপুরা অঞ্চলে বাবু সীতারামের উদ্যান-বাটীতে আশ্রয় লইলেন। কিছুদিন পরেই সেখান হইতে ৺দুর্গাবাড়ীর নিকটে অন্নদা দত্তের বাগানে উঠিয়া গেলেন। তথায় ধর্মপিপাসু বৃদ্ধ দীনু মহারাজ তাঁহার দিব্যমাধুরীপূর্ণ ধ্যানগম্ভীর মূর্তিদর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক সচ্চিদানন্দ নামে পরিচিত হইলেন। ক্রমে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে স্বামী অভেদানন্দও তথায় আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। সকলেই তখন ভগবদ্ভাবে পরিপূর্ণ; আবার ভক্তির রীতিই এই যে, সে বিবিধ প্রকার প্রকাশের মধ্যেই চরিতার্থতা লাভ করে। অতএব শীঘ্রই তিন জনে পদব্রজে কাশী-পরিক্রমায় নির্গত হইলেন। এই প্রকার পরিশ্রমে অনভ্যস্ত তাঁহারা সকলেই কিন্তু পরিক্রমার ফলে জ্বরে পড়িলেন। জ্বর হইতে আরোগ্যলাভের কিছুদিন পরেই স্বামী সারদানন্দের আমাশয় হইল। অগত্যা ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বরাহনগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

বরাহনগরে আরোগ্যলাভান্তে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন ও জগদ্ধাত্রীপূজা-অনুষ্ঠানার্থে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল, হরমোহন, কালীকৃষ্ণ, গোলাপ-মা ও যোগীন-মার সহিত জয়রামবাটী গমন করেন (অক্টোবর, ১৮৯২)। সেখানে মানসিক আনন্দে থাকিলেও পূজার তিন দিন পরে স্বামী সারদানন্দের

ম্যালেরিয়া হইল। মঠে ফিরিয়াও ঐ জন্য তাঁহাকে দীর্ঘকাল ভুগিতে হইয়াছিল। মঠ আলমবাজারে উঠিয়া আসিলে তিনি দক্ষিণেশ্বরে সাধনার বিশেষ সুবিধা পাইলেন। সেখানে একটি মাটির মালসায় ভিক্ষালব্ধ আহার্য সিদ্ধ করিয়া তিনি দিনে একবার খাইতেন এবং পাত্রটি আবার গাছের ডালে ঝুলাইয়া রাখিতেন। ইহার পরে তিনি তীর্থদর্শনে নির্গত হইয়া রাজপুতানা ও সৌরাষ্ট্রের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া ও কিছুদিন বিভিন্ন স্থানে সাধনা করিয়া পুনঃ মঠে ফিরিয়া আসেন।

এদিকে বিদেশে প্রচারকের প্রয়োজন হওয়ায় স্বামীজীর আহ্বান আসিল এবং তদনুসারে স্বামী সারদানন্দ লণ্ডনে শ্রীযুক্ত ই টি ষ্টার্ডির বাটীতে উপস্থিত হইলেন (১লা এপ্রিল, ১৮৯৬)। ইহার অল্প পরেই স্বামীজী দ্বিতীয়বার লণ্ডনে পদার্পণ করিলে নূতন প্রচারকের সহিত তাঁহার মিলন হইল, এবং বিদেশে স্বামী সারদানন্দের প্রকৃত কর্মজীবন আরম্ভ হইল। বক্তৃতায় অনভ্যস্ত সারদানন্দকে স্বামীজী সযত্নে শিক্ষা দিয়া সাধারণ-সমক্ষে উপস্থিতির জন্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে সারদানন্দ পরে বলিয়াছিলেন, "কথা বলিতে গেলেই আমার হাত-পা ছোড়ার বড় মুদ্রাদোষ ছিল। বিলাতে স্বামীজী হাতে একটি ছড়ি নিয়ে বসতেন এবং আমাকে আয়নার সম্মুখে দাঁড় করিয়ে বক্তৃতা দিতে আদেশ করতেন। হাত-পা নাড়লেই স্বামীজীর বেত এসে হাতের উপর আঘাত করে আমাকে সজাগ করে দিত।" কিন্তু এত করিয়াও সভায় বক্তৃতাদানের কথা উঠিলেই সারদানন্দ 'আজ না', 'আজ না', বলিয়া পাশ কাটাইতেন। স্বামীজী প্রথমে ভৎর্সনাদি করিলেন—বলিলেন, "তবে এসেছিলি কেন? যা ফিরে যা।" কিন্তু ইহাতেও ব্যর্থকাম হইয়া তিনি নিজের নামে আহূত বক্তৃতাসভায় ঘোষণা করিলেন যে, সেদিন বক্তৃতা দিবেন স্বামী সারদানন্দ। অগত্যা তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইল

এবং উহা বেশ মনোরমই হইল। অতঃপর লণ্ডনে আরও কয়েকটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতাপ্রদানান্তে জুন মাসের শেষভাগে স্বামীজী তাঁহাকে গুড্‌উইনের সহিত বেদান্ত-প্রচারের জন্য নিউইয়র্কে পাঠাইলেন।

আমেরিকায় তাঁহার কার্য অচিরেই সাফল্যমণ্ডিত হইল। তিনি তাঁহার গুণগ্রাহীদের নিমন্ত্রণক্রমে সদালাপ ও বক্তৃতাদির জন্য নিউইয়র্কের বাহিরেও যাইতে লাগিলেন। একসময়ে তিনি নিউইয়র্কের অদূরবর্তী মণ্ট্-ক্লেয়ার নামক স্থানে মিসেস্ হুইলারের গৃহে ছিলেন। ঐ মহিলাটি এক রাত্রে স্বপ্নে এক শান্ত সৌম্য প্রাচ্য মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পান এবং সে মূর্তি তাঁহার হৃদয়ে চিরমুদ্রিত হইয়া অনুসন্ধিৎসা জাগাইতে থাকে। একদিন স্বামী সারদানন্দের দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখার কালে অতর্কিতে একখানি পুস্তক পড়িয়া গেলে উহার মধ্য হইতে যে চিত্রখানি বাহির হইল, মহিলাটি সবিস্ময়ে দেখিলেন ইনিই সেই স্বপ্নদৃষ্ট মহাত্মা। পরে স্বামী সারদানন্দের নিকট জানিলেন যে, ইনিই লোকগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। তদবধি শ্রীযুক্তা হুইলার শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরক্ত ভক্ত হইলেন।

স্বামী সারদানন্দ প্রচারে সুনাম ও সাফল্য অর্জন করিলেও অধিক দিন আমেরিকায় থাকেন নাই। স্বামীজী প্রথমবারে ভারতে ফিরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপনান্তে কার্যপরিচালনের জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তদনুসারে তিনি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী 'টিউটনিক' নামক জাহাজে আমেরিকা ত্যাগ করিলেন—সঙ্গে চলিলেন শ্রীযুক্তা ওলিবুল ও শ্রীমতী ম্যাকলাউড। পথে তাঁহারা ইউরোপে অবতরণপূর্বক লণ্ডন, প্যারিস ও রোম প্রভৃতি দর্শনান্তে ৮ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় পৌঁছিলেন। এই প্রত্যাবর্তনকালে তিনি দ্বিতীয়বার রোমে সেণ্ট্-পিটারের গির্জা দর্শন করিলেন। কথিত আছে যে, লণ্ডনে যাইবার পথে প্রথম বারে এই গির্জায় গিয়া তিনি সেণ্ট্-পিটারের মূর্তির সম্মুখে সমাধিস্থ হন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, "শশী আর শরৎকে দেখেছিলাম ঋষি কৃষ্ণের দলে।" শ্রীরামকৃষ্ণ যীশু-খ্রীষ্টকে ঋষি কৃষ্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দের উক্ত সমাধি কি ঐ মহাবাণীরই প্রমাণ ?

পাশ্চাত্ত্য অভিজ্ঞতা লইয়া স্বদেশাগত শরৎ মহারাজকে স্বামীজী মিশনের সেক্রেটারীপদে নিযুক্ত করিলেন। আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের পর সারদানন্দজী ধারাবাহিকরূপে এলবার্ট হলে অনেকগুলি বক্তৃতা প্রদান করেন; ঐগুলি সবিশেষ চিত্তগ্রাহী হওয়ায় পরে 'গীতাতত্ত্ব' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা দিয়াছিলেন। প্রচার ভিন্ন অপরাপর ক্ষেত্রেও তাঁহার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও অনুপ্রেরণাদির ফলে ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কার্যবৃদ্ধি ও দায়িত্ববৃদ্ধি সমভাবে হইয়া থাকে। কিন্তু অনুপম কর্মযোগী স্বামী সারদানন্দ অম্লানবদনে ও অক্লান্তভাবেই আপন কর্তব্য করিয়া যাইতে লাগিলেন; শুধু দেখা গেল যে, তাঁহার স্বভাবসুলভ সহিষ্ণুতা, উদ্বেগশূন্য গাম্ভীর্য, দুর্লভ তিতিক্ষা এবং অতুলনীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রতি পরীক্ষার পরে প্রবলতর হইয়া রামকৃষ্ণ মিশনকে সাফল্যের অত্যুচ্চ শিখরে লইয়া যাইতে লাগিল।

মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, মঠ ও মিশনের এই প্রথমাবস্থায় সঙ্ঘের অন্তর্নিহিত ভাবধারা প্রবাহিত হইত আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের সমাহিত চিত্তে সংস্থাপিত শ্রীরামকৃষ্ণ-গোমুখী হইতে। সেই ভাবসমষ্টিকে মঠ ও মিশনের বিশাল ক্ষেত্রে বিচিত্র প্রণালীতে পরিচালিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন তাঁহার গুরুভ্রাতারা। ইঁহাদের মধ্যে আবার স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ প্রধানতঃ সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, আর স্বামী সারদানন্দের দৃষ্টি থাকিত সেই ভাবরাশিকে নির্দিষ্ট কার্যধারায় পরিচালনের প্রতি। কিন্তু এই বিভাগটি উভয়ের চরিত্রের সহিত

পরিচয়লাভের পক্ষে যতই মূল্যবান হউক না কেন, কেবল এই দৃষ্টিভঙ্গী-সাহায্যে আমরা তাঁহাদের চরিত্রবিশ্লেষণে অগ্রসর হইলে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য হইব এবং অপরের প্রতিও অন্যায় করিব ; কারণ একদিকে যেমন স্বামী ব্রহ্মানন্দ অনেক ক্ষেত্রে নবীন প্রতিষ্ঠানগঠনে বা পুরাতন প্রতিষ্ঠানের সুনিয়ন্ত্রণে ব্যাপৃত থাকিতেন, অপরদিকে তেমনি স্বামী সারদানন্দও সঙ্ঘজীবনকে সুপবিত্র ও ভগবন্মুখ রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। আবার এই উভয়বিধ প্রচেষ্টাতেই স্বামীজীর অবদান বড় সামান্য ছিল না। স্বামীজী শুধু ভাবুক ছিলেন না, তিনি ছিলেন অক্লান্ত কর্মী। এতদ্ব্যতীত স্বামী প্রেমানন্দপ্রমুখ গুরুভ্রাতারা স্বস্বক্ষেত্রে বিবিধরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবরাশিকে রূপায়িত করিয়া এই বিরাট সঙ্ঘকে পবিত্র, পূর্ণাবয়ব, শক্তিশালী, সুন্দর ও গৌরবময় করিতেছিলেন। ফলতঃ বাহ্যদৃষ্টিতে যাঁহার অবদান যেরূপই হউক না কেন, আমাদিগকে এই সংহত অন্তর্দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের জীবনী আলোচনা করিতে হইবে।

যাহা হউক, আমরা স্বামী সারদানন্দের জীবনই অনুসরণ করি। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী অধ্যাপক ওকাকুরা ভারতদর্শনে আসিলে তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বুদ্ধগয়া দেখাইয়া আনিলেন। ঐ বৎসরই কাশ্মীরে যাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ অসুস্থ হইয়া পড়িলে তিনি অবিলম্বে কাশ্মীর যাত্রা করিলেন। রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর যাইবার পথে তিনি এক নিদারুণ দুর্ঘটনায় পতিত হন। অশ্বযানে যাইতেছিলেন—চালক উন্মত্তপ্রায়, অশ্ব বেগে চলিতেছে, আর কোচোয়ান আপন মনে বলিয়া যাইতেছে, "আজ যদি আল্লা বাঁচায় দেখব!" অকস্মাৎ মোড় ফিরিবার সময় বিপরীত দিক হইতে আর একখানি গাড়ি আসিয়া পড়ায় শরৎ মহারাজের গাড়ি পাশ কাটাইতে গিয়া রাস্তা হইতে নামিয়া ক্রমে নীচের দিকে গড়াইয়া চলিল। এদিকে আবার একটি বড় পাথরে ধাক্কা লাগায় উহাও গাড়ির

পশ্চাতে আসিতে লাগিল। স্বামী সারদানন্দ দেখিলেন, এভাবে নামিতে থাকিলে মৃত্যু অনিবার্য। তথাপি তিনি উদ্বেগশূন্য হইয়া সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন এবং ভাবিলেন সম্মুখের বৃক্ষটির নিকটে পৌঁছিলেই উহার শাখা ধরিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবেন। ভাগ্যক্রমে ঘোড়াটি আড়াআড়ি ভাবে গাছে ঠেকিয়া থামিয়া গেল এবং তিনি পূর্বসিদ্ধান্তানুযায়ী লাফাইয়া পড়িলেন। ইহাতে পায়ে একটু আঘাত লাগা ভিন্ন তিনি অক্ষতই রহিলেন; ঘোড়াটির উপরে কিন্তু পূর্বোক্ত প্রস্তরখণ্ড আসিয়া পড়ায় সে প্রাণত্যাগ করিল। এই অজ্ঞাত স্থান হইতে আত্মরক্ষা করা ও কোচোয়ানের সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনাই হইল তখন তাঁহার প্রধান চিন্তা। যাহা হউক, কোচোয়ান প্রকৃতিস্থ হইয়া নিকটবর্তী গ্রামে গেল এবং সেখান হইতে গন্তব্য স্থানে যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

আর একবার ইংলণ্ড যাইবার পথে তিনি ভূমধ্যসাগরে তুল্যরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাবাত উত্থিত হইয়া সমুদ্রবক্ষ চঞ্চল করিয়া তুলিলে সহযাত্রীরা প্রাণভয়ে হতাশভাবে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। এই চঞ্চলতার মধ্যে কিন্তু তিনি দ্রষ্টা হিসাবে অচঞ্চল রহিলেন। বলা বাহুল্য যে, সেই নিশ্চেষ্টতা তখন সচেষ্ট অনেকেরই মনে বিরক্তির উদ্রেক করিয়াছিল—যদিও কেহ তাহা সুস্পষ্ট ব্যক্ত করে নাই। অনুরূপ আর একটি ক্ষেত্রে কিন্তু সহযাত্রী ঐ প্রকার নীরব থাকিতে পারেন নাই। সেই বারে মহারাজের একটি ফোড়াতে অস্ত্রোপচার আবশ্যক হওয়ায় স্বামী সারদানন্দ ডাক্তার কাঞ্জিলালের সহিত বাগবাজার হইতে নৌকাযোগে বেলুড়ে যাইতেছিলেন, এমন সময় ভীষণ ঝড় উঠিয়া নৌকা মগ্নপ্রায় হইল। সারদানন্দজী তখন তামাক খাইতে-ছিলেন; ঝড়ের সময়ও নিশ্চিন্তে তাহাই করিতেছেন দেখিয়া সহযাত্রী কাঞ্জিলাল আর সহ্য করিতে পারিলেন না, মহাক্রোধে ছিলিমটা তুলিয়া

লইয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন, "আপনি দেখছি মজার লোক! নৌকা ডুবছে, আর আপনি বসে তামাক খাচ্ছেন।" শরৎ মহারাজ স্বাভাবিক ভাবেই উত্তর দিলেন, "তামাক খাব না তো নৌকা না ডুবতেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে নাকি?" ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেই নৌকা আসিয়া বেলুড়মঠের ঘাটে থামিল।

শ্রীনগরে স্বামী বিবেকানন্দ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে লাহোরে আনিয়া স্বামী সদানন্দের উপর সেবাভার অর্পণ করিলেন। তারপর স্বামীজীর নির্দেশে তাঁহার সহগামী পাশ্চাত্ত্য ভক্তদিগকে তীর্থাদি দর্শন করাইবার দায়িত্ব লইয়া সদলবলে উত্তর-পশ্চিম ভারত ভ্রমণানন্তর কাশীধামে আগমনপূর্বক ৺বিশ্বনাথ দর্শন করিলেন। ইহার স্বল্পকাল পরেই তিনি মঠে (নীলাম্বর বাবুর উদ্যানবাটীতে) ফিরিলেন।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রচার ও অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে গুজরাটের দিকে রওয়ানা হইলেন। এই উপলক্ষে সারদানন্দজী কানপুর, আগ্রা, জয়পুর, আহম্মদাবাদ, লিমডি, জুনাগড়, ভবনগর প্রভৃতি শহরে যান এবং স্থানে স্থানে ইংরেজী এবং হিন্দীতে বক্তৃতা করিয়া জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করেন। এই সময়ে সংবাদ আসিল যে, স্বামীজী পুনর্বার আমেরিকায় যাইবেন বলিয়া তাঁহাদের মঠে প্রত্যাবর্তন আবশ্যক। তদনুসারে তাঁহারা ৩রা মে মঠে উপস্থিত হইলেন।

মঠে আগমনের পর স্বামীজীর সহিত স্বামী তুরীয়ানন্দ বিদেশ যাত্রা করিলেন, এবং স্বামী সারদানন্দ নবাগত সাধুদের শিক্ষার ভার স্বহস্তে লইলেন। তাহারা যাহাতে নিয়মিত সাধনভজন ও শাস্ত্রাধ্যয়নাদি করে তৎপ্রতি তাঁহার প্রথম দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি নিয়ম করিলেন যে, সাধু-দিগকে পর্যায়ক্রমে ঠাকুরঘরে সারারাত্রি জপধ্যান চালাইতে হইবে। নিজেও

প্রায়ই উদয়াস্ত জপধ্যান করিয়া সকলের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করিতেন। অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনায়ও তিনি সাধুদের সহিত বহু সময় কাটাইতেন। এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে বক্তৃতা, বিশিষ্ট ভক্ত পরিবারে উপদেশপ্রদান, পত্রিকায় প্রবন্ধ-প্রকাশ এবং মঠ-মিশনের পত্রাদি লিখাতেও তাঁহার অনেক সময় ব্যয়িত হইত। এই বৎসরের মধ্যভাগে রাজপুতানায় কিষণগড়ে করাল দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তাঁহার নেতৃত্বে মিশন হইতে সাহায্যব্যবস্থা করা হয়। ঐ কর্মের প্রাথমিক ব্যয়নির্বাহের জন্য হস্তে অর্থ না থাকায় ঋণ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই।

ইত্যবকাশে পূর্ববঙ্গ হইতে পুনঃপুনঃ আহ্বান আসিতে থাকায় তিনি ডিসেম্বর মাসে ঐ অঞ্চলে গমনপূর্বক ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতাদি করেন। বরিশালে তিনি আট দিন ছিলেন। অশ্বিনীবাবুর বাটীর নিকটে একখানি নূতন গৃহে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। শরৎ মহারাজ ঐ বাটীতে বিশ্রামাদি এবং অশ্বিনীবাবুর গৃহে সমাগত ভক্ত ও ভদ্রমণ্ডলীর সহিত ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন। বরিশালে তিনি তিনটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন—একটি ইংরেজীতে এবং অপর দুইটি বঙ্গভাষায়। দুইটি প্রশ্নোত্তর-সভাও হয়। শেষদিবস অন্তরঙ্গ ভক্তদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ করিতে করিতে তিনি সমাধিস্থ হন এবং অনেকক্ষণ নিঃস্পন্দভাবে থাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে করিতে সাধারণভূমিতে নামিয়া আসেন।

প্রচারকার্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তান্ত্রিক সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। এই কার্যে তিনি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের মন্ত্রশিষ্য ও তাঁহার পিতৃব্য সিদ্ধ কৌল ঈশ্বরচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন এবং শ্রীশ্রীমা ও স্বামী ব্রহ্মানন্দকে সমস্ত বিষয় অবগত করাইয়া ১৯০০ ইং-র ২০শে নভেম্বর (৫ই অগ্রহায়ণ) চতুর্দশী রাত্রিতে পূর্ণাভিষিক্ত

হইলেন। শ্রদ্ধেয়া যোগীন-মারও ঐ রাত্রে পূর্ণাভিষেক হইল। তন্ত্রসাধনায় রত হইয়া স্বামী সারদানন্দ অচিরেই শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নারীমাত্রে অধিষ্ঠিতা দেখিতে পাইলেন। তিনি স্বরচিত 'ভারতে শক্তিপূজা' গ্রন্থে শক্তিপূজার রহস্যোদ্ঘাটন-প্রসঙ্গে নিজ অনুভূতির যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি সিদ্ধির অতি উচ্চ স্তরে আরোহণান্তেই ঐ পুস্তকপ্রণয়নে অগ্রসর হইয়াছিলেন। গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে আছে, "যাঁহাদের করুণাপাঙ্গে গ্রন্থকার জগতের যাবতীয় নারীমূর্তির ভিতর শ্রীশ্রীজগদম্বার বিশেষ শক্তিপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদেরই শ্রীপাদপদ্মে এই পুস্তিকাখানি ভক্তিপূর্ণচিত্তে অর্পিত হইল।"

স্বামীজী দ্বিতীয়বার যখন আমেরিকা হইতে ফিরিলেন, তখন তিনি অসুস্থ; অথচ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী যাহাতে দেশ অচিরে গ্রহণ করে তজ্জন্য তাঁহার আগ্রহ বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া দেশের অক্ষমতায় ক্ষণে ক্ষণে বিরক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। এই সব মুহূর্তে কেহ তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহস না পাইলেও কার্যব্যপদেশে সারদানন্দকে যাইতেই হইত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, স্বামীজীর আশীর্বাদ বা ভৎর্সনায় বিচলিত না হইয়া তিনি নির্বিকারভাবে স্বকার্যসাধনে নিরত থাকিতেন। স্বামীজী একদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দকে কার্যোপলক্ষে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। মঠে প্রত্যাবর্তনান্তে স্বামী সারদানন্দ যখন স্বামীজীকে জানাইলেন যে, কার্যসম্পাদন হয় নাই, তখন স্বামীজী মনে করিলেন যে, তন্নির্দিষ্ট পন্থা অতিক্রম করায়ই ঐরূপ হইয়াছে; অতএব বিরক্তিসহকারে স্বীয় অনুপম ভাষায় বলিলেন, "ঐ তো এক ছটাক বুদ্ধি— রেখে দে, সুদে-আসলে বাড়ুক, এর পরে কাজে লাগবে।" এমন সময়ে সেবক আসিয়া উভয়কে চা দিয়া গেলে সারদানন্দ নির্বিবাদে বিনা বাক্যব্যয়ে চা খাইতে বসিলেন—যেন কিছুই হয় নাই। তখন স্বামীজী

যেন হতাশ-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এর যেন বেলে মাছের রক্ত; কিছুতেই তাতে না।" তিনি হয়তো ভাবিয়াছিলেন, এইরূপ মর্মান্তিক ভৎ'সনার পরে সারদানন্দ অন্ততঃ প্রতিবাদ জানাইবেন।

আত্মস্থ এই পুরুষের আত্মসংবরণের বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। একদিন ঠাকুরঘরে পাচকের কর্দমাক্ত পদচিহ্ন দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং শাসন করিবার উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ তাহাকে তথায় ডাকিলেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষণিক ক্রোধ অচিরে তিরোহিত হইয়া যাওয়ায় পাচককে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন, "না, কিছু নয়, তুমি যেতে পার।" তিনি স্বীয় দৃষ্টি মানুষের অন্তর্নিহিত অব্যক্ত পূর্ণতার প্রতি নিবদ্ধ রাখিতেন বলিয়া সাময়িক অপূর্ণতার প্রকাশে সহজে ধৈর্য হারাইতেন না। এইজন্য অন্যত্র যাহারা আশ্রয় পাইত না তাহারাও সাদরে ও সসম্মানে তাঁহার নিকট থাকিতে পারিত। শাসন সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "আমি বাপু স্কুল-মাস্টারের মত বেত হাতে করে কে কি করছে দেখে বেড়াতে পারব না। কি ভাল কি মন্দ—এ জানবাব মত বয়স তোমাদের সকলেরই হয়েছে।"

শরৎ মহারাজের ঠিক ঠিক কাজ আরম্ভ হইল স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে। তখনও প্রাথমিক গঠনকার্য চলিতেছে; অতএব অনেকগুলি শিশু-প্রতিষ্ঠান পরীক্ষামূলক ভাবে কিছুদিন মিশনের বাহিরে কাজ চালাইয়া নিজ সাফল্য দেখাইতে পারিলে মিশনের অন্তর্ভুক্ত হইত। স্বামী সারদানন্দ ইহাদের মূল্য স্বীকারপূর্বক বিবিধরূপে সাহায্য করিতেন। এই হিসাবে ১৯০২ ইং-র ২০শে আগস্ট তিনি কলিকাতায় 'বিবেকানন্দ সোসাইটী'র প্রতিষ্ঠাকার্যে পৌরোহিত্য করেন। পরবর্তী বৎসর জানুয়ারী মাসে বাগবাজারে বিবেকানন্দ-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি উহার সভাপতি হন। ঐ বৎসরই ১৮ই জুন তারিখে মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে এক বৃহৎ অট্টালিকা ভাড়া লইয়া তাঁহার দায়িত্বে একটি ছাত্রাবাস স্থাপিত

হয়—উহার নাম হয় 'বিবেকানন্দ-স্মৃতিমন্দির' এবং সারদানন্দজী উহার সভাপতি হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এক বৎসর পরে বাটীর সত্ত্বাধিকারী ছাত্রাবাসটি তথায় রাখিতে অসম্মত হওয়ায় এবং অপর কোনও উপযুক্ত গৃহ সুলভ না হওয়ায় উহা বন্ধ হইয়া যায়। তাঁহার আনুকূল্যে ১৯০৩ অব্দের অক্টোবর মাসে আচার্য জগদীশচন্দ্রের ভগিনী ও সিষ্টার ক্রিষ্টীন বোসপাড়ায় একটি মহিলাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরবৎসর তাঁহার সম্মতিক্রমে বৌবাজারে 'রামকৃষ্ণ-সমিতি অনাথ-ভাণ্ডার' স্থাপিত হয়।

১৯০৩ ইং-তে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ আমেরিকায় চলিয়া গেলে 'উদ্বোধন' পত্রের পরিচালনা ও অর্থব্যবস্থাদি লইয়া গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। অবশেষে কর্তব্যনির্ধারণের জন্য স্বামী সারদানন্দের সভাপতিত্বে পত্রের হিতৈষীরা মিলিত হইয়া স্থির করিলেন যে, স্বামী শুদ্ধানন্দের পরিচালনায় পরীক্ষামূলকভাবে অন্ততঃ এক বৎসর উহা চালান হইবে। তদবধি ১৯০৬ অব্দে গিরীন্দ্রলাল বসাক মহাশয়ের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহারই ছাপাখানা হইতে উহা প্রকাশিত হইতে থাকে। অনন্তর ৩০নং বোসপাড়া লেনে 'উদ্বোধন' আফিস স্থানান্তরিত হয়; কিন্তু গৃহস্বামী শীঘ্রই বাড়ি ছাড়িয়া দিতে বলিলে সারদানন্দজী স্থায়ী বাটীর কথা ভাবিতে বাধ্য হন। অধিকন্তু শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী হইতে কলিকাতায় আসিলে থাকার সুব্যবস্থা করা কষ্টসাধ্য ছিল—তাঁহারও বাসস্থানের প্রয়োজন। এই সঙ্কটকালে শ্রীযুক্ত কেদারচন্দ্র দাস মহাশয় গোপাল নিয়োগী লেনে একখণ্ড ভূমি দান করিলেন। স্বামীজীর গ্রন্থবিক্রয় করিয়া স্বামী সারদানন্দের হাতে ২৭০০৲ জমিয়াছিল; তদ্দ্বারাই গৃহনির্মাণ আরম্ভ হইল। স্বল্প অর্থ নিঃশেষিত হইতে কতক্ষণ লাগে? তখন বীরভক্ত সারদানন্দজী অনেকের আপত্তি সত্ত্বেও নিজ দায়িত্বে ঋণ করিয়া বাটীর কার্য চালাইতে লাগিলেন।

যথাকালে গৃহ সমাপ্ত হইলে উহার এক তলা 'উদ্বোধন'-এর জন্ম এবং দোতলা শ্রীশ্রীমায়ের আবাসস্থল ও ঠাকুরঘররূপে নির্দিষ্ট হইল।

ইহার পরে শ্রীশ্রীমায়ের আহ্বানে মামাদের বিষয়বণ্টনে মধ্যস্থতার জন্ম তাঁহাকে ১৯০৯ ইং-র ২৩শে মার্চ জয়রামবাটী যাইতে হইল। প্রত্যাগমনকালে তিনি মাকেও সঙ্গে লইয়া আসিয়া ২৩শে মে নূতন বাটীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী যোগানন্দের দেহত্যাগের পর সারদানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের সেবাধিকার পাইয়া যথাসাধ্য ঐ কর্তব্যপালনে অগ্রসর হন। তাঁহার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া মা একদা বলেন, "শরৎ যে কয়দিন আছে সে কয়দিন আমার ওখানে (অর্থাৎ কলিকাতায়) থাকা চলবে। তারপর আমার বোঝা নিতে পারে, এমন কে দেখি না।...শরৎটি সর্বপ্রকারে পারে—শরৎ হচ্ছে আমার ভারী।" অন্য আর একবার শ্রীশ্রীমাকে পিতৃগৃহ হইতে কলিকাতায় লইয়া যাইবার কথা উঠিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমাকে কি কেউ নিয়ে যেতে পারে বাবা? নিয়ে যায় তো এক শরৎ। আমার ভার শরৎই নিতে পারে, আর কেউ পারে না।" বস্তুতঃ 'উদ্বোধন'-বাটী শ্রীশ্রীসারদানন্দের মাতৃ-ভক্তির অপূর্ব নিদর্শন।

নূতন বাটীতে মায়ের অধিষ্ঠানান্তে স্বামী সারদানন্দ আপনাকে মায়ের সেবক ও দ্বাররক্ষকবোধে গর্ব অনুভব করিতেন। তাঁহার এই স্বেচ্ছায় গৃহীত দারোয়ানের কার্য সব সময়ে সুখকর ছিল না। একদিন বরিশালের ভক্ত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় মাতৃদর্শনমানসে হ্যারিসন রোড হইতে পদব্রজে ঘর্মাক্তকলেবরে দুই-তিনটার সময় যখন 'উদ্বোধনে' উপনীত হইলেন, তাহার কয়েক মিনিট মাত্র পূর্বে মাতাঠাকুরানী বাহির হইতে ফিরিয়া বিশ্রাম লইতেছিলেন। সুরেন্দ্র বাবুকে সোজা সিঁড়ি

দিয়া উপরে উঠিতে উদ্যত দেখিয়া দ্বারী সারদানন্দ বলিলেন, "এখন মার কাছে যেতে দেব না ; তিনি এই মাত্র ক্লান্ত হয়ে ফিরেছেন।" ভক্তটি ঝোঁকের মাথায় তাঁহাকে এক পার্শ্বে ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন এবং বলিলেন, "মা কি কেবল একা আপনার ?" কিন্তু উপরে যাইয়া কৃত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ফিরিবার সময়ে দেখা না হইলেই মঙ্গল। কিন্তু অবতরণকালে দেখিলেন, সারদানন্দ ঠিক একই স্থানে একই ভাবে দণ্ডায়মান আছেন। সুরেন্দ্র বাবু প্রণাম করিয়া অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিলে তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "অপরাধ আবার কি ? এমন ব্যাকুল না হলে কি তাঁর দেখা পাওয়া যায় ?"

সর্বংসহ সারদানন্দ সবই সহ্য করিলেও তাঁহার দুঃখের পরিমাণ কিছু কম ছিল না। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর তাঁহার পিতৃদেব বারাণসীধামে অকস্মাৎ দেহত্যাগ করায় তিনি তথায় উপস্থিত হন এবং শোকসন্তপ্তা জননী প্রভৃতিকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। ইহার অল্পদিন পরেই তাঁহার পিতৃব্য ঈশ্বরচন্দ্র ২৬শে নভেম্বর স্বর্গারোহণ করেন। ১৯০৭ অব্দের ২৬শে মে তাঁহার গর্ভধারিণী শ্রীযুক্তা নীলমণিদেবীও পরলোকগমন করেন।

নূতন বাটীতে পদার্পণ করিয়া মাতাঠাকুরানী একান্ত শরণাগত সারদানন্দকে উৎফুল্লহৃদয়ে অজস্র আশীর্বাদ করিলেন। এই বাটীতে মায়ের আদেশে সন্ধ্যারতির পরে তিনি প্রায়ই ভজনগান গাহিতেন। এতদ্ব্যতীত কেহ কেহ তাঁহার নিকট সঙ্গীতশিক্ষাও করিত। এইরূপে দিনগুলি আনন্দে কাটিতে থাকিলেও তাঁহার মনে একটি উদ্বেগ প্রবলতর হইতে লাগিল—বাটীনির্মাণে ঋণ হইয়াছে, উহা পরিশোধ করিবেন কিরূপে ? অতঃপর ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' লিখিতে আরম্ভ করিলেন। অবশ্য এই অমূল্য গ্রন্থরচনার অন্য কারণও তিনি নির্দেশ করিতেন। ঐ সময়ে মাস্টার

মহাশয় প্রভৃতি কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ করিতেন, "ওরা ঠাকুরের প্রকৃত জীবন ভুলে অন্যপথে চলেছে।" ইহার প্রতিকারের প্রয়োজন ছিল। অধিকন্তু ঐ সময়ে 'উদ্বোধনে'র জন্য যে-সকল প্রবন্ধ আসিত উহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে এত ভ্রম-প্রমাদ থাকিত যে, একখানি প্রামাণিক গ্রন্থরচনা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। কারণ যাহাই হউক, স্বামী সারদানন্দের এই অমূল্য অবদান বাঙ্গালার ধর্ম ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন-অনুধ্যানের ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন। জীবনের ঘটনার সহিত ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষা, শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ তাঁহার নিপুণ লেখনীতে পরস্পরসংবদ্ধ হইয়া পঞ্চখণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থখানিকে ধর্মজীবনের পঞ্চামৃততুল্য করিয়াছে—এই পীযূষপানে বহু পাঠক অমরত্বলাভ করিয়াছেন।

'লীলাপ্রসঙ্গ' কিরূপ পরিবেশের মধ্যে রচিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে গ্রন্থকার স্বয়ং বলিয়াছেন, "যখন 'লীলাপ্রসঙ্গ' লেখা হয়, কত দিকে গণ্ডগোল ছিল—মা উপরে রয়েছেন, রাধু রয়েছে, ভক্তের ভিড়, হিসাবপত্র রাখা, আবার বাড়ি তৈরী করায় অনেক টাকা ধার হয়েছে। নীচের ছোট ঘরটিতে 'লীলাপ্রসঙ্গ' লিখছি—তখন আমার সঙ্গে কেউ কথা কইতে সাহস পেত না, সকলেই ভয় করত। আমার অনেকক্ষণ ধরে কথা বলবার সময়ই ছিল না। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতে এলে, 'চট পট সেরে নাও' বলে সংক্ষেপে শেষ করতাম। লোকে মনে করত ভয়ঙ্কর অহঙ্কারী।" দুঃখের বিষয়, এই অনুপম পুস্তকখানি অসম্পূর্ণ। তাঁহাকে উহা সম্পূর্ণ করিতে অনুরোধ জানাইলে তিনি অতি বিনীতভাবে উত্তর দিতেন, "ঠাকুরের ইচ্ছা হয় তো হবে।" তিনি এই কথাই সর্বদা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতেন যে, তিনি নিজের ইচ্ছায় উহা রচনা করেন নাই—রচনাকালে সর্বতোভাবে ঠাকুরের হস্তে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছিলেন; ঠাকুর আপন যন্ত্রকে যেরূপ চালাইয়াছেন, যন্ত্র সেইরূপই করিয়াছে মাত্র। তাঁহার কর্মপ্রেরণার দ্বিতীয়

উৎস ছিলেন মাতাঠাকুরানী। মায়ের লীলাসংবরণের পরে তাঁহার কর্মশক্তি সহসা কেন্দ্রভ্রষ্ট হইয়া স্তব্ধতা প্রাপ্ত হয়; সুতরাং গ্রন্থ লিখিবে কে? কিন্তু উহা পরের ঘটনা। আপাততঃ আমরা 'লীলাপ্রসঙ্গ'-রচনার তৎকালীন পরিবেশের কথাই আলোচনা করিতেছি।

কর্মে অকর্ম-দর্শনে সিদ্ধকাম শরৎ মহারাজের মন এরূপ উপাদানে নির্মিত ছিল যে, জনকোলাহলের মধ্যেও উহা শান্তভাবে স্বকার্যসাধন করিত। একদিন 'উদ্বোধনের' আফিসঘরে জন কয়েক যুবক যৌবনসুলভ উচ্চৈঃস্বরে হাস্যকৌতুক করিতেছে, এমন সময়ে গোলাপ-মা কার্যোপলক্ষে সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ভৎর্সনাপূর্বক বলিলেন, "তোমাদের ধন্যি আক্কেল! উপরে মা রয়েছেন, নীচে শরৎ রয়েছে—আর তোমরা এমন হৈ-চৈ করছ?" গোলাপ-মার স্বরও তখন একটু অস্বাভাবিক উচ্চ পর্দায়ই উঠিয়াছিল। উহা শরৎ মহারাজের কর্ণে পৌঁছিলে তিনি বলিলেন, "তুমিও বেশ তো, গোলাপ-মা! ছেলেরা অমন হৈ-চৈ করে, তাই বলে কি তাতে কান দিতে আছে? আমি তো পাশেই আছি; আমি কিছুতে কান দিই না, কিছু শুনতেও পাই না। কানটাকে বুঝিয়ে দিয়েছি, 'তুই তোর প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া কিছু শুনিস না।' কান তো কই কিছুই শোনে না!" এই অনাসক্তির ভাব সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল বলিয়াই সেরূপ অবস্থায় 'লীলাপ্রসঙ্গের' ন্যায় ভাবগম্ভীর গ্রন্থরচনা সম্ভব হইয়াছিল।

এই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষপ্রবরের অন্যান্য গুণাবলীও তাঁহার সমস্ত কর্মকে সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করিত। তাঁহার দৈনন্দিন জীবনপ্রণালী অতি সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। তিনি নিয়ত প্রাতঃস্নান-সমাপনান্তে ভিজা কাপড়-গামছা রৌদ্রে দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রণাম ও শ্রীশ্রীমায়ের পদবন্দনা করিয়া নীচে নামিতেন। অনন্তর ঘণ্টার পর ঘণ্টা লিখিয়া যাইতেন। ইত্যবকাশে সকলের সহিত চা পান করিতেন এবং কখন কখন ধূমপানও করিতেন।

এই কর্মব্যস্ততার জন্য কোনদিনই তাঁহার দেড়টার আগে খাওয়া হইত না। আহারান্তে ঘণ্টা দেড়েক বিশ্রামের পর আবার লিখা আরম্ভ হইত এবং সন্ধ্যার সময় তিনি দপ্তর গুটাইতেন। ইহার পর ভক্তসমাগম হইত। প্রয়োজন হইলে তিনি বেলুড় মঠে যাইতেন এবং দুই-এক দিন সেখানে থাকিয়াও যাইতেন। এতদ্ব্যতীত উৎসবাদিতে অবশ্যই যাইতেন।

তাঁহার কর্মজীবনের সাফল্যের একটি কারণ ছিল নিরভিমান এবং স্বীয় পদগৌরবে অপরের মনুষ্যত্বকে অবমানিত না করা। ১৯১৮ অব্দে স্বামী উমানন্দ পত্র লিখিয়া বৃন্দাবন হইতে চলিয়া আসেন। ঘটনা-ক্রমে ঐ লিপিখানি অপঠিত অবস্থায় পুরাতন চিঠির সহিত মিশিয়া যায় এবং স্বামী সারদানন্দের ধারণা জন্মে যে, উমানন্দ না জানাইয়াই চলিয়া আসিয়াছেন। তাই কর্তব্যানুরোধে সেদিন তিনি তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন; কিন্তু পরে যখন উক্ত লিপি হস্তগত হইল তখন তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে জানাইলেন যে, তিনি সম্পাদকের কার্যের অনুপযুক্ত এবং ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া শিষ্যস্থানীয় উমানন্দের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন।

কর্মীদিগকে স্বাধীনতাদান, তাহাদের কর্মক্ষমতায় বিশ্বাস ও তাহাদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হওয়াই কার্যসাফল্যের রহস্য। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাই তিনি জনৈক কর্মাধ্যক্ষকে লিখিয়াছিলেন, "সকলের আত্মা চিরস্বাধীন বলিয়া তাহার মনে সকল বিষয়ে সর্বদা স্বাধীনতালাভের ইচ্ছার উদয় হয়। যথার্থ নেতা কখন তাহার ঐ স্বাধীনতালাভের ইচ্ছায় বাধা দেন না। কেবল ঐ স্বাধীনতালাভ করিলে যাহাতে সে উহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে, তাহার চেষ্টাই করিয়া থাকেন।" আর একবার তিনি লিখিয়া-ছিলেন, "ক্রোধ, বিরক্তি, কাহারও ত্রুটিতে অসহনীয়তা, মনমুখ এক রাখিতে না পারা এবং সর্বোপরি প্রেমের দ্বারা না হইয়া কৌশলে সকলকে

বশে রাখিবার চেষ্টা অতি সহজেই আশ্রমভঙ্গের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।" এই সব কথা সারদানন্দ শুধু উপদেশচ্ছলে বলিয়াই বিরত হইতেন না— স্বীয় জীবনে কার্যতঃ ইহার প্রমাণ দিতেন। ১৯২০ অব্দে শেষ অসুখের সময় শ্রীশ্রীমা 'উদ্বোধনে' আছেন। পরিচিত ও অপরিচিত ভক্ত-সমাগমে মায়ের প্রায়ই অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া সারদানন্দজী ব্যবস্থা করিলেন যে, বিশেষ বিচারপূর্বক দর্শনের অনুমতি দেওয়া হইবে। একদিন জনৈকা অপরিচিতা মহিলার বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া তিনি একজন সেবকের সহিত তাঁহাকে উপরে যাইতে বলিলেন। উক্ত সেবক অন্য কার্যে ব্যাপৃত থাকায় স্বয়ং না যাইয়া নবাগত এক ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন। স্বামী সারদানন্দ ইহা শুনিয়া প্রাগুক্ত সেবককেই পুনর্বার আদেশ করিলেন; তথাপি সেবক গোপনে ঐ ব্রহ্মচারীকেই পাঠাইলেন। অল্প পরেই যোগীন-মা উপর হইতে বলিয়া উঠিলেন, "এ কাকে উপরে পাঠালে!" সকলে গিয়া দেখেন, সেই মহিলাটি শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করিয়া আর্তনাদ করিতেছেন। তখনই তাঁহাকে সরাইয়া দেওয়া হইল এবং শরৎ মহারাজ পূর্বোক্ত সন্ন্যাসী সেবককে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন যে, এরূপ অবাধ্য হইলে তাহার বেলুড় মঠে চলিয়া যাওয়া উচিত। সন্ন্যাসী কিন্তু প্রত্যুত্তরে জানাইয়া দিলেন যে, তিনি মায়ের সেবার কর্তব্যানুরোধেই সেখানে আছেন, নতুবা তখনই চলিয়া যাইতেন। শিষ্যস্থানীয়ের এতাদৃশ রূঢ় বাক্যে সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও সন্ন্যাসীর উক্তির পুনরুক্তি করিয়াই স্বামী সারদানন্দ শান্তভাবে বলিলেন, "ঐ জন্যই তো সকলে এখানে আছে, আর ঐ জন্যই একটু-আধটু বলাবলি।"

তাঁহার দৃষ্টিতে কাহারও মতামত অবজ্ঞার বস্তু ছিল না। একদিন তিনি যখন বয়স্ক একজন সাধুর সহিত কোন বিষয়ে আলোচনা করিতে-ছিলেন, তখন তথায় উপস্থিত জনৈক যুবক সাধু নিজের অজ্ঞাতসারেই

সহসা কথায় যোগ দিয়া অপ্রতিভ হইয়া পড়িলে শরৎ মহারাজ তাঁহার দিকে ফিরিয়া উৎসাহদানপূর্বক তাহার সমস্ত বক্তব্য শুনিয়া লইলেন। কার্যে উৎসাহ দিবার ধারাও ছিল তাঁহার অপরূপ। পূর্বোক্ত যুবককে তিনি একদা অন্যত্র ধর্মোপদেশকরূপে যাইতে আদেশ করেন। যুবক তাহাতে বলেন যে, তাহার মত অল্পজ্ঞান ও অল্পবয়স্ক সাধুর পক্ষে উপদেষ্টা হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। স্বামী সারদানন্দ ইহার উত্তরে বলেন যে, নিজের অজ্ঞতা সম্বন্ধে এই সচেতন ভাবই তাহার সাফল্যের কারণ হইবে—এই দৈন্যের ফলে তিনি অধিক শিক্ষা এবং শ্রীভগবানের অধিক কৃপালাভ করিতে যত্নপর হইবেন। তাঁহার অপরকে স্বমতে আনিবার কৌশলও লক্ষ্য করিবার বস্তু ছিল। এক সময়ে পূর্ববঙ্গে সেবাকার্যের জন্য মঠের সাধুদিগকে প্রেরণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তখন বেলুড় মঠে পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া সবেমাত্র পাঠাদি আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করা বাবুরাম মহারাজের মনঃপূত না হওয়ায় তিনি আপত্তি উত্থাপন করেন। গুরুভ্রাতার এই যুক্তিসম্মত বাধার প্রতিকারকল্পে স্বামী সারদানন্দ স্বয়ং বেলুড় মঠে উপস্থিত হইয়া বাবুরাম মহারাজের সহিত বন্ধুভাবে আলাপে অগ্রসর হইলেন। তিনি জানাইলেন যে, তিনি গুরুভ্রাতার সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে সর্বতোভাবে প্রস্তুত; কিন্তু পূর্ববঙ্গের অবস্থা বিবেচনা করিলে হৃদয় বিদারিত হয়। অমনি বাবুরাম মহারাজ বলিয়া উঠিলেন যে, সমস্ত ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া তিনি স্বয়ং যাইতে প্রস্তুত। তাঁহাকে কিন্তু যাইতে হইল না—তাঁহার আহ্বান ও উৎসাহে বহু সেবক তখনই পূর্ববঙ্গে যাত্রা করিলেন।

নিঃসম্বল সন্ন্যাসী সারদানন্দ প্রায় সমস্ত জীবনই অভাবের মধ্যে যাপন করিয়াছিলেন। অর্থাদি সম্বন্ধে তাঁহার এমন বৈরাগ্য ছিল যে, স্বামীজীর গ্রন্থ হইতে লব্ধ কিছুই তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গ্রহণ করিতেন না। একসময়ে তাঁহাকে বাতব্যাধিতে ভুগিতে দেখিয়া 'উদ্বোধনের' ম্যানেজার

এক জোড়া মূল্যবান পাদুকা অর্পণ করেন। অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি অত টাকা শোধ করতে পারব না, তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।" অতঃপর ম্যানেজার যখন জানাইলেন যে, তিনি উহা ক্রমে শোধ করিতে পারেন, তখন আশ্বস্ত হইয়া গ্রহণ করিলেন এবং যথাসময়ে টাকা শোধ করিয়া দিলেন। জীবনের শেষ কয় বৎসর ভক্তসমাগম ও দীক্ষাদির ফলে যখন অর্থাদির কিঞ্চিৎ সচ্ছলতা হইয়াছিল, সে সময়ের কথা ছাড়িয়া দিলে তাঁহার জীবন এইরূপ কঠোরতার মধ্যেই অতিবাহিত হয়। বন্ধুপ্রীতি প্রভৃতি কারণও তাঁহাকে তাঁহাদেরই মতন চলিতে বাধ্য করিত। এক সময়ে তিনি সদলবলে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে চড়িয়া পুরী যাইতেছিলেন। ঐ ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী একজন অনুরাগী শিষ্যস্থানীয় ব্যক্তি তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া একখানি উচ্চশ্রেণীর টিকেট কিনিতে চাহিলে সারদানন্দ মহারাজ ভদ্রভাবে উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন ঐ ব্যক্তি নিজের স্থান ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন। তখন শরৎ মহারাজ বিরক্তিসহকারে জানাইলেন যে, সঙ্গীদিগকে ছাড়িয়া তিনি যাইতে অপারগ। ফলতঃ তিনি শেষ পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীতেই ভ্রমণ করিলেন। স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "শিরদার তো সরদার।" সারদানন্দ 'শির' দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাই 'সরদার' হইয়াছিলেন! একদা কাশী সেবাশ্রমের কোন সেবক জানাইলেন যে, তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া গরীবদের মধ্যে তণ্ডুলবিতরণে অপারগ। অমনি সারদানন্দ অম্লানবদনে ঝুলি লইয়া কার্যে অগ্রসর হইলেন। সে অকৃত্রিম হৃদয়বত্তার সম্মুখে ক্ষুদ্র চিত্তের অভিমান পরাজয় স্বীকার করিল।

স্বামী সারদানন্দের সৎসাহস ও আশ্রিতবাৎসল্যও অপূর্ব। ১৯০৯ অব্দে শ্রীযুক্ত দেবব্রত বসু ও শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশনে সাধু হইবার জন্য আসিলেন। দুইজনেই মানিকতলার বোমার মামলার আসামী। এই বিপ্লবীদিগকে আশ্রয় দিলে ইংরেজ সরকারের কোপ অনিবার্য; আবার

পূর্বানুসৃত পন্থা সরলভাবে পরিত্যাগ করিয়া যদি কেহ সাধুজীবন যাপন করিতে চাহে, তবে তাহাকে প্রত্যাখ্যানের ফলে বিবেকের দংশন অবশ্যম্ভাবী। এই উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়া তাঁহার কর্তব্য স্থির করিতে বিলম্ব হইল না। তিনি তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিলেন এবং একদিকে পুলিসের কর্মচারী এবং অপরদিকে মঠের প্রাচীন সাধুবৃন্দকে তাঁহার সদুদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া যুবকদ্বয়ের ধর্মজীবনের সর্বপ্রকার কণ্টক দূর করিলেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভে শ্রীযুক্তা যোগীন-মার কন্যার মৃত্যু হইলে মাতৃহীন পুত্র তিনটির পাঠের অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া স্বামী সারদানন্দ তাহাদিগকে 'উদ্বোধনে' আনিয়া রাখিলেন এবং সর্ববিধ দায়িত্ব নিজ হস্তে লইলেন। এই গুরুভার তিনি সানন্দে দীর্ঘকাল বহন করিয়াছিলেন। ছেলেরা রাত্রে তাঁহারই কক্ষে শয়ন করিত। তাহাদের ঠাণ্ডা সহ্য হইত না বলিয়া শয়নগৃহের বাতায়নাদি রুদ্ধ রাখিতে হইত। তিনি নিজে স্থূলকায় বলিয়া তাঁহার পক্ষে বিপরীত ব্যবস্থা আবশ্যক হইলেও বালকদের তথায় অবস্থানকালে তিনি বদ্ধকক্ষেই বাস করিতেন। এই গৃহত্যাগী, সংসারসম্বন্ধহীন সন্ন্যাসীর এত সহিষ্ণুতা, এত সাহসের উৎস কোথায় ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। জনৈক ভক্তকে উপদেশচ্ছলে তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি কাজই করতে চাও, তবে ভগবানের উপর নির্ভর করে নিজের পায়ে দাঁড়াও। কোন মানুষের মুখ চেয়ে থেকো না—আমারও না। কেউ তোমায় সাহায্য না করলেও তুমি একলা ঐ কাজ করে দেহপাত করবে—এরূপ তেজ, সাহস ও ভগবানে নির্ভর নিয়ে যদি কাজ করতে পার তো কর।" স্বামী সারদানন্দ তাহাই করিতেন।

শেষ বয়সে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না—বিশেষতঃ বাতব্যাধিতে প্রায়ই ভুগিতেন। তাই চিকিৎসকের পরামর্শে স্বাস্থ্য ও বিশ্রামলাভের জন্য তিনি ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে পুরীধামে যাইয়া জুলাই পর্যন্ত

প্রায় পাঁচ মাস অবস্থান করেন। তিনি নিত্য ৺জগন্নাথদর্শনে যাইতেন এবং বিগ্রহের সম্মুখে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে মহাপ্রভুকে প্রাণের প্রার্থনা জানাইতেন। মন্দিরাদিতে গমন করিলে তিনি যাত্রীদের অনুকরণে খুঁটিনাটি অনুষ্ঠানটি পর্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে করিতেন—যেমন কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দিরে সিংহদ্বারে প্রণাম, দ্বারের শিকল কপালে ঠেকানো, ঘণ্টাবাদ্য ইত্যাদি কিছুই বাদ পড়িত না। পুরীতে রথযাত্রার দিনেও তিনি স্থূলকায়ে গলদ্‌ঘর্ম হইয়া রথের দড়ি লইয়া কিছুক্ষণ রথ টানিতেন।

পুরীর একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বামী সারদানন্দ তখন সদলবলে বলরামবাবুদের 'শশীনিকেতন' নামক বাটীতে ছিলেন। একদিন সান্ধ্য-ভ্রমণান্তে রাত্রি আটটায় সেখানে ফিরিয়া দেখিলেন যে, বুন্দীর রাজা বাড়িটি দখল করিয়াছেন—দ্বারে সান্ত্রী বসিয়াছে, প্রবেশ নিষেধ। সারদানন্দ ইচ্ছা করিলেই নবাগতদিগকে বাড়ি ত্যাগ করিতে বলিতে পারিতেন। কিন্তু মার্জিতরুচি সন্ন্যাসী তাহা না করিয়া ভদ্রভাবেই কথা বলিতে লাগিলেন। রাজার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী কিন্তু প্রকৃত অবস্থা না বুঝিয়াই উষ্মা দেখাইতেও ত্রুটি করিলেন না। তবু স্বামী সারদানন্দ ধৈর্য না হারাইয়া শুধু দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "এ বুন্দী নয়, ইংরেজ রাজ্য।" অবশেষে সেক্রেটারীর চমক ভাঙ্গিল। তিনি নিজেদের অসহায় অবস্থা বুঝাইয়া বলিলেন। অগত্যা সারদানন্দ সমুদ্রতীরে বলরামবাবুদের অপর একখানি বাড়িতে আশ্রয় লইলেন। এক সপ্তাহ পরে রাজা চলিয়া গেলে সকলে আবার পূর্বোক্ত বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মূত্রাশয়ের পীড়া হয়; কিন্তু পীড়ার যন্ত্রণা অসহ্য হইলেও উহার বহিঃপ্রকাশ ছিল না। মাতাঠাকুরানী তখন 'উদ্বোধন'-এর উপরে বাস করিতেছেন; পাছে মা তাঁহার জন্য বিব্রত হন—এই চিন্তায়

শরৎ মহারাজ নিঃশব্দে সব সহ্য করিতেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, রোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তীর্থদর্শনোপলক্ষে প্রথমে গয়া ও তথা হইতে কাশী হইয়া বৃন্দাবনে যান এবং অতঃপর দুইদিন মথুরায় ও তিন দিন প্রয়াগে কাটাইয়া প্রায় দুই মাস পরে ফিরিয়া আসেন। কলিকাতায় পুনরাগমনের কয়েক দিন পরেই তিনি শ্রীশ্রীমায়ের পূর্বপ্রাপ্ত আহ্বান শিরোধার্য করিয়া জয়রামবাটী গেলেন। সেখানে মায়ের নূতন বাটীর বহিঃপ্রকোষ্ঠে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। প্রত্যাবর্তন-কালে মাতাঠাকুরানীও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। পথে কোয়ালপাড়া আশ্রমে কোতলপুরের সাব রেজিস্ট্রার আসিয়া মায়ের বাড়ির দলিল রেজেস্ট্রি করিলেন—দলিলখানি শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীর নামে শ্রীমায়ের অর্পণনামা।

এই সময়ে মিশনের সম্মুখে এক ঘোর বিপদ সমুপস্থিত। বাঙ্গালা সরকারের শাসনবিবরণীতে উল্লিখিত হইল যে, বাঙ্গালার বিপ্লবিগণ স্বামী বিবেকানন্দের জ্বালাময়ী লেখা ও বাণী হইতে প্রচুর উৎসাহ পায় এবং তাঁহাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে। তদুপরি বাঙ্গালার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার দরবারে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে এমন কতকগুলি মারাত্মক মন্তব্য করিলেন যাহাতে জনসাধারণের মনে আতঙ্ক জাগিল যে, মিশনের সম্পর্কে থাকিলে রাজরোষে পড়িতে হইবে। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তখন দাক্ষিণাত্যে; সুতরাং স্বামী সারদানন্দকেই এই অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইল। তিনি একখানি স্মারকলিপি পাঠাইলেন, মিস্ ম্যাক্লাউড প্রভৃতি বন্ধুদের সাহায্যে সরকারী মহলে মিশনের প্রকৃত অবস্থা জানাইলেন এবং স্বয়ং গভর্নর ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের ভ্রম অপসারিত করিলেন। ইহার ফলে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ লর্ড কারমাইকেল স্বামী সারদানন্দকে একখানি পত্র

লিখিয়া জানাইলেন, "রামকৃষ্ণ মিশন ও তাহার সভ্যদের কোনরূপ নিন্দাবাদ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমি জানি মিশনের যাবতীয় কার্য রাজনীতি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। জনসাধারণের যে সেবা তাঁহারা এযাবৎ করিয়া আসিতেছেন, সকলের নিকট আমি তাহার প্রশংসা ব্যতীত কিছুই শুনি নাই।" ইহাতে আশু বিপদ কাটিয়া গেল বটে; কিন্তু অসুস্থ দেহ লইয়াই শরৎ মহারাজকে এই কঠিন শ্রম ও উদ্বেগ বরণ করিতে হইয়াছিল; অতএব ২৯শে মার্চ বাত ও মূত্রাশয়ের পীড়ায় তাঁহাকে শয্যাগ্রহণ করিতে হইল। নীরবে যন্ত্রণা সহ্য করিয়া একপক্ষকাল পরে তিনি পথ্য পাইলেন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে স্বামী তুরীয়ানন্দ পুরীতে বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং স্বামী সারদানন্দকে পার্শ্বে পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। তদনুসারে তিনি পুরীতে যাইয়া একমাস অবস্থানপূর্বক তাঁহার সেবাদি করেন এবং অতঃপর তাঁহাকে 'উদ্বোধনে' আনিয়া রাখেন। তখন প্রেমানন্দও অসুস্থ অবস্থায় বলরাম-মন্দিরে ছিলেন। ইঁহাদের উভয়েরই তত্ত্বাবধান স্বামী সারদানন্দকে করিতে হইত এবং ইহা তিনি সাগ্রহে এবং দক্ষতার সহিতই করিতেন। সেবার সহিত তাঁহার একটা প্রাণের যোগ ছিল। সাধু-ব্রহ্মচারী যিনিই অসুস্থ হউন না কেন, তিনি ইহা মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন যে, সে সংবাদ সারদানন্দের কর্ণগোচর হইলে সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত হইয়া যাইবে। সঙ্ঘের বাহিরের অনেকেও এই সেবার অধিকারী হইতেন। একবার গঙ্গাতীরে তপস্যানিরতা গৌরী-মা বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া অযত্নে পড়িয়া আছেন—এই সংবাদ পাইবামাত্র তিনি অবিলম্বে তথায় যাইয়া নিজহস্তে সেবার ভার লইলেন। কলেজে অধ্যয়নকালে শরৎচন্দ্র একদা জানিতে পারেন যে, স্বামীজীর গৃহে এক ব্যক্তি বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং বাটীর লোক সকলেই সেবা করিয়া

ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অমনি তিনি সেই বাটীতে গেলেন এবং সর্ব-প্রকার সেবা করিয়া দুই সপ্তাহে রোগীকে সুস্থ করিলেন। রোগীরা তাঁহার স্নেহে সহজেই বশে আসিত। কেহ হয়তো ইঞ্জেক্শন নিতে চায় না; সারদানন্দ রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আদরের সুরে নানা কথা বলিয়া সম্মত করাইলেন। আর একজন অহিতকর কিছু খাইবার জন্য ব্যাকুল; সারদানন্দের সৌম্য মূর্তি, সস্মিত বদন এবং সস্নেহ নয়ন দেখিয়া সে চিকিৎসকের নির্দেশ মানিতে সম্মত হইল। দুভিক্ষ ও মহামারীর সময়েও এই কারুণ্য রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দকে বিচলিত করিত। ঐ সময়ের তাঁহার একখানি পত্র শুনিয়া করুণাময়ী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী দুঃখে বিগলিতা হইয়া সাশ্রুলোচনে গদ্গদকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "শরতের দিল দেখলে? নরেনের পর এত বড় প্রাণ আর একটিও পাবে না। ব্রহ্মজ্ঞ হয়তো অনেকে আছেন, শরতের মত এমন হৃদয়বান দিলদরিয়া লোক ভারতবর্ষে নাই—সমস্ত পৃথিবীতে নেই।" সেবার মূল মন্ত্র স্বামী সারদানন্দের একখানি পত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, "পরের টাকা পরকে দিবি; তুই কি দিবি? তুই দিবি তোর হৃদয়, প্রাণ-মন, ভালবাসা।"

শেষবয়সে স্বহস্তে সেবা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না—শুধু খবরাখবর লইয়াই তুষ্ট থাকিতে হইত। এইরূপ অবস্থায়ও একদিন অকস্মাৎ দ্বিপ্রহরে অপরের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে রাস্তায় নামিতে দেখিয়া সেবকও পশ্চাতে চলিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই শরৎ মহারাজ সেবকের উপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে আসিতে বারণ করিলেন; কিন্তু সেবকের আগ্রহদর্শনে আর আপত্তি করিলেন না। ক্রমে তিনি এক হোটেলে উপস্থিত হইয়া দোতলায় এক যক্ষ্মারোগীর বিছানায় বসিলেন। তাঁহাকে পার্শ্বে পাইয়া রোগীর আনন্দ ধরে না—সে তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনার জন্য কত রকমেই না চেষ্টা করিতে লাগিল।

তাহার কথার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে থু থু ছড়াইয়া পড়িতেছিল। স্বামী সারদানন্দের উহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। অবশেষে সে কিছু ফল কাটিয়া খাইতে দিলে তিনি উহা নির্বিকারচিত্তে গ্রহণ করিলেন। সমস্ত দেখিয়া সেবক তো স্তম্ভিত! প্রত্যাবর্তনকালে এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য সে অনুযোগ করিতেও ছাড়িল না। সারদানন্দ শুধু সহজভাবে বলিলেন, "ঠাকুর বলতেন, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঙ্গে দেওয়া জিনিস খেলে কোন ক্ষতি হয় না।" সেবকের বুঝিতে বাকী ছিল না যে, এই কথা যতই সত্য হউক না কেন, রোগীর মনে আঘাত না দেওয়াই তাঁহার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এখানে শুধু গুরুবাক্যানুযায়ী আচরণই উদ্দেশ্য ছিল না, হৃদয়বত্তার স্পর্শে সে আচার মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল।

১৯১৮ অব্দে শ্রীশ্রীমায়ের অসুখের সংবাদ পাইয়া স্বামী সারদানন্দকে দুইবার জয়রামবাটী যাইতে হয়। দ্বিতীয় বার (৭ই মে, ১৯১৮) শ্রীশ্রীমা তাঁহার সহিত 'উদ্বোধনে' আসেন।

পরবৎসর বাঙ্গালার গভর্নর রোনাল্ডসে মঠদর্শনে আসেন। অভ্যাসবশতঃ তিনি পাদুকাসহ ঠাকুরঘরে যাইতে উদ্যত হইলে প্রত্যুৎপন্নমতি এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ স্বামী সারদানন্দ স্বয়ং তাঁহার পাদুকা উন্মোচন করিয়া সৌজন্য, নিরভিমানিতা ও দেবগৃহের প্রতি সম্মানের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন।

১৯২০ ইং-র ২৭শে ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীমা শেষ অসুখ লইয়া 'উদ্বোধনে' আসেন এবং সকলের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ২১শে জুলাই রাত্রি দেড়টায় স্বস্বরূপে লীন হন। মহাপ্রয়াণকালে শ্রীশ্রীমা আপন সন্তানদিগকে সারদানন্দের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন; সুতরাং শোক ভুলিয়া তাঁহাকে তাহাদের সান্ত্বনা ও সদুপদেশদানে নিরত হইতে হইল। স্ত্রীভক্তেরাও তাঁহারই নিকট আবেদন-নিবেদন করিতেন। তিনিও শ্রীশ্রীজগদম্বার মূর্তি

ইঁহাদিগকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিয়া সর্বদা তাঁহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। তাঁহার নিকট স্ত্রীভক্তদেরও কোন সঙ্কোচ থাকিত না।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি তাঁহার কর্তব্য ইহাতেই সমাপ্ত হয় নাই। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিমন্দিরনির্মাণ অনেকাংশে তাঁহারই পরিকল্পনানুযায়ী হইয়াছিল। অতঃপর জয়রামবাটীতে একটি মন্দিরপ্রতিষ্ঠা ও আশ্রমস্থাপন তাঁহার অন্যতম প্রধান কর্তব্য হইল। ইতোমধ্যে ১৯২২ অব্দের ১০ই এপ্রিল স্বামী ব্রহ্মানন্দ দেহরক্ষা করিলে শরৎ মহারাজের সম্মুখে এক কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইল। প্রাচীন সন্ন্যাসীরা অনেকেই তাঁহাকে মঠ ও মিশনের সভাপতি হইতে বলিলেন; কিন্তু তিনি ধীর অথচ দৃঢ়ভাবে জানাইলেন, "স্বামীজী আমায় মঠের সেক্রেটারী করে গেছেন, আমি সে পদ ত্যাগ করব না।" বস্তুতঃ তিনি শেষদিন পর্যন্ত সেক্রেটারীই থাকিয়া গেলেন—সভাপতি হইলেন স্বামী শিবানন্দ। এই সভাপতিপদ গ্রহণ না করার হয়তো অন্য কারণও ছিল—তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভক্তি-ভালবাসার জনেরা একে একে অনেকেই চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার মন কার্য হইতে বিশ্রাম লইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল; এই অবস্থায় আরব্ধ কর্তব্য সমাপন করা চলে, নূতন দায়িত্বগ্রহণ অসম্ভব। ঐ সময়ে তাঁহাকে প্রায়ই বলিতে শোনা যাইত, "মা চলে গেলেন, মহারাজও গেলেন —কোন কাজেই যেন উৎসাহ পাই না, প্রবৃত্তিও জাগে না।" যাহা হউক, জয়রামবাটীর পরিকল্পিত মন্দিরের কার্য তাঁহারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সমাপ্ত হইলে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল উহার প্রতিষ্ঠাকার্য সমাপ্ত হইল। সেই দিন সদলবলে সারদানন্দ জয়রামবাটীতে উপস্থিত থাকিয়া কল্পতরু হইলেন—মায়ের অসীম করুণা স্মরণপূর্বক তিনি ইহলোকের ও পরলোকের সমস্ত ভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন। চারিদিকে দীয়তাং ভুজ্যতাং রব; আর নির্বিচারে দীক্ষা, সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য চলিতে লাগিল।

নববঙ্গে নবীন শক্তিপীঠস্থাপনান্তে কর্তব্যমুক্ত স্বামী সারদানন্দ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনপূর্বক আত্মচিন্তায় ডুবিয়া গেলেন—কাযের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ক্রমেই শিথিলতর হইতে লাগিল। সমাধিমগ্ন হইয়া তিনি নিত্যই অধিকাধিক উপলব্ধি করিতে লাগিলেন যে, তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতাতেই অবস্থিত রহিয়াছেন এবং নিত্য ঐরূপ অবস্থিতির জন্য তাঁহার মন অধিকতর লোলুপ হইতে থাকিল। এদিকে বৃদ্ধশরীরে রোগেরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। এইরূপ মানসিক ও শারীরিক অবস্থাসন্দর্শনে ভক্তগণ তাঁহাকে বিশ্রামলাভের জন্য অনুনয়-বিনয় করিয়া ভুবনেশ্বরে পাঠাইলেন (১২ই নভেম্বর, ১৯২৪)। সেখানে শরীর সুস্থ হইল; কিন্তু শ্রীযুক্তা গোলাপ-মার অসুখের সংবাদে অচিরে কলিকাতায় ফিরিতে হইল। তাঁহার আগমনের নয় দিন পরেই (১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৪) গোলাপ-মা দেহরক্ষা করিলেন। তারপর শরৎ মহারাজ কাশীধামে গমন করেন, মার্চ মাসে প্রত্যাবর্তনপূর্বক পুরীধামে যাত্রা করেন এবং তথা হইতে সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ১৯২৫ ইং-তে তাঁহাকে সম্পূর্ণ কর্মবিরত বলিলেই চলে। তাঁহার ঐ সময়ের একখানি পত্রে তৎকালীন মনোভাব সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে: "আমি এখন কর্ম হইতে এক প্রকার অবসর লইয়া রহিয়াছি। আবার যদি কোনও দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ কোনও কাযের জন্য নিঃসন্দেহে পাই, তাহা হইলে নবীন উৎসাহে লাগিব এবং তাঁহার নিকট হইতে শক্তিসামর্থ্যও পাইব। যদি ঐরূপ না পাই, তাহা হইলে আমার দ্বারা যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে জানিবে।"

কিন্তু কার্য সমাপ্তপ্রায় হইলেও তিনি জানিতেন যে, তাঁহাদের অবর্তমানে সঙ্ঘের কর্ম ও অধ্যাত্মস্রোত যাহাতে পূর্ণবেগে নির্ধারিত প্রণালীতে প্রবাহিত হয় তজ্জন্য তাঁহাদিগকেই ব্যবস্থা করিয়া যাইতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে তিনি সকলের সহযোগে ১৯২৬ অব্দে বেলুড় মঠে একটি মহতী

সভার আহ্বান করেন। উহাতে বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে বহু সাধু ও ভক্ত সমবেত হইয়া সঙ্ঘের ভাবী কল্যাণের বিষয় আলোচনা করেন। সভার সভাপতি হইলেন স্বামী শিবানন্দ এবং সম্পাদক হইলেন স্বামী সারদানন্দ। অতঃপর ক্রমবর্ধমান রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের পরিচালনা একজনের পক্ষে সম্ভবপর নহে জানিয়া অধিবেশনের স্বল্পকাল পরেই সকলের সম্মতিক্রমে তিনি একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠনপূর্বক উহার হস্তে দৈনন্দিন কর্মসম্পাদনের দায়িত্ব তুলিয়া দিলেন। এইবার তাঁহার কর্তব্য সত্যই সমাপ্ত হইল। এখন হইতে তাঁহার জীবনধারার একটি পরিবর্তন সকলেই লক্ষ্য করিলেন—এখন হইতে তিনি সর্বদা সম্পূর্ণ আত্মস্থ। ইহাতে ডাক্তার ও ভক্তগণ প্রমাদ গণিলেন এবং ধ্যানজপাদি কমাইয়া একটু শরীরের দিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ জানাইলেন; কিন্তু শরৎ মহারাজ মৌন প্রফুল্লতার সহিত মস্তক আন্দোলনপূর্বক সকলকে নিরস্ত করিলেন।

তাঁহার শারীরিক অবস্থার ক্রমেই অবনতি ঘটিতেছে, ইহা তিনি অবগত ছিলেন। কিন্তু পরের উদ্বেগ জন্মাইতে তিনি সর্বদা অপারগ; সুতরাং সেবকদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার বিষয় লইয়া যেন বিশেষ আলোচনা না হয়। অর্থাৎ ভক্তদের অজ্ঞাতসারেই তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগস্ট সকালে তিনি যথানিয়মে জপধ্যানে বসিলেন। অন্য দিন দ্বিপ্রহর অতীত হইলেও তাঁহার জপধ্যান চলিত; আজ কিন্তু অচিরে আসনত্যাগ-পূর্বক ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে প্রায় অর্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইল। সকলে দেখিল—ইহাও অস্বাভাবিক। ফিরিবার পথে দ্বার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াই পুনর্বার প্রবেশ করিলেন এবং মাতাঠাকুরানীর পটের সম্মুখে কিয়ৎক্ষণ মৌন প্রার্থনা জানাইয়া পুনর্বার দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু দ্বার অতিক্রম না করিয়াই পুনর্বার পূর্বস্থানে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনায়

রত হইলেন। এইরূপ কয়েকবার হইতে লাগিল। অবশেষে যখন স্বকক্ষে আসিলেন তখন মুখে এক অপূর্ব শান্তি বিরাজিত। সমস্ত দিন সাধারণ-ভাবেই কাটিয়া গেল। অনন্তর সন্ধ্যারতির পর সেবক কিছু কাগজপত্র লইয়া ঘরে আসিলে তিনি উহা আলমারিতে রাখিতে গেলেন। অমনি অকস্মাৎ শরীর অসুস্থ বোধ হওয়ায় সেবককে একটি ঔষধ প্রস্তুত করিতে এবং কাহাকেও কোন সংবাদ না দিতে বলিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। ইহাই তাঁহার শেষ বাণী ও শেষ কার্য। চিকিৎসক আসিয়া স্থির করিলেন, সন্ন্যাসরোগ হইয়াছে, আরোগ্যের আশা নাই। এইভাবে প্রায় ত্রয়োদশ দিন অতিবাহিত হইলে ১৯শে আগস্ট রাত্রি দুইটার সময় যোগিবর স্বামী সারদানন্দ মহারাজ মহাসমাধিতে প্রবেশ করিলেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

হুগলী জেলার ময়াল-ইছাপুর গ্রামনিবাসী বাপুলী-উপাধিধারী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ চক্রবর্তীর তিন পুত্র ছিলেন—রামানন্দ, রাজচন্দ্র ও ঠাকুরদাস। রামানন্দের পুত্র গিরিশচন্দ্র ছিলেন শরৎচন্দ্র বা স্বামী সারদানন্দের পিতা এবং রাজচন্দ্রের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন শশিভূষণ বা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা। শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র কলিকাতায় বাটী নির্মাণ করিয়া সেখানেই বাস করিতে থাকেন; কিন্তু শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র স্বগ্রামে থাকিয়া যান। ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন অতি উন্নত তান্ত্রিক সাধক এবং কৌল সমাজে তন্ত্রবিদ্যার জন্য তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রনারায়ণ সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন; রাজা তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন এবং সাধনার জন্য যখন যাহা প্রয়োজন হইত তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র স্বগ্রামের অনতিদূরে ৺ঘণ্টেশ্বরের মহাশ্মশানে, কলিকাতায় কেওড়াতলার শ্মশানে, অথবা রাজপ্রাসাদের পশ্চাতে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে সাধনায় রত থাকিতেন। কালীঘাটে এক গভীর রাত্রে ৺কালিকাদেবী তাঁহাকে বালিকাবেশে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। শশিভূষণের জননী অতিশয় উদারহৃদয়া ও সরলা ছিলেন; তিনি এত লজ্জাশীলা ছিলেন যে, নিকট আত্মীয়ের সম্মুখেও ঘোমটা দিতেন। তাঁহার বর্ণ ছিল গৌর এবং শশীও তাহাই পাইয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের গৃহে নারায়ণ, মনসা, শীতলা, সিংহবাহিনী প্রভৃতি দেবদেবীর নিত্যপূজা হইত এবং প্রতিবৎসর কালীপূজা হইত।

শশিভূষণ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই (১২৭০ বঙ্গাব্দের ২৯শে আষাঢ়, চান্দ্র আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে, রবিবার, শেষরাত্রে ৪টা ৫৬ মিনিটে)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

স্বগ্রাম ইছাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রগাঢ় ধর্মভাবপূর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়া শশী অতিশয় ভগবৎপরায়ণ হইয়াছিলেন। শৈশবে পূজাদি অভ্যাসের ফলে পরবর্তী কালে একাসনে অষ্টপ্রহর অতিবাহিত করা তাঁহার পক্ষে অতি সহজ ছিল। গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পাঠসমাপনান্তে তিনি ইংরেজী শিক্ষার জন্য কলিকাতায় শরৎচন্দ্রের গৃহে আসেন এবং যথা-সময়ে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকারপূর্বক বৃত্তি প্রাপ্ত হন। অনন্তর আলবার্ট কলেজ হইতে এফ. এ. পাশ করিয়া মেট্রোপলিটান কলেজে বি. এ. পড়েন। ছাত্রজীবনে শশী ও শরৎ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া কেশব-চন্দ্রের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করেন। উভয়েই সমাজের সদস্য হইয়া-ছিলেন এবং শশী কিছুদিন কেশবচন্দ্রের পুত্রের গৃহশিক্ষকতা করিয়াছিলেন। শৈশবের ন্যায় বাল্য ও যৌবনেও শশীর ধর্মভাব সুপরিস্ফুট ছিল। 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' আকৃষ্ট হইয়া তিনি আজীবন নিরামিষাহারের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন ও শেষদিন পর্যন্ত তাহা প্রতিপালন করেন।

বাল্যকালে স্বাভাবিক পরিবেশের প্রভাবে এবং বাগ্মিপ্রবর কেশবচন্দ্র সেনের আকর্ষণে শশীর আধ্যাত্মিক ক্ষুধা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলেও সম্পূর্ণ শান্ত হইল না; বরং তাঁহার বুভুক্ষা বৃদ্ধি পাইল মাত্র। অবশেষে সহপাঠী কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী জানাইলেন যে, কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামক পত্রিকায় দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অপূর্ব বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে—একদিন তাঁহার দর্শনের জন্য তথায় যাইতে হইবে। তদনুসারে শরৎ ও শশী বন্ধুসহ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন।[১] যুবকদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণ অতি

১ এই বিবরণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আমরা ব্রহ্মচারী প্রকাশ-প্রণীত 'স্বামী সারদানন্দ' (১৫-১৬ পৃঃ), অদ্বৈতাশ্রম হইতে প্রকাশিত 'Life of Sri Ramakrishna' (৪৭২ পৃঃ) ও ভগিনী দেবমাতা-রচিত 'Sri Ramakrishna and His Disciples (৯৫ পৃঃ)—এই তিনটি বিবরণের মধ্যে যথাসাধ্য সামঞ্জস্য সাধন করিয়া ইহা লিখিলাম।

প্রীতিসহকারে গ্রহণ করিলেন এবং কেশবচন্দ্রের সমাজে যাতায়াত আছে শুনিয়া শশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি সাকার ভালবাসেন কিংবা নিরাকার। শশী উত্তর দিলেন, "ঈশ্বর আছেন কিনা তাই জানি না—তাঁর আবার সাকার না নিরাকার?" সরল ও নির্ভীক উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, "বাপ-মা আজকাল ছেলেদের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেয়; যাই তারা স্কুল-কলেজ থেকে বেরোয়, অমনি অনেক ছেলে-মেয়ের বাপ হয়ে পড়ে। তখন পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য চাকরির সন্ধানে ছুটোছুটি করে বেড়ায়।" অমনি উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, "তা হলে কি, মশায়, বিয়ে করা অন্যায়? এটা কি ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ কাজ?" গৃহে একখানি বাইবেল সংরক্ষিত ছিল এবং উহার এক অংশে চিহ্ন দেওয়া ছিল; পরমহংসদেব ঐ প্রশ্নের উত্তরে পুস্তকখানি খুলিয়া চিহ্নিত অংশটি পাঠ করিতে বলিলেন। উহাতে লিখিত ছিল, "অবিবাহিত ও বিধবাদিগকে আমি বলিতেছি যে, বিবাহ না করাই ভাল—যেমন আমি নিজে অকৃতদার রহিয়াছি। কিন্তু তাহারা যদি সংযম অবলম্বন না করিতে পারে, তবে বিবাহ করাই ভাল; কারণ বাসনার আগুনে পুড়িয়া মরা অপেক্ষা বিবাহ করাই উত্তম।" পাঠ শেষ হইলে পরমহংসদেব বুঝাইয়া দিলেন যে, বিবাহই সর্বপ্রকার বন্ধনের মূল। জনৈক শ্রোতা পুনর্বার আপত্তি তুলিলেন, "আপনি কি তা হলে বলতে চান যে, বিয়ে করাটা ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ কাজ? বিয়ে না করলে সৃষ্টি থাকবে কি করে?" শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে উত্তর দিলেন, "তার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। যারা বিয়ে করতে চায়, তারা করবে বই কি? ও আমাদের মধ্যে একটা কথা হয়ে গেল! আমার যা বলবার আমি বলেছি; তুমি ন্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে নিও।" সেদিন বিরুদ্ধ প্রতিবেশের মধ্যে যুবকদের সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করা হইল না; সুতরাং বিদায়কালে ঠাকুর

শশী প্রভৃতিকে বলিয়া দিলেন, "আবার এসো, কিন্তু একা একা; ধর্মের সাধন গোপনীয়।"

প্রথম দিনেই ঠাকুর শশীর মন জয় করিয়া লইলেন। এই আকর্ষণের ফলে তিনি কলেজের ছুটির দিনে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরের কথামৃত পান করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ তিনি অনেক কথা বলিতেন; কিন্তু অতঃপর যুবকমনে বহু সন্দেহ উঠিলেও এবং সন্দেহনিরসনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে গেলেও ঠাকুরকে ভগবৎপ্রসঙ্গে নিমগ্ন ও ভক্তপরিবেষ্টিত দেখিয়া আর বিশেষ বাক্য-স্ফূর্তি হইত না। তাঁহাকে দেখিলেই ঠাকুর বলিতেন, "বস, বস।" তিনিও বসিতেন; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐ ভাবে বসিয়া থাকিতে থাকিতেই মনের সংশয় বিদূরিত হইয়া তৎস্থলে অপূর্ব শান্তি বিরাজ করিত। ক্রমে সুযোগ বুঝিয়া ঠাকুর তাঁহার নিকট স্বীয় স্বরূপ প্রকটিত করিয়া তাঁহার হৃদয়-মন চিরতরে এক উচ্চতর স্তরে তুলিয়া লইলেন। একদিন বস্তুবিশেষের সন্ধানে শশী দ্রুতপদে ঠাকুরের কক্ষ অতিক্রম করিয়া যাইতেছেন, এমন সময় ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "তুই যাকে চাস—সে এই, সে এই, সে এই।" চকিতে শশীর দৃষ্টি অনুসন্ধেয় বস্তু হইতে সদানন্দময় ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইল। তিনি বুঝিলেন, ঠাকুরই জীবনের একমাত্র জ্ঞেয় বস্তু—আর সব অনুসন্ধান এই বৃহৎ অনুসন্ধানেরই রূপান্তর মাত্র।

দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের ফলে শশী ক্রমে নরেন্দ্রাদি যুবক ভক্তদের সহিত পরিচিত ও প্রেমসূত্রে সংবদ্ধ হইলেন। একসময় নরেন্দ্রের মুখে সুফী কাব্যের প্রশংসা শুনিয়া মূল কাব্যপাঠের আগ্রহে তিনি ফার্সী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন কালীবাড়িতে এতই মনোযোগসহকারে ঐ ভাষা আয়ত্ত করিতেছিলেন যে, ঠাকুর তিন বার ডাকিয়াও কোন উত্তর পাইলেন না। অবশেষে শশী নিকটে আসিলে তিনি জানিতে চাহিলেন, এত নিবিষ্ট-মনে কি করা হইতেছিল। ফার্সী পড়িতেছিলেন শুনিয়া তিনি সাবধান

করিয়া দিলেন, "অপরা বিদ্যায় ডুবে যদি পরা বিদ্যা ভুলে যাস তো তোর হৃদয় ভক্তিহীন হয়ে যাবে।" শশীর ফার্সী পড়া আর অগ্রসর হইল না।

ঠাকুর বরফ খাইতে ভালবাসিতেন; তাই এক গ্রীষ্মের দিনে কলিকাতায় বরফ কিনিয়া শশী পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। বরফ খণ্ডটিকে তিনি এতই যত্নসহকারে গামছা জড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলেন যে, উহা গলিতে পারে নাই। ঠাকুর তাঁহার ঐকান্তিকতা ও বুদ্ধি এবং রৌদ্রে দেহ ঘর্মাক্ত ও মুখ শুষ্ক দেখিয়া ব্যথিতকণ্ঠে তারিফ করিয়া বলিলেন, "আহা, তোর বড় কষ্ট হয়েছে! দ্যাখ, যার হাতে জল গলে না, লোকে তাকে কৃপণ বলে; কিন্তু আমি দেখছি তুই কৃপণ নস, তুই দাতা!"

ফলতঃ দক্ষিণেশ্বরে বারংবার যাতায়াত ও ঠাকুরের সেবাদির ফলে শশী তাঁহার স্নেহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইঁহাদের অলৌকিক সম্বন্ধ তো ছিলই। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, শশী আর শরৎকে দেখেছিলাম ঋষি কৃষ্ণের (অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্টের) দলে ছিল।"—('কথামৃত' ৪।৩৩০)। শশীকে আদর করিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে বলিতেন; কিন্তু অধ্যয়নে নিরত এবং সাংসারিক অসচ্ছলতাবশতঃ পাঠের জন্য অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত শশীর পক্ষে তাহা সম্ভব হইত না। কিন্তু ক্রমে এমন সময় উপস্থিত হইল যখন সাংসারিক চিন্তাকে ছাপাইয়া তাঁহার হৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রেমই পূর্ণরূপে উদ্বেলিত হইল। ঠাকুর গলরোগ লইয়া যখন শ্যামপুকুরে আসিলেন এবং পথ্য-প্রস্তুতির জন্য শ্রীশ্রীমাও তথায় আসিলেন, তখন "রাত্রিকালে ঠাকুরের সেবা করিবার লোকাভাব দূর করিবার জন্য ভক্তগণ মনোনিবেশ করিল। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ তখন ঐ বিষয়ের ভার স্বয়ং গ্রহণপূর্বক রাত্রি-কালে এখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নিজ দৃষ্টান্তে উৎসাহিত করিয়া গোপাল (ছোট), কালী, শশী প্রভৃতি কয়েকজন কর্মঠ যুবক-ভক্তকে ঐরূপ করিতে আকৃষ্ট করিলেন।"—('লীলাপ্রসঙ্গ—দিব্যভাব', ২৬৬ পৃঃ)।

অভিভাবক প্রথমে ততটা আপত্তি করেন নাই; কিন্তু পরে যখন কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া শশী বাড়িতে আহার করিতে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করিলেন, তখন তিনি নানাবিধ বাধাসৃষ্টি করিতে লাগিলেন। শশী কিন্তু নিজ সঙ্কল্প ছাড়িলেন না। তিনি তখন বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তাই জনৈক বৃদ্ধ প্রতিবেশী যখন উপদেশ দিলেন, "পরীক্ষাটা দিয়েই গুরু-সেবা কর না", তখন শশীর উত্তর পাইলেন, "আমি যদি তার আগে মরে যাই? ততদিন আমার মৃত্যু হবে না, একথা কি আপনি নিশ্চয় করে বলতে পারেন?"

শ্যামপুকুরের পরে কাশীপুর। শশী এখানেও গুরুসেবায় নিযুক্ত রহিলেন। ঠাকুরের অসুখ সম্বন্ধে শশী বলিতেন, "জগতের দুঃখ দেখে যীশু ক্রুশ-বিদ্ধ হয়েছিলেন; ঠাকুরও জীবের দুঃখে রোগভোগ করছেন।" রোগের কারণ সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব মত যাহাই থাকুক না কেন, সেবাকার্যে তিনি সর্বদাই অগ্রণী ছিলেন। একদিন ঠাকুরের জামরুল খাইতে ইচ্ছা হইল। তখন শীতকাল—জামরুল কিরূপে পাওয়া যাইবে? শশী সংবাদ লইয়া জানিলেন যে, এক বাগানে উহা আছে; অমনি উহা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। জামরুল পাইয়া ঠাকুর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন সময়ে জামরুল কোথায় পেলি রে?" কোথায় আর পাইবেন? সত্যসঙ্কল্প ঠাকুরের যেখানে অভিলাষ আর বীর ভক্ত যেখানে সেবক, সেখানে কোন্ বস্তু অলভ্য হয়?

ঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত শশীর আহারাদি পর্যন্ত ভুল হইয়া যাইত। কত দিন ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেন, "নেয়ে খেয়ে নাও, আমি এখন ভাল আছি—আমার এখন কোন দরকার নেই, খেয়ে এস।" এমন বহু বার হইয়াছে, যখন শশীকে অবিরাম বীজন করিতে দেখিয়া ঠাকুর তাঁহার হাত হইতে পাখা লইয়া লাটুকে দিয়াছেন। দেহত্যাগের পূর্বে একদিন শশীকে তিনি

স্নেহবিগলিত স্বরে বলিলেন, "ছাখ, তোরা এই সেবা দিয়ে আমায় বেঁধে রেখেছিস। তোরা যদি বলিস তা হলে একবার সেখানে দেখে আসি।" সকলেই বুঝিলেন, ঠাকুর লীলাসংবরণের ইঙ্গিত করিতেছেন—আর যেন বলিতেছেন যে, ভক্তের আকর্ষণই তাঁহাকে মর্ত্যধামে ধরিয়া রাখিয়াছে।

ঠাকুরের সেবায় শশী কতখানি মগ্ন হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরকে কতখানি আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা শেষদিনের নিদারুণ ঘটনাবলীতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সেদিন বৈকালে সাত মাইল ছুটিয়া ডাক্তারের বাড়ি গিয়া যখন জানিলেন যে, ডাক্তার অন্যত্র গিয়াছেন, তখন আবার এক মাইল ছুটিয়া গিয়া পথে তাঁহাকে ধরিলেন এবং ডাক্তার যদিও জানাইলেন যে, তাঁহার তখনই কাশীপুরে যাওয়া অসম্ভব, কারণ অন্যত্র জরুরী কাজ আছে, তথাপি শশী তাঁহাকে টানিয়া কাশীপুরে লইয়া গেলেন। যথাবিধি পরীক্ষান্তে ডাক্তার চলিয়া গেলে সেদিনও পূর্বানুরূপ দৈনন্দিন সেবাদি চলিতে লাগিল—কেহই ভাবিতে পারিলেন না যে, শেষদিন সমাগত। অথবা অপরে যাহাই ভাবুক না কেন, শশী অন্ততঃ চিন্তা করিতে পারেন নাই যে, প্রিয়তমের সহিত তাঁহাদের বিচ্ছেদ আসন্নপ্রায়। সে রাত্রিতে ঠাকুর সাধারণ আহার অপেক্ষা একটু বেশীই খাইলেন; শশী খাওয়াইয়া দিলেন। মহাপ্রস্থানের কোন ইঙ্গিত না পাইয়া তিনি ভাবিলেন, ঠাকুর সে রাত্রে বরং একটু ভালই আছেন। এমন কি, পরিশেষে যখন সত্যই শেষমুহূর্ত আসিল, শশী তখনও মনে করিলেন, ঠাকুরের গভীর সমাধি হইয়াছে; কারণ তিনি দেখিলেন, ঠাকুরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর দিয়া এক আনন্দ-হিল্লোল বহিয়া যাইতেছে—এত আনন্দোচ্ছ্বাস তিনি পূর্বে কখনও দেখেন নাই। রাত্রিশেষে বিশ্বনাথ উপাধ্যায় আসিয়া যখন কহিলেন যে, মস্তকে ও মেরুদণ্ডে ঘৃত মালিশ করিলে সমাধিভঙ্গ হইতে পারে, শশী তখন তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু অবশেষে ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গেলেন, আর আশা

নাই। অপরাহ্ণ প্রায় পাঁচটার সময় ঠাকুরের পূতদেহকে মাল্য-চন্দন-পুষ্পে সাজাইয়া শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল। বাস্তবকে বিশ্বাস করিতে অপটু শশী চিত্রার্পিতের ন্যায় প্রজ্বলিত চিতার পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। লাটু তাঁহাকে হাত ধরিয়া টানিলেন, নরেন ও শরৎ অনেক প্রবোধ দিলেন—শশী তখনও কিংকর্তব্যবিমূঢ়! চিতা নির্বাপিত হইলে তিনি নীরবে ভস্মাস্থি তুলিয়া একটি তাম্রকলসীতে রাখিলেন এবং উহা মস্তকে বহন করিয়া উদ্যানবাটীতে ঠাকুরের শয্যায় স্থাপন করিলেন। শশীর বিশ্বাস—ঠাকুর যান নাই; সুতরাং ঠাকুরের দ্রব্যাদি সযত্নে রক্ষিত হইল এবং ভস্মাস্থিপূর্ণ কলসীতে নিয়মিত পূজা চলিতে লাগিল।

ভস্মাবশেষ ঐ অবস্থায় সাত দিন থাকার পর রামচন্দ্রপ্রমুখ প্রবীণ ভক্তদের সিদ্ধান্তানুযায়ী উহা কাঁকুড়গাছিতে লইয়া যাইবার কথা উঠিল। নিরঞ্জন ইহাতে ঘোরতর আপত্তি তুলিলেন, আর শশী বলিলেন, "কলসী দেব না।" নরেন্দ্রের মধ্যস্থতায় তখনকার মত বিবাদ মিটিল এবং রাম বাবুর প্রস্তাবই গৃহীত হইল; কিন্তু অপর সকলের অজ্ঞাতসারে শশী ও নিরঞ্জন অন্য এক পাত্রে "অর্ধেকেরও উপর ভস্মাবশেষ ও অস্থিনিচয় বাহির করিয়া লইয়া" উহা বলরাম বাবুর বাটীতে নিত্যপূজার জন্য পাঠাইয়া দিলেন ('উদ্বোধন', ১৭শ সংখ্যা, ৪৪০ পৃঃ)। অতঃপর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগস্ট জন্মাষ্টমীর দিনে প্রথম কলসীটি কীর্তনসহ রামবাবুর কলিকাতার বাটী হইতে কাঁকুড়গাছির উদ্যানে লইয়া যাওয়া হইল—কীর্তনের পশ্চাতে শশী অধিকাংশ পথ কলসীটি নিজ মস্তকে বহন করিয়া চলিলেন। অবশেষে কাঁকুড়গাছিতে যথোচিত পূজান্তে যখন উহা সমাহিত করিয়া উহার উপর মাটি ফেলা হইতে লাগিল, তখন শশী কাঁদিয়া উঠিলেন, "ওগো, ঠাকুরের গায়ে বড় লাগছে।" শশীর কথায় সকলেরই চক্ষে জল আসিল—তাই তো, ঠাকুর যে সদা-বিদ্যমান, সদা-সচেতন!

ইহার পর শশীকে গৃহে ফিরিয়া অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিতে হইল; কিন্তু নরেন্দ্রাদির আহ্বান আবার তাঁহাকে কয়েক মাস পরেই বরাহনগর মঠে লইয়া গেল। এখানে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঘ মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদুকা-সম্মুখে অপর কয়েক জনের সহিত সন্ন্যাসগ্রহণান্তে তিনি 'রামকৃষ্ণানন্দ' নামে পরিচিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল, তিনি স্বয়ং ঐ নাম গ্রহণ করিবেন; কিন্তু শশীর সেবা ও ভক্তির দাবী মানিয়া লইয়া তাঁহাকেই উহা দিলেন।

বরাহনগরে আসার পর শশী মহারাজ নিত্য শ্রীগুরুর পূজাদি-অবলম্বনে একদিকে যেমন সকলের মনে গভীর ভক্তিভাব জাগাইতেন, অপরদিকে তেমনি তাঁহাদের কায়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। মঠস্থাপনেব পরেই দেখা গেল যে, তীব্র বৈরাগ্য ও তীর্থদর্শন-অভিলাষে গুরুভ্রাতারা প্রায়ই এদিক সেদিকে চলিয়া যাইতেছেন—কেবল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ একমনে গুরুসেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। তখন অভাবেব দিন। এক দ্বিপ্রহরে চারিজন সন্ন্যাসী রিক্তহস্তে ভিক্ষা হইতে ফিরিলেন—মঠের ভাণ্ডারও সেদিন শূন্য। অতএব আহারের আশা ত্যাগ করিয়া সকলে 'দানাদের ঘরে' কীর্তনে মাতিলেন। এদিকে শশী মহারাজের ভাবনা হইল, ঠাকুরকে কিছু না দিলে তো চলে না। তিনি অপরের অজ্ঞাতসারে পরিচিত এক প্রতিবেশীর নিকট গেলেন। ঐ বাড়ির অন্যান্য সকলেই মঠের বিরোধী; কাজেই প্রতিবেশী জানালা গলাইয়া পোয়াটাক চাল, কয়েকটি আলু ও একটু ঘৃত দিলেন। শশী মহারাজ উহা রন্ধনপূর্বক ঠাকুরকে ভোগ দিলেন এবং পরে ঐ প্রসাদের দ্বারা গোল গোল পিণ্ড পাকাইয়া 'দানাদের ঘরে' কীর্তনমগ্ন অভুক্ত গুরুভ্রাতাদের মুখে একটি একটি পিণ্ড গুঁজিয়া দিলেন। এই অপূর্ব প্রসাদের আস্বাদে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহারা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই শশী, ঐ অমৃত কোথায়

পেলে, ভাই ?" স্বামী বিবেকানন্দ সত্যই বলিয়াছিলেন, "শশী ছিল মঠের প্রধান খুঁটি। সে না থাকলে আমাদের মঠবাস অসম্ভব হ'ত। সন্ন্যাসীরা ধ্যানভজনে প্রায়ই ডুবে থাকত এবং শশী তাদের আহার প্রস্তুত করে অপেক্ষা করত; এমন কি, মাঝে মাঝে তাদের ধ্যান থেকে টেনে এনে খাওয়াত।"

বিশেষ কারণ না ঘটিলে শশী মহারাজ মঠ ছাড়িয়া কোথাও যাইতেন না। একবার ঠাকুরের ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মৃত্যুশয্যা হইতে তাঁহাকে স্মরণ করিলে তিনি তাঁহার গৃহে যাইয়া প্রায় এক ঘণ্টা ঠাকুরের কথায় কাটাইয়াছিলেন। এই নিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়া আচার্য বিবেকানন্দ এক সময়ে লিখিয়াছিলেন, "শশী কেমন স্থান জাগিয়ে বসে থাকে! তাঁহার দৃঢ়নিষ্ঠা একটা মহাভিত্তিস্বরূপ।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতিকে যীশুখ্রীষ্টের প্রতি ভক্তিপরায়ণ জানিয়া ধর্মান্তরিত করার লালসায় মুক্তিফৌজের (Salvation Army) দুই-একজন বাঙ্গালী প্রচারক একসময় মঠে যাতায়াত আরম্ভ করেন; কিন্তু অবশেষে বাইবেলে রামকৃষ্ণানন্দের ব্যুৎপত্তি-দর্শনে যুক্তির পথে কার্যোদ্ধারের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রলোভন দেখান। ইহাতে তাঁহার ধৈর্যের সীমা উল্লঙ্ঘিত হওয়ায় তিনি চিরতরে তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দেন।

অবসরবিনোদনের জন্য শশী মহারাজ এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিতেন—তিনি সময় পাইলেই অঙ্ক কষিতেন বা সংস্কৃত পড়িতেন। মঠে সমাগত যুবকগণ তাঁহার নিকট অধ্যয়নবিষয়ে প্রচুর উৎসাহ পাইত। ঐ সময় স্বামী বিরজানন্দ, বোধানন্দ, বিমলানন্দ ও আত্মানন্দ মঠে যাতায়াত আরম্ভ করেন। শশী মহারাজ তাঁহাদের সহিত ধর্মালাপ করিতেন এবং ঠাকুরের সেবা ও মঠের খুঁটিনাটি কাজের সুযোগ দিতেন। বিরজানন্দকে গণিতে কাঁচা জানিয়া তিনি গ্রীষ্মের ছুটিতে মঠে থাকিয়া তাঁহার নিকট

গণিত শিখিতে বলেন। তদনুযায়ী বিরজানন্দ সেখানে আসিলেন। কিন্তু তাঁহার ভগবদ্‌ব্যাকুল মন তখন অধ্যয়ন অপেক্ষা ঠাকুরসেবা ও মঠের কার্যেই অধিক মগ্ন হইয়া পড়িল; আর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দেরও তো খুব বেশী অবকাশ ছিল না। অতএব ছুটির মধ্যে আর বই খোলা হইল না; কিন্তু বিরজানন্দের বৈরাগ্যের উৎস খুলিয়া গেল—তিনি কিয়ৎকাল পরেই মঠে যোগ দিলেন।

মঠে ঠাকুরপূজাদি চালাইয়া যাওয়ার প্রায় সমস্ত দায়িত্ব স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ লইয়াছিলেন। ঠাকুরসেবার কোন প্রকার ত্রুটি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। রঙ্গপ্রিয় নরেন্দ্রনাথ ইহা জানিতেন; তাই মাঝে মাঝে তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া মজা দেখিতেন। একদিন জনৈক ভক্ত ঠাকুরপূজাকে শীতলাপূজাদির সহিত তুলনা করিয়া ব্যঙ্গ করিতে থাকিলে ক্রুদ্ধ শশী মহারাজ ঘোষণা করিলেন যে, তিনি ঐরূপ ভক্তের অর্থসাহায্য চান না। অমনি স্বামী বিবেকানন্দ বলিলেন, "তবে ভিক্ষা করে নিয়ে আয়।" শশীও উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তাই করব।" স্বামীজী তখন কৃত্রিম কোপসহকারে যুক্তি দেখাইতে লাগিলেন যে, মঠের ভাইদের যে স্থলে অন্নবস্ত্রের অভাব, সে স্থলে পূজার জন্য অধিক খরচা করা অযৌক্তিক। তর্ক বাড়িয়া চলিতেছে দেখিয়া লাটু মহারাজ মধ্যস্থতা করিতে অগ্রসর হইলে স্বামীজী তাঁহাকে ধমক দিয়া নিরস্ত করিলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি কৌতুকপ্রদ কথা বলিয়া ফেলিলেন, যাহাতে হাসির হিল্লোল উঠিয়া সেদিনকার বিতর্ককে ভাসাইয়া লইয়া গেল।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ঠাকুরপূজা একটা দেখিবার জিনিস ছিল। ঠাকুরকে তিনি শুধু বিধি-অনুযায়ী পূজা করিয়াই তৃপ্ত হইতেন না; তাঁহাকে জীবন্ত জানিয়া তদনুরূপ সেবা করিতেন। গ্রীষ্মে নিজের কষ্ট হইলে তিনি পাখা লইয়া ঠাকুরকে বাতাস করিতেন এবং নিজে গলদ্‌ঘর্ম হইতে থাকিলেও

উহাতেই আরাম বোধ করিতেন। ভোরে উঠিয়া দায়ের উল্টা দিক দিয়া তিনি ঠাকুরের জন্য দাঁতনকাঠি থেঁতো করিয়া দিতেন। একদিন বাল্যভোগ দিতে যাইয়া দেখেন যে, সচ্চিদানন্দ (বুড়ো বাবা) উহা ঠিকভাবে থেঁতো করেন নাই। অমনি মনে আঘাত পাইয়া সচ্চিদানন্দের সন্ধানে বাহির হইলেন আর বলিতে লাগিলেন, "আজ তুই আমাদের ঠাকুরের মাড়ি দিয়ে রক্ত বের করেছিস!"

আলমবাজারে আগমনের পর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দায়িত্ব বর্ধিতই হইল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আসিয়া মঠের ভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনিই ছিলেন এক হিসাবে মঠের কর্ণধার। তবে সুখের বিষয় এই যে, আলমবাজারে আসার পর এক বৎসর পরে মঠের আর্থিক অভাব অনেক কমিয়া গিয়াছিল। এই মঠ হইতেও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বিশেষ কোথাও যাইতেন না—এমন কি, উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ ৺কাশীধামও তিনি দর্শন করেন নাই। একবার তিনি নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন, কিন্তু চিন্তান্বিত গুরু-ভ্রাতাদিগকে তাঁহার সন্ধানে দক্ষিণেশ্বর অতিক্রম করিয়া যাইতে হয় নাই। দক্ষিণেশ্বরের ৺কালীমন্দির হইতেই সেবারে তিনি মঠে ফিরিয়াছিলেন। আর একবার তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে তীর্থদর্শনে বাহির হইয়াছিলেন; কিন্তু বর্ধমান জিলার মানকুণ্ডু পর্যন্ত পৌঁছিয়াই অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং সংবাদ পাইয়া স্বামী নিরঞ্জনানন্দ তাঁহাকে লইয়া আসেন।

মঠ-জীবনের দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও যুবক সন্ন্যাসীদের আনন্দের অভাব ছিল না। মঠের বাড়িটি ভূতের বাড়ি বলিয়া ঐ অঞ্চলে সুপরিচিত ছিল। সন্ন্যাসীদের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা হইত এবং কেহ কেহ ভূতও দেখিয়াছিলেন। এক গভীর রাত্রে সকলে নিদ্রিত আছেন, এমন সময় শুনিলেন ছাদে বিকট গড় গড় শব্দ হইতেছে। শব্দ শুনিয়া অনেকে ভয় পাইলেন এবং রামকৃষ্ণানন্দকে বলিতে লাগিলেন, "ভাই, কোথায় নিয়ে এলে?

এ যে সত্যই ভূতের ভাঁটা-খেলা চলছে।” ইহাতে উত্তেজিত শশী মহারাজ “তোর ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করছি” বলিয়া একটি বড় লাঠি-হাতে মার মার শব্দে দুপ দুপ করিয়া একেবারে ছাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখেন ডাম্বেল ও লণ্ঠন রহিয়াছে। তখন সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, “ভূতে বুঝি আবার লণ্ঠন নিয়ে ভাঁটা খেলে? অবশেষে অনুসন্ধানে জানা গেল যে, উহা স্বামী সারদানন্দ ও সদানন্দের কীর্তি।

পূজায় প্রীতি থাকিলেও জ্ঞানার্জনের প্রতি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল—ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। আলমবাজারে দ্বিপ্রহরে আহারান্তে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলীকে অনুষ্টুপ্ ছন্দে সংস্কৃতে অনুবাদপূর্বক ‘বিদ্যোদয়’ নামক পাক্ষিক সংস্কৃতপত্রে ছাপাইতেন। এতদ্ব্যতীত ‘ইনোসেণ্ট্ এ্যাট্ হোম’ ও ‘ইনোসেণ্ট এ্যাব্রড্’ ইত্যাদি হাস্যরসময় ইংরেজী গ্রন্থ উচ্চৈঃস্বরে পড়িয়া সকলকে আনন্দ দিতেন। সংস্কৃতের প্রতি তাঁহার এমনই প্রীতি ছিল যে, একদা কাশীর প্রমদাদাস বাবুর নিকট হইতে যখন সংবাদ আসিল যে, মাসিক ৪০৲ টাকায় একজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত পাওয়া যাইতে পারে, তখন দারিদ্র্যবশতঃ ঠাকুরের জন্য চারি পয়সার মিছরি জোটানো কঠিন জানিয়াও তিনি ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অবশ্য অন্যকারণে ঐ প্রস্তাব তখন কার্যকর হয় নাই।

তাঁহার গুণে মুগ্ধ স্বামীজী ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে আমেরিকার কার্যের জন্য আহ্বান করেন; কিন্তু তখন তাঁহার গায়ে চর্মরোগ—চুলকাইলে মাছের আঁশের মত বাহির হইত এবং শীতকালে উহা বাড়িত। অতএব তাঁহার যাওয়া উচিত কি না, এই বিষয়ে আলমবাজার মঠে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া, স্বামীজী এক পত্রে লিখিলেন, “শশী সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বটে, কিন্তু তোমরা খালি শশীর আসা সম্ভব কিনা তাহাই বিচার করছ!··· শশীকে

আমি বিশ্বাস করি, ভালবাসি। He is the only faithful and true man there (ওখানে সে-ই একমাত্র বিশ্বস্ত ও খাঁটি লোক)." শশীর তবু যাওয়া হইল না; কলিকাতার তদানীন্তন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক জার্মাণ ডাক্তার সাল্জার মত দিলেন যে, শীতপ্রধান দেশে তাঁহার যাওয়া চলিবে না, গ্রীষ্মপ্রধান দেশই ভাল।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অসীম রুদ্ধ ক্ষমতার দ্বারোদ্ঘাটনে আচার্য বিবেকানন্দ ঐভাবে তখন অসমর্থ হইলেও সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন এবং আমেরিকা হইতে প্রথমবারে মঠে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই স্বীয় সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিলেন। মাদ্রাজের ভক্তগণ সেখানে একটি মঠস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানাইলে স্বামীজী তাঁহাদের ব্রাহ্মণসুলভ নিষ্ঠা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি তোমাদের কাছে আমার এমন একজন গুরুভাইকে পাঠাব, যে তোমাদের সর্বাধিক গোঁড়া ব্রাহ্মণের চেয়েও গোঁড়া, অথচ পূজা, শাস্ত্রজ্ঞান, ধ্যানধারণাদিতে অতুলনীয়।" তাঁহার মনে তখন রামকৃষ্ণানন্দের কথাই জাগিয়াছিল। আলমবাজারে আসিয়া তিনি তাঁহাকে প্রথমে একটু পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য বলিলেন, "শশী, তুই আমাকে খুব ভালবাসিস, না?" শশী মহারাজ যাই বলিলেন, "হাঁ", অমনি স্বামীজী আদেশ করিলেন, "তবে চিৎপুরের ফৌজদারী বালাখানার মোড় থেকে ভাল টাটকা নরম পাউরুটি নিয়ে আয়।" শশী মহারাজের নিষ্ঠা থাকিলেও শুচিবাই ছিল না; অধিকন্তু নেতার আদেশে তিনি সদা প্রস্তুত ছিলেন। তাই প্রকাশ্য দিবালোকে পাঁউরুটি কিনিয়া আনিলেন। নির্দেশপালনে তৎপর দেখিয়া নেতা তাঁহাকে আদেশ করিলেন, "ভাই, তোকে মাদ্রাজে যেতে হবে।" দ্বিরুক্তি না করিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সম্মত হইলেন এবং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষে জাহাজে করিয়া স্বামী সদানন্দের সহিত মাদ্রাজে পৌঁছিলেন।

সেখানে তিনি প্রথমতঃ আইস্ হাউস্ রোডে একটা ভাড়া-বাড়িতে ছিলেন ; পরে স্বামীজীর ভক্ত এস্ বিলগিরি আয়াঙ্গার মহাশয়ের 'আইস্ হাউস্' নামক ত্রিতল ভবনের একতলার ঘরগুলি বিনা ভাড়ায় পাইয়া উহাতে উঠিয়া গেলেন। কলিকাতা আসিবার পথে স্বামীজীর পাদস্পর্শে এই ভবনটি পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। বাড়িটির প্রকৃত নাম ছিল 'কাসল্ কার্নান্'। কোনও আমেরিকান কোম্পানি বরফ রাখিবার জন্য সমুদ্রকূলে এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন; তাই উহার নাম হয় 'আইস্ হাউস্' বা বরফগৃহ। পরন্তু পরিকল্পনা কার্যে পরিণত না হওয়ায় উহা বাসগৃহরূপেই ব্যবহৃত হইতে থাকে। বাড়ির প্রাচীরগুলি প্রশস্ত থাকায় উহা গ্রীষ্মকালে বিশেষ আরামপ্রদ ছিল।

মাদ্রাজে আসার সঙ্গেসঙ্গেই তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের পটস্থাপনপূর্বক পূজাদি আরম্ভ করিলেন; অব্যবহিত পরেই বক্তৃতাদিও চলিতে লাগিল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্য আরম্ভ করিলে তিনি ঐ কার্যের জন্য পত্রিকায় আবেদন প্রকাশ-পূর্বক ও অন্যান্য উপায়ে অর্থসংগ্রহে মন দিলেন। এইরূপে ক্রমেই তাঁহার কার্যক্ষেত্রের প্রসার হইতে লাগিল। আবার মাদ্রাজের 'ইয়ংমেন্স্ হিন্দু এসোসিয়েশনে' তিনি ধারাবাহিকভাবে যেসকল বক্তৃতা দেন তাহা 'ব্রহ্মবাদিন্' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রদ্বয়ে প্রকাশিত হওয়ায় তিনি বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত হইতে থাকিলেন। অধিকন্তু নগরের বিভিন্ন স্থানে শাস্ত্রালোচনাও চলিতে লাগিল। এইরূপে ত্রিপ্লিকেন ও মায়লাপুর অঞ্চলে গীতা ও উপনিষদ্ব্যাখ্যা, পুরাসোয়াকাম্ ও চিন্তাদ্রিপেটে গীতাব্যাখ্যা ও ওয়াই এম্ এইচ্ এসোসিয়েশনে 'যোগসূত্র' ব্যাখ্যা চলিত। আবার প্রতি একাদশীতে মঠে ভজন হইত। এই বৎসর একবার ৺রামেশ্বরদর্শনে গমন ব্যতীত তিনি প্রায় সব সময় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাপ্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন।

উৎসবাদির আয়োজনও তিনিই করিতেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ রবিবার মাদ্রাজ শহরে শ্রীরামকৃষ্ণের যে প্রথম জন্মতিথি-উৎসব হয়, উহাতে সর্বশ্রেণীর হিন্দু, এমন কি, মুসলমানরাও যোগ দিয়াছিলেন। ১৯০২-এর জুলাই মাসে স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর তাঁহার উদ্যমে ও মাননীয় আনন্দ চার্লু মহাশয়ের পৌরোহিত্যে পাচাইয়াপ্পা কলেজে বিবেকানন্দ স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। পরবর্তী বৎসর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসবের ন্যায় বিবেকানন্দোৎসবও নিয়মিতভাবে চলিতে থাকে।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষে ক্লাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া একাদশ হইল। সাধারণতঃ প্রত্যেক ক্লাসের জন্য দেড় ঘণ্টা সময় নির্দিষ্ট ছিল; কিন্তু বিষয়বস্তু হৃদয়গ্রাহী হইলে দুই ঘণ্টা বা ততোধিক সময়ও অতিবাহিত হইত। শ্রোতা সাধারণতঃ ২০ হইতে ৫০ জন হইত। কিন্তু স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সেদিকে দৃষ্টি ছিল না; তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে শুনাইতেছেন মনে করিয়াই শাস্ত্রপাঠ করিতেন। কোন দিন দুর্যোগাদিবশতঃ শ্রোতা উপস্থিত না থাকিলেও তিনি যথারীতি পাঠ করিয়া মঠে ফিরিতেন। এইরূপে তাঁহার ঐকান্তিক উদ্যম ও উৎসাহ তখনকার দিনে পাশ্চাত্ত্য ভাবে ভাবিত দক্ষিণের সমাজে কিরূপ নূতন ভাববন্যা আনিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। শুধু অনুমান কেন, প্রত্যক্ষতঃ তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইত। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে আমরা দেখিতে পাই যে, নগরের বহির্ভাগেও বিভিন্ন দূরবর্তী অঞ্চলে ছয়টি বিবেকানন্দ সোসাইটি তাঁহার তত্ত্বাবধানে চলিতেছে (যথা—বানিয়াম্বাদি, নিকুন্দি, আরাসামুখি, বারুর, কৃষ্ণগিরি ও ধরমপুরী)। এই সকল সমিতিতে সাময়িক বক্তৃতা ও ক্লাসের সহিত পূজা, ভজন ও দরিদ্র ছাত্রদিগকে সাহায্যদানের কার্য পরিচালিত হইত।

এই সকল উৎসব ও অন্যান্য কাজে তাঁহার ঐকান্তিকতা ও ঠাকুরের প্রতি নির্ভর প্রতিপদে ফুটিয়া উঠিত। একবার শ্রীরামকৃষ্ণের উৎসব প্রায়

আসিয়া পড়িয়াছে, তখনও দরিদ্রনারায়ণের সেবার কোন ব্যবস্থা হয় নাই দেখিয়া অধীর রামকৃষ্ণানন্দ মধ্যরাত্রে উঠিয়া মঠের অলিন্দে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় রুদ্ধ আবেগে ধীর অথচ গম্ভীর পদক্ষেপে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া বুঝিলেন, এই নিশীথে তিনি তাঁহার প্রাণের বেদনা অন্তরের দেবতার শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছেন; কিন্তু নিকটে যাইতে সাহস হইল না। সৌভাগ্যক্রমে পরদিন জনৈক অনুরাগী প্রচুর অর্থ পাঠাইয়া দেওয়ায় উৎসব সর্বাঙ্গীণ সুসম্পন্ন হইল।

তিনি কিরূপ প্রতিকূল অবস্থায় তখন কার্য পরিচালনা করিতেন তাহা অনুধাবন না করিলে তাঁহার এই কালের চরিত্রের দৃঢ়তা সহজে উপলব্ধ হইবে না। একদিন কার্যান্তে ঘর্মাক্তকলেবরে মঠে ফিরিয়া তিনি দেখিলেন, ঠাকুরকে ভোগ দিবার মত কিছুই নাই। তখন গায়ের কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া বদ্ধদ্বার গৃহে রুদ্ধ অভিমানে পুরুষসিংহ পদচারণ করিতে করিতে ঠাকুরকে বলিলেন, "পরীক্ষা হচ্ছে? আমি তোমায় সমুদ্রের তীর থেকে বালি এনে ভোগ দেব এবং তাই প্রসাদ পাব। পেট নিতে না চায় আঙ্গুল দিয়ে ঠেলে সে প্রসাদ গলায় ঢোকাব।" ঠাকুরের দয়ায় সেদিন ততদুর অগ্রসর হইবার পূর্বেই গৃহদ্বারে করাঘাত হইল এবং তিনি দরজা খুলিয়া দেখিলেন যে, ঠাকুরের ভোগের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য লইয়া এক ভক্ত উপস্থিত। আর একবার ঠাকুরের ভোগের সময় আগতপ্রায়, কিন্তু ঘৃত নাই। শশী মহারাজ চিন্তাকুল হৃদয়ে পায়চারি করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার ক্লাসের জনৈক ছাত্র আসিয়া জানাইলেন, তিনি মঠের কোনও একটা অভাব মিটাইতে চান। রামকৃষ্ণানন্দ প্রথমতঃ অস্বীকার করিলেন, কিন্তু ঐ ব্যক্তির আগ্রহ দেখিয়া পরে স্বীকৃত হইয়া ঘৃতের অভাবের কথা জানাইলেন। ছাত্রটি সেইমাসে উহা তো দিলেনই, পরে প্রতিমাসে উহা

পাঠাইতে থাকিলেন। বস্তুতঃ খুব ঘনিষ্ঠভাবে যাঁহারা মিশিতেন, তাঁহারা ভিন্ন অপর কেহ এসব কষ্টের কাহিনী জানিতেও পারিতেন না। ভদ্রতা হিসাবে কেহ যদি জানিতে চাহিতেন মঠ চলে কি করিয়া, তিনি নিরুদ্বেগে সহাস্যে উত্তর দিতেন, "ঠাকুর সব জুটাইয়া দেন।" তিনি আরও বলিতেন, "অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে যদি নাই চলে, তবে ভগবানের সাহায্যই চাওয়া উচিত।" সুতরাং তাঁহার মান-অভিমান সব ছিল ঠাকুর-স্বামীজীকে লইয়া। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর নিজ জীবনের দুঃখ জানাইতে গিয়া তিনি একদিন স্বামীজীর চিত্রের দিকে তাকাইয়া সক্রোধে বলিয়াছিলেন, "তুমিই তো আমায় এখানে পাঠিয়ে এই বিপদে ফেলেছ।" আবার তখনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া স্বামীজীর নিকট কৃতাপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিয়াছিলেন।

সপ্তাহে একাদশটি ক্লাস চালানো এবং মধ্যে মধ্যে বক্তৃতাপ্রদান, দারিদ্র্য-বশতঃ ও তখনকার দিনে স্বল্পব্যয়ের যানবাহনের অভাবে এইসব কার্যক্ষেত্রে পদব্রজে গমন, আশ্রমে নিজের রন্ধনাদির ব্যবস্থা করা—এই সমস্তের সহিত প্রাণপণে যুঝিয়া তিনি বেদান্তপ্রচারে মত্ত হইয়াছিলেন। কর্মক্লান্ত শরীরে মঠে ফিরিয়া সব দিন রন্ধনের প্রবৃত্তি হইত না; তখন বাজার হইতে রুটি আনিয়া তদ্দ্বারাই রাত্রের আহার শেষ করিতেন। ক্লাসে যাইবার সময় তাঁহাকে এক মাইল হাঁটিয়া বাজারে যাইতে হইত এবং তখনকার দিনের বাহন ঝটকাগাড়ি একা ভাড়া করিবার সামর্থ্য না থাকায় দুই জনের সহিত উহাতে উঠিতে হইত। সেই অপূর্ব বাক্সের মত গাড়িতে তাঁহার সবল, সুদীর্ঘ, স্থূল দেহখানিকে সঙ্কীর্ণ পথে প্রবেশ করাইয়া কোন প্রকারে ন্যুব্জদেহে বসিয়া থাকিতে হইত; আবার ঢালু বাক্স হইতে পড়িয়া যাইবার ভয়ে সর্বদা সাবধান থাকিতে হইত। এইরূপ কায়িক ও মানসিক ক্লেশের মধ্যে মাদ্রাজ-মঠের গোড়াপত্তন হয়। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত, "স্বামীজী, এত ক্লেশ আপনি কিরূপে সহ্য করেন?" তিনি উত্তর দিতেন, "এ শরীরটা তো

একটা যন্ত্র মাত্র, তাও আবার অচেতন ; আর যন্ত্রীর জন্যই তো যন্ত্র, যন্ত্রীকে বাদ দিলে তার থাকা না থাকা দুই-ই সমান। মনে কর, একটা কলম যদি বলে, 'আমি শত শত চিঠি লিখেছি' তবে সত্যি কি উহা তাই করেছে ? উহা তো কিছু লিখেনি, লিখেছে সে ব্যক্তি, যে তাকে ধরে আছে।"

এই নিরভিমান, নীরব কর্মীর সুযশ সুদূরবিস্তৃত হইয়া ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে মহীশূর রাজ্যের বাঙ্গালোর শহরের উপকণ্ঠে আলসুরে লইয়া গিয়াছিল। আমন্ত্রণ পাইয়া তিনি সেখানে উপস্থিত হইলে প্রায় চারি সহস্র ব্যক্তি পঞ্চাশটি কীর্তনের দল লইয়া তাঁহাকে রেলস্টেশনে স্বাগত জানাইলেন এবং শোভাযাত্রা করিয়া বাসস্থানে লইয়া গেলেন। এই কালে তিনি তিন সপ্তাহ সেখানে অবস্থানপূর্বক প্রায় দ্বাদশটি বক্তৃতা দেন ও প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় ধর্মালোচনা করেন। সেই বৎসরই তাঁহাকে মহীশূর নগরেও শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবহরূপে যাইতে হইল। সেখানে তিনি পাঁচটি বক্তৃতা দেন। তন্মধ্যে সংস্কৃত কলেজে সমাগত পণ্ডিতদের এক সভায় সুললিত সংস্কৃতে নির্ভীকচিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয় সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনুদারপন্থী পণ্ডিতসমাজে ঐ সময়ে ঐরূপ বক্তৃতা দেওয়া কেবল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পক্ষেই সম্ভব ছিল। বাঙ্গালোরে সে যাত্রায় যে উৎসাহ উদ্দীপিত হইয়াছিল তাহার ফলে তাঁহাকে পরবৎসরও সেখানে কয়েকটি বক্তৃতা ও ক্লাস করিতে হইয়াছিল। অতঃপর তিনি অপর একজন সন্ন্যাসীকে সেখানে রাখিয়া মাদ্রাজে ফিরিয়া আসেন।

১৯০২ বা ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ত্রিবান্দ্রমে যান এবং একমাস অবস্থান-পূর্বক জনসাধারণের মধ্যে চারিটি বক্তৃতা করেন ও নগরের মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র বাটীতে নিয়মিত গীতাব্যাখ্যা করেন। উহার ফলস্বরূপ একটি বেদান্ত সমিতি স্থাপিত হইয়া ঐ অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাববর্তিকা দীর্ঘকাল প্রজ্বলিত রহিয়াছিল। পরে ১৯২৪ অব্দে সেখানে স্থায়ী মঠ স্থাপিত হয়। ত্রিবান্দ্রম্

হইতে তিনি কন্যাকুমারীদর্শনেও গিয়াছিলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন কলিকাতায় আসেন তখন মেট্রোপলিটান কলেজে তাঁহাকে বক্তৃতা দিতে হয়। কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ঐ বৎসর এবং পরবৎসর তাঁহাকে দক্ষিণাঞ্চলের বহু স্থানে বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজের মায়লাপুর নামক পল্লীতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কর্তৃক যে 'রামকৃষ্ণ বিদ্যার্থিভবন' প্রতিষ্ঠিত হয়, উহা বর্তমানে দক্ষিণাঞ্চলের এক সুবৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হইলেও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উহার পশ্চাতে আছে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের হৃদয়বত্তা, অনুপ্রেরণা ও কর্মপ্রচেষ্টা। কোয়েম্বাটোরে একবার প্লেগের আক্রমণে একটি পরিবারের বয়স্ক সকলের প্রাণনাশ হইয়া কয়েকটি নিঃসহায় শিশুমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে তদ্দর্শনে তাঁহার কোমল হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল এবং তিনি তাহাদের লালনপালনের ভার গ্রহণ করিলেন। ইহা হইতেই 'রামকৃষ্ণ মিশন ষ্টুডেণ্টস্ হোমে'র সূত্রপাত। রামকৃষ্ণানন্দ সর্বদা কার্যে ব্যস্ত থাকিলেও তাঁহার এই স্নেহের প্রতিষ্ঠানটিতে সপ্তাহে অন্ততঃ একবার গিয়া বালকগণকে ধর্মশিক্ষা দিতেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রেঙ্গুনের শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবক-সমিতি হইতে তাঁহার নিকট আহ্বান আসে। তদনুসারে তিনি ২০শে মার্চ রেঙ্গুনে পৌঁছিয়া পাঁচ দিন অবস্থানপূর্বক পাঁচটি বক্তৃতা দেন এবং ধর্মপ্রসঙ্গ করেন। একদিন ঠাকুরের জন্য চাঁপাফুলের সন্ধানে তিন-চারি মাইল হাঁটিয়া যাইবার পথে সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার দেখা হয়। শরৎচন্দ্র এই বৃথা শ্রমের তাৎপর্য জানিতে চাহিলে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বুঝাইয়া দিলেন—

"পূজা-উপাসনা সকলই গো ফাঁকি।
শুধু এই সুযোগে তোমারেই ডাকি॥"

রেঙ্গুনে কবি নবীনচন্দ্র সেনের সহিতও তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

২৯শে মার্চ মাদ্রাজে ফিরিয়া সেই দিন সন্ধ্যায় তিনি বোম্বে শহরে ঠাকুরের উৎসব করিতে চলিলেন। সেখানে মাত্র প্রতি বুধবারে ঠাকুরের পূজাদি হইত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ স্বহস্তে নিত্যপূজার প্রবর্তন করিলেন, উৎসবসমাপনান্তে তিনি পুনঃ মাদ্রাজে ফিরিলেন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকা হইতে প্রথম বারে স্বদেশে আসিলে স্বামী পরমানন্দকে সঙ্গে লইয়া শশী মহারাজ কলম্বো যাইয়া তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং তাঁহার সহিত কাণ্ডী, অনুরাধাপুরম্ ও জাফনা ভ্রমণান্তে ভারতে আসিলেন। অতঃপর দক্ষিণদেশের কয়েকটি বিশেষ স্থান দেখিয়া জুলাই মাসে মাদ্রাজে পৌঁছিলেন। আগস্ট মাসে স্বামী অভেদানন্দকে লইয়া তিনি মহীশূরে গেলেন এবং উভয়ে অনেকগুলি বক্তৃতা প্রদান করিলেন। সেই বারেই বাঙ্গালোরে বর্তমান আশ্রমগৃহের ভিত্তিস্থাপন হইল। অতঃপর অভেদানন্দ পুরীধামে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত মিলনার্থে চলিয়া গেলেন। দুই দিন পরে শশী মহারাজও সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং দীর্ঘকাল পরে এই অভিবাঞ্ছিত গুরুভ্রাতৃমিলনের আনন্দ কয়েক দিন উপভোগান্তে মাদ্রাজে ফিরিয়া আসিলেন। ঐ বৎসর প্রেমানন্দজী তীর্থদর্শনমানসে মাদ্রাজে আসিলে রামকৃষ্ণানন্দজী তাঁহার যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং তাঁহার সঙ্গে কাঞ্চী, পক্ষিতীর্থ ও রামেশ্বরে গেলেন।

ইহার পর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের প্রধান কার্য হইল মাদ্রাজ ও বাঙ্গালোরে দুইটি স্থায়ী মঠ গড়িয়া তোলা। বাঙ্গালোরে ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে মার্কিনদেশীয়া মহিলা ভগিনী দেবমাতা তাঁহার সান্নিধ্যলাভের জন্য মাদ্রাজে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অর্থ-সংগ্রহার্থে তাঁহাকে লইয়া বাঙ্গালোরে উপস্থিত হইলেন। মাসাধিক কাল অবিরাম পরিশ্রমের ফলে বাটীর কার্য আরম্ভ করার মত যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত

হইলে মহীশূর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের সহযোগিতায় আশ্রমনির্মাণ আরম্ভ হইল। এই কঠোর পরিশ্রমের সময়ও তাঁহার চিরাচরিত জীবনধারা অব্যাহতভাবেই প্রবাহিত হইত। নগরে সব সময়ে তাঁহারা সফলকাম হইতেন না; অনেক ক্ষেত্রেই কুবাক্য শুনিতে হইত। ইহা সত্ত্বেও ধৈর্যসহকারে কার্যসমাপনান্তে আশ্রমে ফিরিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের ভোগের জন্য তরকারি কুটিতে বসিতেন অথবা কোন কোন দিন সুগন্ধি পুষ্প চয়নান্তে দেবমাতার দ্বারা মালা গাঁথাইয়া সাদরে ঠাকুরকে পরাইয়া দিতেন। এই-রূপে দিনের কর্ম প্রভুর চরণে অর্পণপূর্বক তিনি আপন মনকে মান-অভিমান ও সাফল্য-বৈফল্য হইতে মুক্ত রাখিতেন।

মাদ্রাজ মঠের জন্যও তাঁহার চেষ্টার বিরাম ছিল না। স্থায়ী বাড়ির জন্য কিছু অর্থও সঞ্চিত হইয়াছিল। এদিকে বিলগিরির দেহত্যাগের পরে সঙ্কটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। বাড়িটি নিলামে উঠিল। উহা ক্রয় করার মত অর্থ মঠে নাই; অতএব বন্ধুরা চেষ্টা করিলেন যাহাতে অন্ততঃ কোনও ভক্তের হাতে উহা যায়, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মূল্য ক্রমেই বর্ধিত হইয়া ভক্তটির ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যাইতে লাগিল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তখন নিকটেই একখানি বেঞ্চিতে বসিয়াছিলেন এবং জনৈক ভক্ত মাঝে মাঝে তাঁহাকে নিলামের অবস্থা বুঝাইয়া দিতেছিলেন। অবস্থার দ্রুত অবনতি হইতেছে দেখিয়া ভক্তটি স্বভাবতঃই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যেমন সাক্ষিস্বরূপে বসিয়াছিলেন, তেমনি রহিলেন এবং অনুদ্বেগে বলিলেন, "তুমি ভেবো না; বাড়ি কে কিনবে বা কে বেচবে তাতে কিছু যায় আসে না। আমার অভাব অল্প। যে-কোন জায়গায় মাথা গুঁজে আমি ঠাকুরের নাম ও গুণগান করে দিন কাটাতে পারি।" বাড়ি হস্তচ্যুত হইয়া গেল। নিরুপায় শশী মহারাজ ঠাকুরকে লইয়া প্রাসাদেরই ক্ষুদ্র বহির্বাটীতে উঠিয়া গেলেন।

সৌভাগ্যক্রমে কিছু দিনের মধ্যেই জনৈক ভক্ত ব্রডিজ্‌ রোডের উপর একখণ্ড ভূমি দান করিলেন এবং সংগৃহীত অর্থের দ্বারা বাটীনির্মাণ আরম্ভ হইল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নিজস্ব বাড়িতে ঠাকুরকে লইয়া গেলেন। ঠাকুরের একটু স্থায়ী স্থান হওয়ায় সেদিন তাঁহার আনন্দ আর ধরে না। তিনি সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, উহা ঠাকুরেরই বাটী, উহাকে সর্বথা ও সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে এবং কোনও প্রকারে দেয়ালে পেরেক প্রভৃতি পুঁতিয়া উহার সৌন্দর্য নষ্ট করা চলিবে না। মঠপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নিকটস্থ ৺কপালীশ্বর শিবের মন্দিরে বিশেষ পূজা দেওয়া হইল, মঠে ভক্তদের মধ্যে পরিতোষপূর্বক প্রসাদ-বিতরণ হইল এবং অপরাহ্ণে সভায় স্যার পি এস শিবস্বামী আয়ার প্রভৃতি বক্তৃতা করিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জীবনের উহা এক অতি গৌরবময় দিন, আর ঐ দিবসই দাক্ষিণাত্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কার্য সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সাফল্যের জন্য প্রায় সবটুকু প্রশংসাই তাঁহার প্রাপ্য। ভাবিয়া অবাক হইতে হয় যে, বরাহনগর ও আলমবাজারের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধজীবন শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ পূজারীর হৃদয়ে কত শক্তিই লুক্কায়িত ছিল! অন্তর্দ্রষ্টা বিবেকানন্দ সত্যই বলিয়াছিলেন, "শশী খুব executive (কাজের লোক)।"

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ আসিয়া দেখিল তাঁহার প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু ইহাতে তিনি মোটেই গর্বানুভব করিলেন না। তিনি জানিতেন, তিনি ঠাকুরের শ্রীহস্তের যন্ত্রমাত্র এবং সঙ্ঘরূপী ঠাকুরের সেবায় তাঁহার প্রাণ সমর্পিত। এই ভাবটি সকলের মনে দৃঢ়াঙ্কিত করিবার জন্য তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে দক্ষিণদেশে লইয়া আসেন এবং তাঁহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও অনায়াস ভ্রমণের জন্য অকাতরে শ্রম ও অর্থব্যয় করেন।

এদিকে বাঙ্গালোরের আশ্রমবাটীর কার্য সমাপ্ত হওয়ায় মহারাজ সেখানে যাইয়া ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী উহার দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার পৌরোহিত্যে একটি বৃহতী সভা হয় এবং উহাতে রাজ্যের দেওয়ান, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও ভগিনী দেবমাতা বক্তৃতা করেন। পরবৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীশ্রীমা দাক্ষিণাত্যের তীর্থভ্রমণে নির্গত হইলে রামকৃষ্ণানন্দ সর্বপ্রযত্নে তাঁহার দর্শনাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। মাদ্রাজ ও মাদুরা দর্শনান্তে শ্রীশ্রীমা রামেশ্বরে যান এবং শশী মহারাজের আগ্রহে ১০৮টি স্বর্ণ বিল্বপত্রের দ্বারা মহাদেবের পূজা করেন। পরে তিনি বাঙ্গালোরে যাইয়া নূতন মঠবাটীতে বাস করেন। ঐ সময় রামকৃষ্ণানন্দও সঙ্গে ছিলেন। তিনি প্রত্যহ সদ্যপ্রস্ফুটিত সুগন্ধি পুষ্প মাতৃচরণে অর্পণান্তে নতজানু হইয়া প্রণাম করিতেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের চরণস্পর্শে দক্ষিণদেশ পবিত্র হইবে এবং তাঁহাদের দর্শন ও উপদেশে প্রারব্ধ কার্যের ভিত্তি দৃঢ়তর হইবে। এই উভয় সাধ তাঁহার পূর্ণ হইল। অতঃপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "এই আমার শেষ।" সে কথার অর্থ কত গভীর তাহা তখন কেহ অবধারণ করে নাই। কিন্তু বিধাতা অচিরেই তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী কলিকাতা ফিরিবার স্বল্পকাল পরেই শশী মহারাজের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। ইতঃপূর্বেই চতুর্দশ বৎসর আপ্রাণ পরিশ্রমের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছিল; এখন বহুমূত্র, কাশী ও জ্বর তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি বায়ুপরিবর্তনের জন্য বাঙ্গালোর আশ্রমে গেলেন; কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতি হইল না। প্রত্যুত ডাক্তার অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগ হইয়াছে। অগত্যা গুরুভ্রাতৃগণ ও বন্ধুগণের পরামর্শে তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হইল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন

পুরীধামে ছিলেন। তিনি স্টেশনে যাইয়া ট্রেনে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও বলিলেন, "শশী, এসব কি? সব ঝেড়ে ফেলে দাও।" রামকৃষ্ণানন্দ উত্তর দিলেন, "রাজা, তুমি আশীর্বাদ করলেই হবে।" কে জানে কোন্ ভাষায় কি বলা হইল? মহারাজ ঐ কথার পুনরাবৃত্তি করিলে শশী মহারাজও তাহাই করিলেন। তারপর নানা প্রকারে সমবেদনাপ্রদর্শনান্তে মহারাজ বলিলেন, "ডাক্তার কবিরাজ যেমনটি বলবে ঠিক তেমনটি করবে।" শশী মহারাজ এই আদেশ যেমন অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন তেমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রথম আদেশ অনুযায়ী সংসারের সমস্ত মায়িক সম্বন্ধও অচিরেই 'ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন।'

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন রোগী কলিকাতায় উদ্বোধন মঠে পৌঁছিলে অবিলম্বে বিজ্ঞ চিকিৎসক আনাইয়া তাঁহাকে দেখানো হইল। চিকিৎসক অভিমত দিলেন—শরীর তিন মাসের বেশী থাকিবে না। তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেনও আসিয়াছিলেন। সেন মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি স্বপ্নে শ্মশান, তুলসীকানন প্রভৃতি দেখেন কি?" স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ উত্তর দিলেন, "ও সব দেখি না; তবে ঠাকুর, মা, স্বামীজী, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি দেখি।" সবিস্ময়ে ভাবি, কি উচ্চসুরেই না তাঁহার অবচেতনাও বাঁধা ছিল!

রোগের শেষ কয়দিন তিনি নিদারুণ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার গাত্রে শুষ্ক বিথাউজ হওয়াতে অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি বিছানায় গড়াগড়ি দিতেন ও ছটফট করিতেন; কিন্তু তখনও তাঁহার মুখে নির্গত হইত "জয় প্রভু, জয় গুরুদেব।" সেবক যথারীতি কাজ না করিলে তিনি বিরক্ত হইতেন সত্য, কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রেও তাঁহার অসীম স্নেহের অভাব ছিল না। জনৈক সেবকের গামছা ও মাদুর নাই দেখিয়া উহা আনাইয়া দিয়া তিনি তাহাকে সস্নেহে বলিলেন, "এই মাদুরে তুমি একটু শোও।" রাত্রিজাগরণে

নিদ্রালু সেবক অচিরেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। এদিকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দও নিদ্রিত হইলেন; নিদ্রান্তে সেবককে বলিলেন, "তোমাকে ঘুমুতে দিয়ে আমারও একটু ঘুম হল।" "ভক্তের জাতি নাই"—ঠাকুরের এই কথা স্মরণ করিয়া নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণবংশজাত শশী মহারাজ এই সময়ে অব্রাহ্মণ সেবকের হস্তেও বিনা দ্বিধায় আহার করিতেন; বলিতেন, "তুমি ঠাকুরের ভক্ত ও ব্রহ্মচারী; তোমার হাতে খেতে আমার কোন আপত্তি নেই।" রথযাত্রার দিনে সেবকের হাতে কিছু পয়সা দিয়া বলিলেন, "রথ দেখে এসো এবং দু-চার পয়সার কিছু কিনে এনো।" সেবক তাঁহাকে ফেলিয়া যাইতে আপত্তি করিলে কহিলেন, "কাশীপুরবাগানে ঠাকুরও আমাকে রথযাত্রার দিন ঐরূপ করতে বলেছিলেন।...রথযাত্রা দেখে তাঁর জন্য দুপয়সা দামের একটি ছুরি (লেবু কাটার জন্য) এনেছিলাম। তাতে প্রসন্ন হয়ে তিনি বলেছিলেন, "এইগুলি মেনে চলতে হয়। গরীব লোকে দুপয়সা পাবার জন্য দোকান দেয়। এই সব মেলাতে দু-চার পয়সার কিছু কেনা উচিত।"

বস্তুতঃ শেষ কয়দিনে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জীবনের সর্বপ্রকার মহত্ত্ব যেন অনাবৃতসৌন্দর্যে সকলের সম্মুখে উন্মোচিত হইয়াছিল। স্বামী প্রেমানন্দ দুই-একদিন অন্তর বেলুড় হইতে তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। একদিন তিনি আসিয়া শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলে শশী মহারাজ তাঁহার হাত-পা টিপিয়া দিয়া সেবা করিলেন; কিন্তু তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া তাঁহার জন্য সেবককে শুষ্ক মেওয়া দিতে বলিলেন। বাবুরাম মহারাজ নিঃশেষে উহা খাইয়া চলিয়া গেলে শশী মহারাজ পাত্রটি হাতে লইয়া দেখিলেন, কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা—মনের ভাব, প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। কিছুই নাই দেখিয়া সেবককে এই বলিয়া তিরস্কার করিলেন যে, তিনি প্রেমানন্দকে যথেষ্ট ফল না দিয়া অন্যায় করিয়াছেন। অতঃপর শূন্য পাত্রটি তিনি হাতে মুছিয়া সর্বাঙ্গে মাখিলেন।

চিকিৎসায় কোনও ফল হইতেছে না দেখিয়া স্বামী সারদানন্দ একবার তাঁহাকে জানাইলেন যে, অপর একজন ডাক্তার একটু চেষ্টা করিয়া দেখিতে চাহেন। উত্তরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলিয়া পাঠাইলেন, "এ দেহ-মন-প্রাণ ঠাকুরের চরণে অর্পণ করেছি! তাঁর প্রতিনিধি রাখাল মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ আছেন; তাঁদের নির্দেশ মত যেন চিকিৎসা হয়। এই বিষয়ে আমার নিজের কোন মতামত নেই।"

শরীরত্যাগের দুই-তিন দিন পূর্বে সকালে আট-নয়টার সময় তিনি অকস্মাৎ ব্যস্তভাবে সেবককে বলিলেন, "ঠাকুর, মা, স্বামীজী এসেছেন; আসন পেতে দে;" সেবক কিছুই না বুঝিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। শশী মহারাজ আবার বলিলেন, "দেখতে পাচ্ছিস না? ঠাকুর এসেছেন—মাদুর পেতে দে, আর তিনটে তাকিয়া দে।" সেবক আদেশপালন করিলে শশী মহারাজ কোন অদৃশ্য দৃশ্যের দিকে নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া তিনবার প্রণাম করিলেন এবং পরে বলিলেন, "তাঁরা চলে গেছেন।" শ্রীমা তখন জয়রাম-বাটীতে। শশী মহারাজ তাঁহাকে দর্শন করিতে চাহিয়াছিলেন; তাই স্বামী ধীরানন্দ তাঁহাকে আনিতে যান; কিন্তু মা আসিতে পারেন নাই। এই অলৌকিক সূক্ষ্ম দর্শনের কথা তিনি পরদিন পুলিন বাবুকে বলেন এবং ঐ বিষয়ে একটি গানরচনার অনুরোধ জানাইয়া গিরিশ বাবুকে গানের এই প্রথম পঙ্‌ক্তিটি বলিতে বলেন, "পোহাল দুঃখরজনী।" মহাকবি গান রচনা করিয়া দিলেন এবং সুগায়ক পুলিন বাবুর মুখে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মুদ্রিতনয়নে আবিষ্টমনে বেহাগরাগিণীতে অনেকক্ষণ ধরিয়া এই সঙ্গীতটি শুনিলেন—

"পোহাল দুঃখরজনী:
গেছে 'আমি'-'আমি' ঘোর কুস্বপন;
নাহি আর ভ্রম জীবন-মরণ;
হের জ্ঞান-অরুণ-বদন বিকাশে, হাসে জননী॥

বরাভয়করা দিতেছে অভয় ;
তোল উচ্চ তান, গাও জয় জয় ;
বাজাও দুন্দুভি, শমনবিজয় ; মার নামে পূর্ণ অবনী ॥
কহিছে জননী, 'কেঁদো না, রামকৃষ্ণপদ দেখ না।
নাহিক ভাবনা, রবে না যাতনা ;
(হের) মম পাশে করুণার দুটি আঁখি ভাসে।
ভুবন-তারণ গুণমণি।' "

২১শে আগস্ট (৪ঠা ভাদ্র) মহাসমাধির কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তিনি ঠাকুরের চরণামৃত পান করিলেন। একটার সময় তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম এবং সর্বশরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—মাথার চুলগুলি পর্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল। ১টা ১০ মিনিটে তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহার মহাসমাধির সংবাদ পাইয়া বিষাদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "একটা দিক্‌পাল চলে গেল ; দক্ষিণ দিক্‌টা যেন অন্ধকার হয়ে গেল।" আর মাদ্রাজের পাচাইয়াপ্পা কলেজে শোকসভায় নগরবাসীরা সমবেত হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন—"দক্ষিণ ভারতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ জীবনপাত করিয়াছেন। মাদ্রাজের হিন্দুসমাজ শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে স্বীকার করিতেছে যে, তাঁহার মহাপ্রয়াণে সমূহ ক্ষতি হইয়াছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ দাস্যভক্তির এক অপূর্ব অত্যুজ্জ্বল আদর্শ এ যুগের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। কি ঠাকুরঘরে, কি বক্তৃতামঞ্চে, কি লোক-ব্যবহারে—সর্বত্র অনন্যসাধারণ গুরুভক্তিই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ও কর্মপ্রচেষ্টার প্রধান উৎস। ঠাকুরঘরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতি স্পষ্ট অনুভব করিতেন এবং পুষ্পচয়ন, পূজা, আরাত্রিক, প্রণামাদি প্রত্যেক কার্যে এত বিভোর হইয়া পড়িতেন যে, উপস্থিত

ভক্তগণের মধ্যেও সে গভীর ভাব প্রসারিত হইত। একদা এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দেখিলেন, পূজান্তে তিনি ঠাকুরকে নিবিষ্টমনে পাখা করিতেছেন এবং গম্ভীরস্বরে উচ্চারণ করিতেছেন—'সৎ গুরু', 'সনাতন গুরু', 'পরম গুরু।' দীর্ঘকাল যাবৎ যদিও পূজারীর দৃষ্টি আগন্তুকের প্রতি আকৃষ্ট হইল না, তথাপি ভদ্রলোকের অন্তর অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল; অতএব ভাবভঙ্গ না করিয়াই তিনি উদ্দেশ্যে প্রণামান্তে বিদায় লইলেন। আরাত্রিকের সময় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যখন 'জয় গুরু' উচ্চারণপূর্বক দীপারতি করিতেন, তখন দর্শকের হৃদয়েও ভক্তির হিল্লোল উঠিত, আর সে আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া তিনি অসীম তৃপ্তিলাভ করিতেন। মাদ্রাজের অসহ্য গরমে স্থূলকায় শশী মহারাজের কষ্ট হইত; কিন্তু ইহার প্রতিকার ছিল অপরাহ্ণে ও রাত্রে পাখা লইয়া ঠাকুরকে বাতাস করা। ঠাকুরের প্রসাদ ভিন্ন তিনি কিছু গ্রহণ করিতেন না। বহুমূত্র-রোগের সময় ডাক্তাররা রুটি খাইতে উপদেশ দিলেন; কিন্তু ঠাকুরকে রুটি নিবেদন করা হয় না বলিয়া তাঁহার উহা খাওয়া হইল না। মঠের নূতন বাড়ি হইবার তুই বৎসরের মধ্যেই ছাদ ফাটিয়া বর্ষায় জল পড়িতে লাগিল। এক রাত্রে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে ঠাকুরের শয়নঘরে যাইয়া রামকৃষ্ণানন্দ দেখিলেন, তাহার উপর জল পড়িতেছে। সেই সময়ে স্থানান্তরিত করিলে পাছে ঠাকুরের নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে তিনি সারারাত্রি উপরে ছাতা ধরিয়া বসিয়া রহিলেন এবং ভোরে বৃষ্টির বিরাম হইলে ঠাকুরকে অন্যত্র লইয়া গেলেন। ইহাই কি 'মৃন্ময়ে চিন্ময়দর্শন?' একরাত্রে মশার কামড়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া রামকৃষ্ণানন্দ দেখিলেন, মশারির মধ্যে মশা ঢুকিয়াছে। তখনই মনে হইল, ঠাকুরেরও তো ঐরূপে নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে; অতএব সেখানেই মশা তাড়াইতে চলিলেন। প্রসাদবিতরণে তাঁহার অসীম আগ্রহ ছিল; সমাগত ব্যক্তিকে উহার কিছু না কিছু

তিনি অবশ্যই দিতেন—এমন কি, মুটে-মজুর পর্যন্ত ইহাতে বঞ্চিত হইত না।

গুরুভ্রাতাদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা পূজার আকারেই আত্মপ্রকাশ করিত। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা যাইবার পথে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের জাহাজ মাদ্রাজে নোঙ্গর করিবে জানিয়া শশী মহারাজ তাঁহাদের জন্য পনর সের ময়দা কিনিয়া স্বহস্তে নিমকি, গজা প্রভৃতি আহার্য প্রস্তুত করিলেন। তখন পাচক বা ভৃত্য ছিল না, রাঁধিবার সামর্থ্যও ছিল না। অতঃপর ঐ সমস্ত খাদ্যদ্রব্য লইয়া কয়েকজন ভক্তের সহিত তিনি নৌকাযোগে জাহাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন কলিকাতায় প্লেগের আশঙ্কা ছিল বলিয়া জাহাজের কাহাকেও নামিতে বা জাহাজে কাহাকেও উঠিতে দেওয়া হইল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া শশী মহারাজ বলিলেন, "মহাত্মাদ্বয়ের পদস্পর্শ হইল না; অন্ততঃ তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাই—মাঝিকে জাহাজ প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতে বল।" আর একবার এর্ণাকুলমে জনৈক ভক্তের বাটীতে উপস্থিত হইয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ জানিতে চাহিলেন, স্বামীজী যখন ঐ বাটীতে আসিয়াছিলেন, তখন কোথায় শয়নোপবেশনাদি করিয়াছিলেন। যখন জানিলেন যে, তাঁহারা যেখানে দাঁড়াইয়া আছেন উহাই সেই স্থান, তখন তিনি ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া ও মস্তকে ধূলি ধারণ করিয়া বলিলেন, "ইহা পবিত্র স্থান।" স্বামীজীর দেহত্যাগের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিবার পূর্বেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সেই রাত্রে ধ্যানযোগে শুনিলেন, স্বামীজী সুপরিচিত স্বরে বলিতেছেন, "শশী, শশী, আমি শরীরটা থুথুর মত ফেলে দিয়েছি।" স্বামীজীর অন্তর্ধানের কয়েক বৎসর পরে (১৯১১ খ্রীঃ, ২৯শে জানুয়ারী) তিনি তাঁহার স্মরণে 'অনিত্যদ্রব্যেষু বিবিচ্য নিত্যং' ইত্যাদি যে সংস্কৃত স্তব রচনা করিয়াছিলেন, উহাতে তিনি তাঁহাকে নরহিতার্থে অবতীর্ণ

নরাবতাররূপে অভিনন্দন জানাইয়া সর্বশেষে অমর প্রণামমন্ত্র সংযোজিত করিয়াছিলেন—

"নমঃ শ্রীযতিরাজায় বিবেকানন্দ-সূরয়ে।
সচ্চিৎসুখস্বরূপায় স্বামিনে ক্লেশহারিণে॥"

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দের মাদ্রাজ আগমন-উপলক্ষে স্বীয় কক্ষটি তাঁহার উদ্দেশ্যে সুসজ্জিত করিয়া শশী মহারাজ বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর ও তাঁর মানসপুত্র এ ঘরে থাকবেন; আমি প্রবেশপথে হলঘরে থেকে তাঁদের সেবা করব—এর চেয়ে আর অধিক কি চাই?" মহারাজের আগমনান্তে জনৈক ভক্ত যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "নূতন স্বামীজীর বক্তৃতাদি হবে কি?" তখন সহাস্যবদনে শশী মহারাজ জানাইলেন, "বক্তৃতায় আছে কি? এঁর মত মানবের দর্শন-স্পর্শনেই অপরের মধ্যে ধর্মভাব সঞ্চারিত হয়।" ব্রহ্মানন্দজীর মাদ্রাজ মঠে অবস্থানকালে রামকৃষ্ণানন্দ প্রত্যহ আরাত্রিকের পর তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতেন এবং সাধু-ব্রহ্মচারী ও অপর সকলের মনে এই বিশ্বাস অঙ্কিত করিয়া দিতেন যে, মহারাজের সেবার দ্বারা ঠাকুরেরই সেবা করা হয়। জনৈক ভক্ত একদা ঠাকুরের জন্য কিছু ফল ও ফুল আনিলে রামকৃষ্ণানন্দ উহা মহারাজকে নিবেদন করিলেন এবং ভক্তটিকে পরে বুঝাইয়া দিলেন যে, মহারাজের মধ্য দিয়া ঠাকুরই উহা গ্রহণ করিয়াছেন। মহারাজও তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন ও তাঁহার উপর অগাধ বিশ্বাস রাখিতেন। একবার তিনি নবাগত একজন সাধুকে বলিয়াছিলেন, "শশী মহারাজের সঙ্গে তিন বৎসর কাটাও, তা হ'লে সাধুজীবনে তোমার কিছু অপ্রাপ্য থাকবে না।"

শশী মহারাজ বাহিরের সৌন্দর্যে দৃষ্টিপাত না করিয়া অন্তরের সৌন্দর্যেই মুগ্ধ হইতেন। সান্ধ্য সূর্যের শোভা কেহ তাঁহাকে দেখাইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "এই সময় ঈশ্বরের চিন্তা করা উচিত, তাঁর সৃষ্টির নহে।"

হিমালয় সম্বন্ধে একদিন বলিয়াছিলেন, "হিমালয় কি?—পাহাড়ের উপর পাহাড় স্তূপীকৃত! ··পৃথিবীতে দর্শনযোগ্য এমন কি আছে? ঈশ্বরই এই বিশ্বে একমাত্র দর্শনীয় বা চিন্তনীয়।" আর ছিল তাঁহার বিনয় ও ঈশ্বর-নির্ভর। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন ব্রহ্মানন্দজীকে মাদ্রাজে আনিবার জন্য পুরীধামে যাইতেছিলেন, তখন গাড়িতে তাঁহার জন্য আসন সংরক্ষিত হয় নাই। অনেক কষ্টে দ্বিতীয় এক প্রকোষ্ঠে উপরের একটি আসন পাওয়া গেল। ঐ কামরার নীচের আসনদ্বয়ে দুইজন ইংরেজ ছিলেন; তাঁহারা তাঁহার স্থূলতা ইত্যাদির উল্লেখপূর্বক নিজেদের মধ্যে বিরুদ্ধ ও সরহস্য সমালোচনা করিতে থাকিলেন, যেন এইরূপ স্থূলকায় একজন উপরের আসন গ্রহণ করিলে উহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া তাঁহাদের বিপদ ঘটিতে পারে। স্টেশনে উপস্থিত দেবমাতা ইহাতে প্রতিবাদ করিলে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলিলেন, "তুমি ভেবো না, জগদম্বাই আমায় দেখবেন।" এদিকে যাত্রার সময় অতীত হইলেও ট্রেন ছাড়িল না; শোনা গেল, ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হইয়াছে, যাত্রীদিগকে গাড়ি বদলাইতে হইবে। নূতন গাড়িতে রেলকর্মচারী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জন্য একটি প্রথম শ্রেণীর নীচের আসন স্থির করিয়া দিলে তিনি তথায় উপস্থিত দেবমাতাকে সহাস্যে বলিলেন, "আমি তোমায় বলেছিলাম না, মা-ই আমার সব সুখ-সুবিধা করে দেবেন?"

তিনি সহজে কাহারও দোষগ্রহণ করিতেন না। মাদ্রাজে জনৈক ধনবান ব্যক্তি কিছু অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় উহা আনিবার জন্য তাঁহাকে বহুবার ধনীর গৃহে যাতায়াত করিয়াও ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে হয়। সঙ্গী জনৈক ভক্ত ইহাতে ধনীর প্রতি রুষ্ট হইলে তিনি অম্লানবদনে কহিলেন, "আমরা আমাদের কর্তব্য করছি মাত্র।" শেষ যেবারে ভদ্রলোক স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন, "আপনারা আর আসবেন না, যদি পারি কিছু

পাঠিয়ে দেব," সেবারে সঙ্গীর ক্রোধ চরমে উঠায় তাঁহার মুখ রক্তিম হইল। পরন্তু পথে আসিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহার স্কন্ধে হাত দিয়া বলিলেন, "ভেতরে যদি আমরা ক্রোধ পোষণ করি, ওর অনিষ্ট হবে; অর্থ না দেওয়াতে আমাদের মনে যেন তার প্রতি বিরুদ্ধ ভাব না জাগে।" একবার এক ভদ্রলোক তাঁহাকে ও একজন ব্রহ্মচারীকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে উভয়ে উপস্থিত হইয়া দেখেন, গৃহস্বামী অনুপস্থিত। সংবাদ পাইয়া তিনি আসিয়া সলজ্জভাবে যখন বলিলেন যে, নিমন্ত্রণের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং কোন আয়োজন হয় নাই, অদোষদর্শী রামকৃষ্ণানন্দ তখন তাঁহার দ্বারা বাজার হইতে কিছু খাদ্য আনাইয়া উহাই গ্রহণপূর্বক অম্লানবদনে মঠে ফিরিলেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বহির্গমনের সুযোগে দেবমাতা একবার তাঁহার গৃহ পরিষ্কার করিয়া ও বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখিলেন। মঠে ফিরিয়া তিনি যখন অনুসন্ধানানন্তর ইহা দেবমাতার কার্য বলিয়া জানিলেন, তখন সন্তুষ্ট না হইয়া বরং এই বলিয়া দেবমাতাকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, সন্ন্যাসীদের ব্যবহার্য শয্যা বা বস্ত্রাদি নারীর স্পর্শ করা অনুচিত—স্ত্রীলোক ভক্ত হইলেও সন্ন্যাসী তাহার নিকট কোন ব্যক্তিগত সেবা লইবে না। অর্থসম্বন্ধেও তিনি অনুরূপ সাবধান ছিলেন—তিনি উহা স্পর্শ করিতেন না, তাঁহার প্রতিভূস্থানীয় অপরে অর্থগ্রহণ বা ব্যয়াদি করিত।

মঠে যোগদানজন্য যেসব যুবক আসিত তাহাদের প্রতি একদিকে তিনি যেমন ছিলেন সদয়, অপরদিকে তেমনি তাহাদের চরিত্রে সন্ন্যাসজীবনের আদর্শ দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিবার জন্য তিনি ছিলেন কঠোর। জনৈক সন্ন্যাসীকে তিনি একদিন আন্দামানের একখানি পত্রে 'পোর্ট ব্লেয়ার, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ' এই ঠিকানা লিখিতে বলিলে সন্ন্যাসী শুধু 'পোর্ট ব্লেয়ার'

লিখিলেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া লেখকের সমুচিত শাস্তিবিধান করিলেন। কিন্তু পরদিনই মঠে পাকা আম আসিলে যখন সর্বোত্তম আমটি পরিবেশক তাঁহার পাতে দিল, তখন তিনি উহার স্বাদ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "বা, বেশ মিষ্টি" এবং সঙ্গে সঙ্গে উহা উক্ত সন্ন্যাসীর পাতে তুলিয়া দিলেন। পরে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, গুরু বা গুরুতুল্য ব্যক্তির নির্দেশ পালন না করিলে আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি হয় না—এই জন্যই পূর্বদিন তাঁহার কল্যাণার্থে তিনি ক্রোধ করিয়াছিলেন। একটি যুবক ভবঘুরে বৈরাগীর দলে যোগ দিবার পর দুর্ব্যবহারে জর্জরিত হইয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের আশ্রয়ভিক্ষা করে। তিনি আশ্রয় দিলেন বটে; কিন্তু সে দিন কয়েক পরেই পূর্বাভ্যাসবশতঃ অনুমতি ব্যতিরেকেই অন্যত্র চলিয়া গেল। পুনর্বার পূর্বেরই ন্যায় আশ্রমে আসিয়া ক্ষমা ও আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাকে আবার সুযোগ দিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এরূপ স্নেহের স্পর্শে যুবকটির মতিগতি পরিবর্তিত হইল এবং সে সুসংযত সন্ন্যাসজীবন অবলম্বন করিল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নবাগতদের অন্তর দেখিতেন, শুধু বাহিরের আচরণে ভ্রান্ত হইতেন না। নবাগত এক যুবককে মঠের সকলেই ভালবাসিতেন। তিনি তাহাকে স্নেহ করিলেও তাহার সেবা গ্রহণ করিতেন না। ইহাতে সকলেই অবাক্ হইতেন। অবশেষে একদিন সে মঠ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে তিনি মনোভাব খুলিয়া বলিলেন, "ছেলেটা তমোগুণী। সে উপোস করে লুকিয়ে খায় আর ধ্যানের নাম করে মাদুর পেতে ঘুমায়। মন, মুখ এক না হলে ধর্মপথে উন্নতি হয় না।" এক নবীন সাধু পূর্বাশ্রমে মাতৃদর্শনে যাইয়া বাড়ি হইতে কিছু নূতন বস্ত্র ও একখানি সিল্কের চাদর লইয়া আসেন। শশী মহারাজ তাঁহাকে ঐ সকল ফেলিয়া দিতে বলেন; কারণ স্বগৃহের প্রাচীন স্মৃতির সঙ্গে সন্ন্যাসীর মনকে বিজড়িত রাখা অন্যায়।

তাঁহার নিজজীবনও সর্ববিষয়ে বড়ই সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। সকালে তিনি গীতা ও বিষ্ণু-সহস্রনাম নিয়মিত পাঠ করিতেন। স্বামী প্রেমানন্দের সহিত তীর্থভ্রমণকালে মঠের বাহিরে গিয়া প্রথম রাত্রিতেই তিনি দেখিলেন যে, গ্রন্থ দুইখানি আনা হয় নাই। অমনি একজনের সাহায্যে তখনই বই দুইখানি সংগ্রহ করাইলেন। তিনি সর্বদা ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতে ভালবাসিতেন এবং অপরেও উহাতেই মগ্ন থাকুক, ইহাই ছিল তাঁহার একান্ত চেষ্টা। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন দেবমাতাকে লইয়া তিনি বাঙ্গালোরে যান তখন দেবমাতার অসুখ হইলে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পুরাণাদি কথা শুনাইতেন। তখন তাঁহারা মহীশূররাজের অতিথিরূপে বাস করিতেছিলেন। একদিন জনৈক রাজকর্মচারী আসিয়া ভগিনী দেবমাতার সহিত নানা বিষয়ে গল্প জুড়িয়া দিলেন। এদিকে শশী মহারাজ কি এক অস্বস্তিতে অবিরাম উসখুস করিতে থাকিলে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হইয়া দেবমাতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি অসুস্থ বোধ কচ্ছেন?" তিনি অকপটে উত্তর দিলেন, "আমি ভালই আছি; কিন্তু তোমাদের আলোচনা আমার আদৌ ভাল লাগছে না।" সৌভাগ্যক্রমে ভগবৎপ্রেমিক সন্ন্যাসীর এই স্বাভাবিক বিরক্তিতে আগন্তুক ভদ্রলোক ক্ষুণ্ণ না হইয়া প্রসঙ্গান্তর আরম্ভ করিলেন।

উপদেশগ্রহণ বা শাস্ত্রব্যাখ্যাদি-শ্রবণার্থে আগত ব্যক্তিদের আচরণের প্রতি তাঁহার প্রখর দৃষ্টি থাকিত এবং জিজ্ঞাসুসমুচিত ব্যবহারে ত্রুটি হইলে তৎক্ষণাৎ উহা সংশোধন করিয়া দিতেন। জনৈক আগন্তুক মঠে আসিয়া একদিন সংবাদপত্র খুলিয়া পাঠ করিতে থাকিলে তিনি বলিলেন, "রেখে দাও তোমার কাগজ-পড়া। এসব পড়ার যায়গা তো ঢের আছে। মঠে এসেছ, এখন ভগবানের চিন্তা কর।" ধর্মপিপাসুদের কোনপ্রকার দুর্বলতাকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। একদিন এক ব্যক্তি লটারীতে কিছু

অর্থলাভ করিয়া পঞ্চদশ মুদ্রা মঠের সাহায্যে দান করিতে চাহিলে উহা তিনি গ্রহণ করিলেন না; অসদুপায়ে লব্ধ অর্থ দেবসেবায় ব্যয় করা তাঁহার মতে গর্হিত ছিল।

পরধর্মের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধায় তাঁহার অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ ছিল। বাইবেল তিনি অতি মনোযোগসহকারে অধ্যয়নপূর্বক উহার সমস্ত ভাবরাশি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার বাইবেল-ব্যাখ্যাকালে প্রতিবাক্যে এত তেজ ও ভাব অনুস্যূত থাকিত যে, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরাও মুগ্ধ হইতেন। নিষ্ঠাবান হিন্দু সন্ন্যাসী বলিয়া সুপ্রথিত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অনেক ক্ষেত্রে গীর্জায় গিয়া বেদীর সম্মুখে খ্রীষ্টানী রীতিতে নতজানু হইয়া প্রার্থনাদির দ্বারা মাদ্রাজবাসীকে চমৎকৃত করিতেন। এক সন্ধ্যায় ঝড়বৃষ্টিতে আক্রান্ত কতিপয় মুসলমান ছাত্র মঠে আশ্রয় গ্রহণ করিলে তিনি তাহাদের সহিত মহম্মদের বাণী লইয়া এরূপ হৃদয়গ্রাহী আলোচনা আরম্ভ করিলেন যে, ছাত্রেরা উহাতে আকৃষ্ট হইয়া এক সপ্তাহ যাবৎ প্রতিসন্ধ্যায় ঐ বিষয়ে আরও আলোচনা শুনিতে তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ একাধারে উপদেষ্টা, বক্তা ও লেখক ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা, ইংরেজী ও সংস্কৃতে বহু বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন। উহার কিছু কিছু পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার প্রণীত 'রামানুজচরিত' তাঁহার প্রতিভার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং বঙ্গভাষায় উহা এক অমূল্য সম্পদ। বস্তুতঃ রামানুজ ও তাঁহার শ্রীসম্প্রদায় সম্বন্ধে ইহাই উক্ত ভাষায় একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ। ইংরেজীতে যে বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে 'Universe and Man' (বিশ্ব ও মানব), 'Sri Krishna the Pastoral and King-maker' (রাখাল ও নৃপতিস্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ), The

Soul of Man' (মানবাত্মা) ইত্যাদি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রথম গ্রন্থে আছে বেদান্তের কয়েকটি স্থূল তত্ত্বের আলোচনা, দ্বিতীয় গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ও দ্বারকালীলা এবং তৃতীয় পুস্তকে মানবের স্বরূপ আলোচনা।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ দীর্ঘজীবী ছিলেন না—ঊনপঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি ইহধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রতিভাবান ব্যক্তির জীবনের মূল্য শুধু দীর্ঘতার পরিমাপে স্থিরীকৃত হয় না। বিশেষতঃ অধ্যাত্মজগতে সময় অপেক্ষা ভগবদনুরক্তির গভীরতাই অধিক আদরণীয়। শশী মহারাজের জীবনে প্রতিভা ও অনুভূতি একত্র মিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছিল। রামকৃষ্ণসঙ্ঘে তাই এই অমর জীবন চিরপ্রেরণা প্রদান করিবে।

স্বামী অভেদানন্দ

স্বামী অভেদানন্দ

স্বামী অভেদানন্দের পূর্ব নাম ছিল কালীপ্রসাদ চন্দ্র। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত রসিকলাল চন্দ্র উত্তর কলিকাতার ২১ নং নিমু গোস্বামীর লেনে বাস করিতেন। ইংরেজীতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল এবং 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারী' নামক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়া তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার কৃতবিদ্য ছাত্রদের মধ্যে কৃষ্ণদাস পাল, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও বিশ্বনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের পিতা) প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। রসিকলালের প্রথমা পত্নী বিহারীলাল নামক একটি পুত্রসন্তান রাখিয়া লোকান্তরিত হন। এই পুত্র দুর্ভাগ্যক্রমে আলেকজাণ্ডার ডাফ্ ও স্বীয় সহপাঠী কালীচরণ ব্যানার্জী প্রভৃতির প্ররোচনায় খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণপূর্বক গৃহত্যাগ করিলে বিপত্নীক রসিকলাল নয়নতারা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। সুশীলা ও ধর্মপ্রাণা নয়নতারা মা কালীর নিকট একটি পুত্রসন্তানের জন্য আকুল প্রার্থনা জানাইয়া ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর মঙ্গলবার (১২৭৩ সালের ১৭ই আশ্বিন, কৃষ্ণা নবমী তিথিতে) কালীপ্রসাদকে লাভ করেন। সন্তানটি আঙ্গিনাতে প্রসূত হয়। নবজাত পুত্র সর্বাঙ্গে নাড়ী-বিজড়িত হইয়া যেন পদ্মাসনে মৃতপ্রায় বসিয়া ছিল। অবশেষে চক্ষে লঙ্কাচূর্ণ দিলে সে কাঁদিয়া উঠিল। মা কালীর প্রসাদে লব্ধ তাঁহার নাম হইল কালীপ্রসাদ।

মাত্র দেড় বৎসর বয়সে আমাশয়রোগের আক্রমণে কালীপ্রসাদের প্রাণসংশয় হইয়াছিল। ভগবৎকৃপায় কবিরাজী চিকিৎসায় তিনি আরোগ্য-লাভ করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার হাতেখড়ি হয় এবং যথাসময়ে

তিনি লাহাপাড়ার গোবিন্দ শীলের পাঠশালায় প্রবেশপূর্বক দুই বৎসর পাঠাভ্যাস করেন। অতঃপর আহিরীটোলায় যদু পণ্ডিতের বঙ্গবিদ্যালয়ে তিন বৎসর অধ্যয়ন করেন। বঙ্গবিদ্যালয়ের পরে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ভর্তি হন। মেধাবী, ধীর ও শান্তস্বভাব কালী-প্রসাদ প্রত্যেক বিদ্যালয়েই পরীক্ষায় অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতেন এবং কখনও কখনও ডবল প্রমোশনও পাইতেন।

পাঠাভ্যাসকালে কালীপ্রসাদ সংস্কৃতের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। বিদ্যালয়ের বিধিবদ্ধ সামান্য শিক্ষাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি হাতীবাগান টোলে হেরম্ব পণ্ডিতের নিকট মুগ্ধবোধ পাঠ করেন। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর প্রধান শিক্ষক তাঁহার সংস্কৃতানুরাগে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে একখানি 'ছন্দোমঞ্জরী' পড়িতে দেন। বলা বাহুল্য যে, বাল্যের এই ছন্দোজ্ঞানের ফলেই তিনি পরবর্তী কালে বহু সুললিত সংস্কৃত স্তোত্র রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের পাঠাভ্যাসকালে শঙ্করাচার্যের দার্শনিক প্রতিভার পরিচয় পাইয়া কালীপ্রসাদের মনে পণ্ডিত ও দার্শনিক হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগিল। দৈবক্রমে চৌদ্দ বৎসরের বালক কালীপ্রসাদ পিতার পুস্তকাবলীর মধ্যে একখানি গীতা পাইয়া উহা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া যোগশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং চূড়ামণি মহাশয়ের পরামর্শানুসারে পাতঞ্জল যোগসূত্র পড়িবার উদ্দেশ্যে কাশীবর বেদান্তবাগীশের নিকট উপস্থিত হইলেন। কর্মব্যস্ত বেদান্তবাগীশ তাঁহাকে স্নানের পূর্বে তৈলমর্দনকালে আসিয়া যোগসূত্রের মর্ম শুনিয়া যাইতে বলিলেন। কালীপ্রসাদ ইহাতেই সম্মত হইলেন এবং যোগসূত্রপাঠান্তে ঐ ভাবেই 'শিবসংহিতা'ও পাঠ করিলেন। যোগশাস্ত্রপাঠে তিনি জানিলেন যে, উপযুক্ত গুরুর নিকট যোগাভ্যাস করা আবশ্যক। তদনুসারে গুরুর সন্ধানে মন আকুল হইয়াছে

এমন সময় সহপাঠী যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্যের নিকট তিনি দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের সংবাদ পাইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবার আগ্রহে তিনি (সম্ভবতঃ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে) একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন। পথ অজ্ঞাত। অনেক দূর চলার পর যখন জানিলেন যে, দক্ষিণেশ্বর পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছেন, তখন আবার বিপরীত দিকে হাঁটিয়া দ্বিপ্রহরে কালী-বাড়ির উত্তরের প্রবেশদ্বার অতিক্রমপূর্বক বেলতলা ও পঞ্চবটীর পার্শ্ব দিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সংবাদ লইয়া জানিলেন যে, পরমহংস মহাশয় কলিকাতায় গিয়াছেন, রাত্রে ফিরিবেন। অগত্যা তিনি হতাশমনে ক্লান্তদেহে পরমহংসদেবের গৃহের উত্তরের বারান্দায় বসিয়া আছেন, এমন সময় আর একজন যুবক সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইনিই শশী বা পরবর্তী কালের স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। শশীর সঙ্গলাভ করিয়া কালীপ্রসাদের বিশেষ সুবিধা হইল। কালীবাড়ির কর্মচারীদের সহিত পরিচয় থাকায় শশী উভয়ের জন্য প্রসাদ সংগ্রহ করিলেন এবং পরমহংসদেবের কথাপ্রসঙ্গে সময়ও সুন্দর কাটিয়া গেল।

রাত্রি নয়টায় শ্রীরামকৃষ্ণ লাটুর সহিত ফিরিয়া নিজকক্ষে ক্ষুদ্র শয্যাটিতে উপবেশন করিলেন। অতঃপর কালীপ্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে আহূত হইয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে তিনি আত্মপরিচয় দিয়া জানাইলেন, "আমার যোগসাধনার ইচ্ছা আছে। আপনি আমায় শিখাবেন কি?" পরমহংসদেব এই প্রশ্নে স্বল্পক্ষণ মৌন থাকিয়া উত্তর দিলেন, "তোমার এই অল্প বয়সেই যোগশিক্ষার ইচ্ছা হয়েছে—এ অতি ভাল লক্ষণ। তুমি পূর্বজন্মে যোগী ছিলে। কিন্তু তোমার একটু বাকী ছিল। এই তোমার শেষ জন্ম। আমি তোমায় যোগশিক্ষা দেব। আজ বিশ্রাম কর; কাল এসো।" অনুরাগের নবোদয়ে

বিনিদ্র রজনী-যাপনান্তে কালীপ্রসাদ পরমহংসদেবের আহ্বানে ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীগুরুসকাশে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তিনি এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়িতেছেন এবং যোগশাস্ত্রের সহিত পরিচিত আছেন। তৎপরে তিনি সানন্দে কালীপ্রসাদকে উত্তরের বারান্দায় লইয়া গিয়া একখানি তক্তাপোশে যোগাসনে বসাইলেন এবং স্বীয় দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা জিহ্বায় বীজমন্ত্র লিখিয়া দিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বক্ষঃস্থল হইতে শক্তিকে ঊর্ধ্বদিকে আকর্ষণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কালীপ্রসাদ গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আবার শক্তিকে আকর্ষণপূর্বক অধোদিকে নামাইয়া দিলে তিনি বাহ্যভূমিতে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর ঠাকুর তাঁহাকে ধ্যানাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন এবং ধ্যানে যেসব দর্শনাদি হয় তাহা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতে আদেশ করিলেন ; অধিকন্তু কালীপ্রসাদকে অবিবাহিত জানিয়া বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন। অতঃপর কালীপ্রসাদ কালীমন্দিরে কিয়ৎক্ষণ ধ্যানান্তে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। বিদায়কালে ঠাকুর তাঁহাকে মিষ্টি প্রসাদ দিয়া বলিলেন, "আবার এসো। যদি পয়সা যোগাড় না হয়, তবে এখান হতে দেওয়া হবে।" সেদিন এক ভদ্রলোক গাড়ি করিয়া কলিকাতায় ফিরিতেছিলেন। ঠাকুরের ইচ্ছানুসারে তিনি কালীপ্রসাদকে গাড়িতে তুলিয়া লইলেন।

বাড়িতে আসিয়া ঠাকুরের উপদেশানুসারে কালীপ্রসাদ প্রত্যহ সকাল ও রাত্রিতে ধ্যান করিতে এবং ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া স্বীয় অনুভূতি নিবেদন করিতে লাগিলেন। ইহাতে স্বভাবতঃ পড়াশুনায় অমনোযোগ আসিল ও বাড়ির লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহারা বাধা দিতে লাগিলেন। কালীপ্রসাদ কিন্তু তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া সাধনায় রত থাকিলেন। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে গমনাগমনের ফলে তাঁহার অনেক

ভক্তের সহিত পরিচয় ঘটিল এবং ঠাকুরের বিবিধ সেবার সুযোগ পাইয়া তিনি ধন্য হইলেন। ঠাকুর ঝাউতলায় গমনকালে অনেকসময় তাঁহার স্কন্ধে হাত দিয়া চলিতেন, আবার কখন কখন ঐ ভাবে ভ্রমণকালে অনেক উচ্চ তত্ত্ব শিখাইতেন। এতদ্ব্যতীত ভক্তদের বাড়ি যাইয়া সদা-লোচনা করিতেও উপদেশ দিতেন। একদিন কালী দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া নিবেদন করিলেন যে, ধ্যানে তিনি ঈশ্বরের সর্বতঃপ্রসারী চক্ষুর্দ্বয় দর্শন করিয়াছেন। অপর একদিন ঠাকুরের শ্রীচরণে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি অনুভব করিলেন যেন, পরমহংসদেব জগন্মাতারূপে তাঁহাকে স্তন্যপান করাইতেছেন। অন্যদিন রাত্রে ধ্যানকালে তিনি বোধ করিলেন, তাঁহার আত্মা দেহ ছাড়িয়া ঊর্ধ্বলোকে চলিয়াছে। বহু মনোরম দৃশ্য দেখিতে দেখিতে একটি সুন্দর প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় সর্বধর্মের প্রতীক ও মূর্তবিকাশ রহিয়াছে। সেই প্রাসাদের এক বিরাট কক্ষে প্রবেশান্তে দেখিলেন, চতুষ্পার্শ্বে বেদীতে বিভিন্ন ধর্মের দেব, দেবী ও অবতারগণ বসিয়া আছেন; আর মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ক্রমে সব দেব, দেবী ও অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় বিরাট দেহে একীভূত হইলেন। এই সমস্ত শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "তোর বৈকুণ্ঠদর্শন হয়ে গেল; এখন হতে তুই অরূপের ঘরে উঠলি, আর রূপ দেখতে পাবি না।"

কালীপ্রসাদ যে শুধু দক্ষিণেশ্বরেই ঠাকুরের দর্শনে যাইতেন তাহাই নহে; ঠাকুর কলিকাতায় ভক্তগৃহে আসিলে তিনিও সেখানে মিলিত হইতেন। এইরূপে তিনি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন কাঁকুড়গাছিতে রামবাবুর উদ্যানে গিয়াছিলেন; ৩রা জুলাই রথযাত্রার দিনে বলরাম-মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন, এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে রামবাবুর কলিকাতার গৃহে গিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। শেষোক্ত দিনে কালীপ্রসাদ দক্ষিণেশ্বর হইতে ঠাকুরের

সঙ্গে আসিয়া তাঁহার আদেশে নিরঞ্জনের সহিত নরেন্দ্রনাথকে ডাকিবার জন্য নরেন্দ্রভবনে গিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রথম হইতেই ঠাকুরের গলায় ব্যথা আরম্ভ হইল—ঢোক গিলিতে, আহার করিতে, কথা বলিতে কষ্ট হয়, আর গয়ারে দুর্গন্ধ। গোলাপ-মা বলিলেন, "কলকাতার দুর্গাচরণ খুব বড় ডাক্তার ; তাঁকে দেখালে রোগ সেরে যেতে পারে।" বালকস্বভাব ঠাকুর উহাতেই রাজী হইলেন। কালীপ্রসাদ সেই দিন উপস্থিত ছিলেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিযাপনান্তে পরদিন প্রাতে লাটু ও গোলাপ-মার সহিত নৌকারোহণে পরমহংসদেবকে ডাক্তারের নিকট লইয়া গেলেন এবং পরে আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরাইয়া আনিলেন। ঐ বৎসর ঠাকুর যেদিন পাণিহাটির মহোৎসবে যান, কালী সেদিনও ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন এবং মহোৎসবান্তে নৌকাযোগে একই সঙ্গে সন্ধ্যার পর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরের পর শ্যামপুকুর। লাটু ও কালী সেবক হইয়া ঠাকুরের সঙ্গে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আশ্বিন কলিকাতায় আসিলেন এবং সাত দিন বলরাম-মন্দিরে থাকিয়া ৫৫ নং শ্যামপুকুর রোডের ভাড়া-বাড়িতে গেলেন। কালী তদবধি গৃহসম্পর্কশূন্য হইয়া পরমহংসদেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। শ্যামপুকুরের পর তিনি ঠাকুরের সহিত কাশীপুরে চলিলেন (১১ই ডিঃ, ১৮৮৫)। এখানে পরমহংসদেবের আদেশে নরেন্দ্রনাথ প্রত্যেকের কার্যক্রম বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। কালী দুই ঘণ্টা দিনে ও দুই ঘণ্টা রাত্রে সেবা করিতেন। দ্বিপ্রহরে ঠাকুরকে তেল মাখাইয়া গাড়ি-বারান্দার ছাদের উপর রৌদ্রে জলচৌকীতে বসাইয়া স্নান করাইতেন এবং ঐ সুযোগে শ্রীমুখনিঃসৃত তত্ত্বকথা শুনিতেন।

এই সময়ে নরেন্দ্রের প্রভাবে কালীর ভাবধারা কিরূপে পরিবর্তিত হইয়াছিল আমরা তাহার বিবরণ 'লীলাপ্রসঙ্গ' হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

"আজ ফাল্গুনী শিবরাত্রি। বালক-ভক্তদিগের মধ্যে তিন-চারি জন স্বামীজীর সহিত স্বেচ্ছায় ব্রতোপবাস করিয়াছে।… দশটার পর প্রথম প্রহরের পূজা, জপ ও ধ্যান সাঙ্গ করিয়া স্বামীজী পূজার আসনে বসিয়াই বিশ্রাম ও কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সঙ্গীদিগের মধ্যে একজন তাঁহার তামাক সাজিতে বাহিরে গমন করিল এবং অপর একজন কোন প্রয়োজন সারিয়া আসিতে বসতবাটীর দিকে চলিয়া গেল। এমন সময় স্বামীজীর ভিতর সহসা পূর্বোক্ত দিব্য বিভূতির তীব্র অনুভবের উদয় হইল এবং তিনিও উহা অন্য কার্যে পরিণত করিয়া উহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বাসনায় সম্মুখোপবিষ্ট স্বামী অভেদানন্দকে বলিলেন, 'আমাকে খানিকক্ষণ ছুঁয়ে থাক তো।' ইতোমধ্যে তামাক লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া পূর্বোক্ত বালক দেখিল, স্বামীজী স্থিরভাবে ধ্যানস্থ রহিয়াছেন এবং অভেদানন্দ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিজ দক্ষিণ হস্তদ্বারা তাঁহার দক্ষিণ জানু স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে ও তাঁহার ঐ হস্ত ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। দুই-এক মিনিট কাল ঐ ভাবে অতিবাহিত হইবার পর স্বামীজী চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন, 'ব্যস, হয়েছে। কিরূপ অনুভব করলি? অভেদানন্দ—ব্যাটারি ধরলে যেমন কি-একটা ভিতরে আসছে জানতে পারা যায় ও হাত কাঁপে, ঐ সময়ে তোমাকে ছুঁয়ে সেইরূপ অনুভব হতে লাগল।'… পরে সকলে দুই প্রহরের পূজা ও ধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন। অভেদানন্দ ঐ কালে গভীর ধ্যানস্থ হইল। ঐরূপ গভীরভাবে ধ্যান করিতে আমরা তাহাকে ইতঃপূর্বে আর কখন দেখি নাই। তাহার সর্বশরীর আড়ষ্ট হইয়া গ্রীবা ও মস্তক বাঁকিয়া গেল এবং কিছুক্ষণের জন্য বহির্জগতের সংজ্ঞা এককালে লুপ্ত হইল।… রাত্রি চারিটায় চতুর্থ প্রহরের পূজা শেষ হইবার পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পূজাগৃহে উপস্থিত হইয়া স্বামীজীকে বলিলেন, 'ঠাকুর ডাকিতেছেন।' শুনিয়াই স্বামীজী বসতবাটীর দ্বিতলগৃহে ঠাকুরের নিকট

চলিয়া গেলেন। স্বামীজীকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন, 'কিরে? একটু জমতে না জমতেই খরচ?...ওর ভিতর তোর ভাব ঢুকিয়ে ওর কি অপকারটা কল্লি বল দেখি? ও এতদিন এক ভাব দিয়ে যাচ্ছিল, সেটা সব নষ্ট হয়ে গেল। ছয় মাসের গর্ভ যেন নষ্ট হল।...যা হোক, ছোঁড়াটার অদেষ্ট ভাল।'...ফলে দেখা গেল, অভেদানন্দ যে ভাবসহায়ে পূর্বে ধর্ম-জীবনে অগ্রসর হইতেছিল, তাহার তো একেবারে উচ্ছেদ হইয়া যাইলই আবার অদ্বৈতভাব ঠিক ঠিক ধরা ও বুঝা কালসাপেক্ষ হওয়ায় বেদান্তের দোহাই দিয়া সে কখন কখন সদাচারবিরোধী অনুষ্ঠানসকল করিয়া ফেলিতে লাগিল।"

দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, কালী একবার ছিপ দিয়া মাছ ধরিতে লাগিলেন। পরমহংসদেব মানা করিলেও তিনি "আত্মা কাহাকেও মারেন না, কাহারও দ্বারা হতও হন না" ইত্যাদি গীতাবাক্য আবৃত্তি করিয়া নিজ কার্যের সমর্থন করিলেন। অতঃপর একদিন ঠাকুর শয্যায় শয়ন করিয়া কালীর সহিত আলাপ করিতেছেন, এমন সময় বিষম যন্ত্রণায় বলিয়া উঠিলেন, "ত্যাখ, বাইরে ওকে ঘাসের উপর দিয়ে চলতে বারণ কর; আমার বড় কষ্ট হচ্ছে—ও যেন আমার বুকের উপর দিয়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে।" কালী সেদিন প্রকৃত বেদান্তানুভূতির মর্ম বুঝিলেন। কিন্তু বুদ্ধিদ্বারা জ্ঞাত তত্ত্বের অনুভূতিক্ষেত্রে আত্মলাভ করা সময়সাপেক্ষ। তাই 'অষ্টাবক্রসংহিতা'-পাঠে কালীকে নেতিপরায়ণ দেখিয়া বুড়োগোপাল একদিন ঠাকুরকে জানাইলেন, "কালী নাস্তিক হয়ে গেছে, কিছুই মানে

১। রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের স্বামী শংকরানন্দ-প্রণীত 'স্বামী অভেদানন্দের জীবনকথা' গ্রন্থে (৪৭ পৃঃ) মূল ঘটনা স্বীকৃত হইলেও এই ভাবসঞ্চারণ অস্বীকৃত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, বিবেকানন্দ স্বামীজী তখনও ঐরূপ শক্তি অর্জন করেন নাই—প্রত্যুত ঐ সময়ে শুধু কুণ্ডলিনীর জাগরণে ঐরূপ কম্প উপস্থিত হইয়াছিল।

না।" তারপর ঠাকুর কালীকে একান্তে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে, তুই নাকি নাস্তিক হয়ে গেছিস?" কালী নির্বাক্! কিন্তু ক্রমে তিনি জানাইলেন যে, তিনি ঈশ্বর, শাস্ত্র, লোকাচার কিছুই মানেন না। ঠাকুর তাঁহার সরল ও নির্ভীক উত্তরে বিরক্ত না হইয়া বলিলেন, একদিন তুই সব মানবি! তুই একঘেয়ে হোসনি—আমি একঘেয়ে ভালবাসি না।" অবশেষে সেবা করার সুযোগে কালী একদিন ঠাকুরের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করিলেন। ঠাকুরও আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তোর ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান হবে।" পরে ধ্যানযোগে তিনি একদা ঐ জ্ঞানের আস্বাদ পাইয়া ঠাকুরের নিকট সবিশেষ জানাইলে তিনি বলিলেন, "এই ঠিক ঠিক জ্ঞান।" ইহার পর কালীর মন হইতে নাস্তিকতা চিরতরে বিদূরিত হইল।

কাশীপুরে কালীর বৈরাগ্য একবার বিশেষভাবে পরীক্ষিত হইয়াছিল। ঠাকুর সেদিন বলিলেন, "আজ তোর বাবা এসেছিল, বল্লে তোর মা কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছে। তা আমি অনুমতি দিচ্ছি, তুই বাড়ি গিয়ে থাক।" কালী আদেশপালন করিয়া বাড়িতে গেলেন এবং সেখানে পিতা-মাতার নিকট প্রচুর আদরযত্নও পাইলেন। কিন্তু অল্পক্ষণেই যেন মনে হইল—এই বিজাতীয় আবহাওয়ায় তাঁহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। বাধ্য হইয়া একরূপ দৌড়াইয়াই কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে এত শীঘ্র স্বসকাশে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, তুই বাড়ি যাস নি?" কালী সব খুলিয়া বলিলে ঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বেশ করেছিস।"

একবার বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সন্ন্যাসিবেশে কাশীপুরে আসিয়া বলিলেন যে, তিনি গয়াধামের নিকট বরাবর পাহাড়ের এক গুহায় একজন হঠযোগী সাধু দেখিয়া আসিয়াছেন। ইহা শুনিয়া হঠযোগশিক্ষায় উৎসুক কালী

কাহাকেও না জানাইয়া একাকী গয়া যাত্রা করিলেন। তিনি গয়া স্টেশনে নামিয়া নগ্নপদে তিন-চারি মাইল পাহাড়ী সংকীর্ণ পথ অতিক্রমান্তে পাহাড়ের নীচে এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন ও সেখানে শিবমন্দিরের ধর্মশালায় রাত্রিযাপন করিলেন। ধর্মশালায় এক সন্ন্যাসীর সহিত পরিচয় হওয়ায় তাঁহার হস্তলিখিত পুঁথি হইতে বিরজাহোমের মন্ত্র ও পুরীনামা সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের পরিচায়ক 'মঠ', 'মড়ি' প্রভৃতি সংকেতগুলি লিখিয়া লইলেন। অবশেষে হঠযোগীর নিকট যাইতে উদ্যত হইলে গ্রামবাসীরা নিষেধ করিল; কারণ আগন্তুক দেখিলেই হঠযোগীর চেলা পাথর ছুড়িয়া মারে। ইহাতে পশ্চাৎপদ না হইয়া কালী সন্তর্পণে চলিয়া অকস্মাৎ একেবারে যোগী ও তাঁহার চেলার নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রথমতঃ যোগী ও শিষ্য তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু পরে তাঁহার সন্ন্যাসোচিত পরিচয় পাইয়া এবং তাঁহাকে শিক্ষার্থী জানিয়া থাকিতে দিলেন। কালী কিন্তু সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, ইঁহারা অঘোরপন্থী এবং যোগ সম্বন্ধেও বিশেষ জ্ঞান নাই; সুতরাং তিনি ফিরিবার চেষ্টায় রহিলেন। এদিকে যোগী এমন উপযুক্ত শিষ্য পাইয়া ছাড়িতে চাহেন না। তখন কালী জল আনিবার ভান করিয়া কলসীহস্তে গুহা হইতে বহির্গত হইলেন এবং দূরে গিয়াই কলসী পরিত্যাগপূর্বক দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেলেন। অবশেষে কাশীপুরে ফিরিয়া ঠাকুরকে সবই জানাইলেন। ঠাকুর সস্নেহে বলিলেন, "যত বড় সাধু বা সিদ্ধ যোগী যে যেখানে আছে আমি সব জানি। চার খুঁট ঘুরে আয়; কিন্তু এখানে (নিজের বুকে হাত দিয়া) যা দেখছিস এমনটি আর কোথাও পাবি নি।" অতঃপর মাস্তুলের পাখীর দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, তুলনা না করিলে প্রকৃত মহত্ত্ব বুঝা যায় না।

কাশীপুরে নরেন্দ্রের সহিত তারক, কালী প্রভৃতি বৌদ্ধ মতের আলোচনা করিতেন ও গ্রন্থাদি পড়িতেন। ব্রাহ্মসমাজের সাধু অঘোরনাথ-প্রণীত

'বুদ্ধচরিতে' 'ললিত-বিস্তরের' যেসব শ্লোক উদ্ধৃত ছিল, কালী তাহা কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে 'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথায়' (২৬৮ পৃঃ) একটি ঘটনার উল্লেখ আছে—"একদিন তো কালী-ভাই ঠাকুরকে বুদ্ধদেবের কথা জিগগেস করলে। কালীভায়ের তখন ধারণা ছিল যে, বুদ্ধদেব ঈশ্বর মানতেন না। একদিন তাই নিয়ে খুব তর্ক হল। তাতে তিনি (ঠাকুর) বল্লেন, 'বুদ্ধদেব নাস্তিক কেন হবে গো তিনি যে স্বরূপকে দেখেছিলেন, সেখানে অস্তি-নাস্তির মধ্যের অবস্থা।' " যাহা হউক, বুদ্ধের আলোচনায় মত্ত কালী একবার নরেন্দ্র ও তারকের সহিত বুদ্ধগয়ায় গমনপূর্বক তিন-চারি দিন তপস্যায় কাটাইয়া আসিলেন (শিবানন্দ-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)।

কালীর সর্বদাই প্রবল জ্ঞানস্পৃহা ছিল। তিনি পরমহংসদেবের সেবার অবসরকালে সায়েন্স এসোসিয়েশনে ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকারের বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন এবং কাশীপুর উদ্যানে বসিয়া ইংরেজ পণ্ডিতদের ধর্ম, ন্যায় ও দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মর্তালীলা-সমাপনান্তে ১৫ই ভাদ্র শ্রীশ্রীমা ও স্বামী যোগানন্দাদির সহিত কালী বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। তথায় অবস্থানের সুযোগে তিনি ভিক্ষাবৃত্তি-অবলম্বনে বৃন্দাবনপরিক্রমায় বাহির হইলেন। প্রায় একুশ দিন পরে পরিক্রমা শেষ হইল। অতঃপর কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি বরাহনগর মঠে উঠিলেন।

মঠের একটি ছোট ঘরে বাস করিয়া কালী মহারাজ অধিকাংশ সময় ধ্যান-জপ ও শাস্ত্রপাঠাদিতে কাটাইতেন। তাই ঐ ঘরটির নাম হইয়াছিল 'কালী-তপস্বীর ঘর।' এই সময়ে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের স্তোত্ররচনায়ও মন দিয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনই এই সময়ে আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি নিরামিষ আহার করিতেন, জুতা পরিতেন না, নিমন্ত্রণে যাইতেন না, কাহারও সহিত মিশিতেন না এবং

গীতা ও উপনিষদাদির এক-একটি শ্লোকের উপর দিনের পর দিন ধ্যান করিয়া উহার মর্মার্থ উদ্ঘাটন করিতেন। তিনি আহারের বিষয়ে উদাসীন ছিলেন বলিয়া শশী মহারাজ দরজায় ধাক্কা দিয়া ও ভৎ'সনা করিয়া তাঁহাকে আহারে প্রবৃত্ত করিতেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যথাবিধি সন্ন্যাসগ্রহণান্তে তাঁহার নাম হইল স্বামী অভেদানন্দ। সন্ন্যাসের পরেও তাঁহার তপস্যাদি সমভাবেই চলিতে থাকিল। একদিন মধ্যাহ্নের পরে মাস্টার মহাশয় আসিয়া দেখিলেন, বারান্দায় তপ্ত ধূলির উপর অভেদানন্দের দেহ অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। তিনি যোগীন মহারাজকে বলিলেন, "কালী মঠের কঠোরতা সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করেছে।" যোগানন্দ সহাস্যে বলিলেন, "ও কি মরে? ঐ শালা অমনি করে ধ্যান করে।"

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পরমহংসদেবের জন্মোৎসবের পরে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দের সহিত কালী মহারাজ পুরীধামে যান এবং এমার মঠে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে বৈষ্ণববাবাজীদের পরিত্যক্ত এক গুহায় তিনি কিছুদিন ধ্যান করিয়াছিলেন। ছয় মাস ঐ অঞ্চলে কাটাইয়া তাঁহারা ভাদ্রমাসে বরাহনগরে প্রত্যাগমন করেন।

সন্ন্যাসগ্রহণের পর স্বামী অভেদানন্দ ও অদ্ভুতানন্দ একবার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে নবীন সন্ন্যাসীদের আদর্শ ও প্রবীণদের ভাবধারা লইয়া এক তুমুল বিতর্ক আরম্ভ হয়। রাম বাবুর বক্তব্য ছিল এই যে, ঠাকুরকে ধরিয়া থাকিলেই সব হইল. শাস্ত্রাভ্যাসাদি নিষ্প্রয়োজন; আর নবীনদের মুখপাত্ররূপে স্বামী অভেদানন্দের বক্তব্য ছিল এই যে, ঠাকুরকে ধরিয়া থাকিয়া ধ্যানভজনাদি তো করিতেই হইবে; এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন শাস্ত্র ও মতবাদের সহিতও পরিচয় আবশ্যক। এই বিষয় লইয়া পরে অভেদানন্দকে ভক্তমহলে অনেক গঞ্জনা সহ্য করিতে হইলেও

তিনি বিচলিত হন নাই। ফলতঃ মঠস্থাপনের প্রথমাবস্থায় তাঁহাদিগকে এরূপ বহু প্রতিকূল ভাবের সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছিল।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ এবং অপর কোন কোন গুরুভ্রাতা শ্রীশ্রীমায়ের সহিত আঁটপুর হইয়া কামারপুকুর ও জয়রামবাটী যান। সেখানে অভেদানন্দের মনে উত্তরাখণ্ড গমনের অভিলাষ জন্মে এবং শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি লইয়া স্বামী নির্মলানন্দের সহিত তিনি তীর্থদর্শনে বহির্গত হন। উভয়ে গ্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া নগ্নপদে চলিলেন। অভেদানন্দের প্রতিজ্ঞা ছিল—অর্থ স্পর্শ করিবেন না, রন্ধন করিবেন না, জুতা বা জামা পরিবেন না, কাহারও বাড়িতে নিদ্রা যাইবেন না এবং তিন অথবা পাঁচ বাড়িতে মধ্যাহ্নে ভিক্ষা করিয়া একাহারে থাকিবেন। এইরূপে চলিতে চলিতে তাঁহারা গাজীপুরে পৌঁছিয়া পওহারী বাবার সহিত আলাপাদি করিলেন। এখানে হরিপ্রসন্ন বাবুর (স্বামী বিজ্ঞানানন্দের) সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর তাঁহারা অযোধ্যা, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, উত্তরকাশী ও দেবপ্রয়াগাদি তীর্থভ্রমণান্তে বদরিকাশ্রমে উপনীত হইলেন এবং ৺বদরী-নারায়ণদর্শনান্তে কেদারনাথে চলিলেন। এখানে এক পর্বতগুহায় কিয়দ্দিবস একাকী তপস্যা করিয়া অভেদানন্দ মহারাজ এক উদাসী সাধুর সহিত গোমুখী যাত্রা করেন। গোমুখীদর্শনান্তে তিনি আবার উত্তরকাশী হইয়া যমুনোত্রী যান এবং তথা হইতে দেরাদুনের পথে হৃষীকেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

হৃষীকেশে অবস্থানকালে তিনি ঝুপড়ীতে বাস করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন এবং ধনরাজ গিরির নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন। তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া ধনরাজ গিরি পরে স্বামী বিবেকানন্দকে বলিয়াছিলেন, “অভেদানন্দ ! অলৌকিকী প্রজ্ঞা !” দৈবক্রমে স্বামী অভেদানন্দ অচিরেই ব্রঙ্কাইটিস ও জ্বরে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। তখন স্বামী সারদানন্দ ও সান্ন্যাল মহাশয় সেখানে ছিলেন; তাঁহারা সেবার ভার

লইলেন। পরে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশানুসারে স্বামী নির্মলানন্দ তাঁহাকে গোযানে হরিদ্বারে লইয়া গিয়া কাশীর ট্রেনে তুলিয়া দিলেন (মার্চ, ১৮৯০)।

কাশীতে আসিয়া তাঁহার রক্তামাশয় হইল এবং তিনি ডাক্তার প্রিয় বাবুর বাড়িতে থাকিয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন; অধিকন্তু তাঁহার সেবার জন্য একজন গুরুভাই স্বামীজীর নির্দেশে গাজীপুর হইতে তথায় গেলেন। পরে স্বামী সদানন্দ সেবাভার গ্রহণ করেন। কালী মহারাজ আরোগ্যলাভান্তে সদানন্দের সহিত এলাহাবাদে ঝুসীতে যাইয়া তপস্যা করেন। ঐ সময়ে তিনি সদানন্দকে বেদান্ত পড়াইতেন। অতঃপর সম্ভবতঃ জুন মাসে তিনি বরাহনগরে যান।

মঠে তিনি রাতদিন কেবল পড়াশুনা করিতেন। ফুরসত পাইলে নরেন্দ্রনাথের সহিত তর্ক জুড়িয়া দিতেন। তর্কে তিনি আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। তবে একদিন নরেন্দ্রনাথ একটু কোণ-ঠাসা হইয়া বলিলেন, "আজ এই পর্যন্ত, কাল ঠিক এখান থেকে শুরু হবে।" পরদিন নরেন্দ্রনাথ এইরূপ অকাট্য যুক্তির অবতারণা করিলেন যে, অভেদানন্দ হার মানিয়া বলিলেন, "নরেনকে একদিনও যুক্তি দিয়ে হারাতে পারলুম না।" যুক্তিবিচারের ক্ষেত্র যাহাই হউক না কেন, নরেন্দ্রের হৃদয় সর্বদাই অভেদানন্দের প্রতি প্রেমপূর্ণ ছিল। ঐ দারিদ্র্যের দিনে সাধুদিগকে যথেষ্ট কায়িক শ্রম করিতে হইত; কিন্তু কালী মহারাজের অধ্যয়নপ্রবণ মন ঐ সব ঝঞ্চাটে যাইতে চাহিত না। ইহাতে কেহ কেহ বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলে একদিন স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "তোদের একটা ভাই যদি পড়াশুনা নিয়েই থাকে, তো তোদের এত গাত্রদাহ কেন? নিয়ে আয় তোদের কত হাওা আছে; আজি মেজে দিচ্ছি।" ইহার কিছু পরেই স্বামী অখণ্ডানন্দের সহিত স্বামীজী হিমালয়ভ্রমণে নির্গত হইলেন এবং অভেদানন্দও কিছু পরে তীর্থ-ভ্রমণে চলিয়া গেলেন। স্বামী অদ্ভুতানন্দ

তখন বরাহনগর মঠে ছিলেন ; তিনি ও অপরেরা তাঁহাকে থাকিয়া যাইতে পীড়াপীড়ি করিলেও তিনি স্বীয় সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না।[২]

কাশী, প্রয়াগ, দিল্লী, আগ্রা, চিত্রকূট, সরযূ, জয়পুর, খেতড়ি, আবু ও গিরণার প্রভৃতি তীর্থ ও দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া স্বামী অভেদানন্দ জুনাগড় অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে পোরবন্দরে শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ মহাশয়ের নিকট সংবাদ পাইলেন যে, স্বামীজী ঐ অঞ্চলেই আছেন। সুতরাং তাঁহার সহিত মিলিত হইবার আগ্রহে তিনি অবিলম্বে জুনাগড়ে উপস্থিত হইলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে মনসুখরাম সূর্যরাম ত্রিপাটী মহোদয়ের ভবনে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন। জুনাগড়ে কিছুদিন একসঙ্গে কাটাইয়া অভেদানন্দ দ্বারকাভিমুখে চলিলেন এবং স্বামীজী বোম্বাইয়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। দ্বারকা ও প্রভাস-দর্শনান্তে অভেদানন্দ মহারাজ জাহাজে বোম্বাই গেলেন এবং তথা হইতে মহাবালেশ্বরে উপস্থিত হইয়া নরোত্তম মুরারজী গোকুলদাসের গৃহে আবার স্বামীজীকে দেখিতে পাইলেন। অতঃপর তিনি পুণা, বরোদা, নাসিক ও দণ্ডকারণ্য দর্শন এবং তাপ্তী, গোদাবরী, কাবেরী প্রভৃতি পুণ্যতোয়া নদীতে অবগাহন করিয়া ক্রমে ৺রামেশ্বরে উপনীত হইলেন। তথা হইতে তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লী, মাদুরা, কাঞ্চী, কুম্ভকোণম্ প্রভৃতি তীর্থদর্শনান্তে মাদ্রাজে জাহাজে উঠিয়া কলিকাতায় আসিলেন। তখন মঠ আলমবাজারে উঠিয়া আসিয়াছে।

গুজরাতে ভ্রমণকালে স্বামী বিবেকানন্দ যদিও তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, পাদুকাব্যবহার করা আবশ্যক, তথাপি তিনি ঐ অঞ্চলে

২। রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের স্বামী শংকরানন্দ প্রণীত 'স্বামী অভেদানন্দের জীবনকথা'র (৮৭ হইতে ৯৬পৃঃ) সহিত এই বিবরণের অমিল আছে জানিয়াও আমরা স্বামী শিবানন্দের ৮।১।৯০ তারিখের পত্র, ব্রহ্মচারী প্রকাশ-প্রণীত স্বামী সারদানন্দের জীবনী, স্বামী বিবেকানন্দের ১৯।২।৯০, ৮।৩।৯০, ১৫।৩।৯০, ৩১।৩।৯০, ১০।৫।৯০, ৪।৬।৯০, ৬।৭।৯০ তারিখের পত্র ও স্বামী অখণ্ডানন্দের 'স্মৃতিকথা'র অনুসরণ করিলাম।

রিক্তপদেই চলিতেন। আহার ও জলপান সম্বন্ধেও তিনি বিরাগী সাধুর ন্যায় উদাসীন ছিলেন। ইহার ফলে তাঁহার পায়ে গিনিওয়ার্ম হয় এবং আলমবাজার মঠে আগমনের পর পা দুইটি ফুলিয়া রোগ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। এই রোগে তিনি চারি মাস শয্যাশায়ী ছিলেন এবং সাতবার তাঁহার পায়ে অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছিল। তখন স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ গুরুভ্রাতারা তাঁহার বিশেষ সেবা করিয়াছিলেন। রোগমুক্তির পর এইবারে তাঁহার নিকট মঠজীবন বেশ আনন্দময় ছিল। তীর্থভ্রমণান্তে অনেকেই তখন মঠে অবস্থান করিতেছিলেন এবং মঠের উঞ্ছবৃত্তির অবসান হইয়া কতকটা সচ্ছলতা আসিয়াছিল। নূতন সতরঞ্চিতে বসিয়া রিডিং ল্যাম্পের সাহায্যে পাঠ করা তখন কঠিন ছিল না। স্বামী অভেদানন্দ এই পরিবর্তিত অবস্থার পূর্ণ সুযোগ লইয়াছিলেন।

আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের সাফল্যলাভের পর বিদ্বেষপূর্ণ অনেক স্বদেশ ও বিদেশবাসী তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করিলে উহার প্রতিকার-কল্পে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার টাউন হলে যে সভা হয়, তাহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছেন, "কালী বেদান্তী এই সময় প্রাণপণ খাটিয়াছিলেন। উন্মাদের মত দিবারাত্র কাজ করিয়া টাউন হলের সভা করিয়াছিলেন।" এইরূপে কিছুকাল মঠে বাস করিয়া ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের শ্রীরামকৃষ্ণোৎসবের কিছুদিন পরে তিনি পুনর্বার তীর্থ-পর্যটনে নির্গত হন।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জীবনের এক নূতন পর্যায় আরম্ভ হইল—দীর্ঘ সাধনার ফলে তিনি যে শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন, আজ তাহার বিকাশের সুযোগ ঘটিল। বিদেশে বেদান্তপ্রচারার্থে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে তিনি ঐ বৎসর আগস্ট মাসের মাঝামাঝি 'গোলকুণ্ডা' জাহাজে লণ্ডন যাত্রা করিলেন। প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পরে লণ্ডনে পৌঁছিয়া তিনি স্বামী বিবেকানন্দের

বাসস্থান উইম্বলড়নে মিস্ মূলারের বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। লণ্ডনে প্রায় এক মাস অবস্থানের পর স্বামীজী অকস্মাৎ একদিন জানাইলেন যে, 'খ্রীষ্ট-থিয়োসফিক্যাল সোসাইটী'তে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইবে—সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইয়া গিয়াছে, কোন পরিবর্তন অসম্ভব। অভেদানন্দ তো আকাশ হইতে পড়িলেন; অথচ স্বামীজী তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না জানিয়া তাঁহারই নির্দেশমত 'পঞ্চদশী'-অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখিয়া তাহা আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। অবশেষে ২৭শে অক্টোবর তাঁহার জীবনের প্রথম বক্তৃতা হইয়া গেল। উহা শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন এবং স্বামী অভেদানন্দের ভাবী প্রচারকজীবন যে অতি সমুজ্জ্বল সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না। আর সকলেই বুঝিলেন যে, স্বামীজী লোক চিনিতে পারেন এবং তাহাদিগকে কার্যের উপযুক্ত করিয়া লইতে পারেন—"আশ্চর্যো জ্ঞাতা, কুশলানুশিষ্টঃ।"

নভেম্বর মাসে কার্যের সুবিধার জন্য স্বামীজী, অভেদানন্দ ও গুড্উইন্ ১৪নং গ্রে কোর্ট্ গার্ডেন্সে ভাড়াবাড়িতে উঠিয়া আসিলেন এবং বক্তৃতার জন্য ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে একটি হল ভাড়া লইলেন। স্বামীজী এই গৃহে তিন মাস অবস্থানের সুযোগে অভেদানন্দকে ইংরেজ-জীবনের জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ শিখাইয়া দিলেন। অভেদানন্দও স্বামীজীর সাহায্যে ডয়সন্, ম্যাক্স্-মূলার প্রভৃতি মনীষীর সহিত পরিচিত হইলেন এবং স্বামীজীর নির্দেশে লণ্ডন ও নগরোপকণ্ঠে বক্তৃতাদি-সাহায্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন।

স্বামীজীর লণ্ডনত্যাগের পর স্বামী অভেদানন্দ ষ্টার্ডি মহোদয়ের আবাসে উঠিয়া আসিলেন। ষ্টার্ডি নিজে নিরামিষাশী ও কঠোরী ছিলেন; অভেদানন্দও উক্ত ভবনে তদনুরূপ জীবনই অবলম্বন করিলেন। তিনি হর্ম্যোপরি একটা উত্তাপহীন ও গবাক্ষশূন্য ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে উপাধানবিহীন কঠিন শয্যায় শয়ন করিতেন ও নীচের এক কক্ষে অধ্যয়নাদি করিতেন।

এই আবাসস্থানকে ভিত্তি করিয়াই ১৮৯৭ ইং-র ১২ই জানুয়ারী হইতে রীতিমত বেদান্তের বক্তৃতা ও ক্লাস আরম্ভ হইল। পরন্তু লণ্ডনের কার্য দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। ঐ বৎসরের মধ্যভাগে তাঁহার আমেরিকাগমনের আহ্বান আসিল। স্বামীজী তখন ভারতে—এই প্রস্তাবে তাঁহারও সমর্থন ছিল। অতএব লণ্ডনের কার্যপরিচালনার্থে স্বামীজী যে অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন, উহার দ্বারা টিকেট কিনিয়া স্বামী অভেদানন্দ ৩১শে জুলাই আমেরিকাগামী জাহাজে আরোহণ করিলেন।

৯ই আগস্ট নিউইয়র্কে উপনীত হইয়া তিনি বেদান্তসমিতির সম্পাদিকা মিস্ মেরী ফিলিপ্‌সের বাড়িতে উঠিলেন। পূর্ব বৎসর লণ্ডনে জাহাজ হইতে অবতরণকালে ঘটনাক্রমে অভ্যর্থনার জন্য আগত কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তিনি একাকী গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইয়া স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন; নিউইয়র্কেও অনুরূপ অবস্থায় অভেদানন্দ নিজেই স্বতন্ত্র ব্যবস্থাবলম্বনে বাসস্থানে উপস্থিত হইয়া মিস্ ফিলিপ্‌স্‌কে অবাক্ করিয়াছিলেন। নিউইয়র্কে তিনি প্রথম এক পক্ষকাল নগরপরিদর্শন করিয়া আমেরিকার জীবনের সহিত সুপরিচিত হইলেন। অবশেষে ২৫শে আগস্ট বেদান্তসমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হইল। সভায় স্বামী বিবেকানন্দের ছাত্র-ছাত্রী ও গুণগ্রাহী বন্ধুগণ উপস্থিত ছিলেন।

আমেরিকায় অবস্থানের প্রথমাবধিই অভেদানন্দ স্বীয় কার্যক্ষেত্রকে একই স্থানে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া সর্বত্র বিস্তার করিতে সচেষ্ট ছিলেন। নিউইয়র্কে আসার পথে কাউণ্ট্ দাদ্‌মারের পত্নীর সহিত তাঁহার যে আলাপ হইয়াছিল, সেই পরিচয়ের সুযোগে ২৭শে আগস্ট কেরোলিনায় দাদ্‌মার-দম্পতির গৃহে গমনপূর্বক তিনি পাঁচ দিন কাটাইয়া আসিলেন। পরে ১৬ই সেপ্টেম্বর স্বামীজীর শিষ্যা ব্রহ্মচারিণী যতিমাতার (মিস্ ওয়াল্‌ডোর) গৃহে গমনান্তে তিনটি সন্ধ্যায় ২০।৩০ জন শ্রোতার সম্মুখে বেদান্তালোচনা

করিলেন। ১৪ই অক্টোবর শ্রীযুক্তা ওলি বুলের কেম্ব্রিজ্ (মাস্)-স্থিত ভবনে যাইয়া সেখানেও পাঁচ দিন থাকিলেন।

স্বামী সারদানন্দ তখন আমেরিকায় ছিলেন। তিনি ২৭শে সেপ্টেম্বর স্বীয় কর্মকেন্দ্র বষ্টন হইতে নিউইয়র্কে আসিয়া অভেদানন্দের সহিত দেখা করিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্তা হুইলারের আমন্ত্রণে অভেদানন্দ মণ্ট্-ক্লেয়ারে উপস্থিত হইলে সেখানেও উভয় গুরুভ্রাতার পুনর্মিলন হইল। এই সুযোগে উভয়ে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক শ্রীযুক্ত এডিসনের গৃহে যাইয়া তাঁহার সহিত প্রায় দুই ঘণ্টা আলাপ করেন। উভয় গুরুভ্রাতারই তখন বিশ্বাস ছিল যে, আমেরিকার কার্যের সাফল্যের জন্য নিরামিষাহার অত্যাবশ্যক এবং তাঁহারা ঐরূপই করিতেন।

ইত্যবসরে ২৯শে অক্টোবর স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্কে যে প্রথম বক্তৃতা দিলেন উহাতে উপস্থিত সকলেই বিশেষ প্রীত হইলেন। বক্তৃতান্তে তিনি ব্রুক্লিনে যাইয়া যতিমাতার আতিথ্য স্বীকারপূর্বক সেখান হইতেই নিউইয়র্কের কার্য চালাইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরেই লেক্সিংটন এভিনিউর একখানি বাড়ি সংগৃহীত হওয়ায় তিনি সেখানে চলিয়া আসিলেন। নিউইয়র্কের কার্যের সহিত তাঁহাকে নিয়মিতভাবে মণ্ট্-ক্লেয়ারেও বক্তৃতা দিতে হইত। মণ্ট্-ক্লেয়ারে তিনি নরওয়েনিবাসী ও উত্তরমেরু-অভিযানকারী মিঃ নান্সেনের সহিত পরিচিত হন। এতদ্ব্যতীত মিঃ লেগেটের আমন্ত্রণে বহুবার তাঁহার বাড়িতে গিয়াও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির বন্ধুত্বলাভে সমর্থ হন। ইঁহাদের মধ্যে মনস্তত্ত্ববিদ্ মিঃ গেট্স্ অন্যতম। এই সময়ে স্বামী অভেদানন্দ 'রাজযোগের' ক্লাস করিতে এবং স্বয়ং শুধু দুধ ও ফলমূল খাইতে আরম্ভ করেন।

তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও প্রতিভায় নিউইয়র্কে বেদান্তপ্রচার ক্রমেই দৃঢ়মূল হইতে লাগিল। এই কার্যে তিনি উদারচেতা ধর্মযাজক

ডাঃ হিবার নিউটনের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। নিউটন তাঁহাকে স্বীয় পুস্তকালয় ব্যবহার করিতে দিতেন, নিজের গির্জার বক্তৃতার বিজ্ঞাপনের সহিত তাঁহার বিজ্ঞাপন পাঠাইতেন, নিজে বেদান্ত-সমিতির অবৈতনিক সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন, গির্জায় সমাগত উপাসকদিগকে স্বামী অভেদানন্দের নিকট পাঠাইতেন এবং অপরাপর ধর্মযাজকদের সহিত তাঁহার আলাপ করাইয়া দিতেন। ইহার পরে তিনি ধর্মযাজক ম্যাক্ আর্থারের সহিতও পরিচিত হন। অচিরেই কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্যাক্সনের সহিত তাঁহার আলাপ হইল এবং অধ্যাপকের অনুরোধে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, কার্যের সাফল্যের জন্য এই সকল আলাপ-পরিচয় অতি মূল্যবান্ হইলেও, স্বামী অভেদানন্দের অনুপম উৎসাহ ও উদ্যমই ছিল সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জিনিস। স্বীয় প্রচারব্রত-উদ্‌যাপনের জন্য তিনি কোন কষ্টই গ্রাহ্য করিতেন না—প্রচণ্ড শীতের তুষারপাত অগ্রাহ্য করিয়াও নিয়মিত ক্লাস চালাইয়া যাইতেন।

আবার এই সাফল্যদর্শনে ইহাও সিদ্ধান্ত করা চলিবেনা যে, বেদান্ত-প্রচার সর্বত্র নির্বিবাদেই চলিতেছিল। বস্তুতঃ এই সময়ে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বহু বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। গোঁড়া ধর্মসম্প্রদায় তো তাঁহার বিরোধিতা করিতেনই, শিক্ষিত অথচ ভারতীয় উদার ভাবের সহিত অপরিচিত সমাজও মাঝে মাঝে এই বিরোধিতায় যোগ দিতেন। কিন্তু সত্যের জয় সর্বত্র—অভেদানন্দও গুরুকৃপায় এই সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াই চলিলেন। তাঁহার কার্যপদ্ধতি ছিল সর্বাপেক্ষা অল্প বাধার পথে চলা। এই জন্য তিনি বাইবেল-শাসিত খ্রীষ্টান সমাজে ধর্মযাজকদের অতুল প্রভাব আছে জানিয়া তাঁহাদের সহিত মিত্রতাস্থাপনকেই স্বীয় সাফল্যের উপায় স্থির করিলেন। কার্যতঃও দেখা গেল যে, তাঁহার ধারণা অমূলক নহে।

ধর্মযাজকদের বন্ধুত্বের সাহায্যে তিনি সহজেই গণ্যমান্য-সমাজে প্রবেশের সুযোগ পাইয়া তাহাদের মধ্যে বেদান্তপ্রীতি জাগাইয়া তুলিলেন। তাহার প্রচারপ্রণালী শুধু বক্তৃতা বা ক্লাস করাতেই আবদ্ধ ছিল না; তিনি বহু ক্ষেত্রে বন্ধুদের বাড়িতে অবস্থানপূর্বক তাহাদের প্রীতির সম্বন্ধকে আরও নিবিড়তর করিয়া তুলিতেন। বক্তৃতাতেও বাগ্মিতার প্রতি তাঁহার তেমন দৃষ্টি ছিল না, যেমন ছিল যুক্তি ও তথ্য-উদ্ঘাটনপূর্বক বিশ্বাস-উৎপাদনের প্রতি।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর হইতে ১৮৯৮-এর ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত সাত মাস সুকঠিন পরিশ্রমান্তে স্বামী অভেদানন্দ তখনকারমত কাজ বন্ধ করিলেন এবং গ্রীষ্মে বিশ্রামলাভের জন্য ওয়াশিংটনে গেলেন। সেখানে অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট মিঃ ম্যাকিন্‌লের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর ডাঃ জেন্‌সের আমন্ত্রণে কেম্ব্রিজ কন্‌ফারেন্সে যোগ দিবার জন্য তথায় গমন করিয়া শ্রীমতী ওলি বুলের বাড়িতে আশ্রয় লইলেন। এই সময়ে তিনি একদিন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসার জেম্‌সের বক্তৃতা শুনেন। জেম্‌স্ বেদান্তের একত্ববাদ খণ্ডন করিয়া বক্তৃতান্তে অভেদানন্দকে কেম্ব্রিজ কন্‌ফারেন্সে একত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে বলেন। অভেদানন্দ ইহাতে সম্মত হন। কন্‌ফারেন্সে বক্তৃতাশেষে প্রশ্নোত্তর হইল; প্রশ্নগুলি জেম্‌সের ছাত্ররাই করিলেন। সভার শেষে জেম্‌স তাঁহার করমর্দনপূর্বক তাঁহার যুক্তিগুলির প্রশংসা করিলেন এবং স্বীয় ভবনে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। উক্ত ভোজে আরও অনেক পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। ভোজের পর প্রায় চারি ঘণ্টা ধরিয়া 'বহুত্বে একত্ব' সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং জেম্‌স্ মহোদয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, একত্ববাদের পক্ষেও প্রবল যুক্তি আছে।

তখনও নিউইয়র্কের বক্তৃতা-কাল আরম্ভ হয় নাই; অতএব অভেদানন্দ

এই সুদীর্ঘ অবকাশে বষ্টন, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি স্থান-দর্শনান্তে হুইলার-দম্পতির আমন্ত্রণক্রমে মণ্ট্-ক্লেয়ারে তাঁহাদের নবপরিণীতা কন্যা ও জামাতাকে আশীর্বাদ করিতে গেলেন এবং তদনন্তর নায়েগারা জলপ্রপাত প্রভৃতি অনেক স্থান দেখিয়া তৃপ্তিলাভ ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিলেন। অবশেষে তিনি বাফেলো শহর হইয়া গ্রীন্‌একারে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে নিয়মিতভাবে গীতা-ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। তখনও তিনি নিরামিষাশী ছিলেন। কিন্তু বিদেশে উপযুক্ত রুচিকর ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শরীর ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতেছে জানিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী লিখিয়া পাঠাইলেন, "আহারাদি সম্বন্ধে আর তাদৃশ কঠোরতা করিবে না। তুমি সেখানে একদম নিরামিষ আহার না করিয়া উত্তম মৎস্যাদি আহার করিবে।" ডাঃ জেন্‌স্‌ও তাঁহার শারীরিক অবস্থা জ্ঞাত হইয়া বলিয়াছিলেন, "এভাবে এদেশে চলবে না। যখন যে দেশে থাকা যায়, সে দেশের রীতি মেনে চলতে হয়। আপনার জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে। পুষ্টিকর খাদ্য না খেলে যে অসুস্থ হয়ে পড়বেন।" এইসব উপদেশের ফলে তাঁহার কঠোরতা কিঞ্চিৎ শিথিল হইল।

গ্রীন্‌একার ছাড়িয়া তিনি বষ্টন্ (ম্যাস্) নগরে গেলেন। উহা দর্শনান্তে রোড্-দ্বীপের নিউপোর্ট দেখিয়া ৯ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে পৌঁছিলেন। সেই রাত্রেই আবার লঙ্গ্ আইল্যাণ্ডের ইস্ট্‌হ্যাম্প্‌টনে যাইয়া এপিস্কোপেল্ চার্চের মাননীয় ধর্মযাজক হিবার নিউটন্-এর অতিথি হইলেন। সেখানে সপ্তাহকাল বাসের পর নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিয়া পূর্বপরিচিত অধ্যাপক হার্শেল পার্কারের সহিত হোয়াইট্ পর্বত-আরোহণে চলিলেন। অতঃপর ৩০শে সেপ্টেম্বর প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি মিঃ লেগেটের অতিথি হইলেন। লেগেট্‌দের স্টোন্‌রিজের বাড়িতে সতর দিন বাস করিয়া তিনি তাঁহাদের নিউইয়র্কের বাড়িতে আসিলেন এবং

একটি বোর্ডিং হাউসে বাসস্থান ঠিক করিলেন। এখানে থাকিয়া তিনি বেদান্তপ্রচারকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করার মানসে মিঃ লেগেটের সভাপতিত্বে সংগঠিত বেদান্তসমিতিকে ২৮শে অক্টোবর দেশের আইন অনুসারে রেজেস্ট্রী করাইলেন। সমিতির জন্য ২২ শ স্ট্রীটের ১০৯নং পূর্ব এসেম্বলি হলটি ভাড়া করা হইল। এই হলে প্রথম বক্তৃতায় শ্রোতৃসংখ্যা হইল ১৫৩। অভেদানন্দ জানিতে পারিলেন—তিনি আমেরিকানদের হৃদয় জয় করিয়াছেন।

এই পর্যন্ত আমরা স্বামী অভেদানন্দের প্রাথমিক কার্যের একটা ধারাবাহিক ক্ষুদ্র চিত্র অঙ্কিত করিলাম। অতঃপর এই প্রবন্ধে এরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়াও সম্ভব হইবে না ; কিন্তু পাঠক বুঝিয়া লইবেন যে, তাঁহাকে অনেক ক্ষেত্রে এতদপেক্ষাও কঠিনতর অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল এবং সর্বত্রই তিনি বিজয়মণ্ডিত হইয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি যে, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য-শিষ্যা ও পরিচিতদের পূর্ণ সাহায্য পাইলেও নিজের উদ্যমে বহু নূতন বন্ধু সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কপর্দকহীন সন্ন্যাসীকে আহারাদির জন্য পরমুখাপেক্ষী থাকিতে হইলেও তিনি সর্বদা সর্বত্র সসম্মানে আহূত হইতেন এবং অতি সম্ভ্রান্তপরিবারেও সাদরে গৃহীত হইতেন। তিনি প্রচারকার্যের জন্য সকলেরই যথাসাধ্য সাহায্য লইতেন ! আর তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা তাঁহাকে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া লইয়া চলিয়াছিল। তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন কবি, দার্শনিক, গায়ক, চিত্রকর, বৈজ্ঞানিক, আবিষ্কারক, পর্বতারোহক ইত্যাদি। এইরূপে ঘরোয়া আলোচনা, ক্লাস, বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির সাহায্যে তিনি স্বামীজীর প্রবর্তিত বেদান্তপ্রচারকে বহুবিস্তৃত করিয়া তুলিলেন।

তাঁহার কোন কোনও বক্তৃতা এত সুন্দর হইতেছিল যে, উহা দুই বা ততোধিক বার পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছিল। 'পুনর্জন্মবাদ' সম্বন্ধে তিনটি

বক্তৃতা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হওয়ায় জনৈক শ্রোতা নিজব্যয়ে উহার ২০০০ খানি ছাপিয়া বক্তাকে উপহার প্রদান করেন। ইহাই তাঁহার পুস্তক-প্রকাশের ভিত্তি হইল। এই সকল গ্রন্থাদির আলোচনায় দেখা যায় যে, স্বামী অভেদানন্দ বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যায় অপূর্ব ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেন। তিনি শ্রোতাদের চিরবদ্ধ সংস্কারে অযথা আঘাত না দিয়া এমন ধীর ও শান্তভাবে তাহাদিগকে স্বমতে আনিতে চেষ্টা করিতেন যে, তাহারা জানিতেই পারিত না—তাহারা কখন স্বমত পরিত্যাগ করিয়া নবমতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের সহিত সুপরিচিত থাকায় তিনি তাহাদের চিরাভ্যস্ত চিন্তাধারায় চলিয়া তাহাদিগকে ক্রমে অজ্ঞাতসারে বেদান্তমতে অধিরূঢ় করাইতেন।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল তিনি ছয়জন ছাত্র ও ছাত্রীকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করিলেন। অতঃপর বক্তৃতার কাল শেষ হইলে বোর্ডিং-হাউস্ ছাড়িয়া পূর্ববারের অবকাশকালের ন্যায় বিভিন্ন স্থানে বন্ধুদের বাড়িতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন বন্ধুলাভ, বক্তৃতা ও ভাববিনিময়ে যত্নপর হইলেন। এই অবকাশকালেই তিনি লিলি ডেলে প্রেততত্ত্ববিদ্‌দিগের সভায় যোগদান করেন ও বক্তৃতা দেন; অধিকন্তু কয়েকটি প্রেতাবতরণ-চক্রেও উপবেশন করেন। তারপর গ্রীনএকার কন্‌ফারেন্সে বক্তৃতাপ্রদানান্তে তিনি সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভে বষ্টনে পৌছিয়া খবর পাইলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ পুনর্বার আমেরিকায় আসিয়াছেন; অতএব কালবিলম্ব না করিয়া রিজ্‌লে ম্যানরে মিঃ লেগেটের বাড়িতে স্বামীজী ও তৎসহ নবাগত স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত মিলিত হইলেন এবং দশ দিন ইঁহাদের সঙ্গসুখ-উপভোগান্তে নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিলেন।

নিউইয়র্কের বেদান্তপ্রচারের সঙ্গে অভেদানন্দ আর একটি উল্লেখযোগ্য কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন—উহা হইতেছে বালকবালিকাদের ক্লাস। তিনি

হিতোপদেশাদি গ্রন্থ হইতে কাহিনী-বিশেষ মনোনীত করিয়া তদবলম্বনে এক ঘণ্টা কাল তাহাদের সহিত প্রতি শনিবার অপরাহ্ণে গল্পগুজবে ব্যাপৃত থাকিতেন এবং ঐ ভাবে তাহাদের সুকুমার মনগুলিকে গড়িয়া তুলিতেন। ইহা খুবই চিত্তাকর্ষক ছিল এবং কোন কোন বালকবালিকা ইহার লোভে কষ্ট স্বীকার করিয়া দূর দূর স্থান হইতে হাঁটিয়াও আসিত। পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহাকে এই কার্যে সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন।

অভেদানন্দ নিউইয়র্কে আসিয়া প্রথমে মট্ মেমরিয়াল হলে বক্তৃতা আরম্ভ করেন। ১৮৯৮-৯৯এ পাঁচ মাস তিনি এসেম্বলী হলে বক্তৃতা দেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর হইতে ম্যাডিসন্ এভিনিউতে অবস্থিত ৫৯নং স্ট্রীটের টাক্সেডো হলে বক্তৃতা হয় এবং ১৪৬নং ইস্ট ৫৫ স্ট্রীটের বাড়িতে বেদান্ত-সমিতির কার্যালয়াদি স্থাপিত হইয়া উহাতেই বিভিন্ন বিষয়ে ক্লাস চলিতে থাকে।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের প্রারম্ভে বেদান্ত-সমিতি ১০৩নং ইস্ট ৫৮ স্ট্রীটের বাড়িতে উঠিয়া গেল। এখানেই স্বামীজী ইউরোপ যাইবার পথে আসিয়া স্বামী অভেদানন্দ ও তুরীয়ানন্দের সহিত বাস করিতে থাকিলেন। সমিতির নামে সমস্ত বাড়িটাই ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। এই কার্যে অভেদানন্দের অসীম সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। এই বাড়িতে আসার আগে অকস্মাৎ ৩০শে এপ্রিল তিনি সংবাদ পাইলেন যে, পূর্বের বাড়ি ছাড়িয়া দিতে হইবে। তদনুসারে ২রা মে বাড়ি ছাড়িয়া পরিচিত জনৈক বন্ধুর নিকট গিয়া জানিলেন যে, তাঁহার হাতে ৫৮ স্ট্রীটের বাড়িখানি আছে; উহার ভাড়া মাসিক ৭৫ ডলার। হাতে টাকা নাই; তথাপি ঠাকুরের উপর ভরসা করিয়া এবং মাত্র ১০ ডলার অগ্রিম দিয়া তিনি তখনই সেই বাড়িতে প্রবেশ করিলেন।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের বক্তৃতাগুলির কোন কোনটিতে শ্রোতৃসংখ্যা ৬০০

পর্যন্ত উঠিল এবং যোগের ক্লাসেও ছাত্রসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় দুইবার করিয়া ক্লাসের ব্যবস্থা করিতে হইল। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সভা-সমিতি প্রভৃতিতেও অভেদানন্দ বহু মনীষীর সমক্ষে বক্তৃতা করিতে আহূত হইতেন। এই সময় হইতে বক্তৃতা-ঋতুতে এত অর্থ-সমাগম হইতে লাগিল যে, আগের মত বক্তৃতার কয় মাস শেষ হইতেই বাড়ি ছাড়িয়া দেওয়ার আবশ্যক হইত না। এই বৎসর গ্রীষ্মাবকাশে তিনি বিভিন্ন স্থান-দর্শনান্তে পশ্চিম উপকূলে 'শান্তি আশ্রমে' স্বামী তুরীয়ানন্দের নিকট গমন করেন। অভেদানন্দ এখানে ছয় দিন অবস্থান করিয়া ১২ই আগস্ট আশ্রম পরিত্যাগ-পূর্বক স্যান্ ফ্রান্সিস্কো আসিলেন এবং ঐ শহরে ও পার্শ্ববর্তী স্থানগুলিতে পরিভ্রমণ, ঘরোয়া বৈঠক ও আলাপাদি-সাহায্যে বেদান্তপ্রচার করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তিনি অধ্যাপক হাউইসনের আমন্ত্রণে বার্কলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফিলোসফিক্যাল ইউনিয়নে প্রায় চারিশত শ্রোতার সম্মুখে দেড় ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা করেন। এই ঋতুর ভ্রমণকালে ইহাই তাঁহার একমাত্র বক্তৃতা। ইহার পর পশ্চিমাঞ্চল-ভ্রমণ শেষ করিয়া তিনি ৭ই অক্টোবর নিউইয়র্কে উপস্থিত হইলেন এবং ৩রা নভেম্বর হইতে আবার যথারীতি বেদান্তসমিতির কার্য আরম্ভ করিলেন। এবারে বক্তৃতা ও ক্লাস কার্নেগী লাইসিয়ামে চলিতে লাগিল।

অভেদানন্দ এখন দার্শনিক বলিয়া পরিচিত এবং রয়েস্, জেম্‌স্, হাউইসন্, ল্যান্‌ম্যান্ প্রভৃতি পণ্ডিতাগ্রণী অধ্যাপকদের দ্বারা বিশেষ সম্মানিত। মিঃ লেগেটের পদত্যাগের পর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হার্শেল সি পার্কার বেদান্ত-সমিতির সভাপতি হইয়াছেন। রবি-বাসরীয় বক্তৃতা, শিশুক্লাস ও যোগক্লাস নিয়মিত চলিতেছে। প্রতি বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব যথাবিধানে অনুষ্ঠিত হইতেছে। বেদান্ত-সমিতি হইতে পুস্তকাদি প্রকাশিত হইয়া বিক্রয় হইতেছে এবং সমিতির

সভ্য ও বন্ধুসংখ্যা বহুগুণ বর্ধিত হইয়াছে। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগেও অনুরূপ কার্য-পরিচালনা করিয়া ৭ই আগস্ট তিনি ইউরোপ যাত্রা করিলেন।

প্রথমতঃ ইংলণ্ডে অবতরণ করিয়া তিনি স্কট্ল্যাণ্ডের গ্লাস্‌গো প্রভৃতি নগর ও ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থান দর্শন করিলেন। অতঃপর ফ্রান্স অতিক্রম করিয়া সুইট্জ্যারল্যাণ্ডে উপস্থিত হইলেন। সেখানে জেনেভা হ্রদ দর্শন ও বিভিন্ন পর্বতশিখরে আরোহণজনিত অপূর্ব আনন্দানুভব করিয়া তিনি প্যারি হইয়া লণ্ডনে আসিলেন এবং অনতিবিলম্বে ৩রা অক্টোবর নিউইয়র্ক যাত্রা করিলেন।

নিউইয়র্কে আগমনান্তে তাঁহার প্রথম কার্য হইল আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিসভা আহ্বান করিয়া বীর সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার ও আমেরিকাবাসী সকলের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন। সেদিন উদ্বেলিত-হৃদয়ে অভেদানন্দ জানাইলেন, স্বামীজীর নিকট তাঁহারা কত ঋণী এবং সভায় স্বামীজীকে নিউইয়র্কের বেদান্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া অভিহিত করা হইল। স্মৃতিতর্পণের পর নিয়মিতভাবে বেদান্তসমিতির কার্য্য চলিতে লাগিল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত কার্যবিবরণ হইতে দেখা গেল যে, সমিতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইয়াছে—সভ্য ও বন্ধুসংখ্যা আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে; অর্থব্যয় অপেক্ষাকৃত অধিক হইলেও কোষে কিছু সঞ্চিত রহিয়াছে এবং ৫২৫০খানি পুস্তিকা ও ২৫০০খানি পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে। অতঃপর বক্তৃতাকার্য সমাপ্ত করিয়া অভেদানন্দ ১৫ই মে ইটালীভ্রমণে বহির্গত হইলেন। এবারে ইটালী, সুইটজ্যারল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম প্রভৃতি দর্শনান্তে তিনি ২৭শে সেপ্টেম্বর আমেরিকাগামী জাহাজে উঠিলেন।

অতঃপর ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের যে প্রচার-ঋতু আরম্ভ হইল, উহাতে যোগশিক্ষাদানাদিকার্যে তিনি এতই ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন যে, বাধ্য হইয়া

শিশুক্লাশটি বন্ধ করিতে হইল। ঐ বৎসর ১৮ই নভেম্বর স্বামী নির্মলানন্দ নিউইয়র্কে পৌঁছিয়া ১২ই ডিসেম্বর হইতে সংস্কৃত ক্লাস আরম্ভ করিলেন এবং অন্যান্য কার্যেও অভেদানন্দকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। পর বৎসর ৪ঠা মে বেদান্ত-সমিতি ৬২নং ওয়েস্ট ৭১ স্ট্রীটের প্রশস্ত বাড়িতে উঠিয়া গেল। এই বাড়ির হলে ৩০০ শ্রোতার বসিবার আসন ছিল। সুতরাং এখন হইতে বাহিরে হল ভাড়া করার প্রয়োজন হইত না। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন অভেদানন্দ পুনর্বার ইউরোপ যাত্রা করিলেন। এইবার উদ্দেশ্য অষ্ট্রীয়া ও বাভেরিয়ার টাইরলের হাই আল্পস্ আরোহণ করা। ইউরোপ হইতে তিনি ১৬ই অক্টোবর নিউইয়র্কে ফিরিলেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ৩০শে জানুয়ারী ব্রুক্‌লিনে একটি বেদান্তকেন্দ্র-স্থাপনানন্তর উহার কার্যভার স্বামী নির্মলানন্দের উপর অর্পিত হইল। ফেব্রুয়ারীর প্রথম ভাগে স্বামী অভেদানন্দ কানাডায় বক্তৃতা উপলক্ষে গেলেন এবং কানাডার বিভিন্ন স্থান, আমেরিকার পশ্চিমোপকূল ও মেক্সিকো প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ ও বক্তৃতাদি করিয়া ২৭শে অক্টোবর নিউইয়র্কে ফিরিলেন। এই বৎসর ১৪ই নভেম্বর হইতে ১৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি প্রতি মঙ্গলবারে ব্রুক্‌লিন ইন্‌স্টিটিউটে ভারত সম্বন্ধে তিন-চারি শত শ্রোতার সম্মুখে যে-সকল বক্তৃতা দেন, উহাই পরে 'ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড হার পীপ্‌ল' (ভারত ও ভারতবাসী) নামক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া স্বদেশ ও বিদেশে তাঁহাকে ভারতীয় জাতীয়তা ও কৃষ্টির অন্যতম প্রতিনিধিরূপে সুপরিচিত করিয়া দেয়।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের বার্ষিক অধিবেশনে স্থির হইল যে, সমিতির নিজস্ব বাটীনির্মাণ আবশ্যক। ঐ বৎসর ২৭শে জানুয়ারী স্বামী নির্মলানন্দ ভারতে ফিরিয়া গেলেন ; ইহার কয়েক মাস পরে ১৬ই মে স্বামী অভেদানন্দ ভারতযাত্রা করিলেন। ইতোমধ্যে তাঁহার অনুপস্থিতিতে

নিউইয়র্কের কার্যপরিচালনের জন্য স্বামী বোধানন্দ ১৫ই এপ্রিল বোম্বাই বন্দরে জাহাজে উঠিলেন এবং ১লা জুন হইতে তাঁহার নেতৃত্বে নিউইয়র্কের কার্য আবার আরম্ভ হইল। এদিকে এই কয় বৎসরের বিপুল সাফল্য লইয়া স্বামী অভেদানন্দ ১৬ই জুন কলম্বোতে পদার্পণ করিলে কলম্বো-বাসীরা তাঁহাকে সমুচিত অভ্যর্থনা জানাইল। অতঃপর তিনি কাণ্ডি, জাফ্‌না ও অনুরাধাপুরম্‌ দর্শন এবং নানা স্থানে বক্তৃতাদি করিয়া জাহাজে টিউটিকোরিন পৌঁছিলেন। সেখানেও অনুরূপ অভ্যর্থিত হইয়া ও বক্তৃতাদি করিয়া দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ স্থানগুলির দর্শনে নির্গত হইলেন, অধিকন্তু সর্বত্র বেদান্তের মহিমাও প্রচার করিলেন। ঐ অঞ্চলের মধ্যে বাঙ্গালোরেই জনসাধারণের সর্বাধিক উৎসাহ দেখা গেল। দাক্ষিণাত্যের ভ্রমণ-সমাপনান্তে ২৩শে আগস্ট তিনি পুরীধামে উপস্থিত হইলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ ও প্রেমানন্দ তাঁহাকে স্টেশন হইতে ৺জগন্নাথদেবের মন্দিরে লইয়া গেলেন এবং পরে 'শশিনিকেতনে' উপস্থিত করিলেন। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রায় সর্বত্রই তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া তীর্থদর্শন, ভক্তদের সহিত আলাপ-পরিচয়, বক্তৃতার আয়োজন প্রভৃতি সকল বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিলেন; কিন্তু একসঙ্গে নীলাচলে আসিতে পারেন নাই। দুই-তিন দিন পরে তিনিও আসিলেন। তীর্থশ্রেষ্ঠ জগন্নাথধামে এই গুরুভ্রাতৃসম্মিলনে যে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইল অভেদানন্দ তাহাতে কিয়ৎদ্দিবস যথাভিরুচি অবগাহন করিয়া ৮ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা যাত্রা করিলেন। স্বদেশাগত অভেদানন্দকে বঙ্গবাসীরাও সমুচিত সংবর্ধনা জানাইল এবং তাঁহার মুখে বেদান্তের মহিমা শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হইল। অনন্তর ৫ই অক্টোবর তিনি পাটনা যাত্রা করিলেন এবং পাটনার পরে কাশী, আগ্রা, আলোয়ার ও আহমেদাবাদ হইয়া বোম্বাই পৌঁছিলেন। পথে বহু স্থানেই তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল।

অবশেষে ১০ই নভেম্বর (১৯০৬) তিনি স্বামী পরমানন্দকে সঙ্গে লইয়া আমেরিকা যাত্রা করিলেন।

বেদান্ত-সমিতির নিজস্ব গৃহসংগ্রহের জন্য পূর্বসঙ্কল্পানুযায়ী ১৯০৭ ইং-র ২রা মার্চ ১০৫ ওয়েস্ট, ৮০নং স্ট্রীটের ভবনটি ক্রয় করা হইল। সমকালেই অপর একটি আশ্রম-স্থাপনের জন্য ওয়েস্ট কর্ণওয়াল স্টেশন হইতে চারি মাইল দূরে ১৫০ একর পরিমিত এক মনোরম স্থান ও তৎসহ বাটী ক্রীত হইল। উহা বার্কশায়ার জেলার অন্তর্গত ও নিউইয়র্ক হইতে ১৫০ মাইল দূরে। উদ্দেশ্য রহিল যে, বেদান্ত-প্রচারে নিরত স্বামীজীদের ইহা একটি বিশ্রামস্থান হইবে, বেদান্তের ছাত্র-ছাত্রীরাও মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া নির্জনে সাধন করিতে পারিবেন এবং সেখানে গ্রীষ্মাবকাশে শিক্ষাও চলিতে থাকিবে। ইতোমধ্যে স্বামী অভেদানন্দের প্রত্যাবর্তনানন্তর স্বামী বোধানন্দ পিট্‌স্‌বার্গের বেদান্তকেন্দ্রের ভার লইয়া তথায় চলিয়া গেলেও নবাগত স্বামী পরমানন্দকে নিউইয়র্কে রাখিয়া অভেদানন্দের পক্ষে ইউরোপ-ভ্রমণাদির অসুবিধা হইল না। এইভাবে ঐ বৎসর জুলাই মাসে তিনি ইংলণ্ডে উপস্থিত হন এবং ২৯শে আগস্ট পর্যন্ত তথায় অবস্থানান্তে আমেরিকায় ফিরিয়া আসেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী তিনি পুনর্বার ইংলণ্ডে গমন করিলেন। এই যাত্রায় বক্তৃতা ব্যতীত যোগের ক্লাসও চালাইতে হইল। ক্রমে ১লা জুলাই ২২নং কণ্ডুইট্ স্ট্রীটে বেদান্ত-সমিতির উদ্বোধন হইল। এই উদ্বোধনকার্যে ভগিনী নিবেদিতাও উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর লণ্ডনের কার্য-সমাপনান্তে তিনি ২১শে আগস্ট নিউ-ইয়র্কে পদার্পণ করিলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেও তিনি পুনর্বার লণ্ডনে গিয়াছিলেন। ঐ যাত্রায় তিনি প্যারিতে একমাস ছিলেন এবং যথারীতি গীতা, রাজযোগ ও ধ্যানের ক্লাস চালাইয়াছিলেন। ঐ বৎসর জুন মাসের শেষে তিনি নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে

তাঁহার অন্যতম প্রধান কাজ হইল 'ইন্দো-আমেরিকান্' (ভারত-আমেরিকান) ক্লাব-সংগঠন। ইহাতে একদিকে যেমন ভারতীয় ছাত্রগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইলেন, অপরদিকে তেমনি তাঁহারা আমেরিকানদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আসিবার সুযোগ পাইলেন।

বেদান্ত-সমিতির বাড়িটি ক্রয় করিতে ঋণ হইয়াছিল। স্বামী অভেদানন্দ বিগত কয়েক বৎসর অধিকাংশ সময় বাহিরে থাকায় সমিতির সভ্য-সংখ্যা ও আয় কমিয়া গেল; সুতরাং ধারশোধ করিবার জন্য অধিকাংশ কক্ষই ভাড়া দিয়া ১৯১০ ইং-র মে মাস হইতে তিনি বার্কশায়ারের আশ্রমে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং ভারতে ব্রহ্মানন্দজীকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, নিউইয়র্কের কার্যের সহিত তাঁহার আর সম্বন্ধ নাই, অতএব অপর কেহ যেন ঐ কার্যের জন্য আসেন। স্বামী পরমানন্দ ইতঃপূর্বেই নিউইয়র্কের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া বষ্টনের কার্যে মন দিয়াছিলেন। কাজেই ১৯১২ হইতে স্বামী বোধানন্দ নিউইয়র্কের কার্যভার প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে বার্কশায়ারে সমাগত অভেদানন্দেরও কার্যের প্রসার হইতে লাগিল; সেখানেও নিত্য লোক-সমাগম নিতান্ত অল্প ছিল না।

এই ভাবে দীর্ঘকাল দক্ষতার সহিত বেদান্তপ্রচার চালাইয়া কর্মক্লান্ত অভেদানন্দ স্বদেশে প্রত্যাগমনের জন্য ব্যাকুল হইলেন। সেই জন্য ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগ হইতেই আমেরিকার কাজ গুটাইতে লাগিলেন। নভেম্বরে আশ্রমবিক্রয়ের জন্য বায়না হইয়া গেল এবং ১৫ই ডিসেম্বর তিনি নিউইয়র্কে চলিয়া আসিলেন। সেখান হইতে অচিরে সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে উপনীত হইলেন। এই শহরে তিনি পূর্ণ এক বৎসর বেদান্ত-আন্দোলন চালাইয়া ১৯২০ অব্দের ২১শে ডিসেম্বর লস্ এঞ্জেলিস যাত্রা করিলেন। পরবর্তী বৎসরের ১৯শে জুন পর্যন্ত সেখানে নিয়মিতভাবে

প্রচারকার্য চালাইয়া ২৭শে জুলাই (১৯২১) তিনি সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো হইতে শেষ বারের মত ভারতে চলিলেন। পথে হনলুলুতে ১১ হইতে ২১শে আগস্ট পর্যন্ত প্যান্‌ প্যাসিফিক্‌ এডুকেশন কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিয়া আবার জাহাজ ধরিলেন এবং জাপান, হংকং ইত্যাদি দেখিয়া সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর সিঙ্গাপুর, কোয়ালালাম্‌পুর ও রেঙ্গুনে অভিনন্দিত হইয়া এবং বক্তৃতাদি করিয়া ১০ই নভেম্বর কলিকাতায় অবতরণ করিলেন।

বেলুড় মঠে বাসকালে তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে অভিনন্দিত করিলেন। পরবৎসরের প্রারম্ভে তিনি জামসেদপুরে বক্তৃতা করিতে গেলেন এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারী স্বামী শিবানন্দের সহিত পূর্ববঙ্গ যাত্রা করিলেন। কিছুদিন পরেই বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তনপূর্বক স্বামী ব্রহ্মানন্দের দেহত্যাগ পর্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়া শিলং ও ৺কামাখ্যাদর্শনে নির্গত হইলেন। আমেরিকা হইতে সদ্যঃ-প্রত্যাগত প্রথিতযশা শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য অভেদানন্দ যেখানে যাইতেন সেইখানেই উৎসাহ উদ্দীপিত হইত এবং তাঁহাকেও বক্তৃতা ও উপদেশাদির দ্বারা লোকের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটাইতে হইত। শিলং এবং গৌহাটীতেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। শিলং হইতে ফিরিয়াই তিনি তিব্বত-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। তিব্বতযাত্রার পথে তিনি কাশী, লাহোর ও রাওলপিণ্ডি দেখিয়া শ্রীনগরে উপনীত হইলেন এবং তথা হইতে যাত্রা করিয়া প্রায় দুই মাস পরে হেমিস্‌ গুম্ফায় পৌঁছিলেন। এখান হইতে শ্রীনগরে ফিরিতে তাঁহার আরও একমাস লাগিয়াছিল। তদনন্তর তক্ষশীলা ও পেশোয়ার-দর্শনান্তে তিনি হৃষীকেশে গেলেন। পুণ্যস্মৃতিপূত এই ক্ষেত্র দর্শনপূর্বক কনখল হইয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন।

পূর্ণোদ্যমী প্রচারকের পক্ষে সর্ববিষয়ে অনুকূল আমেরিকার নগরসমূহে দীর্ঘকাল বেদান্ত-আন্দোলনে নিযুক্ত অভেদানন্দ বুঝিয়াছিলেন যে, মহানগরী

হইতে দূরে, চিরাভ্যস্ত জীবনযাপনের প্রতিকূল ও প্রচারের উপযুক্ত সুযোগ-বিহীন ক্ষুদ্র গ্রাম বেলুড়ে পড়িয়া থাকিলে তাঁহার জীবনকে পঙ্গু করা হইবে। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক গ্রন্থ ও বহুবিধ দ্রব্যাদি লইয়া স্বল্প-পরিসর মঠবাটীতে বাস করাও আয়াসসাধ্য ছিল। অতএব ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, কলিকাতায় একটি বেদান্তকেন্দ্র-স্থাপন অত্যাবশ্যক। এই অভিপ্রায়ানুসারে ১৯২৩ অব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী তিনি ৪৫-বি মেছুয়া বাজারের ভাড়াটে বাড়িতে পরিকল্পিত কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই বাড়িতে আড়াই মাস বাস করিয়া তিনি তাঁহার চিরাচরিত প্রথায় বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা ও দীক্ষাদির সাহায্যে বেদান্ত-আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। তারপর তিনি ১লা মে হইতে ১১নং ইডেন হস্পিটাল রোডের বাড়িতে উঠিয়া গেলেন। এখানে ক্রমে ত্যাগী শিষ্যদের আগমন হইতে থাকিল এবং এখানেই বেদান্ত-সমিতির যথার্থ গোড়াপত্তন হইল। ১৯২৪ অব্দে দার্জিলিং যাইয়া তিনি একটি আশ্রম-প্রতিষ্ঠার জন্য 'রুবি কটেজ' নামক দুইখানি গৃহসমেত একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিলেন। পরে গৃহাদির আবশ্যক পরিবর্তনান্তে ১৯২৫ অব্দের কার্তিক মাসে 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত-আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হইল।

এদিকে কলিকাতার বেদান্ত-সমিতির কার্য প্রসার পাইয়াছে; সুতরাং বৃহত্তর বাটীর আবশ্যক হওয়ায় স্বামী অভেদানন্দ সদলবলে ৪০নং বিডন স্ট্রীটে উঠিয়া আসিলেন। ইতোমধ্যে ভারতীয় জীবনের সহিত পুনঃসংযোগস্থাপনের ফলে জনসাধারণের প্রয়োজন সম্বন্ধে তিনি অধিক অবহিত হওয়ায় তাঁহার কর্মধারা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইল। তিনি স্থির করিলেন যে, এই দরিদ্র দেশে সমিতির কর্মিবৃন্দকে বেদান্ত-প্রচারের সহিত শিক্ষা ও সমাজসেবায়ও আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। এইরূপে দার্জিলিং ও কলিকাতার কেন্দ্রদ্বয় সমাজকল্যাণেও যথাসম্ভব

আত্মোৎসর্গ করিল। বস্তুতঃ রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত সমিতির শুধু ভাবগত ঐক্যই রক্ষিত হইল না, কার্যতঃও সহযোগিতা চলিতে থাকিল। এতদ্ব্যতীত স্বামী শিবানন্দ ও সারদানন্দ প্রভৃতি প্রাচীন সন্ন্যাসীদের সমিতিতে আগমন ও অভেদানন্দের বেলুড় মঠে প্রায়শঃ গমনের দ্বারা সংযোগসূত্র দৃঢ়ীকৃত হইল। ১৯২৬-এর মার্চ মাসে এই হৃদ্যতার বহিঃপ্রকাশস্বরূপে বেদান্ত-সমিতিতে একটি সাধুসম্মিলন হইল এবং স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ বেলুড় মঠের ও কলিকাতাস্থ অপর সব মঠের সাধুগণ বেদান্তমঠে আসিয়া আহার করিলেন। কিন্তু এইরূপ বিবিধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বেদান্ত-সমিতি ক্রমেই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গেল—পরিশেষে শুধু স্বামী অভেদানন্দের সহিত মঠ ও মিশনের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ রক্ষিত হইল।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের উল্লেখযোগ্য ঘটনা—বেদান্ত-সমিতির মুখপত্র 'বিশ্ববাণী'র প্রকাশ এবং ১৯২৯-এর সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা—সমিতির জন্য ১৬নং রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটে ১১ কাঠা জমি ক্রয় করিয়া বাটী-নির্মাণের সুবিধার জন্য সমিতিকে ঐ রাস্তার ১০নং বাড়িতে তুলিয়া আনা। এই সময় হইতে দেখা গেল যে, স্বামী অভেদানন্দের দৈনন্দিন কার্যে আর তেমন মন নাই—তিনি যেন স্বীয় সন্তানদিগকেই সর্বকার্যে সম্মুখে ঠেলিয়া দিয়া নিজে পশ্চাতে চলিয়া যাইতে সচেষ্ট। অতঃপর তিনি প্রধানতঃ দার্জিলিংএ বাস করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে ভক্তদের আহ্বানে কলিকাতায় আসিয়া তাহাদের আধ্যাত্মিক পিপাসা মিটাইতে লাগিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী একসময়ে বলিয়াছিলেন, "কালী যখন তার বাইরের কাজ কমিয়ে দেবে, তখনই তার আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ লোকে বুঝতে পারবে।" বর্তমানে তাহাই ঘটিল। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আজ সরল শিশুর ন্যায় সকলের সঙ্গে এমনভাবে মিশিতে লাগিলেন যেন তিনি তাঁহাদেরই একজন। দূর হইতে বক্তৃতার ছটায় মুগ্ধ করা আজ তাঁহার কাজ নহে, এখন ভক্তগণের অন্তরে

প্রবেশপূর্বক তাহাদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবে অনুপ্রাণিত করাই তাঁহার জীবনের শেষ ব্রত।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে নূতন মঠের একতলা সম্পূর্ণ হইলে সমিতি উহাতে উঠিয়া আসিল। কিন্তু স্থানের অপ্রাচুর্য-বশতঃ স্বামী অভেদানন্দ তখনও দার্জিলিংয়েই রহিয়া গেলেন। ১৯৩৪-এর শেষভাগ হইতে তিনি কলিকাতার অর্ধসমাপ্ত আশ্রম-ভবনে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কয়েক মাস পরেই (৬ই মার্চ, ১৯৩৫) আশ্রমের ভূমিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিলেন। কলিকাতা ও দার্জিলিং-এর আশ্রম দুইটিকে দেবোত্তর সম্পত্তি করিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহার মনে ছিল। কিন্তু কলিকাতার সম্পত্তি ঋণভারে জর্জরিত থাকায় উহাকে আপাততঃ দেবোত্তর করিতে পারিলেন না; ১৯৩৬-এর মে মাসে দার্জিলিং-এর আশ্রমটিকে ঐরূপ করিয়া দিলেন।

তখন শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিক উৎসব চলিতেছিল। ১৯৩৭ অব্দের ১লা মার্চ তিনি টাউন হলে 'পার্লামেণ্ট্ অব্ রিলিজনে'র উদ্বোধন-সভায় সভাপতিত্ব করিলেন। সেদিন তাঁহাকে দুইবার বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। ইহার পরদিন তিনি লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহাই তাঁহার শেষ অভিভাষণ। ইতোমধ্যে বেদান্ত-সমিতিতে মন্দিরের কার্য শেষ হইয়া গিয়াছে। ২রা মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে তিনি কলিকাতার আশ্রমে বিবেকানন্দ-স্মৃতিভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন এবং মন্দিরে যথাস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণের পটস্থাপনান্তে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। দার্জিলিং-এর আশ্রমে তখনও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠা হয় নাই; তাই তিনি সেখানে যাইয়া ২৯শে আগস্ট শ্রীশ্রীঠাকুরের পটে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহাই তাঁহার শেষ দার্জিলিং-গমন। অতঃপর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আর মাত্র দেড় বৎসর তিনি মর্ত্যধামে ছিলেন।

কলিকাতায় ফিরিবার কিয়ৎকাল পরেই সমিতির পক্ষ হইতে সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার নামে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হইল এবং তিনিও ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ জন্মতিথিতে উহা দেবোত্তর সম্পত্তি করিয়া দিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার জীবনের আর একটি অসমাপ্ত কার্য ছিল তাঁহার অপ্রকাশিত বক্তৃতাবলী একবার দেখিয়া দেওয়া; সুতরাং আহারের পর প্রতিরাত্রে প্রধান প্রধান বক্তৃতাগুলির পাঠ চলিতে লাগিল—তিনি শুনিয়া মাঝে মাঝে সংশোধন করিয়া দিতে লাগিলেন।

জীবনের কর্মসমাপনান্তে শেষ দেড় বৎসর তিনি প্রায় শয্যাগত ছিলেন বলিলেই চলে। তবে সমাগত কাহাকেও তিনি ফিরাইয়া দিতেন না; শয্যায় শুইয়াই সকলকে অমায়িক ব্যবহার ও আলাপে আপ্যায়িত করিতেন। নন্দোৎসবের পরদিন ৮ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) সকালে ৮-১৬ মিনিটে তিনি সমাধিযোগে মহাপ্রয়াণ করিলেন। সংবাদ পাইয়া চারিদিক হইতে বন্ধু-বান্ধব ও শিষ্যেরা সমাগত হইলেন। বেলুড় মঠ ও উদ্বোধনাদি কলিকাতার মঠগুলি হইতেও সাধুরা আসিয়া শেষ দর্শন করিয়া গেলেন এবং শেষকৃত্যে যোগ দিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিলেন। তাঁহারই অভিপ্রায়ানুসারে কাশী-পুরের শ্মশানে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধিমন্দিরের ঠিক উত্তরেই পুষ্পমাল্য ও চন্দনাদিতে ভূষিত হইয়া তাঁহার দেহ চন্দনকাষ্ঠে সজ্জিত চিতাগ্নিতে আহুত হইল।

স্বামী অদ্ভুতানন্দ

স্বামী অদ্ভুতানন্দ

লাটু মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত সৃষ্টি। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "লাটু যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য হইতে আসিয়া অল্প দিনের মধ্যে আধ্যাত্মিক জগতে যতটা উন্নতিলাভ করিয়াছে, আর আমরা যে অবস্থা হইতে যতটা উন্নতিলাভ করিয়াছি—এতদুভয়ের তুলনা করিয়া দেখিলে সে আমাদের অপেক্ষা অনেক বড়। আমরা সকলেই উচ্চবংশজাত এবং লেখাপড়া শিখিয়া মার্জিত বুদ্ধি লইয়া ঠাকুরের নিকট আসিয়াছিলাম; লাটু কিন্তু সম্পূর্ণ নিরক্ষর। আমরা ধ্যান-ধারণা ভাল না লাগিলে পড়াশুনা করিয়া মনের সে ভাব দূর করিতে পারিতাম; লাটুর কিন্তু অন্য অবলম্বন ছিল না—তাহাকে একটিমাত্র ভাব-অবলম্বনেই চলিতে হইয়াছে। কেবলমাত্র ধ্যান-ধারণা সহায়ে লাটু যে মস্তিষ্ক ঠিক রাখিয়া অতি নিম্ন অবস্থা হইতে উচ্চতম আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, তাহাতে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির ও তাহার প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ কৃপার পরিচয় পাই।"

লাটুর শৈশবের নাম ছিল রাখ্‌তু-রাম। কথিত আছে যে, শৈশবে বসন্তরোগের আক্রমণে তাঁহার জীবনসংশয় উপস্থিত হইলে তাঁহার মাতা শ্রীরামচন্দ্রের নিকট সন্তানের জন্য আকুল প্রার্থনা জানান। অতঃপর শিশু সুস্থ হইলে মাতার ধারণা জন্মিল, শ্রীরামচন্দ্রই পুত্রকে রক্ষা করিয়াছেন। এই বিশ্বাসের ফলেই তাঁহার ঐ নাম হয়। রাখ্‌তু-রাম ছাপরা জেলার কোন পল্লীগ্রামে এক মেষপালকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্যজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায়

নাই; কারণ যখনই তাঁহাকে এইসব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইত, তিনি বিরক্তি-সহকারে বলিতেন, "আরে, ঈশ্বরতত্ত্ব ছেড়ে দিয়ে তোরা কি আমার কথা নিয়ে সময় কাটাবি? আমার কথা জানবার কি দরকার আছে? তোরা আমায় ঝুট মুট দিক করিস নি!"[১] এইরূপ সন্ন্যাসোচিত উদাসীনতা বা নির্বাক্ গাম্ভীর্যের সম্মুখে জীবন সম্বন্ধে সমস্ত কৌতূহল এককালে নিস্তব্ধ হইয়া যাইত। তবে অপরের সহিত কথাপ্রসঙ্গে শৈশবের যে দুই-চারিটি ঘটনা অতর্কিতে বলিয়া ফেলিতেন, তদবলম্বনেই আমরা ঐ কালের সামান্য কিছু পরিচয় পাই। তিনি বলিতেন, "আমি তো রাখালদের সঙ্গে থাকতাম।" সরলমতি রাখালদের সঙ্গে ক্রীড়া ও গোচারণাদিতে তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হইত এবং প্রকৃতির উন্মুক্ত বিশাল ক্ষেত্রই ছিল তাঁহার বিদ্যালয়। আর সে সৌন্দর্যময় প্রাকৃতিক পটভূমিকা স্বভাবতঃই তাঁহার ভগবৎপ্রবণ মনকে উদ্বেলিত করিয়া সঙ্গীত জাগাইত, "মনুয়ারে, সীতারাম ভজন কর লিজিয়ে।" তাঁহার জনকজননী অতি দরিদ্র ছিলেন—দুই বেলা পর্যাপ্ত আহার পর্যন্ত তাঁহাদের জুটিত না। আহারসংস্থানের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁহারা উভয়েই অকালে দেহত্যাগ করেন এবং পাঁচ বৎসর বয়সে রাখ্তু-রাম অনাথ হন। ইহার পর তাঁহার নিঃসন্তান খুল্লতাত বালকের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। ইঁহার অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ছিল; সুতরাং ইঁহার বাড়িতে রাখ্তু-রাম কিছুদিন পূর্বাপেক্ষা সুখেই ছিলেন।

এই আনন্দের দিনগুলির কিন্তু শীঘ্রই অবসান হইল পিতৃব্যের ভাগ্য-বিপর্যয়ে। শীঘ্রই মহাজনের পীড়নে নিঃসম্বল খুল্লতাত রাখ্তু-রামকে লইয়া জীবিকার্জনের জন্য কলিকাতায় আসিলেন। দেশের মাটিকে ছাড়িয়া

১ লাটু মহারাজ বিহারী ও বাঙলা মিশাইয়া এক অপূর্ব চিত্তাকর্ষক ভাষায় কথা বলিতেন। বর্তমান গ্রন্থে উহাকে প্রধানতঃ বঙ্গভাষায় পরিণত করা হইল।

আসিতে রাখ্‌তু-রামের কোমল প্রাণে কতটুকু ব্যথা বাজিয়াছিল তাহা তিনি একদা কথাচ্ছলে প্রকাশ করিয়াছিলেন, "ওরে, দেশ ছেড়ে চলে আসতে কি মন চায়? আমার তো কান্না পেয়েছিল। তোদের আত্মীয়-স্বজন সব রয়েছে, তাদের ছাড়তে পারবি কেন? আমার তো কেউ ছিল না, আমি তবু পারি নি।" কলিকাতায় আসিয়া রাখ্‌তু-রামের পিতৃব্য তাঁহাকে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আরদালি ও স্বগ্রামবাসী ফুলচাঁদের সাহায্যে দত্তপরিবারে ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিলেন।

প্রভুগৃহে রাখ্‌তু-রামের কাজ ছিল—বাজার করা, মেয়েদের বেড়াইতে লইয়া যাওয়া, ফাই-ফরমাশ খাটা, রামচন্দ্রের টিফিন লইয়া যাওয়া ইত্যাদি; এসব কাজ তিনি অতি তৎপরতার সহিত করিতেন। ফলতঃ কর্মঠ, আদেশ-পালনে উন্মুখ ও সচ্চরিত্র বালক শীঘ্রই সকলের স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার আদরের নাম হইল 'লাল্‌টু'। এই লাল্‌টু নামই পরে শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহময় মুখে 'লাটু,' 'লেটো' বা 'নেটো'তে পরিণত হইয়াছিল।

কাজের অবসরে লাটু কুস্তি ও কসরৎ প্রভৃতি করিতেন। ইহাতে রাম বাবুর জনৈক বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন বন্ধু একদিন রাম বাবুকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, বাড়িতে কুস্তিগির ভৃত্য রাখিলে আহারাদির ব্যয়বৃদ্ধি পায়। তদুত্তরে উদারমনা রাম বাবু বলিয়াছিলেন, "তোমরা তো বোঝো না যে, কুস্তি লড়লে কাম কমে যায়।" পুনশ্চ আর একদিন অপর বন্ধুর মনে সন্দেহ উঠিল, চাকর লাটু বাজারের পয়সা চুরি করে। ব্যঙ্গচ্ছলে তিনি স্পষ্টই লাটুকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, "হ্যারে, ছোঁড়া, ঠিক করে বল তো আজ কটা পয়সা সরালি?" এরূপ হীন কটাক্ষ সহ্য করিতে না পারিয়া লাটু দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, "জানবেন বাবু, আমি নকর বটে, কিন্তু চোর নই।" এই সদম্ভ উক্তিতে হৃতমান বন্ধু রাম বাবুকে অভিযোগ

জানাইলেন। সব শুনিয়া রাম বাবু শুধু বলিলেন, "দেখুন, লাটু চোর নয়। ওর যখন যা দরকার হয়; ওর মার (দত্তগৃহিণীর) কাছ থেকে চেয়ে নেয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ রামচন্দ্রের মুখে তখন প্রায়ই ঠাকুরের এই সকল উপদেশ শুনিতে পাওয়া যাইত—"ভগবান মন দেখেন, কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না ;" "যে ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, তারই কাছে ঈশ্বর প্রকাশিত হন ;" "নির্জনে তাঁর জন্য প্রার্থনা করতে হয়, তাঁর জন্য কাঁদতে হয়, তবে তো তাঁর দয়া হয় ;" ইত্যাদি। সরল বালক লাটুর মনে এই সকল জ্বলন্ত উপদেশ আগুন ধরাইয়া দিল এবং তখনই তাঁহার গোপন সাধক-জীবন আরম্ভ হইল। তখন প্রায়ই দেখা যাইত, তিনি দ্বিপ্রহরে একখানি কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন। মাঝে মাঝে চোখ দুটি জলে ভিজিয়া উঠিত, আর অমনি তিনি বামহস্তে উহা মুছিয়া ফেলিতেন। পরিবারের লোকেরা মনে করিতেন, পিতৃব্যের জন্য লাটুর মন খারাপ হইয়াছে এবং তদনুযায়ী প্রবোধও দিতেন। তখন কে জানিত যে, 'এত মিঠে যাঁর কথা, সেই সাধুটি'র চিন্তায় আজ লাটু আত্মহারা ?

লাটু সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন ; একদিন এক রবিবারে রামচন্দ্রকে বলিয়াও ফেলিলেন, "আপনি আজ সেখানে যাবেন ; আমায় নিয়ে চলুন।" রামচন্দ্র বিশ্বস্ত বালকের এই স্নেহের আবদার উপেক্ষা না করিয়া লাটুকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। ইহা ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের অবসানের কিংবা ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভের কথা। দক্ষিণেশ্বরে সমাগত রামচন্দ্র ঠাকুরকে স্বগৃহে দেখিতে না পাইয়া অনুসন্ধানে বাহির হইলেন ; লাটু পশ্চিমের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে ঠাকুর শ্রীরাধিকার গান গাহিতে গাহিতে ফিরিলেন এবং লাটুকে দেখিতে পাইয়াই রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ছেলেটাকে বুঝি তুমি সঙ্গে করে এনেছ, রাম ? একে কোথায় পেলে ? এর

যে সাধুর লক্ষণ দেখছি।" তারপর সকলে গৃহে প্রবেশ করিলেন। লাটুর মনই তাঁহাকে জানাইয়া দিল, ইনিই তাঁহার বহু-বাঞ্ছিত সাধু। তিনি তাঁহাকে পায়ে ধরিয়া প্রণাম করিলেন এবং করজোড়ে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন—ঠাকুর বলিতেছেন, "যারা নিত্যসিদ্ধ তাদের জন্মে জন্মে জ্ঞান হয়েই রয়েছে। তারা যেন পাথর-চাপা ফোয়ারা। মিস্ত্রী এখানে সেখানে ওস্কাতে ওস্কাতে যেই এক জায়গায় চাপটা সরিয়ে দেয়, অমনি ফোয়ারার মুখ থেকে ফর ফর করে জল বেরুতে থাকে।" এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর হঠাৎ লাটুকে ছুঁইয়া দিলেন। সহসা লাটুর রোমাঞ্চ হইল, ওষ্ঠদ্বয় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল, আর দরদর ধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল—লাটু তখন আর এই জগতে নাই! অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর তাঁহাকে আবার স্পর্শ করিলে লাটুর ভাবসংবরণ হইল। স্বীয় লীলাসহচরকে এক আঁচড়েই চিনিয়া লইয়া ঠাকুর রামচন্দ্রকে নির্দেশ দিলেন, "এখানে ওকে মাঝে মাঝে পাঠিও।" আর লাটুকে বলিলেন, "ওরে, আসিস। এখানে মাঝে মাঝে আসবি, জানিস।"

অপর একদিন ঠাকুরের নিকট কোন একটি দ্রব্য-প্রেরণের কথা উঠিতেই লাটু সাগ্রহে বলিলেন, "আমায় দিন, আমি আপনার সব ওখানে পৌঁছে দেব।" সেদিন (সম্ভবতঃ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮০) লাটু একাই ফল-মিষ্টান্নাদি লইয়া প্রায় ১১টার সময় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন এবং উদ্যানপথে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া শ্রীপাদপদ্মে দীর্ঘ প্রণাম জানাইলেন। অতঃপর দ্বিপ্রহরে ৺কালীমাতার ভোগারতিদর্শনান্তে প্রসাদধারণের জন্য ঠাকুরের পার্শ্বে বসিলেন। ঠাকুর বুঝিয়াছিলেন, ৺কালীমন্দিরের আমিষ প্রসাদ-গ্রহণে লাটুর বিহারদেশীয় সংস্কারে আঘাত লাগিতে পারে; তাই তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, বিষ্ণুমন্দিরে নিরামিষ ভোগ ও গঙ্গাজলে রান্না হয়—তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন। লাটু অত-শত

না বুঝিয়া সরলভাবে বলিলেন, "আপনি যা পাবেন, আমি তাই খাব—আমি তো আপনার প্রসাদ পাব, তা ছাড়া আর কিছু খাব না।" ঠাকুর ইহাতে সহাস্যে পার্শ্ববর্তী রামলাল-দাদাকে বলিলেন, "শালা কেমন চালাক দেখছিস? আমি যা পাব শালা তাতেই ভাগ বসাতে চায়!" যাহা হউক, আহারান্তে সমস্ত দিনটিই দক্ষিণেশ্বরে কাটাইবার পর সন্ধ্যায় ঠাকুর তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, কলিকাতায় ফিরিতে হইবে। ফিরিবার পয়সা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে লাটু মুখে উত্তর না দিয়া পকেট নাড়িয়া জানাইয়া দিলেন, আছে। ঠাকুর হাসিলেন মাত্র।

দ্বিতীয় দর্শনের পর লাটু স্বকার্যে উদ্যম হারাইলেন। দক্ষিণেশ্বরে কথাচ্ছলে ইহা শ্রীরামকৃষ্ণের কর্ণগোচর হইলে তিনি বলিলেন, "এমনটি হয়ে থাকে। এখানে আসবার জন্য ওর মন কেমন করে—একদিন পাঠিয়ে দিও।" তদনুসারে লাটু পুনর্বার যেদিন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন, সেদিন কবিরাজ আসিয়া বিধান দিয়া গেলেন যে, বায়ুপরিবর্তনের জন্য ঠাকুরের কামারপুকুরে যাওয়া উচিত। এদিকে লাটু ধরিয়া বসিলেন, "আমি আপনার এখানে থাকব; আমি আর নকরি করব না।" ঠাকুর তাঁহাকে যতই প্রবোধ দেন, লাটু ততই ক্রন্দনের সুরে বলেন, "আমি আর ওখানে যাব না, আমি এখানে থাকব।" অবশেষে ঠাকুর বলিলেন, "আমিও এখানে থাকছি না রে!" অগত্যা লাটুকে ফিরিতে হইল; কিন্তু তৎপূর্বে ঠাকুরের নিকট মনিবগৃহে অনাসক্তভাবে অবস্থানের কৌশলটি শিখিয়া আসিলেন। পরে তিনি বলিয়াছিলেন, "তাঁর কত কৃপা! তিনি দেশে যাবার আগে আমায় কেমন সুন্দর শুনিয়ে গেলেন, মনিবের সংসারে কেমন করে থাকতে হয়। কিন্তু আমার মনের দুঃখ যাবে কেন?"

হাঁ, মনের দুঃখ যাবে কেন? মনিবের সংসারে নিঃসঙ্গ হইয়া থাকা চলে, সকলকে আপনার বলা চলে, সমস্ত কর্ম করা চলে, হাস্য-কৌতুক

পর্যন্ত চলে—কিন্তু মনের দুঃখ চাপা থাকিলেও ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। তাই লাটু নিজেই বলিয়াছিলেন, "জান! তাঁর জন্য আমার ভারী মন কেমন করত—বড় অস্থির হয়ে পড়তুম। রাম বাবুর ওখানে থাকতে পারতুম না—লুকিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যেতুম। কিন্তু সেখানেও আনন্দ মিলত না। তাঁর ঘরে যেতুম না—সব ফাঁকা লাগত।" দক্ষিণেশ্বরে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন, গঙ্গাতীরে বসিয়া কাঁদিতেন, পঞ্চবটীতে নীরবে কাল কাটাইতেন। পরিচিত ব্যক্তিরাও তাঁহার আর্তি বুঝিতে পারিতেন না—মনে করিতেন, রাম বাবু বকিয়াছেন, তাই মনের দুঃখে বালক দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছে। এই সময়ে এক সন্ধ্যায় রামলাল-দাদা লাটুকে প্রসাদ দিবার জন্য গঙ্গাতীরে যাইয়া দেখেন, তিনি কাহাকে যেন প্রণাম করিতেছেন। প্রণামান্তে মাথা তুলিয়া লাটু তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরমহংস মশায় কোথায় গেলেন?" "পরমহংস মহাশয়! মাথা খারাপ হইল না কি?"—নির্বাক রামলাল-দাদা ভাবিতে লাগিলেন। লাটু তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, ঠাকুর দেশে থাকিলেও দক্ষিণেশ্বরে নিত্য অবস্থান করেন—সেখানে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়। রামচন্দ্র লাটুর পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন এবং ইহার কারণও বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারই গুরুর প্রতি তাঁহার প্রিয় ভৃত্যের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া ভক্ত রামচন্দ্র লাটুর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিলেন না; অধিকন্তু লাটুকে বিদায় না দিয়া গৃহকর্মের জন্য অপর একটি ভৃত্য নিযুক্ত করিলেন। ইহারপর লাটুর কার্য হইল, উৎসবাদিতে ভক্তদের ডাকিয়া আনা ও ফল-মিষ্টান্নাদি দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যাওয়া।

ইহারই পরে একসময়ে দত্তগৃহে জ্ঞানানন্দ অবধূত টাইফয়েড-রোগে আক্রান্ত হওয়ায় রাম বাবু লাটুকে অবধূতের সেবা করিতে বলিলেন। লাটু ঐ কার্য সানন্দে গ্রহণ করিলেন। তখন অবধূতের মুহুর্মুহুঃ ভাব হইত এবং তাঁহাকে নাম শুনাইতে হইত। ফলতঃ রোগীর সেবা করিতে যাইয়া

লাটুকে অবিরাম নামোচ্চারণ করিতে হইত। অবধূতের সেবায় চারি মাস রত থাকার কালে লাটু মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবনের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন; তখন রাম বাবু সন্ধ্যাকালে অবধূতকে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' শুনাইতেন এবং মাঝে মাঝে ঠাকুরের উক্তি ও গল্প-অবলম্বনে কঠিন অংশগুলিকে সহজ ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিতেন।

দীর্ঘ আট মাস পরে ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমনের পর একদিন সন্ধ্যাসমাগমে লাটু তথায় উপস্থিত হইলে ঠাকুর স্নেহভরে তাঁহাকে সেখানে থাকিয়া যাইতে বলিলেন। বলা বাহুল্য, লাটু সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। রাত্রে প্রসাদগ্রহণান্তে তিনি সেদিন ঠাকুরের পদসেবার সৌভাগ্য লাভ করিলেন। সে দিব্যস্পর্শে প্রথমে তাঁহার অশ্রুবিসর্জন হইতে লাগিল; ক্রমে তিনি নির্বাক, নিস্তব্ধ ও স্থিরদৃষ্টি হইয়া বসিয়া রহিলেন। পরদিন মধ্যাহ্ন পর্যন্ত সে ধ্যান-তন্ময়তার পরিবর্তন ঘটিল না। যখন মন্দিরে ভোগের ঘণ্টা বাজিল তখন ঠাকুরের আহ্বানে ব্যাবহারিক জগতে ফিরিয়া আসিয়া মন্দিরে প্রণাম ও স্নানাহার সমাপন করিলেন। সেবারে লাটু তিন দিন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন এবং তাঁহার সমাধিপ্রবণ মনকে সাধারণ স্তরে নামাইবার জন্য ঠাকুর তাঁহাকে অবিরাম নানা কাজে ব্যস্ত রাখিয়াছিলেন। তিন দিন পরেও লাটুকে প্রভুগৃহে ফিরিতে অসম্মত দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে নানাভাবে বুঝাইতেছেন, এমন সময়ে রামচন্দ্র সস্ত্রীক সেখানে উপস্থিত হইয়া সব জানিতে পারিলেন। অনন্তর অনেক চেষ্টায় ও মার (দত্ত-গৃহিণীর) স্নেহের আকর্ষণে সেযাত্রা লাটু গৃহে ফিরিলেন।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে স্বীয় নির্বুদ্ধিতার জন্য শ্রীযুক্ত হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের মন্দিরে আগমন নিষিদ্ধ হইলে সেবকাভাবে ঠাকুর বিশেষ অসুবিধায় পড়িলেন। এমন কি, মন্দিরের কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিযুক্ত হিন্দুস্থানী ভৃত্যও সে অভাব দূর করিতে পারিল না। তাই দক্ষিণেশ্বরে

উপস্থিত রাম বাবুকে ঠাকুর একদিন বলিলেন, "দেখ, রাম, এই ছেলেটিকে তুমি আমার কাছে রেখে দাও। ছেলেটি বড় শুদ্ধসত্ত্ব, আর এখানে থাকতেও ভালবাসে।" তদবধি ঠাকুরের সেবক হইয়া লাটু দক্ষিণেশ্বরেই বাস করিতে লাগিলেন।

লোকদৃষ্টিতে এই নবীন সম্বন্ধ যেরূপই হউক না কেন, ঠাকুর লাটুকে শুধু সেবকরূপেই গ্রহণ করিলেন না, তিনি তাঁহার সব দায়িত্বই স্বহস্তে লইলেন। তাই দেখিতে পাই, ঠাকুর পুত্রনির্বিশেষে তাঁহার বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বপ্রকার শিক্ষার জন্যই সচেষ্ট। বর্ণপরিচয়কালে ব্যঞ্জনবর্ণে আসিয়া লাটু তাঁহার বিহারী সংস্কারানুসারে 'ক'-কে বলেন 'কা,' 'খ'-কে বলেন 'খা'। ঠাকুর যতই বলেন, "ওরে, ওটা 'ক' ", লাটু ততই বলেন, "কা"। ঠাকুর বলেন, "আরে এখানেই যদি 'কা' বলবি, তবে 'ক'-এ আকারকে কি বলবি?" তবু লাটুর সেই এক কথা—"কা"। বিফলমনোরথ হইয়া ঠাকুর তখন কহিলেন, "যা, আর তোর পড়ে দরকার নেই।" লাটুর বিদ্যাভ্যাস এখানেই শেষ হইল। পুঁথিগত বিদ্যা আরম্ভেই সমাপ্ত হইলেও ঠাকুর তাঁহাকে অধ্যাত্মবিদ্যায় পরিপূর্ণ করিয়া দিতে লাগিলেন। লাটু মহারাজ বলিতেন, "ঠাকুর আমায় কত শিখাতেন, কত বুঝাতেন। বলতেন, 'যা না নরেনের কাছে।' সেখানে বসে বসে আমি কত শুনেছি।" ঠাকুর আবার তাঁহাকে 'নেশা করিতেও' শিখাইতেন—'যে-সে নেশা নয়, একদম রাজা নেশা!' তিনি তাঁহাকে 'ভগবানের নেশা' করাইয়া দিলেন। লাটু বলিতেন, "ঠাকুর আমাকে টেনে নিলেন।...তিনি আমায় বলতেন, 'দেখ, দিল্ সাফ রাখবি, আর গরদা ঢুকতে দিবি না।'... অহঙ্কারের ব্যাপারকে তিনি গরদা বলতেন। অহঙ্কারী মানুষ কেমন জড়িয়ে পড়ে দেখ না—'আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার টাকা'—এসব বলে বলে কেবল নিজের জাল নিজে বুনতে থাকে।" একদিন

ঠাকুরের পদসেবায় নিযুক্ত লাটুকে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দিকিনি, তোর রামজী এখন কি করছেন?" লাটু 'রামজীর ব্যাপার' তখন আর কি বুঝিবেন—তিনি নীরব রহিলেন। তখন ঠাকুর নিজেই কহিলেন, "ওরে, এখন তোর রামজী সুচের ভিতর হাতী চালাচ্ছেন।" লাটু উহার তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া পরে বলিয়াছিলেন, "আমার এতটুকু আধার; আমার মধ্যে তিনি সাধন ঢেলে দিচ্ছিলেন।"

কুস্তিগির লাটু খুব খাইতে পারিতেন—এক একবারে অনেক আটা উদরস্থ হইয়া যাইত। ইতোমধ্যে ঠাকুর একদিন যোগীনকে আহার সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিতেছেন শুনিয়া লাটুও আহারের পরিমাণ কমাইতে থাকিলেন। ইহাতে প্রথমে খুবই কষ্ট হইত, 'খিদের চোটে পেটে ব্যথা লাগত।' ইহারই মধ্যে একদিন লাটু ও রাখাল কুস্তি লড়িতেছিলেন—কেহই কাহাকেও হারাইতে পারিতেছেন না দেখিয়া ঠাকুর সকৌতুকে বলিলেন, "ওগো, তোমাদের যে গজকচ্ছপের মত লড়াই হচ্ছে—কেউ কাউকে হারাতে পারছ না।" কৌতুক করিলেও ঠাকুরের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, সাধনের সহিত অধিক শ্রম ও অল্প আহারের মিশ্রণে লাটুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে; তাই বলিলেন, "দুটো নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করলে শরীর ভেঙ্গে যাবে।" উহাতেই ক্ষান্ত না হইয়া কিয়দ্দিবস লাটুকে পার্শ্বে বসিয়া খাওয়াইলেন এবং স্বহস্তে পাতে ঘৃত ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। তদবধি আহারবিষয়ে লাটু মধ্যপন্থা অবলম্বন করিলেন এবং অতঃপর কুস্তি ছাড়িয়া দিয়া অভ্যাসবশতঃ একটু ঠেলাঠেলি করিতেন মাত্র।

ঈর্ষা ও অভিমানাদি-জয় সম্বন্ধেও ঠাকুরের দৃষ্টি সদা জাগ্রত ছিল। একদা রাখালকে পান সাজিতে বলিলে তিনি বারংবার অস্বীকার করিলেন। লাটু এরূপ আচরণের অন্তর্নিহিত নিবিড় প্রেমের প্রতি লক্ষ্য না

রাখিয়া শুধু ব্যাবহারিক বিচারদৃষ্টিতে বলিয়া ফেলিলেন, "ওকি কথা, রাখালবাবু, আপনি উনার আদেশ শুনছেন না, আবার তার উপর কথা বলছেন—এ আপনার কেমন ব্যবহার!" ক্রমে দুইজনের বচসা আরম্ভ হইল। ঠাকুরের ইহাতে ভারী আমোদ—তিনি পান-সাজার কথা ভুলিয়া গিয়া রামলালকে ডাকিয়া বলিলেন, "ও রামনেলো, রাখাল-নেটোর যুদ্ধ দেখবি আয় রে!" রামলাল আসিয়াই ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন; তাই ঠাকুর যখন রহস্যচ্ছলে প্রশ্ন করিলেন, "এদের মধ্যে বড় ভক্ত কে?" —তিনি সহাস্যে উত্তর দিলেন, "মনে হয় রাখাল।" অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় লাটু জ্বলিয়া উঠিলেন। ঠাকুরও তখন সকৌতুকে বলিলেন, "রাখালেরই ভক্তি বেশী। ন্যাখ দিকিনি, রাখাল কেমন হেসে হেসে কথা বলছে, আর (লাটুকে দেখাইয়া) ঐ ন্যাখ, কেমন রেগে আছে। ক্রোধ তো চণ্ডাল—ক্রোধে ভক্তি-শ্রদ্ধা উবে যায়।" জোঁকের মুখে নুন পড়িল—লাটু অপরাধ স্বীকারপূর্বক চুপ করিলেন। তখন ঠাকুর বুঝাইয়া বলিলেন, "পান খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল দেহের; তাই রাখাল অমান্য করতে পেরেছে। দেহের ভেতর যিনি, তাঁর ইচ্ছা হলে রাখালের সাধ্য ছিল না, অমান্য করে।" বিতণ্ডার পরে অবশেষে লাটুই পান সাজিলেন।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে জনৈক ভক্তের অসভ্যতা দেখিয়া লাটুর ধৈর্যচ্যুতি হইল এবং উক্ত ভক্তকে বেশ একটু ভৎর্সনা করিলেন। ভক্তের প্রাণে ইহাতে ব্যথা বাজিল কিনা জানি না; কিন্তু ঠাকুর লাটুকে বলিলেন, "এখানে যারা আসে তাদের ওরকম কড়া কথা বলতে নেই। একে তো তারা সংসারের জ্বালায় জ্বলছে; এখানে এলে তোরা যদি তাদের বেআদবিতে এত কড়া কথা বলে দুঃখ দিবি, তা হলে তারা যায় কোথায় বলতো?" ইহাতেও নিবৃত্ত না হইয়া পরদিন লাটুকে ভক্তটির নিকট

পাঠাইলেন—যাহাতে তাঁহার মনঃকষ্ট দূরীভূত হয়। ভক্তগৃহ হইতে প্রত্যাবর্তনান্তে লাটুকে প্রশ্ন করিলেন, 'হ্যারে, এখানকার প্রণাম দিয়ে এসেছিস?" ঠাকুরের প্রণাম ভক্তকে দেওয়া—ইহা আবার কিরূপ? লাটু কী আর উত্তর দিবেন! কিন্তু ঠাকুরের প্রণাম জানাইতে তাঁহাকে পুনর্বার ভক্তগৃহে যাইতেই হইল। এদিকে প্রণামের কথা শুনিয়াই ভক্তটি কাঁদিয়া আকুল হইলেন এবং লাটুও তখন তাঁহার ভক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়া স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিলেন।

একসময় লাটু ঠাকুরের সাবধানবাণী শুনিয়াছিলেন, "ওরে দেখিস, একে (নিজেকে দেখাইয়া) যেন ভুলিস নি।" 'একে' বলিতে লাটু পাছে দেহমাত্রকে বুঝেন, এই জন্য ঠাকুর সেদিন কথাপ্রসঙ্গে নিজের মধ্যে যে ভগবান আছেন, তাঁহারই প্রতি স্পষ্টতঃ লাটুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। লাটুও তদবধি ঠাকুরকে ঈশ্বরজ্ঞানে জীবনসর্বস্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ণ ভগবত্তার জ্ঞান থাকিলে সেব্য-সেবক-লীলার স্ফূর্তি হয় না। লাটুও তাই পরে এক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, "তা হলে কি তাঁর সেবা করা যায়, না তাঁর ধারে থাকা যায়?" গুরুসেবা সম্বন্ধে লাটু মহারাজ বলিতেন, "গুরুকে যেদিন মা-বাপের মত ভাবতে পারবে, সেদিন সে তাঁর কিছু সেবায় লাগবে; কিন্তু তার আগে তাঁর সেবা করতে পারবে না।" সেবায় তাঁহার তন্ময়তা সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। একরাত্রে ঠাকুর কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাহিরে গিয়াছেন। কেন যেন সে রাত্রে লাটুর জপে মন বসিল না—প্রাণে একটা অভাব বোধ করিয়া তিনি ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, ঠাকুর সেখানে নাই। তিনি ভাবিলেন, ঠাকুর হয়তো শৌচে গিয়াছেন; সুতরাং ঐ দিকে অগ্রসর হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর ঐ দিক হইতে আসিয়া বলিলেন, "ওরে, যার সেবা করবি, তার কখন কি দরকার হয় হুঁশ রাখবি।"

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমাকে বড় নির্জন জীবনযাপন করিতে হইত; আবার ভক্তদের আহারাদির জন্য পরিশ্রমও করিতে হইত অনেক। একদিন গঙ্গাতীরে লাটু নিশ্চল উপবিষ্ট আছেন দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, "ওরে লেটো, তুই এখানে বসে আছিস, আর উনি যে নহবতে রুটিবেলার লোক পাচ্ছেন না।" ইহার পর শ্রীশ্রীমায়ের নিকট তাঁহাকে উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "এ ছেলেটি বেশ শুদ্ধসত্ত্ব।...তোমার যখন যা প্রয়োজন হবে একে বলো, এ করে দেবে।" সেদিন হইতে লাটু সানন্দে শ্রীশ্রীমার সেবায়ও নিযুক্ত হইলেন।

সাধনরহস্য সম্বন্ধে ঠাকুর তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন, "যাগে-যোগে জেগে থাকবি, ঘুমের কালে তাঁকে ডাকবি, কাজের মাঝে তাঁকে ধরবি, আর হরদম তাঁর সেবায় লাগবি।" ঠাকুরের কৃপায় তিনি জিতনিদ্র হইয়াছিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের কোন একদিন কীর্তনের পরিশ্রমান্তে রাত্রে ঠাকুরকে ব্যজন করিতে যাইয়া লাটু নিদ্রাবেশে ঢুলিতে থাকিলে ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, "ওরে, বলতে পারিস ভগবান ঘুমান কি-না?" লাটু জানাইলেন, উহা তাঁহার পক্ষে জানা অসম্ভব। তখন ঠাকুর বলিলেন, "ভগবানের ঘুমাবার জো নেই; ...তিনি সারাদিন সারারাত জেগে জেগে জীবজন্তুর সেবা করছেন—তাই নির্ভয়ে জীবজন্তু ঘুমোতে পারছে।" আর একদিন ক্লান্ত ও স্বভাবতঃ নিদ্রাপরবশ লাটু সন্ধ্যাকালে ঘুমাইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে তাঁহাকে জাগাইয়া ঠাকুর ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিলেন, "ও কিরে! এই ভর সন্ধ্যাবেলা ঘুম কি রে? ... সন্ধ্যার সময় কোথায় ভগবানকে ডাকবি, তা না, শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিস।" ঠাকুরের কণ্ঠস্বরে নিদ্রোত্থিত লাটু অপ্রতিভ হইয়া এক কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, "আমি আর এমন সময় কোন দিন ঘুমোব না।" তিনি এই প্রতিজ্ঞা চিরজীবন পালন করিয়াছিলেন। একবার কঠিন নিউমোনিয়া-রোগের

সময় সন্ধ্যাকালে তিনি সেবারত স্বামী সারদানন্দকে অনুরোধ করিলেন তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইতে ; কিন্তু রোগের প্রকৃতি বুঝিয়া এবং চিকিৎসকের নিষেধ স্মরণ করিয়া স্বামী সারদানন্দ ঐ কথা কর্ণে না তুলিয়াই কার্যান্তরে যাইতে যাইতে শুনিতে পাইলেন লাটু মহারাজ বলিতেছেন, "তোমরা যদি আমায় বসিয়ে না দাও, আমায় মহাবীরের শরণ নিতে হবে।" ইহার তাৎপর্য সারদানন্দ তখন জানিতেন না। তিনি বহির্গত হইবামাত্র লাটু মহাবীরকে স্মরণ করিয়া স্বচেষ্টায় উঠিয়া বসিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া স্বামী সারদানন্দ অনুযোগ করিতে থাকিলে তিনি উত্তর দিলেন, "আমি অতশত জানি না ; এ তাঁর হুকুম—আমায় তাঁর হুকুম মেনে চলতে হবে।"

ইহাও কিন্তু তাঁহার নিদ্রাজয়ের পরাকাষ্ঠা নহে। দক্ষিণেশ্বরে আর একদিন রাত্রির প্রথম প্রহরে নিদ্রাভিভূত হওয়ায় ঠাকুর তাঁহাকে তিরস্কার করেন। লাটু তাই স্বীয় মনকে খুব কষাঘাতপূর্বক সেই রাত্রি হইতেই নিদ্রার বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তিনি অতঃপর প্রায় সারা রাত্রি ধ্যান-ধারণায় কাটাইতেন এবং দিবাভাগে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেন।

অন্তরের আকাঙ্ক্ষা অনেক ক্ষেত্রে বাহিরের সামান্য বস্তু-অবলম্বনেও আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৮৪ অব্দের একদিন লাটু সমবয়স্কদের সহিত গোলোকধাম খেলিতে বসিয়া সৌভাগ্যক্রমে প্রথমবারেই সাত চিৎ ফেলিয়া ঘুঁটি একেবারে গোলোকধামে তুলিয়া দিলেন। ইহাতে তাঁহার কত আনন্দ! এই সময়ে ঠাকুরও সেখানে আসিয়া পড়েন এবং মুক্তিকামী লাটুর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা এইভাবে সামান্য ক্রীড়া-অবলম্বনে উন্মেষিত হইয়াছে দেখিয়া তিনিও ঐ আনন্দে যোগ দেন।

ঠাকুরের সাহচর্যে লাটুর এক লাভ এই হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার সহিত কলিকাতার বহু শিক্ষিত গৃহে যাইয়া ঐ সমাজের সংস্কৃতির সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন এবং আক্ষরিক বিদ্যা না থাকিলেও সর্ববিষয়ে

মার্জিত বুদ্ধির অধিকারী হইয়াছিলেন। লাটু ছিলেন বড়ই সরল। তিনি নিজের দুর্বলতার কথা অকপটে ঠাকুরের নিকট নিবেদন করিতেন; কারণ তিনি জানিতেন যে, এই সর্বজ্ঞের নিকট বস্তুতঃ কিছুই গোপন থাকে না। ঠাকুরও সরল শিষ্যকে সরল পথে লইয়া যাইতেন। জৈব সংস্কার সহজে সাধককে ছাড়িতে চায় না। একদিন লাটুর অন্তরে আসক্তির আগুন এমনি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল যে, তিনি নামজপে এককালে অসমর্থ হইয়া ঠাকুরের শরণ লইলেন। ঠাকুর সব শুনিয়া বলিলেন, "তাও আসবে যাবে; কিন্তু নামকে ছাড়িস নি।" ঠাকুরের উপদেশে তিনি মনোজয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ঠাকুরের মুখে ভিক্ষার প্রশংসা শুনিয়া লাটু মধ্যে মধ্যে ভিক্ষায় বাহির হইতেন। একবার স্থানমাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া তাঁহার তীর্থদর্শনেও অভিলাষ হয়। তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া ঠাকুর বলিলেন, "এখানকার প্রসাদী অন্ন ছেড়ে কোথায় যাবি?...একান্তই যদি কোথাও যেতে চাস, তা যা না কলকাতায় রামের ওখানে।" লাটু কলিকাতায় গেলেন; কিন্তু ঠাকুরকে ছাড়িয়া বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না—শীঘ্রই ফিরিয়া আসিলেন। পরন্তু ইহার পরও লাটুকে পরীক্ষা করিবার জন্য এবং লাটুর মনকে আরও অন্তর্মুখীন করিবার জন্য ঠাকুর তাঁহাকে যেন দূরে দূরে রাখিতে লাগিলেন। এ দুঃখে লাটুর বুক ফাটিয়া যাইত। অবশেষে শ্রীশ্রীমায়ের শরণ লইয়া তিনি কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইলেন এবং ঠাকুরও তাঁহাকে আবার পূর্ববৎ গ্রহণ করিলেন।

লাটুর অনেক আচরণ ছিল অদ্ভুত; কিন্তু স্নেহময় ঠাকুর উহা স্নেহের চক্ষেই দেখিতেন। দক্ষিণেশ্বরে থাকা কালে লাটু নিদ্রাভঙ্গে প্রথমেই ঠাকুরকে দর্শন করিতেন এবং ঠাকুর স্বগৃহে না থাকিলে অপর কাহাকেও প্রথম দেখিয়া ফেলার ভয়ে চক্ষু আবৃত করিয়া ডাকিতেন,

"আপনি কোথায় গেলেন?" অগত্যা ঠাকুর আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিতেন।

ঠাকুরের আহ্বানে যুবকভক্তগণ কীর্তনে যোগ দিতেন এবং নাচিতেন। তিনি একদিন জগদম্বাকে জানাইলেন, "মা, তোর যদি ইচ্ছা হয়, এই ছেলেদের একটু ভাব-টাব হোক।" ইহার পরেই বিষ্ণুঘরে কীর্তনকালে ভাবাবেশে লাটু এমন হুঙ্কার তুলিতেন যে, সারা মন্দিরটি গমগম করিত। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহে কীর্তন খুব জমিয়াছিল। কীর্তনান্তে খোকা মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজকে এই যে কীর্তন হল, এর মধ্যে ঠিক ঠিক ভাব কার হয়েছিল?" ঠাকুর একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আজ লেটোরই ঠিক ঠিক ভাব হয়েছিল, আর সবার অল্প-স্বল্প।" তবে ঠাকুর বাড়াবাড়ি ভালবাসিতেন না; তাই একদিন লাটুকে সাবধান করিয়া দিলেন, "ওরে, বেশী নাচুনি-কাঁদুনি ভাল নয়; ওতে সময় সময় ভাবভঙ্গ হয়ে যায়। ভাবকে গোপন করতে না পারলে ভাব অন্তর্মুখী হতে চায় না।"

এক ব্রাহ্মমুহূর্তে সকলকে আপন প্রকোষ্ঠে ধ্যানে বসাইয়া ঠাকুর গান ধরিলেন, "জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী" ইত্যাদি। হঠাৎ লাটু 'উহু'-রবে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। শ্রবণমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার দুই স্কন্ধে হস্ত স্থাপনপূর্বক চাপিয়া ধরিলেন। লাটু যেন আসনে থাকিতে পারিতেছিলেন না—শীঘ্রই বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন; কিন্তু ঠাকুরের গান সমভাবেই চলিতে লাগিল।

অপর একদিন লাটু শিবমন্দিরে ধ্যানে প্রেরিত হইয়া অল্প পরেই ধ্যানযোগে কালাতীত অবস্থায় উপনীত হইলেন। অপরাহ্ণ উপস্থিত তবু তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য। সংবাদ পাইয়া ঠাকুর শিবমন্দিরে গেলেন এবং পাখা লইয়া লাটুকে বাতাস করিতে লাগিলেন। শীতল বায়ুস্পর্শে লাটুর শরীর ক্রমে কাঁপিয়া উঠিল; তখন ঠাকুর বলিলেন, "ওরে, বেলা

যে পড়িয়ে এল! সন্ধ্যে-টন্ধ্যে সাজাবি কখন?" ধ্যানোত্থিত লাটু ঠাকুরকে বীজন করিতে দেখিয়া বড়ই অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন এবং অপরাধীর ন্যায় জানাইলেন যে, শিবের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে রাখিতে তাঁহার সম্মুখে একটি জ্যোতিঃ আবির্ভূত হয়; উহাতে সমস্ত গৃহ পূর্ণ হইয়া যায়—তারপর তিনি আর কিছুই অবগত নহেন। ঠাকুর শুধু বলিলেন, "বেশ বেশ। এরকম আরো কত দেখবি! এখন এক গ্লাস জল খা দিকিন"—ইহা বলিয়া সস্নেহে জল দিলেন।

এক সময় লাটু ধ্যান করিতে গিয়া অল্প পরেই মাটিতে মুখ গুঁজিয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণমধ্যেই ঠাকুর তথায় আসিয়া তাঁহাকে চিৎ করিয়া শোয়াইলেন এবং বুকে ডলিয়া সহজাবস্থায় আনিলেন। অতঃপর বলিলেন, "চুপ কর শালা, চুপ কর! তুই বুঝি আজ মা কালীকে দেখেছিস?" অপর এক গভীর রাত্রে ঠাকুর ত্যাগী সন্তানদিগকে ধ্যানের জন্য বিভিন্ন স্থানে পাঠাইয়া দিলেন, ধ্যানান্তে লাটু বেলতলা হইতে ফিরিলে বলিলেন, "আজ লেটোর পুনর্জন্ম হয়েছে।" একবার লাটু পঞ্চবটীতে ধ্যানে ডুবিয়া আছেন—ঠাকুর বিষ্ণুঘরের পুরোহিতের দ্বারা লাটুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু লাটু নিশ্চল, নিথর! তখন নরেন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া পরীক্ষার্থে একখণ্ড কাষ্ঠ লইয়া বৃক্ষশাখায় সজোরে আঘাত করিতে থাকিলেন—লাটু তথাপি ভ্রূক্ষেপহীন! অবশেষে ঠাকুর তথায় উপস্থিত হইয়া লাটুর অবস্থা জ্ঞাত হইলেন এবং নরেন্দ্রকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। এই সময়ে লাটু সারা রাত্রি ধ্যান-ধারণায় কাটাইতেন এবং দিবাভাগেও উহার রেশ চলিত। ঠাকুর তাই বলিয়াছিলেন, "লেটো চড়েই আছে—ক্রমে লীন হবার জো।"

ইতোমধ্যে ঠাকুর গলরোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার্থে শ্যামপুকুরে আসিলেন। সেবক লাটুও সঙ্গে আসিলেন। এখানে একদিন লাটু

ভাবাবেশে গায়ের জামা ছিঁড়িতে থাকিলে ঠাকুর তৎক্ষণাৎ বোতাম খুলিয়া বুকে হাত বুলাইয়া দিলেন। ক্রমে লাটুর ভাব শান্ত হইল। কিন্তু এইরূপ ভাবসমাধি চলিতে থাকিলেও লাটু ঠাকুরের সেবায় সর্বদা তৎপর থাকিতেন—স্বেচ্ছায় অবহেলা করিতেন না। তিনি বলিয়াছিলেন, "তাঁর সেবাই তো আমাদের উপাসনা—আমাদের কি আর অন্য উপাসনা আছে?" ঠাকুর তাঁহাদিগকে শিখাইতেন, কিরূপে নিঃশ্বাস ফেলিতে হয়, কোন দিকে মুখ রাখিতে হয়, কত মন্ত্র জপ করিতে হয়, কিন্তু লাটু জানিতেন—আসল উপাসনা হচ্ছে তাঁর সেবায়।

অতঃপর কাশীপুরের অধ্যায় আরম্ভ হইল। সেখানেও লাটু সেবার সহিত সাধনায় রত রহিলেন। একদিন ঠাকুরের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অকস্মাৎ লাটুর হাত থামিয়া গেল—দেহ স্থির, চক্ষু নিঃস্পন্দ! দুই-চারি বার ডাকিয়া কিংবা গায়ে হাত দিয়াও সাড়া পাওয়া গেল না। এই ঘটনাটিকে লক্ষ্য করিয়া লাটু মহারাজ পরে বলিয়াছিলেন, "একদিন তো কাশীপুরে ওনার মাথায় হাত বুলুচ্ছিলুম; তখন আমার সামনে সেই মুল্লুক খুলে গেল। সেই মুল্লুকে যা দেখেছি তা চোখ ধরতে পারে নি; যা আস্বাদন করেছি, তা জিব নিতে পারে নি।"

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীমায়ের বৃন্দাবনযাত্রার সময় অনেকেই সঙ্গে চলিলেন; লাটু তাঁহাদের অন্যতম। বৃন্দাবনে অবস্থানকালে লাটুর আহারাদির কিছুই ঠিক থাকিত না—অনেক সময় নিজের রুটি বানরকে দিয়া আবার মায়ের নিকট রুটির জন্য আবদার করিতেন। ঐ সময় তিনি কিছুদিন অপরের অজ্ঞাতসারে যমুনাপুলিনে তপস্যা করিয়াছিলেন। অবশেষে ইং ১৮৮৭ অব্দের প্রথম ভাগে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্তের একটি কন্যা আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছে—এই সংবাদ পাইয়া শ্রীশ্রীমা লাটুকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া লাটু দুই-চারি দিন দত্তগৃহে অতিবাহিত করিয়া বরাহনগর মঠে চলিয়া গেলেন। তথায় সন্ন্যাসগ্রহণান্তে তাঁহার নাম হইল অদ্ভুতানন্দ। সন্ন্যাসী অদ্ভুতানন্দ একাদিক্রমে দেড় বৎসর বরাহ-নগরে কঠিন তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। সম্ভবতঃ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে তাঁহার নিউমোনিয়া হয়। তাঁহার অনেক আচরণই অনন্যসাধারণ ছিল। অসুখের সময়ের একটি ঘটনা পূর্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আর একটি ঘটনা এই—একদিন শীতনিবারণের জন্য ঘরে মালসা করিয়া আগুন দেওয়া হইলে এবং ঘরের চারিদিক বন্ধ করা হইলে তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "আমাকে মেরে ফেল্লে রে বাপ! আমি আর কারুর কথা শুনব না, ছাদে গিয়ে শোব"—সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িলেন। অগত্যা মালসা সরাইতে হইল এবং চারিদিক খুলিতে হইল। আরোগ্য-লাভান্তে তিনি রামচন্দ্রের গৃহে যাইয়া কয়েক মাস ছিলেন। অতঃপর মঠে পুনরাগমন করেন এবং তথায় তিন-চারি মাস বাস করিয়া বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর উদ্যানবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট চলিয়া যান। নীলাম্বর বাবুর বাটী হইতে মা পুরীধামে গমন করিলে (নভেম্বর, ১৮৮৮) লাটু মহারাজ পুনর্বার বরাহনগর মঠে আগমন করেন।

এই বিভিন্ন সময়ে তিনি বরাহনগরে কিরূপ জীবনযাপন করিতেন তাহার কিঞ্চিৎ আভাস কয়েকটি ঘটনা ও উক্তি হইতে পাওয়া যায়। সারদানন্দজী একবার বলিয়াছিলেন, "রাত্রে লেটো ঘুমায় না। সে প্রথম রাত্রে ঘুমানোর ভান করে নাক ডাকায়। সকলে ঘুমিয়ে পড়লে উঠে মালা জপ করতে বসে।" এই তথ্য-আবিষ্কারের ইতিহাস বড়ই উপভোগ্য। একরাত্রে খট খট শব্দ শুনিয়া সারদানন্দজী ভাবিলেন, ইঁদুর আসিয়াছে। তিনি তাড়া দিলেন—আওয়াজ বন্ধ হইল। আবার অল্প পরে সেই খট খট—সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ তাড়া ও তাহার ফলে শব্দ বন্ধ

হওয়া। বার বার এরূপ হওয়াতে স্বামী সারদানন্দের মনে সন্দেহ জাগিল। তাই তথ্য-আবিষ্কারের জন্য পরের রাত্রে লণ্ঠনাদির যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন এবং যাই ঐরূপ শব্দ হইল, অমনি ঝটিতি আলো জ্বালিয়া দেখেন লাটু মহারাজ জপে নিরত—তাঁহারই ঘূর্ণায়মান মালার শব্দ হইতেছে ঐরূপ। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলিয়াছিলেন, "লাটুকে ডেকে না খাওয়ালে তার খাওয়ার হুঁশ থাকত না। এমন কতদিন হয়েছে যে, আমাদের সকলকার খাওয়া হয়ে গেছে, ডেকে তার সাড়া না পেয়ে ঘরে তার খাবার দিয়ে আসা হয়েছে। দুপুর গেছে, সন্ধ্যে গেছে, সেই রাত্রে তাকে ডাকতে গেছি—লাটু সেই একই ভাবে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে আর দুপুরের খাবার তেমনি পড়ে আছে। অনেক ডাকাডাকি হাঙ্গামা-হুজ্জত করে তবে তাকে খাওয়ান হত।"

১৮৯২ অব্দে মঠ আলমবাজারে উঠিয়া গেল। এখানে লাটু মহারাজ থাকেন নাই বলিলেই চলে—মাঝে মাঝে আসিতেন মাত্র।

আলমবাজার মঠের একটি ঘটনায় ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি এবং ভুল দেখাইয়া দিলে তাহা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করার প্রবৃত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের কোনও একদিন স্বামী অভেদানন্দ-রচিত "নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ, ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামি"—ইত্যাদি স্তোত্রপাঠকালে 'ঈশাবতারং' শুনিয়া লাটু মহারাজ ভাবিলেন, ঠাকুরকে ঈশার অবতার বলা হইয়াছে; তাই স্বামী সারদানন্দকে বলিলেন, "তোমরা এরই মধ্যে তাঁকে ভুলে গেলে দেখছি! ঈশাকে পূজো করছ!" তখন স্বামী অভেদানন্দ ঠিক অর্থ বুঝাইয়া দিলেন আর গুণগ্রাহী লাটু অমনি ঐ স্তোত্রটি ভক্তদের মধ্যে প্রচার করিতে লাগিয়া গেলেন। আলমবাজারে তাঁহার কৃচ্ছ্রসাধনের একটি দৃষ্টান্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ দিয়াছিলেন—"সেদিন সেই প্রথম আমরা

আলমবাজার মঠে গেছি। দেখি, একজন টান হয়ে খাটিয়ায় শুয়ে আছেন, অপর দুইজন তাঁকে টানাটানি করছেন।··· অনেক দিন পরে তাঁকে ঐরূপ শুয়ে থাকবার কারণ আর তাঁদের ঐরূপ টানাটানি করবার উদ্দেশ্য কি ছিল জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন, 'মনে করেছিলুম আর খাব না, অন্ন-ত্যাগ করব—তাই পড়ে ছিলুম।" ১৮৯২ হইতে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লাটু মহারাজের প্রকৃত বাসস্থান ছিল গঙ্গাতীর। এই কয় বৎসরের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে হইলে গিরিশ বাবুর ভাষায় বলা চলে, "গীতার সাধু দেখতে চাও তো লাটুকে দেখগে।" লাটু তখন 'স্থিতপ্রজ্ঞ'—জগতের কাহারও সহিত বাধ্য-বাধকতা নাই, কোন বিষয়ে রাগদ্বেষ নাই, কোন বস্তুতে লোভমোহ নাই; তাঁহার মুখে অভিসম্পাত বর্ষিত হইত না, আশীর্বাদও উচ্চারিত হইত না; অন্য জগতে মন রাখিয়া তিনি তখন পূর্বসংস্কারবশে লৌকিক আচার-ব্যবহার, আহার-বিহারাদি করিতেন মাত্র।

এই কয় বৎসর স্বামী অদ্ভুতানন্দ প্রায়ই ভিক্ষালব্ধ অর্থে চালভাজা বা ছোলাভাজা কিনিয়া দিবসের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। বস্ত্রের জন্য তিনি রাম বাবুর দ্বারে উপস্থিত হইতেন এবং কম্বলাদি গিরিশ বাবুর নিকট হইতে লইতেন। এতদ্ব্যতীত বলরাম বাবু, হরমোহন বাবু, খগেন বাবু, উপেন বাবু, খোড়ো কেদার বাবু প্রভৃতির গৃহেও মাঝে মাঝে তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইত। সালকিয়ার একজন মুদি সাত-আট মাস রুটি ও ছোলা-ভাজা দিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিল। তখন তিনি বাগবাজারের পোলের নীচে তপস্যা করিতেন। গঙ্গাতীরে অবস্থানকালে অনেক দিন তিনি ভিজা ছোলা খাইয়া দিন কাটাইতেন। একদিন গামছার খোঁটে বাঁধা ছোলা গঙ্গার জলে ডুবাইয়া ইট চাপা দিয়া ধ্যানে বসিলেন—তখন ভাঁটা ছিল। জোয়ার আসিয়া জল যখন অনেক উচ্চে উঠিয়াছে তখন

তাঁহার আহারের স্পৃহা জাগিলে দেখিলেন, খাদ্য পাওয়া অসম্ভব। উপায়ান্তর না থাকায় আবার জল নামিয়া যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। ভাঁটার সময় ভিজা ছোলা তুলিয়া অবেলায় ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল।

আহারাদি বিষয়ে এইরূপ স্বচ্ছন্দগতি অবলম্বনপূর্বক তিনি আপনভাবে ধ্যানভজনে মগ্ন থাকিতেন অথবা গঙ্গাতীরে অপর দশজনের সঙ্গে বসিয়া ভাগবতাদি ব্যাখ্যা শুনিতেন। ধ্যানাদির কোন কাল বা স্থান নির্ধারিত ছিল না—স্বাধীন মহাপুরুষ কখনও তীরভূমিতে, কখনও পোলের নীচে, কখন পার্শ্ববর্তী নৌকায় ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। বাগবাজারে একদা খড়ের নৌকায় বসিয়া আছেন—কখন নৌকা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে জানেন না। যখন ঐ বিষয়ে সচেতন হইলেন তখন দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইয়া উত্তরাভিমুখে চলিয়াছেন। অগত্যা মাঝিদের বলিয়া দক্ষিণেশ্বরেই নামিয়া পড়িলেন। গঙ্গাতীরে বাসকালে কিছুদিন দ্বিপ্রহরে ৺শ্মশানেশ্বরের ঘাটের পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন এবং রাত্রিযাপন করিতেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে। রাত্রি দ্বিপ্রহরে আবার চাদনীর ছাদে উঠিয়া জপধ্যানে মগ্ন হইতেন। বৃষ্টি হইলে ঘাটের ধারেই অবস্থিত রেলের মালগাড়িতে উঠিয়া বসিতেন। একরাত্রে ঐ ভাবে বসিয়া আছেন, ইত্যবসরে কখন যে ইঞ্জিন আসিয়া গাড়ি টানিয়া চলিয়াছে তিনি জানেন না। পরদিন দেখেন, অনেক কুলি আসিয়া তাঁহাকে নামিতে বলিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, গাড়ি তখন চিৎপুরে। অতঃপর বৃষ্টি হইলে আর তিনি গাড়িতে উঠিতেন না—চাদনীর ছাদ হইতে নামিয়া উহারই এক কোণে বসিয়া থাকিতেন।

স্বামী অদ্ভুতানন্দের এই অন্তর্মুখীন ভাব অন্যূন আড়াই বৎসর একই ভাবে চলিয়াছিল। তদনন্তর ১৮৯৫ অব্দের কোনও একসময়ে তিনি পুরী ও ভুবনেশ্বরে গিয়াছিলেন। পুরীতে ৺জগন্নাথদেবের সম্মুখে দণ্ডায়মান

হইয়া প্রার্থনা জানাইতেন, "যে রূপ দেখে মহাপ্রভু চোখের জলে ভেসে যেতেন, আপনি দয়া করে সেই রূপটি একবার দেখান।" ৺জগন্নাথ তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। পরে পুরীত্যাগকালে তিনি ৺জগন্নাথের নিকট তুইটি অদ্ভুত বর চাহিলেন, "বেশী ঘুরতে-টুরতে পারব না, আর যা খাই তাই যেন হজম হয়ে যায়।" দ্বিতীয় বরের কারণ-নির্দেশচ্ছলে তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষান্নের কোন ঠিক তো নেই, জান তো! হজম-শক্তি ভাল না হলে দেহ ভেঙ্গে যায়। শরীর ভেঙ্গে পড়লে সাধন-ভজনে মন লাগে না।" দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট লাটু যেমন সরল বালক ছিলেন, পরিণত বয়সে শ্রীক্ষেত্রে ৺জগন্নাথের সম্মুখেও আজ তিনি সেই একই সরল বালক।

ইং ১৮৯৫ হইতে ১৮৯৭ পর্যন্ত তিনি উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত অর্থদ্বারা পুরি ও আলুর তরকারি সংগ্রহ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন; কিন্তু অনুরুদ্ধ হইয়াও মুখোপাধ্যায়গৃহে অন্নগ্রহণ করিতেন না। ১৮৯৬ অব্দে তাঁহাকে একাদিক্রমে আট মাস প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে দেখা যাইত—সেখানে তিনি নীরবে বসিয়া পাঠ শুনিতেন। ইহার পর তিনি বলরাম বাবুর বাটীতে চলিয়া আসেন। সেখানে যাইতে তাঁহার প্রথমে আপত্তি ছিল; কারণ বিধিবদ্ধ জীবনপ্রণালী তাঁহার পক্ষে কষ্টদায়ক। কিন্তু গৃহকর্তা যখন বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার স্বাধীনতা অব্যাহত থাকিবে, তখন তিনি সম্মত হইলেন।

লাটু মহারাজের চিন্তাধারা ও জীবনপ্রণালীর সহিত স্বামীজীর ভাবধারা ও কার্যাবলীর পার্থক্য খুবই বেশী ছিল। ১৮৯৭ অব্দে স্বামীজী আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলে সকলেই পশুপতি বাবুর গৃহে তাঁহার সংবর্ধনায় অগ্রসর হইলেন; কিন্তু লাটু মহারাজকে দেখিতে পাওয়া গেল না। তিনি তখন ভাবিতেছেন, "ওদেশে সাহেব মেমদের সঙ্গে মিলে নরেনের কি আমার

কথা মনে আছে?” নরেন কিন্তু ঠিক মনে করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইয়া বলিলেন, “তুই আমার সেই লাটু ভাই, আর আমি তোর সেই নরেন ভাই।” ইহাতে তাঁহার ক্ষোভ আপাততঃ নিবৃত্ত হইলেও স্বামীজীর আচার-ব্যবহার ও মিশন-প্রতিষ্ঠাদি দেখিয়া সন্দেহ আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল এবং একদিন বলিয়াও ফেলিলেন, “ভাই, এত ঝঞ্ঝাট কেন আনছ? এতে যে ধ্যান-ধারণা সব ঘুলিয়ে যাবে।” সেদিন স্বামীজীর যুক্তি লাটু মহারাজকে আশ্বস্ত করিলেও এরূপ আচরণ পূর্ববৎই দুর্বোধ্য থাকিয়া তাঁহার জীবনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিতে লাগিল। মঠে আসিয়া স্বামীজী নিয়ম করিলেন, প্রত্যুষে ঘণ্টা বাজিলেই নিদ্রাত্যাগ করিতে হইবে। অমনি একদিন দেখা গেল, খেয়ালী লাটু কাপড়-গামছা লইয়া মঠ ছাড়িয়া যাইতেছেন। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথা যাচ্ছিস?” লাটু বলিলেন, “কলকাতায়।” “কেন?” “তুমি ওদেশ থেকে এসেছ, কত নূতন নিয়ম করছ—আমি ওসব মানতে পারব না। আমার মন এখনও এমন ঘড়ি-ধরা হয় নি যে, তুমি ঘণ্টা বাজাবে আর আমার মন অমনি ধ্যানে বসে যাবে।” নবীন ও প্রাচীন ধারার এই বিষম সংঘর্ষস্থলে নিরুপায় স্বামীজী প্রথমে বলিলেন, “তবে তুই যা।” কিন্তু ফটক পার হইতে না হইতেই তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া কহিলেন, “তোকে এ নিয়ম মানতে হবে না—যারা নূতন এসেছে, তাদের জন্য এ নিয়ম করা হয়েছে।” আর একবার স্বামীজী মঠে ডাম্বেল-ভাঁজার ব্যবস্থা করিলে অদ্ভুতানন্দ বলিলেন, “এ আবার কি একটা মত চালিয়ে দিলে ভাই! এ বয়সে আমাদের ডাম্বেল ভাঁজতে হবে নাকি? আমি তো তোমার ডাম্বেল ভাঁজতে পারব না।” কথা শুনিয়া স্বামীজী হাসিতে লাগিলেন।

এইরূপে সঙ্ঘজীবনের সহিত সর্বক্ষেত্রে আপনাকে মিলাইতে অপারগ

হইলেও এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা চলিবে না যে, লাটু মহারাজ নিয়মভঙ্গে আনন্দ পাইতেন বা এরূপ করার সমর্থন করিতেন। তিনি বলিতেন, "মঠে থাকলে নিয়ম মানতে হবে। সেখানে থেকে নিয়ম মানব না—এ তো ভাল নয়।" একদা জনৈক সাধু তাঁহার নিকট কোন এক মঠের মহান্তের নামে অভিযোগ করিলে তিনি সাধুটিকে অধ্যক্ষের নিকট ক্ষমা চাহিতে বলিয়াছিলেন। অধিকন্তু ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "এখন দেখছি বিবেকানন্দ ভায়ের মঠ করা সার্থক হয়েছে।"

মতের অমিল থাকিলেও বিবেকানন্দ-ভাই তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। ১৮৯৭ ইং-তে তিনি যখন উত্তর-ভারতভ্রমণে নির্গত হন, তখন স্বামী অদ্ভুতানন্দকে সঙ্গে লইয়া যান। কাশ্মীরে যে 'হাউস-বোটে' স্বামীজী ছিলেন, উহাতে দেশপ্রথানুযায়ী মাঝি সপরিবারে বাস করিত। নৌকায় উঠিয়া ইহা দেখিয়াই লাটু ঝটিতি তীরে নামিয়া বলিলেন, "আমি মেয়েমানুষের সঙ্গে এক বোটে থাকব না।" পরে স্বামীজী যখন আশ্বাস দিলেন যে, তাঁহার উপস্থিতিতে ভয় নাই, তখন লাটু পুনঃ উঠিতে সম্মত হইলেন। একদিন স্বামীজী কাশ্মীরের এক প্রাচীন মন্দির সম্বন্ধে বলিলেন যে, উহা দুই-তিন হাজার বৎসরের পুরাতন। অমনি লাটু এতাদৃশ অনুমানের কারণ জানিতে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি বুঝলে কি করে? আমায় বোঝাও। ওখানে কি সে কথা লিখা আছে?" স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন, "তোকে সে কথা বোঝাতে পারব না। যদি তুই লেখা-পড়া শিখতিস তা'হলে হয় তো তোকে বোঝাতে চেষ্টা করতুম।" লাটু মহারাজের বুদ্ধির তারিফ করিবার জন্য স্বামীজী কখন কখন তাঁহাকে প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিকের নামানুসারে প্লেটো বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এরূপ মূর্খত্বের অপবাদেও পশ্চাৎপদ না হইয়া বুদ্ধিমান প্লেটো উত্তর দিলেন, "ওঃ বুঝেছি। তুমি এমন বিদ্বান যে, আমার মত

গণ্ড-মূর্খুকেও বোঝাতে পার না"—চারিদিকে হাসির রোল পড়িয়া গেল। কাশ্মীরভ্রমণান্তে খেতড়িতে পৌঁছিয়া স্বামীজী রাজপ্রাসাদে অতিথি হইলেন। কিন্তু স্বামী অদ্ভুতানন্দ রাজার অন্ন গ্রহণ করিবেন না বলিয়া চুপি চুপি বাহিরে খাইয়া আসিতেন। একদিন রাজবাড়ির দারোয়ানের নিকট হইতে প্রায় বলপূর্বক রুটি ও বেগুন-পোড়া আদায় করিয়াছিলেন—দারোয়ান সন্ত্রস্ত ছিল, পাছে রাজ-অতিথিকে ভিক্ষা দিয়া রাজরোষে পড়ে। সেবারে তিনি স্বামীজীর সহিত জয়পুর পর্যন্ত বেড়াইয়া কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরে ফিরিয়া আসেন।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি কিছুদিন কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে বাস করিয়াছিলেন। তখন মঠ বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানে। স্বামী অদ্ভুতানন্দকে মধ্যে মধ্যে সেখানেও দেখা যাইত। আমেরিকা হইতে সদ্যঃ-প্রত্যাগত স্বামী সারদানন্দ তখন শয্যাদি বেশ ফিটফাট রাখিতেন, আর লাটু মহারাজ তাঁহার গৃহে প্রবেশপূর্বক কৌতুকচ্ছলে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করিতেন। স্বামী সারদানন্দ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "দেখছি, ওদেশ থেকে এসে তুমি কতখানি সাহেব বনেছ।" কথা শুনিয়া সারদানন্দ শুধু হাসিতেন। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে রাম বাবুর শেষ অসুখের সময় তাঁহার শয্যাপার্শ্বে সর্বদা উপস্থিত থাকিয়া লাটু মহারাজ আপ্রাণ সেবা করেন। রাম বাবু ২৪ ঘণ্টা পাখার বাতাস চাহিতেন—লাটু সারা রাত্রি সে কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি সন্ন্যাসী হইলেও উপকারীর প্রতি স্বীয় কর্তব্য বিস্মৃত হন নাই।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজীর দ্বিতীয়বার বিদেশ-গমনের পর লাটু মহারাজ বেলুড় মঠ হইতে বিডন স্ট্রীটে 'বসুমতী'-পত্রিকার ছাপাখানায় চলিয়া যান। ঐ সময় তাঁহাকে সমাজের নিম্নস্তরের অনেকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে হইত। কেহ যদি পরে প্রশ্ন করিত, "যারা চরিত্রহীন তাদের সঙ্গে

আপনি মিশতেন কেন?” তিনি উত্তর দিতেন, “কিন্তু তারা তো কপট ছিল না।” সাধুর লোক-পরীক্ষার মানদণ্ড অদ্ভুত! ছাপাখানার কর্মচারীদিগকে তিনি খুব খাওয়াইতেন; ছোলা-সিদ্ধ, রাঙাআলু-সিদ্ধ, চা, মোহনভোগ—এই সব স্বহস্তেই প্রস্তুত করিতেন। মাঝে মাঝে আবার হিং-এর কচুরি কিনিয়া আনিতেন। তখনও দিনের বেলা গঙ্গার ধারেই কাটাইতেন; সেখানে যে যাহা দিত তাহারই দ্বারা দৈনন্দিন ঐরূপ ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার নিজের প্রয়োজন ছিল অতি সামান্য—দুই-তিন বাটি চা ও তৎসহ ছোলা-সিদ্ধ হইলেই যথেষ্ট। বিশেষ অনুরোধে এক-আধখানি কচুরি হয়তো গ্রহণ করিতেন। এইভাবে কিছুদিন যাপনের পর ১৮৯৯-এর শেষাশেষি ‘বসুমতী’র ছাপাখানা গ্রে স্ট্রীটে উঠিয়া গেলে তিনি অন্যত্র চলিয়া যান।

পরবৎসর ডিসেম্বর মাসে স্বামীজী যখন বেলুড়ে ফিরিয়া আসেন, স্বামী অদ্ভুতানন্দ তখন সেখানেই থাকিলেও স্বেচ্ছায় তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান নাই—স্বামীজীই তাঁহাকে খুঁজিয়া গঙ্গাতীর হইতে আনিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর শত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রণালীবদ্ধ সঙ্ঘজীবনের মধ্যে তিনি আবদ্ধ হন নাই। এমন কি, ১৯০১ অব্দে স্বামীজী তাঁহাকে মঠের ট্রাস্টী করিতে চাহিলে তিনি অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, “আমার ওসব ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে না। আমি ওসবের মধ্যে থাকব না।”

লাটু মহারাজ নিরক্ষর হইলেও শাস্ত্রের বাণী তাঁহার নিকট শুধু ‘কথার কথা’ না হইয়া ‘প্রাণের ব্যথা’-স্বরূপ ছিল। স্বামী শুদ্ধানন্দের (সুধীর মহারাজের) সহিত একদিন তিনি পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির উপনিষদ্-ব্যাখ্যা শুনিতে গিয়াছিলেন। পণ্ডিত কঠোপনিষদ্ হইতে যখন

“অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ॥”

—এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া অর্থ করিলেন,[১] তখন লাটু মহারাজ স্বানুভূতির সহিত সামঞ্জস্য দেখিয়া সোৎসাহে পার্শ্ববর্তী শুদ্ধানন্দকে কহিলেন, "এ সুধীর, পণ্ডিত ঠিকই বলেছে।" কথাটি তিনি একটু উচ্চৈঃস্বরেই বলিয়া ফেলিলেন; অপরের যে ইহাতে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে এবং বিপরীত মন্তব্যের অবকাশ ঘটিতে পারে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। একবার বলিয়াই কিন্তু তৃপ্তি হইল না—অন্তরের উদ্বেলিত আনন্দ তরঙ্গের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে বাহিরের বেলাভূমিতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল, আর স্বামী শুদ্ধানন্দের গা ঠেলিয়া কহিতে লাগিলেন, "এ সুধীর, পণ্ডিত ঠিক বলেছে।" অগত্যা সুধীর মহারাজ ভাবিলেন, উপস্থিত লোকেরা তো এই ভাবগাম্ভীর্য বুঝিতে পারিবে না; সুতরাং সভাগৃহ-পরিত্যাগই শ্রেয়ঃ। আবাসস্থলে ফিরিবার পথেও স্বামী অদ্ভুতানন্দের আনন্দের রেশ একই ভাবে চলিতে লাগিল; এমন কি, রাত্রেও শুদ্ধানন্দজীকে জাগাইয়া তিনি কহিতে লাগিলেন, "এ সুধীর, পণ্ডিত ঠিক বলেছে।" একই উচ্চভাবে এইরূপ দীর্ঘকাল তন্ময় থাকার দৃষ্টান্ত ধ্যানসিদ্ধ ব্যক্তি ভিন্ন অন্যত্র বড়ই বিরল। স্বামী শুদ্ধানন্দ তখন তাঁহার সহিত একই গৃহে থাকিতেন এবং শাস্ত্রালোচনা করিতেন। লাটু মহারাজের এই শাস্ত্রপ্রীতি গভীররাত্রেও অপূর্বরূপে প্রকটিত হইত—অকস্মাৎ নিশীথকালে তিনি হয়তো আদেশ করিতেন, "এই সুধীর, সুধীর, গীতাপাঠ কর।" শুদ্ধানন্দ সানন্দে তাহাই করিতেন।

সাধারণতঃ মঠের বাহিরে সাধনাদিতে রত থাকিলেও সঙ্ঘের প্রতি তাঁহার অগাধ ভালবাসা ছিল। বিশেষতঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দের ইঙ্গিত বা আদেশ মানিতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। তিনি স্ত্রীলোকের সহিত

---

১ শস্যের শীষকে যেমন অতি সাবধানে খড় হইতে পৃথক করিতে হয়, তেমনি হৃদয়ে সর্বদা অধিষ্ঠিত পরমাত্মাকেও স্বদেহ হইতে পৃথক করিতে হয়।

অধিক মিলা-মিশা করিতে চাহিতেন না—সাধ্যমত এড়াইয়া চলিতেন। একবার বলরাম-মন্দিরে এক স্ত্রীভক্ত তাঁহার ঘরে আসিয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। লাটু মহারাজ তাঁহাকে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট যাইতে বলিলেও তিনি বসিয়াই রহিলেন। অধিকন্তু কথাপ্রসঙ্গে জানাইলেন যে, স্বামী সারদানন্দের আদেশে তিনি আসিয়াছেন। শরৎ মহারাজের নাম শুনিয়াই লাটু মহারাজ বলিলেন, "শরৎ আমার কাছে কেন পাঠালে? আমি রাজাকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দকে) জানাব। রাজার হুকুম হলে তোমায় ঠাকুরের কথা শুনাব; কিন্তু তাঁর হুকুম না পেলে তোমায় কোন কথা বলব না।" যেই কথা, সেই কাজ—তিনি মহারাজের নিকট গেলেন। মহারাজ তখন বলরাম-মন্দিরেই ছিলেন। তিনি সব শুনিয়া মহিলাটিকে বলিলেন, "শরতের কথায় ওকে এমনভাবে বিরক্ত করো না—ওতে তোমারই অকল্যাণ হবে।" ফলতঃ লাটু মহারাজ একাই ঘরে ফিরিলেন। নিবারণচন্দ্র দত্ত প্রায়ই ঠাকুরদের গান রচনা করিয়া মঠের সাধুদের শুনাইতেন। লাটু মহারাজ ইহাতে বলিয়াছিলেন, "দেখ, ঠাকুরদের গান তৈরী করতে নেই—ওতে দরিদ্দির বাড়ে।" এই নিষেধ মহারাজের মনঃপূত না হওয়ায় তিনি লাটুকে বলেন, "ও গানের ভেতর দিয়ে ঠাকুরের নাম প্রচার করছে—তাতে নিষেধ করা কেন?" অমনি সে কথা শিরোধার্য করিয়া লাটু নিবারণকে জানাইলেন, "তুমি রাখালকে খুশী করবার জন্য গান বাঁধতে পার।"

বলরাম-মন্দিরে থাকা কালেও তিনি যাহা কিছু পাইতেন, ভক্তসেবায় লাগাইতেন। ঐরূপ অর্থভিক্ষার সময় তাঁহাকে অনেক ক্ষেত্রে অনেক অপমান-সূচক কথা শুনিতে হইত। তাই জনৈক ভক্ত একদিন তাঁহাকে বলিলেন যে, গৃহস্থের জন্য সাধুর ভিক্ষা করা অনুচিত; যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে অতঃপর ভক্তরাই দিবেন। তর্ক বাড়িয়াই চলিল। অবশেষে অকস্মাৎ

লাটু মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, "এসব কথা তোমায় কে শিখিয়ে দিয়েছে?" "আপনারই একজন গুরুভাই"—এই উত্তর শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ও! তাই তোমাদের এত জেদ। আচ্ছা, তারই কথা থাকবে। রাজাকে (ব্রহ্মানন্দজীকে) অনেক দিক ভেবে চলতে হয়—মঠের সুনাম তাকেই যে রক্ষা করতে হয়।" পরে তিনি আর যেখানে-সেখানে ভিক্ষা চাহিতেন না এবং পরিচিত ক্ষেত্রেও বিচারপূর্বক গ্রহণ করিতেন। একদিন জনৈক ভক্ত তাঁহাকে কিছু দিলে তিনি না লইয়াই চলিয়া গেলেন এবং কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, "আরে, ও এখন নেশার ঝোঁকে আছে; নেশা ছুটে গেলে বলবে—শালা আমায় ঠকিয়ে নিয়েছে।"

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজীর দেহত্যাগের কিঞ্চিৎ পূর্ব হইতে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কাশীধাম যাওয়া পর্যন্ত লাটু মহারাজ প্রায়শঃ বলরাম-মন্দিরেই ছিলেন। মধ্যে একবার রাম বাবুর স্ত্রীর শেষ অসুখের সময় (এপ্রিল, ১৯০৩) রাম বাবুর বাড়িতে গিয়াছিলেন এবং ১৯০৩-এর ৺দুর্গাপূজার পরে কয়েক জন ভক্তসহ উত্তর-ভারতের কয়েকটি তীর্থ দেখিয়া আসিয়াছিলেন।

বলরাম-মন্দিরে লাটু মহারাজের অশেষ গুণাবলীর মধ্যে সহ্যগুণটি বিশেষ অভিব্যক্ত হইয়াছিল। এক মাতাল তাঁহাকে একদিন খুব কটূক্তি করিতে থাকিলে উপস্থিত ভক্তেরা মাতালকে দণ্ড দিতে অগ্রসর হইলেন। লাটু মহারাজ বারণ করিয়া বলিলেন, "দেখ, ও মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গালাগালি করছে, আর তোমরা যে মদ না খেয়ে মাতাল হয়ে গালাগালি করছ! কার শাস্তি দেওয়া উচিত বল তো? ওকে তোমরা আর কি মারবে? মদই ওকে মেরে রেখেছে।" এইরূপ বিচারের সম্মুখে সমস্ত শাসন পরাজিত হয়! কলিকাতায় এরূপ উচ্ছৃঙ্খল লোকের অভাব নাই; কিন্তু লাটু মহারাজের সহানুভূতিরও কোন অপ্রাচুর্য ছিল না।

রাত্রি এগারটায় জনৈক মাতাল দোকান হইতে মাংস কিনিয়া আনিয়া উহা প্রসাদ করিয়া দিতে বলিলে তিনি অম্লানবদনে পাত্রটি সম্মুখে রাখিতে নির্দেশ দিয়া মাতালকে তাহার প্রিয় গান, "জগৎ দেখ না চেয়ে যাচ্ছি বেয়ে সোনার তরণী ; তরীর উপর শ্যামকলেবর রাম রঘুমণি" ইত্যাদি গাহিতে বলিলেন। গান শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "প্রসাদ হয়ে গেছে, তুলে নাও।" মাতালও সানন্দে মাংসপাত্র লইয়া চলিয়া গেল।

ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে তিনি বড়ই উদার ছিলেন। মুসলমানদের ঈদ ও মহরম উপলক্ষে তিনি পীরের দরগায় পূজা পাঠাইতেন। খ্রীষ্টমাস ও গুড্ ফ্রাইডের দিনে স্বহস্তে যীশুখ্রীষ্টকে ভোগ নিবেদন করিতেন বা মালা পরাইয়া দিতেন। খ্রীষ্টান ডি মেলো ধ্যান সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ চাহিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাকে ভালবাস?" সাহেব বলিলেন, "যীশু ও ঠাকুর উভয়কে।" "বরাবর কাকে ভালবেসে এসেছ?" ডি মেলো যীশুর নামই করিলে লাটু মহারাজ বিধান দিলেন, "দেখ, যীশুকেই ধরে থেকো।"

ঠাকুরের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত লাটুর সত্যনিষ্ঠা ছিল চমকপ্রদ। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন যে, জনৈক ভক্তের বাড়িতে বিগ্রহ দেখিতে যাইবেন। সেদিন বৃষ্টি হইয়া রাস্তায় জল দাঁড়াইয়া গেল ; তথাপি লাটু এক-হাঁটু জল ভাঙ্গিয়া ভিজা-কাপড়ে যথাসময়ে বিগ্রহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

স্বামী অদ্ভুতানন্দের একটি অভ্যাস ছিল এই যে, শাসনের প্রয়োজন হইলে অপরকে শাসন না করিয়া নিজেকেই শাসন করিতেন আর উপদেশ-দানকালে অভিমান দূর করিবার জন্য নিজের নিরক্ষরতার স্মৃতি সর্বদা জাগাইয়া রাখিতেন। একদিন এক ব্যক্তি অত্যন্ত বেয়াড়া ভাবে তর্ক করিতে থাকিলে মৃদু ভর্ৎসনায় কাজ হইতেছে না দেখিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি এমন বকুনি খেলে, হাসতে তোমার লজ্জা করছে না—এমন

বেহায়া তুমি?" তার্কিক 'সর্বভূতে একই ব্রহ্ম বিদ্যমান' এই অদ্বৈত সিদ্ধান্তের অপপ্রয়োগ করিয়া উপহাসক্রমে বলিলেন, "আপনি তো আমায় ধমক দেন নি, নিজেই নিজেকে ধমকাচ্ছেন। এতে কে না হাসবে?" লাটু মহারাজ তখন আত্মস্থ হইয়া বলিলেন, হাঁ, লাল কাপড় পরেছি—ভারী সাধু বনে গেছি আর কি! একটা ছোট কথা শুনলে এখনও ভেতর থেকে ফোঁস বেরোয়!" কাহাকেও কোন উপদেশ দিবার পর তিনি বিড় বিড় করিয়া বলিতেন, "ভারী সাধু হয়েছি রে, বাপ! পরকে উপদেশ দিতে যাচ্ছি। আরে, তুই কি উপদেশ দিবি? ওরা তোর চেয়ে কত বড়, কত শিক্ষিত!" এই পদ্ধতিকে তিনি বলিতেন, "উল্টো পাক দিয়ে মনের পাকগুলোকে খুলে দেওয়া"—আর সঙ্গে সঙ্গে হাতে উল্টা পাক দেখাইয়া দিতেন।

লাটু মহারাজ একদিন কোন এক ভদ্রলোকের গৃহে নিমন্ত্রিত হন। বাড়ির লোকেরা অনেকেই তাঁহাকে চিনিতেন না; সুতরাং গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীকে পঙ্‌ক্তি হইতে পৃথক করিয়া বসাইলেন এবং পরিবেশনকালে তেমন মনোযোগও দিলেন না। অকস্মাৎ গৃহকর্ত্রী সেখানে আসিয়া এবং অবস্থা দেখিয়া কান্নার সুরে বলিতে লাগিলেন, "আমার কি হবে গো! সন্ন্যাসীকে খেতে বসিয়ে দেখলুম না!" নিরভিমান স্বামী অদ্ভুতানন্দ যতই সান্ত্বনা দেন, গৃহিণী ততই গৃহের অকল্যাণের ভাবনায় বিলাপ করেন। ইহা দেখিয়া তিনি সেই আসনে বসিয়াই গৃহের মঙ্গলের জন্য দুই-চারি মিনিট জপ করিলেন।

শ্লীলতার জ্ঞান ছিল তাঁহার আবার অপূর্ব! ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ৺দুর্গাপূজার সময় শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী হইতে আসিয়া বলরাম-মন্দিরে একমাস ছিলেন। গাড়ি হইতে নামিয়া তিনি প্রিয় সন্তান লাটুকে দেখিয়া যাই বলিলেন, "বাবা লাটু, কেমন আছ?" লাটু অমনি উত্তর দিলেন, "তুমি

ভদ্দর ঘরের মেয়ে, সদর বাড়িতে কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ? আমাকে তো ডেকে পাঠালেই পারতে।" খেয়ালী সন্তানের ভব্যতা দেখিয়া মা হাসিতে হাসিতে উপরে চলিয়া গেলেন। কখন কখন তিনি আবার মায়ের সম্বন্ধে বেদান্তবিচারও করিতেন। মা জয়রামবাটী ফিরিবেন। লাটু মনের বিষাদ ঢাকিবার জন্যই বোধ হয় নিজের ঘরে দ্রুত পদচারণ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে বেদান্তবিচার করিতে লাগিলেন, "সন্ন্যাসীর কে পিতা, কে মাতা?—সন্ন্যাসী নির্মায়া।" মা নীচে নামিয়া উহা শুনিলেন এবং দ্বারপ্রান্তে আসিয়া বলিলেন, "বাবা লাটু, তোমায় আমাকে মেনে কাজ নেই, বাবা!" আর যায় কোথায়? স্নেহের স্পর্শে বেদান্ত ভাসিয়া গেল—লাটু মায়ের পদতলে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মাও তখন অশ্রুসিক্তা। মায়ের চক্ষে জল দেখিয়া লাটু আবার তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, "বাপের ঘরে যাচ্ছ মা, কাঁদতে কি আছে?"—ইহা বলিয়া স্বীয় উত্তরীয়ে মায়ের অশ্রুমোচন করিলেন। মায়ের সম্বন্ধে লাটু মহারাজ একদিন অন্তরের কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "মাকে মানা কি সহজ কথা রে?—তিনি যে স্বয়ং লক্ষ্মী!"

লাটু মহারাজ সাধারণতঃ গাম্ভীর্যপূর্ণ হইলেও তাঁহার রহস্যবোধ যথেষ্ট ছিল। বলরাম-মন্দিরে অবস্থানকালে তিনি প্রায়ই গিরিশ বাবুর বাড়িতে যাইতেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, গিরিশ বাবু স্বরচিত 'কালাপাহাড়' নাটকে প্রচ্ছন্নভাবে লাটুর চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। একদিন গিরিশ বাবুর কি কথার উত্তরে তিনি বলিলেন,

"মনকে ছাঁদো মনকে বাঁধো, মনকে দিও না লাই।
আগুর কথা পিছু করো, হুঁশিয়ার রহিও ভাই॥"

গিরিশ বাবু কথাটার উদ্দেশ্য ধরিতে না পারিয়া কহিলেন, "বড় ঠারে-ঠোরে কথা হয়ে যাচ্ছে যে সাধু!" লাটু 'কালাপাহাড়'-রচনার প্রতিশোধের

সুযোগ পাইয়া বলিলেন, "সেই ভাল, না হলে 'কালাপাহাড়' জমবে কেন ?"—অর্থাৎ তুমিও তো কম ঠারেঠোরে কাজ সার নাই !

ঐ সময় প্রায় ছয় মাস কাল লাটু অনিদ্রারোগে ভুগিয়াছিলেন। গিরিশ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলে মহাকবি তাঁহাকে গল্প করিয়া ঘুম পাড়াইতেন। বস্তুতঃ গিরিশ বাবুর সহিত তাঁহার খুব হৃদ্যতা ছিল। অথচ গিরিশ বাবুর অসুখের সময় তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেও তিনি যাইতেন না। কেহ নেহাত পীড়াপীড়ি করিলে বলিতেন, "দেখ, গিরিশের কষ্ট আমি দেখতে পারি না।" তাঁহার অনুরাগ কত গভীর ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া গেল গিরিশ বাবুর দেহত্যাগের দিনে (১৯১২ খ্রীঃ, ৮ই ফেব্রুয়ারী)। সংবাদ পাইয়া লাটু মহারাজ শোকদমনের জন্য দিবসব্যাপী মৌনাবলম্বন করিলেন। পরদিন মৌন ভাঙ্গিলেও সব সময় শুধু গিরিশের প্রসঙ্গেই অতিবাহিত হইল। স্বামীজীর দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়াও তিনি অনুরূপ কারণেই বেলুড়ে যান নাই—যদিও তিনি কলিকাতায়ই ছিলেন। অথচ দুঃখবোধ ছিল তাঁহার সুগভীর। কাশীতে থাকাকালে বাবুরাম মহারাজের দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া তিনি তিন দিন স্তব্ধবৎ অবস্থান করিয়াছিলেন। কাশী হইতে একবার আলমোড়ায় যাইবার জন্য হরি মহারাজ সাদর আমন্ত্রণ জানাইলে লাটু মহারাজ উত্তর দিলেন, "জীবের দুঃখে দুঃখিত হয়ে বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা এখানে বিরাজ করছেন। তাঁদের ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।"

যাহা হউক, গিরিশ বাবুর দেহত্যাগের পরে রামকৃষ্ণ বাবুর একমাত্র পুত্র ঋষি অকস্মাৎ কলেরারোগে দেহত্যাগ করিলে তাঁহার মন কলিকাতা হইতে উঠিয়া গেল। তিনি হয়তো তখনই চলিয়া যাইতেন; কিন্তু বাবুরাম মহারাজের বিশেষ অনুরোধে ৺দুর্গাপূজা পর্যন্ত থাকিয়া ৺বিজয়াদশমীতে কাশীযাত্রা করিলেন। যাত্রার পূর্বে বাসগৃহখানির দিকে তাকাইয়া তিন

বার বলিলেন, "মায়া, মায়া, মায়া!" পথে বৈদ্যনাথ-দর্শনান্তে কাশীতে সদলবলে পৌঁছিয়া তিনি অদ্বৈতাশ্রমে উঠিলেন; কিন্তু সেখানে স্থানাভাব দেখিয়া টেড়িনিমে কুণ্ডু মহাশয়দের বাড়িতে চলিয়া গেলেন। এই বাটীতে সপ্তাহখানেক থাকিয়া সোনাপুরায় বংশী দত্তের বাটীতে আশ্রয় লইলেন। অতঃপর বাড়িওয়ালার আত্মীয়েরা আসিতেছেন শুনিয়া ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের পূর্বেই ৬৮নং পাঁড়ে হাউলির বাড়িটি ভাড়া লইয়া তথায় উঠিয়া গেলেন। প্রায় চারি বৎসর এই বাড়িতে অবস্থানান্তে তিনি ৯৬নং হাড়ার-বাগের ভাড়াবাটীতে উঠিয়া যান এবং সেখানেই স্বধামে গমন করেন।

কাশীতে বাসকালে একদিন শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি তাঁহার সুগুপ্ত ভক্তি হঠাৎ নিজ পূর্ণ সৌষ্ঠবে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ভাসাভাসা মাতৃভক্তির প্রতিবাদকল্পে প্রায়ই তিনি বলিতেন, "তোদের মা-ঠাউনকে হামি মানে না!" কিন্তু সেদিন ৺বিশ্বনাথের পূজার জন্য পুষ্প ও বিল্বপত্র লইয়া রাস্তায় নামিয়া অকস্মাৎ বলিলেন, "চল্, আগে মার কাছে যাই।" মা তখন কাশীতে। সেখানে গিয়া কম্পিতকলেবরে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্বক লাটু মহারাজ নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

পাঁড়ে হাউলির বাড়িতে লাটু মহারাজ জপধ্যানে এতই তন্ময় থাকিতেন যে, আহারাদির কোন নিয়মিত সময় ছিল না; গৃহে থাকিলেও তাঁহার জীবনে পর্বতকন্দর বা অরণ্যোচিত শৃঙ্খলাহীনতা লক্ষিত হইত—আজ যদি দৈনিক আহার হইল রাত্রি দশটায়, তো কাল রাত্রি একটায় এবং পরশ্ব রাত্রি তিনটায়! এইরূপ ধ্যান ও কঠোরতাদি সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিলে তিনি বলিতেন, "আরে, আমরা আর কি কঠোর করছি? কঠোর করেছিল দস্যু রত্নাকর। সংস্কারের দাগ যেন পাথরের আঁক—সহজে উঠে না। কর্ম না হলে কি কৃপা মিলে?"

কাশীতে তাঁহার আশ্রিতবাৎসল্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একবার দুশ্চিকিৎস্য (সম্ভবতঃ যক্ষ্মা) রোগে আক্রান্ত একটি দরিদ্র যুবক তাঁহার পাঁড়ে হাউলির বাড়িতে আশ্রয় পাইয়া তাঁহারই বিধানানুসারে মাত্র ৺বিশ্বনাথের পূজা ও চরণামৃত পানপূর্বক নিরাময় হইয়াছিল। এক-সময়ে গৃহনির্মাণের জন্য কিছু টাকা তাঁহারই আশ্রিত কেহ চুরি করিলে পুলিসে খবর দিবার কথা উঠে। অমনি বাধা দিয়া তিনি বলেন, "দেখ, সে বেচারী লোভ সামলাতে না পেরে চুরি করেছে সত্য ; কিন্তু যাকে আশ্রয় দিয়েছি তাকে পুলিসে দেওয়া কি ভাল দেখায় ?" একবার জনৈক নিঃসম্বল ভক্তের অভিলাষ হয় যে, তিনি কলিকাতা হইতে কাশীতে ৺বিশ্বনাথ-দর্শনে যাইবেন, কিন্তু একান্ত দরিদ্র তাঁহার পক্ষে উহা কিরূপে সম্ভব হইবে ? সংবাদ পাইয়া লাটু মহারাজ তাঁহাকে জানাইলেন যে, কোনও প্রকারে এক পিঠের রেল-ভাড়া সংগ্রহ করিয়া চলিয়া আসিলেই আর সব ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। এই আশ্বাস পাইয়া ভক্তটি আসিলেন বটে ; কিন্তু নিজেকে কপর্দকশূন্য দেখিয়া বড়ই মনঃক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। ৺বিশ্বনাথদর্শনে যাইয়া সেই কষ্ট আরও বর্ধিত হইল। কারণ সামান্য ফুল-বেলপাতা দিয়া পূজা করিলেও বাহিরে আসিয়া যখন দেখিলেন সকলেই দান করিতেছে, আর নিঃস্ব তিনিই মাত্র সেই পুণ্যার্জনে বঞ্চিত, তখন তাঁহার মনে এইরূপ ধিক্কার আসিল—"একে তো তীর্থে আসিয়া সাধুর অন্ন ধ্বংস করিতেছি; অধিকন্তু পুণ্য-অর্জনের জন্য একটি পয়সারও ক্ষমতা রাখি না।" গৃহে ফিরিয়া তিনি রুদ্ধকক্ষে অশ্রুপাত করিতে থাকিলে অদ্ভুতানন্দ সব জানিতে পারিয়া বিধান দিলেন, "তুমি গঙ্গাস্নানান্তে ভগবানের উদ্দেশে গঙ্গাজল অর্পণ করে এই বলে প্রার্থনা করো, 'জগতের সমস্ত দুঃখ দূর হোক্।' " ভক্তটি ভাবিলেন, "ইহা অক্ষমের সান্ত্বনার জন্য একটা অনুকল্প ব্যবস্থা মাত্র—প্রকৃত পুণ্যলাভ ইহাতে হয় না।" তথাপি

মহাপুরুষের আদেশ মান্য করিয়া তাহাই করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! ঐরূপ করিবামাত্র তাঁহার মন শান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

লাটু মহারাজ অপরের মনোভাব বুঝিতে পারিতেন। এক সময়ে জনৈক ভক্ত স্বীয় পরিবারের মহিলাদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াও তাঁহাদিগকে ৺বিশ্বনাথ-দর্শনে লইয়া গেলেন না; বলিলেন, "ও পাথর দেখে কি হবে?" ভাবিলেন, তিনি খুব বেদান্তবাদী হইয়াছেন। ঐ দিন লাটু মহারাজের দর্শনার্থে যাইয়া তিনি যখন সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছেন, তখন শুনিলেন স্বামী অদ্ভুতানন্দ বলিতেছেন, "পাথর! আমি দেখছি, সাক্ষাৎ শিব; আর তুই বলছিস পাথর!" এই ঘটনাটিকে শুধু কাকতালীয়-ন্যায়ে বিভিন্ন ব্যাপারের আকস্মিক মিলন বলিয়া যুক্তিবাদী উড়াইয়া দিতে পারেন; কিন্তু এই যুক্তি তিনি কতবার প্রয়োগ করিবেন? কারণ লাটু মহারাজের জীবনে এইরূপ ঘটনা অহরহঃ ঘটিত। এক রাত্রে তাঁহার পার্শ্বে নিদ্রিত এক ভক্ত কুস্বপ্ন দেখিতেছেন, এমন সময় তিনি ঐ ভক্তকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "এখানে এসেও এই সব চিন্তা?" তাঁহার নিকট যে সব ভক্ত বা সেবক থাকিতেন, তাঁহাদের মনে ধ্যানকালে অপবিত্র ভাব উদিত হইলে অন্তর্দ্রষ্টা লাটু মহারাজ তাহা জানিতে পারিতেন এবং তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বলিতেন, "পবিত্র হও, পবিত্র হও। সৎ না হলে সৎ-স্বরূপকে জানতে পারবে না" ইত্যাদি। জনৈকা মহিলা স্বামীর সহিত কলহ করিয়া তীর্থদর্শনে বহির্গত হন এবং ৺কাশীধামে পৌঁছিয়া আত্মীয়গণের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিয়া দেখিলেন, তিনি যেন কেমন করিয়া সে গোপন রহস্য অবগত হইয়াছেন; কাজেই প্রণাম করিয়া উঠিবামাত্র কহিলেন, "স্ত্রীলোকদের স্বামীকে মেনে চলতে হয়। যে মানে না, তার সংসারে খিটি-মিটি লেগেই থাকে।" বিধবা সঙ্গিনী দুইজন তাঁহার পদপ্রান্তে দুইটি টাকা রাখিয়া প্রণাম করিলে তিনি উহা কিছুতেই

গ্রহণ করিলেন না, বলিলেন, "গরীব আর বিধবার টাকা সন্ন্যাসীকে নিতে নেই।"

লাটু মহারাজকে নিত্য বহু ভক্তের বিবিধ আধ্যাত্মিক অভাব মিটাইতে হইত। নিরক্ষর তাঁহার মুখে অবিরাম উচ্চ ধর্মতত্ত্ব-শ্রবণের জন্য বহু শিক্ষিত ব্যক্তিও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার এই সময়ের উপদেশাবলী সংগৃহীত হইয়া 'সৎকথা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা পাঠ করিলে তাঁহার গভীর অনুভূতি ও অপরের মনে প্রেরণা জাগাইবার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া অবাক হইতে হয়।

শেষবয়সে তাঁহার দেহে বহুমূত্ররোগ দেখা দিল। এই সময় পায়ে একটা ফোস্কা হইয়া যথোচিত যত্নের অভাবে বিষাক্ত পচাঘায়ে (গ্যাংগ্রীনে) পরিণত হয়। অস্ত্রোপচারের ফলে সে যাত্রা উহা সারিলেও পুনর্বার বহুমূত্র-জনিত বিষাক্ত ক্ষত দেখা দিল। ইহার চিকিৎসাকল্পে শেষ চারিদিন প্রত্যহ তাঁহার দেহে দুই-তিন বার অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল; কিন্তু কি অপূর্ব তিতিক্ষা—দেখিয়া মনে হইত না যে, তিনি যন্ত্রণাভোগ করিতেছেন। অস্ত্রোপচারে কোন ফল হইল না। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল তিনি মহাসমাধিতে দেহরক্ষা করিলেন। তাঁহার শেষসংবাদ স্বামী তুরীয়ানন্দের একখানি পত্রে (২৫।৪।২০) সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

"এমন অদ্ভুত মহাপ্রয়াণ প্রায় দেখা যায় না। ইদানীং সর্বদাই অন্তর্মুখ থাকিতেন লিখিয়াছি। অসুখের সময় হইতে একেবারে ধ্যানস্থ ছিলেন—ভ্রূমধ্যবদ্ধদৃষ্টি। সকল বাহ্য বিষয় হইতে একেবারে সম্পূর্ণ উপরত! সদা সচেতন, অথচ কিছুরই খবর রাখিতেন না।...মধ্যে মধ্যে প্রায় প—কে ডাকিতেন; প—র হাতে খাইতেন। কখন কিছু না খাইলে প— বলিত, 'তবে আমিও কিছু খাব না।' অমনি লাটু মহারাজ খাইয়া লইতেন। কিন্তু দেহত্যাগের পূর্বরাত্রে কিছুই খাইলেন না। প— বলিল, 'খাইলেন না,

তবে আমিও আর খাইব না।' লাটু মহারাজ এবার বলিলেন, 'মৎ খা'—একেবারে মায়া-নির্মুক্ত উক্তি! পরদিন সকালে আমি যাইয়া দেখি খুব জ্বর। নাড়ী দেখিলাম—নাড়ী নাই। ডাক্তার আসিয়া হার্ট পরীক্ষা করিলেন—শব্দ পাইলেন না। টেম্পারেচার ১০২°৬। বেশ সজ্ঞান—তবে কোন বাহ্য চেষ্টা নাই।···দুধ দিলে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ৺বিশ্বনাথের চরণামৃত অতি সন্তোষের সহিত খাইয়াছিলেন। বেলা ১০টার পর আমি বিদায় লইয়া পুনরায় চারটার সময় উপস্থিত হইব বলিয়া আসিলাম।···বাটী আসিয়া স্নানাহারান্তে একটু বিশ্রাম করিতেছি, সংবাদ পাইলাম লাটু মহারাজ ১২টা ১০ মিনিটের সময় ইহলোক ছাড়িয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন।···আমি তাঁহাকে শেষদর্শন করিবার জন্য ৯৬ নং হাড়ার বাগ বাটীতে উপস্থিত হইলাম।

"···যখন তাঁহাকে বসাইয়া দিয়া পূজাদি করা হয় তখনকার মুখের ভাব যে কি সুন্দর দেখাইয়াছিল, তাহা লিখিয়া জানানো যায় না। এমন শান্ত, সকরুণ, আনন্দময় দৃষ্টি আমি পূর্বে কখনও লাটু মহারাজের আর দর্শন করি নাই। ইতঃপূর্বে অর্ধ-নিমীলিত নেত্র থাকিত, এখন একেবারে বিস্ফারিত ও উন্মুক্ত হইয়াছিল। তাহাতে যে কি ভালবাসা, কি প্রসন্নতা, কি সাম্য ও মৈত্র-ভাব দেখিলাম, তাহা বর্ণনার অতীত। যে দেখিল সেই মুগ্ধ হইয়া গেল। বিষাদের চিহ্নমাত্র নাই। আনন্দের ছটা বাহির হইতেছে—সকলেই যেন প্রীতিভরে অভিনন্দন করিতেছেন। এ সময়ের দৃশ্য অতীব অদ্ভুত ও চমৎকার প্রাণস্পর্শী! অদ্ভুতানন্দ নাম পূর্ণ করিতেই যেন প্রভু এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখাইলেন।··· ধন্য গুরু মহারাজ, ধন্য তাঁহার লাটু মহারাজ!"

স্বামী তুরীয়ানন্দ

কলিকাতার বাগবাজার-অঞ্চলে বসুপাড়া-পল্লীতে শ্রীযুত চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক এক স্বধর্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি তেজস্বী ও স্পষ্টবাদী বলিয়া পরিচিত ছিলেন; আর তাঁহার অসাধারণ নাড়ীজ্ঞান ছিল। তাই আসন্নমৃত্যু বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা তাঁহাকে বলিয়া রাখিতেন, "শেষ সময়ে ভুলো না; হাড় ক'খানা যাতে গঙ্গায় যায়, তার ব্যবস্থা করো।" চন্দ্রনাথ ডব্লিউ ওয়াট্‌সন কোম্পানির গুদাম-সরকার ছিলেন। এই সামান্য আয়েই তিনি সহধর্মিণী প্রসন্নময়ীর সহিত সানন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। মহেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ ও হরিনাথ নামে চন্দ্রনাথের তিনটি পুত্র ছিল। তাঁহার কন্যাত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ভিন্ন সকলেই অকালে গতাসু হয়। হরিনাথ আমাদের উত্তরকালের স্বামী তুরীয়ানন্দ। ইনি ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী (১২৬৯ সাল, ২০শে পৌষ, শনিবার, চান্দ্র পৌষ, শুক্লা চতুর্দশী তিথি, মৃগশিরা নক্ষত্রে বেলা ৯টায়) জন্মগ্রহণ করেন। ঠিকুজির ফলে জানা যায় যে, হরিনাথ বিদ্বান্, তপোনিষ্ঠ, স্বধর্মপরায়ণ সন্ন্যাসী হইবেন। বালকের জন্মগ্রহণের পর চন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠতাত বলিয়াছিলেন, "কৃষ্ণ এসেছেন।" হরিলুটের সন্তান বলিয়া চন্দ্রনাথ নবজাতকের নাম রাখিলেন হরিনাথ।

হরিনাথ যখন মাত্র তিন বৎসরের শিশু, তখন অকস্মাৎ একটি ক্ষিপ্ত শৃগাল তাঁহাকে অতর্কিতে আক্রমণ করিলে শিশুকে রক্ষা করার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া প্রসন্নময়ী তাহাকে দুই হস্তে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিলেন। এইরূপে সন্তান রক্ষিত হইলেও মাতা শৃগালদংশনে অচিরে দেহত্যাগ

স্বামী তুরীয়ানন্দ

করিলেন। অতঃপর জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়ার উপর হরিনাথের লালনপালনের ভার অর্পিত হইল। মহেন্দ্রনাথ হরিনাথ অপেক্ষা বিশ বৎসরের এবং উপেন্দ্রনাথ দশ বৎসরের বড় ছিলেন। স্নেহপরায়ণা ও কোমলপ্রাণা ভ্রাতৃবধূর আদরযত্নে হরিনাথ জননীর অভাব অনেকটা ভুলিলেন বটে; কিন্তু অজ্ঞাতে সে শূন্যতা তাঁহার কিশোরচরিত্রে একটু পরিবর্তন আনিয়া দিল। সহিষ্ণুতার প্রতিমা মাতার নিকট যে হরিনাথ দুরন্ত ছিলেন, ভ্রাতৃজায়ার নিকট তিনি বড় শান্ত ও বাধ্য হইয়া পড়িলেন। আহারে তাঁহার তেমন বিচার রহিল না, যাহা পাইতেন তাহাই খাইতেন। তথাপি তাঁহার অন্তর্নিহিত তেজ মাঝে মাঝে বিদ্রোহের আকারে বাহির হইয়া পড়িত; তখন তিনি অপরকে প্রহারাদি পর্যন্ত করিতেন। বড় বউদির স্নেহের কথা স্মরণ করিয়া পরে তিনি বলিয়াছিলেন, "বড় বউদির কাছেই মানুষ হয়েছিলুম। সর্বদাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতুম। ভয়ানক নেওটা ছিলুম। বড় বউদিও আমায় খুব স্নেহযত্ন করতেন, মার মত মানুষ করেছিলেন। সাধু হয়ে গেলেও তাঁর জন্য চিন্তা ছিল। তাঁর শরীর না যাওয়া পর্যন্ত চিন্তিত ছিলুম। তাঁর শরীর যাওয়ার পর নিশ্চিন্ত হলুম।" বুদ্ধিবিকাশের পরেই হরিনাথ কম্বুলিয়াটোলা বাংলা স্কুলে ভর্তি হইলেন। তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আত্মীয়গণ যখন তাঁহার পিতাকে গঙ্গাযাত্রা করাইলেন, তখন হরিনাথ কাঁদিয়া উঠিলেন। হরিনাথের দিদি পিতাকে বলিলেন, "হরি কাঁদছে, ওকে একটু সান্ত্বনা দিন।" পরলোকে প্রসারিতদৃষ্টি সপ্ততিপর বৃদ্ধ শুধু বলিলেন, "হরিকে আর কি বলব? হরি জগতের, জগৎ হরির।"

বাল্যকালে শরীরচর্চা ও ব্রহ্মচর্যপালনে হরিনাথের একটু মাত্রাধিক্য দেখা যাইত। তিনি প্রত্যহ আখড়ায় যাইয়া কুস্তি লড়িতেন এবং এক-সঙ্গে একশত ডন ও পাঁচশত বৈঠক দিতে পারিতেন। সঙ্গী ছেলেরা বলিত, "অত করিস নি। বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস; শেষে মরে

যাবি।" বিদ্রূপের ভঙ্গীতে হরিনাথ উত্তর দিতেন, "আমি একাই মরে যাব; আর তোরা বেঁচে থাকবি!" ধর্মসাধনার ক্ষেত্রেও বালব্রহ্মচারী হরিনাথ গায়ত্রীজপ ও সন্ধ্যারাধনা তো নিয়মিত করিতেনই, তদুপরি প্রত্যহ তিনবার গঙ্গাস্নান, স্বপাক হবিষ্যান্ন-ভোজন ও কঠিন শয্যায় শয়নাদিতে অভ্যস্ত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রপাঠাদিও যথেষ্ট ছিল। বেদান্তবিচারে তিনি অল্পবয়সেই পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাঁহার চাল-চলনের অসাধারণতা-দর্শনে হিতকামী প্রতিবেশীরা মহেন্দ্রনাথকে সাবধান করিয়া দিলেন। কিন্তু উপার্জনক্ষম জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃমাতৃহীন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে শাসনের দ্বারা তখনই সংসারে আকৃষ্ট করার প্রয়োজন বুঝিতে পারিলেন না; বরং বলিলেন, "হরিনাথ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের সদাচারেই তো লিপ্ত আছে, ইহাতে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে?" এই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা হরিনাথকে একদিকে যেমন কখন কখনও বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে লাগিল, অপরদিকে তেমনি সুপ্রবৃত্তিগুলিকে পল্লবিত করিয়া এবং অভিজ্ঞতা আনিয়া দিয়া নিজ আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিল।

গঙ্গাস্নানে তাঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল। নিজের নিকট ঘড়ি না থাকায় অনেক দিন তিনি ভুলক্রমে অধিক রাত্রে উঠিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইতেন এবং যথাসময়ে গঙ্গাস্নানান্তে গৃহে ফিরিতেন। এইরূপে এক জ্যোৎস্নারাত্রে প্রত্যূষের পূর্বেই গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। একটু পরে একগলা জলে নামিয়া স্নান করিতে করিতে দেখিলেন, যেন খড়ের তালের মত কি একটা তাঁহারই দিকে ভাসিয়া আসিতেছে। তীর হইতে শব্দ হইল, "কুমীর, কুমীর! উঠে এস।" অমনি সংস্কারবশে হরিনাথ তৎক্ষণাৎ জল ছাড়িয়া উঠিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই স্মরণ হইল, "আমি না বেদান্তবিচার করি? এই বুঝি আমার 'ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা' বলা?" কাজেই পুনঃ গঙ্গায় নামিয়া বিচার করিতে লাগিলেন, "আমি শুদ্ধ আত্মা, আমার দেহ নাই,

মৃত্যু নাই।" সৌভাগ্যক্রমে জলে নাড়া পড়ায় বা যে কোনও কারণেই হউক কুমীরটাকে আর দেখা গেল না।

আচারনিষ্ঠ হইলেও হরিনাথ গুণগ্রাহী ছিলেন। তখন জেনারেল এসেম্ব্লিতে বাইবেল-পাঠ অপরিহার্য হইলেও পাঠকালে কক্ষটি প্রায়ই শূন্য থাকিত। অথচ হরিনাথ স্বহস্তে নারায়ণপূজা-সমাপনান্তে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে বাইবেল-পাঠ শুনিতেন। কবিবর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলাকাব্য' ও তুলসীদাসের দোঁহাবলী তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। সন্ধ্যাসমাগমে তিনি গঙ্গাতীরে বসিয়া মহিলাকাব্যের 'মাতা'র অংশটি কিংবা দোঁহাবলী অনর্গল আবৃত্তি করিতেন এবং উহাতে সন্ধ্যাকিরণোদ্ভাসিত পবিত্র জাহ্নবীতীরে এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হইত।

পিতার দেহত্যাগের পরে আহারাদি-সম্বন্ধে হরিনাথের কঠোরতা যেন ক্রমেই বর্ধিত হইতেছিল। কিন্তু শরীর অত সহিতে পারিবে কেন? ফলে শীঘ্রই তাঁহার আমাশয় হইল এবং আত্মীয়স্বজনের পীড়াপীড়িতে এই বিষয়ে কতকটা শিথিলতা অবলম্বন করিতে হইল। এইরূপে বাহিরের কঠোরতা কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলেও একটি ঘটনায় অন্তরের বৈরাগ্য আরও বৃদ্ধি পাইল। প্রিয়নাথ ও কেদারনাথ নামীয় দুইটি খুল্লতাতপুত্র তাঁহার অতি প্রিয় ছিলেন। কেদারনাথ অল্পবয়সেই বিসূচিকারোগে দেহত্যাগ করিলেন। হরিনাথ দাঁড়াইয়া সব দেখিলেন—মানুষের জীবন কত ক্ষণভঙ্গুর, আর মৃত্যুর সম্মুখে মানুষের সর্বপ্রকার চেষ্টা, সর্বপ্রকার স্নেহের আকর্ষণ কত অকিঞ্চিৎকর!

উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে চিৎপুরে ৺সর্বমঙ্গলার মন্দিরে এক সাধুর আগমন হয়। বাল্যবন্ধু গঙ্গাধরের (অখণ্ডানন্দজীর) সহিত হরিনাথ প্রায়ই সেখানে যাইতেন; কিন্তু সকাম অপর দর্শকদের ন্যায় তিনি বাক্‌সিদ্ধ সাধুর নিকট কোনও প্রার্থনা না জানাইয়া নীরবে বসিয়া থাকিতেন। সাধু

ইহা লক্ষ্য করিয়া হরিনাথকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আস যাও, কিছু তো চাও না ? তোমার কি চাই ?" হরিনাথ উত্তর দিলেন, "সাধন-ভজন ও ভগবান্‌লাভ।" সাধু আনন্দে উল্লসিত হইয়া বলিলেন, "বেশ বেশ ! তোমার হবে। তবে এখন নয়, একটু দেরি আছে। এখন ঘরে থেকে সাধন কর।" হরিনাথ সাধুর বাক্য শিরোধার্য করিয়া গৃহে থাকিয়াই সাধনভজনে ডুবিলেন।

হরিনাথের মনে তখন ধর্মপিপাসা জাগিয়া তাঁহাকে উহার সন্ধানে সর্বত্র লইয়া যাইতেছে। এই সময়ে পল্লীতে প্রচার হইল যে, দীননাথ বসু মহাশয়ের বাড়িতে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব আসিবেন। সংবাদ পাইয়া তিনি গঙ্গাধরের সহিত সেখানে গেলেন। হরিনাথের বয়স তখন তের কি চৌদ্দ বৎসর। সেই প্রথম সন্দর্শনের কথা তাঁহার একখানি চিঠি (১৯।৯।১৭ তাং) হইতে জানা যায় কেশবচন্দ্রের সহিত ঠাকুরের তখন 'সবে পরিচয় হইয়াছে।' হরিনাথ ও গঙ্গাধর সেখানে গিয়া দেখিলেন, একখানি গাড়ি হইতে একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি (হৃদয়) অপর একজন সংজ্ঞাহীন ও অত্যন্ত কৃশ ব্যক্তিকে নামাইতেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখকান্তি ও অঙ্গের ভাব যেন শাস্ত্রবর্ণিত শুকদেবের ন্যায়। ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া গেলে তিনি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া মধুরকণ্ঠে "যশোদা নাচাত তোরে বলে নীলমণি" ইত্যাদি গান গাহিলেন এবং অনেক পরমার্থপ্রসঙ্গ করিলেন। ইহার পর হরিনাথ আরও দুই-তিন বৎসর পূর্বেরই ন্যায় সাধনভজনে ব্যাপৃত রহিলেন। তবে তিনি স্থির করিলেন, তিনি বিবাহ করিবেন না। বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া কেহ আসিলে বরের মুখে বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া আলাপ-আলোচনা সেইখানেই শেষ হইত। পড়াশুনার দিকেও আর তাঁহার তেমন মন রহিল না। প্রবেশিকা-পরীক্ষা তিনি দিলেন না। জিজ্ঞাসিত হইয়া শুধু বলিলেন, "কি হবে ইংরেজী বিদ্যা শিখে ?"

দীননাথ বসুর বাটীতে প্রথম সন্দর্শনের দুই-তিন বৎসর পরে (সম্ভবতঃ ১৮৭৮ বা ১৮৭৯ খ্রীঃ) হরিনাথের দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ হয়। ঠাকুর তাঁহাকে ছুটির দিন ব্যতীত অন্য দিনে যাইতে বলিয়া দেন। অধিকন্তু তিনি জানিয়া লইয়াছিলেন যে, হরিনাথ অদ্বৈত-বিচার করেন এবং 'রামগীতা' তাঁহার প্রিয় পুস্তক। ঠাকুর তাঁহাকে কিরূপে এই শুষ্ক জ্ঞানপথ হইতে সরস জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিপথে আনিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ আমরা 'লীলাপ্রসঙ্গ' হইতে উদ্ধৃত করিব (৩য় ভাগ, ৭৫-৮০ পৃঃ)—

"আমাদের জনৈক বন্ধু হরিনাথ একসময়ে বেদান্তচর্চায় বিশেষ মনোনিবেশ করেন। ঠাকুর তখন বর্তমান এবং উঁহার আকুমার ব্রহ্মচর্য, ভক্তি, নিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য উঁহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন। বেদান্তচর্চা ও ধ্যানভজনাদিতে নিবিষ্ট হইয়া হরিনাথ পূর্বে পূর্বে যেমন ঘন ঘন ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিতেন, সেরূপ কিছুদিন করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। ঠাকুরের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে বিষয় অলক্ষিত থাকে নাই। বন্ধুটির সঙ্গে যাতায়াত করিত এমন এক ব্যক্তিকে দক্ষিণেশ্বরে একাকী দেখিয়া ঠাকুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি রে, তুই যে একলা, সে আসে নি?' জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বলিল, 'সে মশাই আজকাল খুব বেদান্ত চর্চায় মন দিয়েছে। রাতদিন পাঠ, বিচার-তর্ক নিয়ে আছে। তাই বোধ হয় সময় নষ্ট হবে বলে আসে নি।' ঠাকুর শুনিয়া আর কিছু বলিলেন না। উহার কিছুদিন পরেই আমরা যাহার কথা বলিতেছি, তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন, 'কি গো, তুমি নাকি আজকাল খুব বেদান্তবিচার করছ? তা বেশ বেশ! তা বিচার তো খালি এই গো—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; না আর কিছু?' বন্ধু—'আজ্ঞা হাঁ, আর কি?' বন্ধু বলেন, বাস্তবিকই ঠাকুর সেদিন ঐ কয়টি কথায় বেদান্ত-সম্বন্ধে তাঁহার চক্ষু

যেন সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়াছিলেন। কথাগুলি শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছিলেন, ঐ কয়টি কথা হৃদয়ে ধারণা হইলে বেদান্তের সকল কথাই বুঝা হইল।'… কথাগুলি ঠাকুর তাঁহাকে লইয়া পঞ্চবটীতে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন। ইতিপূর্বে তাঁহার (হরিনাথের) ধারণা ছিল—উপনিষদ্ পঞ্চদশী ইত্যাদি নানা জটিলগ্রন্থ না পড়িলে, সাংখ্য-ন্যায়াদি দর্শনে ব্যুৎপত্তি না হইলে বেদান্ত কখনও বুঝা যাইবে না এবং মুক্তিলাভ সুদূরপরাহত থাকিবে। ঠাকুরের সেদিনকার কথাতেই বুঝিলেন, বেদান্তের যত কিছু বিচার সব ঐ ধারণাটি হৃদয়ে দৃঢ় করিবার জন্য। …ঠাকুরের নিকট সেদিন তিনি বিদায়গ্রহণ করিলেন এবং তখন হইতে গ্রন্থপাঠাদি অপেক্ষা সাধনভজনেই অধিক মনোনিবেশ করিবেন এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে কলিকাতার দিকে ফিরিলেন। এইরূপে তিনি সাধনসহায়ে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিবার সঙ্কল্প মনে স্থির ধারণা করিয়া তদবধি তদনুরূপ কার্যেই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিলেন।…

"পূর্বোক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে ঠাকুর একদিন বাগবাজারে ৺বলরাম বসুর বাটীতে শুভাগমন করিয়াছেন। বাগবাজার-অঞ্চলের ভক্তগণ সংবাদ পাইয়া অনেকে উপস্থিত হইলেন। আমাদের পূর্বোক্ত বন্ধুর আবাস অতি নিকটেই ছিল। ঠাকুর তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করায় পাড়ার পরিচিত জনৈক প্রতিবেশী যুবক যাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া আসিলেন। বলরাম বাবুর বাটীর দ্বিতলের প্রশস্ত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াই বন্ধু ভক্তমণ্ডলীপরিবৃত ঠাকুরকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিকটেই এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। ঠাকুরও তাঁহাকে সহাস্যে কুশলপ্রশ্নমাত্র করিয়াই উপস্থিত প্রসঙ্গে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। দুই-একটি কথার ভাবেই বন্ধু বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুর উপস্থিত সকলকে বুঝাইতেছেন—জ্ঞান বল, ভক্তি বল, দর্শন বল, কিছুই

ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন হইবার নহে। শুনিতে শুনিতে তাঁহার মনে হইতে লাগিল ঠাকুর তাঁহার মনের ভুল ধারণাটি দূর করিবার জন্যই অদ্য যেন ঐ প্রসঙ্গ উঠাইয়াছেন। মনে হইতে লাগিল, ঠাকুর ঐ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতেছেন তাহা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন। শুনিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন—'কি জান, কাম-কাঞ্চনকে ঠিক ঠিক মিথ্যা বলে বোধ হওয়া, জগৎটা তিন কালেই অসৎ বলে ঠিক ঠিক মনে-জ্ঞানে ধারণা হওয়া কি কম কথা! তাঁর দয়া না হলে কি হয়? তিনি কৃপা করে ঐরূপ ধারণা যদি করিয়ে দেন তো হয়। নইলে মানুষ নিজে সাধন করে সেটা কি ধারণা করতে পারে? তার কতটুকু শক্তি! সে শক্তি দিয়ে সে কতটুকু ধারণা করতে পারে? এইরূপে ঈশ্বরের দয়ার কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের সমাধি হইল। কিছুক্ষণ পরে অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'একটা ঠিক করতে পারে না, আবার আর একটা চায়।' ঐ কথাগুলি বলিয়াই ঠাকুর ঐরূপ ভাবাবস্থায় গান ধরিলেন—

'ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব,
ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে!'

গাহিতে গাহিতে ঠাকুরের দুই চক্ষে এত জলধারা বহিতে লাগিল যে, বিছানার চাদরের খানিকটা ভিজিয়া গেল! বন্ধুও সে অপূর্ব শিক্ষায় দ্রবীভূত হইয়া কাঁদিয়া আকুল! কতক্ষণে তবে দুইজনে প্রকৃতিস্থ হলেন। বন্ধু বলেন, 'সে শিক্ষা চিরকাল আমার অন্তরে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। সেদিন হইতেই বুঝিলাম, ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কিছুই হইবার নহে।' "

হরিনাথ একদিন ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন, "মশাই, কামটা একেবারে যায় কি করে?" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "যাবে কেন রে? মোড় ফিরিয়ে

দে না !” হরিনাথ জানিতেন, যুদ্ধ করিয়াই সমস্ত মনোবৃত্তিকে পরাজিত করিতে হয়; তাই উত্তর শুনিয়া তিনি অবাক হইলেন। আবার আরও অবাক হইলেন, যখন তিনি উহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাইলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য-সম্বন্ধে তাঁহার আরও শিক্ষার অবকাশ ঘটিয়াছিল। বাল-ব্রহ্মচারী হরিনাথ নারীজাতিকে ঘৃণা করিতেই অভ্যস্ত ছিলেন। এমন কি, মাতৃকল্পা জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর হস্তে আহার করিতে পর্যন্ত তাঁহার মন সঙ্কুচিত হইত। বালিকাদিগকে তিনি নিকটেও আসিতে দিতেন না। উক্ত বিষয়ে ঠাকুর একদিন উপদেশ দিতেছেন, এমন সময় হরিনাথ বলিলেন, “উঃ আমি তোদের হাওয়া সহ্য করতে পারি না।” ঠাকুর অমনি তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “তুই বোকার মত কথা বলছিস। নারী মূর্তিদের অবজ্ঞার চোখে দেখার কারণ কি? তারা জগন্মাতার মানবী মূর্তি। তাদের মায়ের মত দেখবি ও শ্রদ্ধা করবি। তাদের প্রভাব হতে মুক্ত হবার এই হচ্ছে উপায়। তা না করে যতই তাদের অবজ্ঞা করবি ততই তাদের ফাঁদে পড়বি।”

হরিনাথ একদিন ঠাকুরকে বলিলেন, “মশাই, যখন আমি এখানে আসি তখন বেশ উদ্দীপনা পাই; কিন্তু কলকাতায় ফিরে গেলে সে উদ্দীপনা আর থাকে না কেন?” ঠাকুর স্নেহসিক্ত-স্বরে শিষ্যের মনে অগাধ বিশ্বাস জন্মাইয়া বলিলেন, “তা কি করে হতে পারে? তুই হরিদাস, হরির দাস; তোর পক্ষে ঈশ্বরবিস্মৃতি অসম্ভব।” হরিনাথ বাধা দিয়া বলিলেন, “আমি তো তা বুঝতে পারি না।” সদ্‌গুরুও তেমনি দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন, “কোন বস্তু বা বিষয়ের সত্যতা কারুর জানা বা না জানার উপর নির্ভর করে না। তুই জানিস আর নাই জানিস, তুই হরির সেবক, হরির ভক্ত।”

হরিনাথ জানিতেন, মুক্তি বা নির্বাণলাভই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এই বিষয়েও ঠাকুর একঘেয়ে ভাব সরাইয়া তাঁহার মনকে আরও উদার করিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "নির্বাণকে আদর্শ করেছিস কেন? নির্বাণ অপেক্ষাও উচ্চতর অবস্থা আছে এবং তা লাভ করা যায়। যারা নির্বাণ প্রার্থনা করে তারা হীনবুদ্ধি, ভয়তরাসে—যেমন দশ-পঁচিশ খেলায় কেবলই চিক খুঁজছে—কিসে ঘরে উঠে যায়, সেই চেষ্টা। ঘুঁটি একবার পাকলে আর নামাতে চায় না। একে বলে কাঁচা খেলোয়াড়। আর পাকা খেলোয়াড় মার পেলে পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দেয়, আবার তখনই কচেবারো বলে পাশা ফেললেই আবার উঠে গেল। তাদের পাশা হাতের বশ। যেমন বলে তেমনি পড়ে। সুতরাং ভয় নেই, নির্ভয়ে খেলে।"

হরিনাথ আর একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়া দেখিলেন, ঠাকুর একজন বেদান্তের পণ্ডিতকে বলিতেছেন, "কিছু বেদান্ত শোনাও।" পণ্ডিত চমৎকার বুঝাইয়া যাইতে লাগিলেন এবং ঠাকুরও প্রীতিসহকারে শুনিতে লাগিলেন। পরে কিন্তু তিনি পণ্ডিতের সুখ্যাতি করিয়া ভক্তদিগকে বলিলেন, "আমার কিন্তু বাপু অতশত ভাল লাগে না। আমার মা আছেন, আর আমি আছি। তোমাদের ও বড় বড় জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, ধ্যান-ধ্যেয়-ধ্যাতা ইত্যাদি ত্রিপুটী প্রভৃতি বেশ খুব ভাল। আমার হচ্ছে কিন্তু—মা আর আমি, আর কিছুই নাই।" ঠাকুরের কথার ভঙ্গীতে বেদান্তের ত্রিপুটী অপেক্ষা ঠাকুরের 'মা আর আমি' হরিনাথের নিকট সেদিন বড় সহজ, সরল ও মধুর বলিয়া মনে হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইহাই অবলম্বনীয়।

একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে মধ্যাহ্নভোজনে বসিয়াছেন, হরিনাথ এবং অপর কেহ কেহ উপস্থিত আছেন। ঠাকুরের সম্মুখে ভাতের থালা এবং চারিদিকে ছোট ছোট বাটিতে ব্যঞ্জনাদি পরিবেশিত হইয়াছে। শিষ্যদের মনে পাছে কোন সংশয় জাগে এই জন্য লোককল্যাণকামী ও সন্দেহভঞ্জন ঠাকুর নিজেই বলিতে লাগিলেন, "মনটা সদাই অখণ্ডের দিকে ছুটে। তোমাদের সঙ্গে

কথা কইব বলে মনটাকে নীচে নামিয়ে রাখবার জন্য এটা খাই, ওটা খাই —ভিন্ন ভিন্ন বাটি থেকে একটু করে জিভে দিই।"

হরিনাথ ঠাকুরকে অবতার বলিয়া জানিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার রোগযন্ত্রণাদিকে লীলা মনে করিয়া ঐ জন্য তত উদ্বিগ্ন হইতেন না। কাশীপুরে একদিন ঠাকুরকে দেখিতে গিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "কেমন আছেন?" ঠাকুর বলিলেন, "বড় কষ্ট হচ্ছে, খেতে পাচ্ছি না; অসহ্য জ্বালাযন্ত্রণা হচ্ছে।" হরিনাথ কিন্তু দিব্যচক্ষে দেখিলেন—ঠাকুর আনন্দের সাগর ও রোগযন্ত্রণার অতীত। ঠাকুর যতই নিজের যন্ত্রণার কথা বলেন, হরিনাথ ততই ঐরূপ অনুভূতি করেন। বারংবার এইরূপ হওয়ায় তিনি ঠাকুরকে বলিয়াই ফেলিলেন, "আপনি যাহাই বলুন না কেন, আমি দেখছি আপনি অসীম আনন্দের সমুদ্র।" ইহা শুনিয়া ঠাকুর মৃদুহাস্যে আপন-মনে বলিলেন, "শালা ধরে ফেলেছে রে!"

দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমনকালে নরেন্দ্রের সহিত হরিনাথের একটা বেশ শ্রদ্ধামিশ্রিত বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। দুইজনে অনেক সময় একই সঙ্গে হাঁটিয়া গাড়িতে করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। একদিন হাঁটিয়া বরাহনগরের পথে ফিরিবার সময়ে নরেন্দ্রনাথ হরিনাথকে বলিলেন, "ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু বল।" হরিনাথ উত্তর দিলেন, "কি আর বলব?" এই বলিয়া তিনি "অসিতগিরিসমং স্যাৎ[১]" ইত্যাদি শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন। নরেন্দ্রনাথও নানাকথা কহিতে কহিতে বলিলেন, "ওঁর কথা আর কি বলব? আমাকে যদি বল, তিনি এল্-ও-ভি-ই (love) personified (মূর্তিমান্ প্রেম)।" আর একদিন নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,

---

১ "সাগররূপ মসীপাত্রে যদি নীলপর্বতসদৃশ মসী রাখা হয়, কল্পতরুর শ্রেষ্ঠ শাখা যদি লেখনী হয়, পৃথিবী যদি লিখিবার পত্রিকা হয়, আর ৺সরস্বতী অনন্তকাল ধরিয়া লিখিতে থাকেন, তথাপি, হে ঈশ্বর, তোমার গুণরাশির সীমা করা যায় না।"—শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্

"হরি-ভাই, ভগবান কি শাক-মাছ, যে এত দাম দিয়ে (অর্থাৎ এত জপ-তপ করে) তাঁকে কিনবে? 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'—পরমাত্মা যাঁকে কৃপা করেন, তাঁরই কাছে তিনি লভ্য হন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের অল্প পরেই হরিনাথ প্রবল বৈরাগ্যের আকর্ষণে একমাত্র বস্ত্র পরিয়া এবং উত্তরীয়রূপে একখানি লেপের ওয়াড় স্কন্ধে ফেলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন এবং আসামের শিলং পর্যন্ত ঘুরিয়া আসেন। অতঃপর চব্বিশ বৎসর বয়সে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বরাহনগর মঠে যোগদান করেন এবং সন্ন্যাসগ্রহণানন্তর স্বামী তুরীয়ানন্দ নামে অভিহিত হন। সন্ন্যাসের পরও সহোদরদের প্রতি তাঁহার ভালবাসার হ্রাস হয় নাই। 'তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ একদিন দেখেন, এক মুণ্ডিতমস্তক গেরুয়াধারী তরুণ সন্ন্যাসী তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। সন্ন্যাসীর চক্ষে অশ্রু। উপেন্দ্রনাথ চিনিলেন, ইনিই হরিনাথ। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদছ কেন? এই তো তুমি চাও।" উত্তর আসিল, "আপনাদের নিকট আমি অনেক প্রকারে ঋণী।" দাদা আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তা হোক; বড় ভাইদের যা কর্তব্য তা আমরা করেছি। কিন্তু তুমি যখন গৃহী হলে না, তখন এই পথই ভাল। আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার সিদ্ধিলাভ হোক।" অমনি মেঘমুক্ত শারদাকাশ সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত হইল—হরিনাথের অশ্রুসিক্ত মুখে আনন্দের রেখা ফুটিয়া উঠিল।

নবীন সন্ন্যাসী কিন্তু বরাহনগরের পরিবেশের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে পারিলেন না—পরিব্রাজক ও সাধকরূপে তিনি চলিলেন তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে। এইরূপে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বামী সারদানন্দাদির সহিত হৃষীকেশে তপস্যা করেন এবং পর বৎসর গ্রীষ্মকালে গঙ্গোত্রী প্রভৃতি তীর্থদর্শনে গমন করেন। ইহার সবিশেষ বিবরণ সারদানন্দপ্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গঙ্গোত্রী হইতে ফিরিয়া তিনি একাকী ভ্রমণপূর্বক

মুশুরী পাহাড়ের সানুদেশে রাজপুরে উপস্থিত হইয়া তপস্যামগ্ন হন। এখানে সরকারের গোয়েন্দা-বিভাগের এক কর্মচারী তাঁহার অনুসরণ করে এবং বিবিধ প্রশ্নে তাঁহাকে উত্যক্ত করিতে থাকে। হরি মহারাজ ইহাতে বিশেষ বিরক্তি দেখাইলে গোয়েন্দা বলে, "আপনি পুলিসকে ভয় করেন না।" দৃপ্ত সিংহের পুচ্ছ পদদলিত হইলে সে যেমন বীর-বিক্রমে দণ্ডায়মান হইয়া গর্জন করে, পুরুষসিংহ স্বামী তুরীয়ানন্দও তেমনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি যমকেও ভয় করি না, পুলিস তো দূরের কথা।" হিংস্র জন্তুকেও ভয় না করিয়া যিনি গভীর অরণ্যে বিচরণ করেন, তিনি কি সংসার-অরণ্যের ক্ষুদ্র হিংস্র মানবের নিকট পরাজিত হইবেন? বস্তুতঃ পরাজয় হইল পুলিসের। সে পরে তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত হইয়াছিল।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের শেষে স্বামী বিবেকানন্দের সাহচর্যে কিয়দ্দিবস বিভিন্ন স্থানে যাপনান্তে হরি মহারাজ দিল্লী হইতে ব্রহ্মানন্দজীর সহিত জ্বালামুখী প্রভৃতি তীর্থদর্শনে চলিলেন। পাঞ্জাব ও সিন্ধুর বহুস্থান-দর্শনান্তে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত তিনি বোম্বে আসিয়া আমেরিকাগামী স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ পাইলেন। তথায় একদিন স্বামীজী জানাইলেন যে, তাঁহার শরীর ভাল নহে; সুতরাং সমাগত ভদ্রলোকদের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গ হরি মহারাজকেই করিতে হইবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও হরি মহারাজ প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়া বৈরাগ্যেরই উপদেশ দিলেন। কথা সাঙ্গ হইলে স্বামীজী তাঁহাকে একান্তে বলিলেন যে, গৃহস্থদিগকে এরূপ উচ্চাঙ্গের বৈরাগ্যের উপদেশ দিলে অযথা তাহাদের মন বিচলিত হয়—তাহারা উহার মোটেই অনুসরণ করিতে পারে না। অমনি হরি মহারাজ সহাস্যে বলিলেন, "আমার মাথায় ছিল যে, আপনি উপস্থিত আছেন; কাজেই যা-তা বলা চলে না। বেশী ভাল কথা বলতে গিয়ে এই গোল হয়ে গেল।"

ইহার স্বল্পকাল পরে ব্রহ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী বৃন্দাবনে গমনপূর্বক

দীর্ঘকাল তপস্যায় কাটাইয়াছিলেন। হরি মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে সমধিক শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন। সুতরাং তাঁহাকে ভিক্ষার্থে যাইতে না দিয়া স্বয়ং দ্বারে দ্বারে খণ্ড খণ্ড রুটির সন্ধানে ঘুরিতেন। এই কঠিন শ্রমের ফলে কোন দিন উদরপূর্তি হইত, কোন দিন বা হইত না। একদিন কূপের পার্শ্বে দুইজনে বসিয়া জলে ভিজাইয়া শুষ্ক রুটি খাইতেছেন, এমন সময়ে হরি মহারাজ সকাতরে বলিলেন, "মহারাজ, আপনাকে ঠাকুর কত স্নেহযত্ন করতেন এবং ক্ষীর সর ননী খাওয়াতেন; আর আজ আমি শুকনো রুটি খাওয়াচ্ছি"—ইহা বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গেল।

বৃন্দাবনে অবস্থানকালে হরি মহারাজ রাধারানীর দর্শনমানসে কখন কখন নিধুবনে যাইতেন। একদিন তমালবৃক্ষের শাখায় রাধারানীর আলুলায়িত বেণী দেখিয়া প্রথমে ভাবিলেন উহা ময়ূরপুচ্ছ; কিন্তু অচিরেই নয়নপথে সত্য উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহাকে চমকিত করিল। একদিন বহু গৃহে ভিক্ষাটনে ক্লান্ত হইয়াও পূর্ণকাম না হওয়ায় শরীরের উপর তাঁহার অত্যন্ত ধিক্কার আসিল। জলে-ভিজানো রুটি মুখে দিতে দিতে তিনি বলিতে লাগিলেন, "শালা শরীর, তোর জন্যই তো আমার এত কষ্ট—এই খা।" ইহার পর তাঁহার স্পষ্ট অনুভূতি হইল, "আমি দেহ নহি—আমি স্বতন্ত্র, ক্ষুধাতৃষ্ণাবর্জিত আত্মা—দেহটা ত্যক্ত জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় পৃথক পড়িয়া আছে।" এই অনুভূতির পর অতৃপ্ত ক্ষুধায় ও পর্যটনে ক্লান্ত দেহ ভূশয্যায় লুটাইয়া পড়িল। নিদ্রাভঙ্গে তিনি দেখেন, শরীরের ক্লান্তি বিদূরিত হইয়া তৎস্থলে দেহমন পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে এক অসীম আনন্দ। অতঃপর তিনি অযোধ্যাদি-দর্শনান্তে ১৮৯৪-এর শেষে মঠে ফিরিয়া প্রায়শঃ সেখানেই বাস করিতে থাকেন। তবে মধ্যে একবার দেওভোগে নাগ মহাশয়কে দেখিয়া আসিয়াছিলেন এবং ১৮৯৬-এর শেষে মুঙ্গের ও মিথিলা প্রভৃতি স্থানেও গিয়াছিলেন।

হরি মহারাজের পরিব্রাজকজীবনের কয়েকটি বিশেষ ঘটনার কালনির্ণয় করা অসম্ভব; অথচ চরিত্রাঙ্কনের পক্ষে তাহারা অপরিহার্য। একদা গ্রীষ্মকালে দ্বিপ্রহরে নগ্নপদে ভিক্ষাটনের পর প্রয়াগের নিকটবর্তী কোন আম্রকাননে কূপের শীতল জলে স্বচ্ছন্দে স্নান করিতে যাইয়া তিনি মূর্ছিত অবস্থায় ভূপতিত হন। সৌভাগ্যক্রমে ঐ অঞ্চলের কোন সাধু-ভক্তের সেবায় দুই দিন পরে সংজ্ঞালাভ হয়।

পথ চলিতে চলিতে তাঁহার একদা মনে হইল, "জগতে সকলেই কোন-না-কোন কর্তব্যসম্পাদনে রত; শুধু আমিই ভবঘুরের মত ব্যর্থ জীবনযাপন করছি।" তারপর কেশীঘাটে শায়িতাবস্থায় ধ্যান করিতে তাঁহার অনুভূতি হইল—সুবিশাল ভূমিতলে তিনি শায়িত আছেন এবং তাঁহার দেহ আকাশ-পাতাল জুড়িয়া বিস্তৃত রহিয়াছে; আর সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অশরীরী বাণী উঠিতেছে, "দেখ, তুমি কত মহান্! কেন তুমি ভাব তোমার জীবন ব্যর্থ? ওঠ, জাগ, পরম সত্য লাভ কর—সে সত্যের কণা-মাত্র বিশ্বকে মুক্ত করতে পারে। ইহাই মহত্তম জীবন।" তুরীয়ানন্দ চমকিত হইয়া জাগিলেন—সে গ্লানি চিরতরে তিরোহিত হইল।

সৌরাষ্ট্রে গীর্নার পাহাড়ে শরীর অসুস্থ হইলে তিনি বৈদ্যের নিকট যাইতে উদ্যত হইলেন। অমনি স্মৃতিতে জাগিল "ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ"—আর বৈদ্যগৃহে যাওয়া হইল না; ভগবানে নির্ভর করিয়া গঙ্গাজলে রোগনিবারণের আশায় কুঠিয়ায় ফিরিলেন।

উপনিষদে আছে যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ অভীঃ লাভ করেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ এক প্রত্যূষে উত্তরকাশীতে গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার পথে দেখেন, এক ব্যাঘ্র মৃতদেহ ভক্ষণ করিতেছে। অমনি প্রাচীন সংস্কার জাগিয়া তাঁহার গতি প্রতিহত করিল; কিন্তু পরক্ষণেই আত্মজ্ঞান তাঁহাকে বলিয়া দিল, "বাঘ মৃতদেহ খাচ্ছে তো খাক; এতে আমি ভীত হই কেন?" তিনি পুনর্বার

স্বপথে অগ্রসর হইলেন। আর একবার টিহিরী-গাড়োয়ালে তপস্যাকালে রাত্রে গ্রামে রব উঠিল ব্যাঘ্র আসিয়াছে। অমনি তিনি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া স্বীয় ভগ্নগৃহের দ্বারে ইষ্টক সজ্জিত করিয়া ব্যাঘ্রের পথরোধে তৎপর হইলেন। কিন্তু মুহূর্তমধ্যে দেহবুদ্ধি পরাজিত হইয়া আত্মবুদ্ধি প্রকাশিত হওয়ায় পদাঘাতে সেই ইষ্টকস্তূপ অপসৃত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

স্বামীজীর প্রথমবারে ভারত-প্রত্যাবর্তনের পর হরি মহারাজ তাঁহারই ইচ্ছায় রাজপুতানা ও সৌরাষ্ট্র-ভ্রমণান্তে মঠে ফিরিয়া জানিলেন যে, গুরু-ভ্রাতাদের আগ্রহে স্বাস্থ্যলাভের জন্য স্বামীজী পুনর্বার এই সর্তে সমুদ্রযাত্রা করিতে সম্মত হইয়াছেন যে, হরি মহারাজকেও তাঁহার সঙ্গে আমেরিকায় যাইতে হইবে। স্বামীজী পূর্বেও তাঁহাকে এই প্রস্তাব জানাইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সম্মত হন নাই। আজও তিনি সম্মত ছিলেন না। কিন্তু স্বামীজী তুরীয়ানন্দজীর সে অসম্মতির উত্তরে করুণ-স্বরে বলিলেন, "হরি-ভাই, ঠাকুরের কাজের জন্য আমি বুকের রক্ত বিন্দু বিন্দু পাত করে মৃতপ্রায় হয়েছি। তোমরা কি আমায় এ কাজে সাহায্য করবে না—কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে?" আদেশ যখন আর্তির আকারে সম্মুখে আসে, তখন কাহার না মন টলে? তুরীয়ানন্দ এই যুক্তির কাছে পরাস্ত হইয়া ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে স্বামীজীর সহিত কলিকাতা-বন্দরে জাহাজে উঠিলেন।

ক্রমে তিনি ইংলণ্ড হইয়া আগস্ট মাসে নিউইয়র্কে পৌঁছিয়া কিয়দ্দিবস বেদান্ত-সমিতি-ভবনে অবস্থানান্তে রিজ্‌লে ম্যানরে শ্রীযুক্ত লেগেটের গৃহে স্বামীজীর সহিত অতিথি হইলেন। এখানে অনতিবিলম্বেই স্বামীজী জানাইলেন, "হরি ভাই, আমার টাকা ফুরিয়ে গেছে; আমি আর তোমার ভার নিতে পারব না। এখন তুমি কি করবে দেখ।" হরি মহারাজ তো ভাবিয়া আকুল—কি করবেন এই বিদেশে? তিনি স্বামীজীকে জানিতেন এবং বুঝিয়াছিলেন যে, ইহা কৌতুক নহে; পরন্তু কৃত্রিম কঠোরতার

আবরণে কর্মক্ষেত্রে নামাইবার কঠোরতর কৌশল। তিনি ভাবিয়া মণ্ট্-ক্লেয়ারে বৃদ্ধা শ্রীযুক্তা হুইলারের গৃহে যাওয়াই স্থির করিলেন। পরন্তু স্বামীজী যখন পরামর্শ দিলেন যে, সেখানে যেন শাস্ত্রাধ্যাপন চলে, তখন তুরীয়ানন্দ অস্বীকৃত হইলেন। অগত্যা সৎপ্রসঙ্গ মাত্র করার উপদেশ দিয়া স্বামীজী বলিলেন, "ওতেই যথেষ্ট কাজ হবে। হরি ভাই, জীবন দেখাও, আর ভারতকে ভুলে যাও।" কথাগুলি তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া ভাবী কার্যাবলীকে নবরূপ দান করিয়াছিল। যাহা হউক, মণ্ট্-ক্লেয়ারে উপস্থিত হইবার পর অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে বহু কর্মে বিজড়িত হইতে হইল; কারণ তাঁহাকে পাইয়া শ্রীযুক্তা হুইলারের উৎসাহ দ্বিগুণ বর্ধিত হইল এবং তিনি বহু ব্যক্তিকে নবাগত সন্ন্যাসীর সকাশে উপস্থিত করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু মণ্ট্-ক্লেয়ারে থাকিলেও স্বামী তুরীয়ানন্দ শনি ও রবিবারে নিউইয়র্কের কার্যে অভেদানন্দজীকে সাহায্য করিতেন। পরবর্তী গ্রীষ্মকালে অভেদানন্দ মহারাজ অন্যত্র গমন করিলে স্বামী তুরীয়ানন্দকে ঐ সময়ের জন্য পূর্ণ কার্যভার লইতে হইল।

নিউইয়র্কের বেদান্তানুরাগীরা তাঁহার নাম ও যশ পূর্বেই শুনিয়াছিলেন, অধুনা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠতররূপে নিকটে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। বেদান্তসমিতির বৈঠকখানার পার্শ্বে একটি অন্ধকার গৃহে তিনি প্রায়ই ধ্যান-মগ্ন থাকিতেন—শুধু নির্দিষ্ট সময়ে সমাগত ব্যক্তিদের সহিত সদালাপ করিতে নির্গত হইতেন। তখন তাঁহার হাস্যময় মুখ, সৌজন্য ও বক্তব্য বিষয় বুঝাইবার আগ্রহ আগন্তুককে মুগ্ধ করিত। অন্তররাজ্যে মগ্ন থাকা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইলেও জিজ্ঞাসুর অনুসন্ধিৎসা মিটাইতে তিনি এত তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, সময়ের কথা ভুলিয়া অনেক ক্ষেত্রে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত প্রসঙ্গ চালাইতেন। কথা বলিতে বলিতে তিনি মাঝে মাঝে "হরি ওঁ," "হরি ওঁ তৎ সৎ" বা "শিব শিব" উচ্চারণ করিতেন। কখনও বা আপনমনে

অনেকক্ষণ ধরিয়া সংস্কৃতশ্লোক আবৃত্তি করিতেন। উপস্থিত ব্যক্তি ইহার অর্থ না বুঝিলেও গুরুগম্ভীর সুললিত উচ্চারণে আকৃষ্ট হইতেন এবং বক্তার অন্তর্মুখীনতা লক্ষ্য করিয়া নীরবে বসিয়া থাকিতেন। প্রশ্নোত্তর-দানকালে তিনি অকস্মাৎ যেন আনমনা হইয়া সুদূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেন এবং নিজেই এই প্রকার আচরণের ব্যাখ্যাকল্পে বলিতেন, "প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দুভাবে হতে পারে—একটি হচ্ছে উত্তর দিচ্ছি মনে করে উত্তর দেওয়া; আর অপরটি হচ্ছে অন্তর থেকে স্বতঃ উত্তর আসা। আমার উত্তর অন্তর হতে আসে।"

অন্তরঙ্গের সহিত আলাপ-প্রসঙ্গে তিনি কিরূপে স্থান-কাল ভুলিয়া যাইতেন, একদিনের ঘটনায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেদিন গুরুদাস মহারাজের সহিত একটি সম্ভ্রান্তপল্লীর পথে চলিতে চলিতে তিনি আলোচ্য বিষয়ে মাতিয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রতিবাক্যে যেন বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে এবং মনোযোগী শ্রোতাও একমনে শুনিতেছেন; ভাবের আতিশয্যে কণ্ঠস্বর ক্রমেই উচ্চতর এবং গতিবেগ দ্রুততর হইতে লাগিল। অকস্মাৎ দণ্ডায়মান হইয়া তিনি শূন্যে হস্ত প্রসারণপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "গুরুদাস, সিংহতুল্য হও, সিংহতুল্য হও। পিঞ্জর ভেঙ্গে ফেলে মুক্ত হও। একটা বড় লাফ মার, আর কাজ ফতে কর।" এরূপ ঘটনায় আকৃষ্ট পথচারী শুধু মুচকি হাসিয়া চলিয়া যাইত। ব্যক্তিগত সৎপ্রসঙ্গের সহিত তিনি ধ্যানপ্রণালীও শিখাইতেন এবং সপ্তাহে একদিন গীতাব্যাখ্যা করিতেন। বক্তৃতা তিনি কদাচিৎ দিতেন; কারণ তাঁহার মতে "বক্তৃতাতে জনসাধারণ আকৃষ্ট হয়; কিন্তু প্রকৃত কাজ হয় ঘনিষ্ঠ মিলনে। অবশ্য দুই-ই দরকার।"

দ্বিতীয় বার আমেরিকায় আসিয়া আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ পশ্চিমাঞ্চলে বেদান্তপ্রচারে বিশেষ সাফল্যলাভ করেন; কিন্তু স্বয়ং দীর্ঘকাল তথায় থাকিতে পারিবেন না জানিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দকে কার্যভার দিবেন স্থির করেন

এবং ভক্তমণ্ডলীকে বলেন, "আমি তো তোমাদের কাছে শুধু বক্তৃতা করেছি ; এরপর তোমাদের কাছে আমি আমার এমন একজন গুরুভাইকে পাঠাব, যার মধ্যে কি করে আমার বাক্যগুলিকে জীবনে পরিণত করতে হয় তা দেখতে পাবে।" ভারত হইতে যাত্রার পূর্বে তিনি হরি মহারাজকে বলিয়াছিলেন, "আমি পাশ্চাত্ত্য জগৎকে ক্ষাত্রবীর্য দেখিয়েছি, বক্তৃতায় তাদের চমৎকৃত করেছি ; তুমি তাদের ব্রাহ্মণোচিত পবিত্রতা ও ধ্যানপরায়ণতা দেখাও।" বস্তুতঃ পাশ্চাত্ত্য বেদান্তানুরাগীর জীবনগঠনের জন্য স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রয়োজন ছিল। এতদ্ব্যতীত স্বামীজীর বাণীতে মুগ্ধ হইয়া কুমারী মিনি বুক্ আশ্রমস্থাপনের জন্য সান্ আণ্টোন উপত্যকায় ১৬০ একর নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। এই আশ্রমগঠনের দায়িত্ব পড়িল হরি মহারাজের উপর।

তাঁহার নিকট পশ্চিমাঞ্চলে আহ্বান আসিল ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে। সেখানে আসিয়া বেদান্ত-প্রচারের জন্য তিনি ভূমিদাত্রী কুমারী বুকের সহিত প্রথমে লস্ এঞ্জেলিসে ও পরে ২৬শে জুলাই সান্ ফ্রান্সিস্কো নগরে উপনীত হইলেন। উভয় স্থলেই নবাগত স্বামী একজন প্রভাবশালী ধর্মপ্রচারকরূপে খ্যাতিলাভ করিলেও দীর্ঘকাল তথায় থাকিতে পারিলেন না ; অবিলম্বে (৩রা আগস্ট. ১৯০০) দ্বাদশ জন ছাত্র-ছাত্রী সমভিব্যাহারে আশ্রমস্থাপনার্থে তাঁহাকে যাত্রা করিতে হইল।

মিনি বুকের দান গ্রহণ করিলেও উহার স্বরূপ বা অবস্থান সম্বন্ধে গ্রহীতারা কিছুই জানিতেন না। তাঁহারা সান্ ফ্রান্সিস্কো হইতে রেলযোগে শেষ স্টেশন সান্ হোজেয় উপনীত হইলেন এবং তথা হইতে চারি-ঘোড়ার গাড়িতে চল্লিশ মাইল পার্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া সান্ আণ্টোন উপত্যকায় অবতরণপূর্বক দেখিলেন—উপত্যকার একাংশ বন্ধুর এবং উহা ওক্, পাইন্ ইত্যাদি বৃক্ষে সমাকীর্ণ, অপরাংশ সমতল ও তৃণাচ্ছাদিত ; সুদূরে

চির-তুষারাবৃত সিয়েরা নেভাডা পর্বতমালা ; উপত্যকাটি শীতে অতীব শীতল এবং গ্রীষ্মে অত্যুষ্ণ ; শীতে স্বল্প বৃষ্টিপাত হয়, পরে সব শুকাইয়া যায়—আশ্রমভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত নির্ঝরিণীতে এক বিন্দুও জল থাকে না ; পানীয় জল চারি মাইল দূর হইতে আনিতে হয় ; আশ্রমের বিস্তীর্ণ ভূমির পরিমাণ প্রায় ৪৮৫ বিঘা ; উহাতে একখানি কাঠের ঘর ব্যতীত কিছুই নাই। আশ্রয়হীন, জলহীন এই বিজন প্রদেশে সুখে লালিত আমেরিকার নগরবাসীরা বাস করিলে মৃত্যু অনিবার্য—এই দুর্বিষহ চিন্তায় ভগ্নহৃদয় তুরীয়ানন্দ জনৈক ছাত্রকে বলিয়াই ফেলিলেন, "এ তোমরা আমাদের কোথায় এনেছ ?" তাঁহার ভাব বুঝিতে না পারিয়া একটি ছাত্রী বলিল, "স্বামীজী, আপনি হতাশ হলেন যে ! আপনি কি জগন্মাতার উপর বিশ্বাস হারালেন ?" সারাজীবন কঠোর তপস্যায় যে সন্ন্যাসী জীবন-পাত করিয়াছেন, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তাঁহার হৃদয়ের করুণা আমেরিকান্ মহিলা বুঝিবে কিরূপে ? হরি মহারাজ শুধু ছাত্রীটির কথাই অনুমোদন করিয়া বলিলেন, "তোমার কি বিশ্বাস ! আজ হতে তোমার নাম হ'ল শ্রদ্ধা।" শান্তি আশ্রমের সূত্রপাত হইল। নবাগতরা কয়েকটি তাঁবু খাটাইলেন ; উহারই একটির মেজেতে কাঠের পাটাতন করিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। ক্রমে কাঁচা ইট ও কাঠের সাহায্যে আরও কয়েকটি গৃহ নির্মিত হইল। আশ্রমের সকল কার্যে স্বামী তুরীয়ানন্দ উৎসাহ দিতেন ও যোগদান করিতেন এবং কেহ বাধা দিলে বলিতেন, "আমি নিজে না করলে ওরা শিখবে কিরূপে ? সকলে মিলে কাজ করলে শীঘ্র হয়ে যায়।" একদিন কাঠ কাটিতে গিয়া অনবধানতাবশতঃ তাঁহার নাক আহত হইয়া রক্ত পড়িতে থাকিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আমায় ভাল কাঠুরিয়া হইতে হইবে।"

স্বামী তুরীয়ানন্দের অনুকরণে ও অনুপ্রেরণায় শান্তি আশ্রমের সকলে

তপস্যা ও অধ্যয়নাদিতে মগ্ন হইলেন। প্রত্যূষে স্নানান্তে শীতকালে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া গৃহমধ্যে কিংবা গ্রীষ্মকালে বৃক্ষতলে ধ্যান চলিত। ধ্যানের পূর্বে সংস্কৃতপাঠ ও ব্যাখ্যা হইত। এক ঘণ্টা ধ্যানের পর সকলে গৃহকার্য ও রন্ধনাদিতে ব্যাপৃত হইতেন। আটটায় প্রাতরাশের পর পুনর্বার কার্য আরম্ভ হইত এবং ১০টা-১১টায় 'রাজযোগ' বা গীতাদি-পাঠের পর পুনর্বার এক ঘণ্টা ধ্যান চলিত। বেলা একটায় মধ্যাহ্ন-ভোজন ও সন্ধ্যা সাতটায় সান্ধ্যভোজন হইত। তৎপরে সান্ধ্য ধ্যান। মাতৃভাবে মাতোয়ারা হরি মহারাজ সর্বাবস্থায় সকলকে মায়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন। জাগতিক আলাপ-আলোচনায় কেহ রত থাকিলে শুনিতেন তাঁহার 'হরি ওঁ' শব্দ ক্রমেই নিকটবর্তী হইতেছে; অমনি চিন্তা মায়ের দিকে ধাবিত হইত। তিনি বলিতেন, "আশ্রমে কেবল মায়ের কথা, মায়ের চিন্তাই চলিতে থাকুক"

এই ভগবৎপ্রবণতা তিনি শুধু মুখেই শিক্ষা দিতেন না; জীবনেও তাহা প্রতিপন্ন করিতেন। একদিন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তাঁহার একটি হস্ত কীটদষ্ট হইলে তিনি বাহিরে কিছুই প্রকাশ না করিয়া পূর্ববৎ ধ্যানমগ্ন রহিলেন। কিন্তু পরে বিষের প্রতিক্রিয়ায় হাতটি ক্রমেই ফুলিয়া উঠিয়া জীবনসংশয় উপস্থিত হইল। দৈবক্রমে সন্ধ্যাকালে এক ব্যক্তির তথায় আগমন হইল। তিনি বেদান্তের আকর্ষণে ৪০ মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া শান্তি আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন—সঙ্গে কিছু ঔষধও আছে। ঐসব প্রয়োগের ফলে সকলে আশু বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন।

সর্বকর্মে ভারতসুলভ ভাগবতদৃষ্টি পাশ্চাত্ত্যজীবনে সংক্রামিত করিবার জন্য তিনি সর্বদা প্রয়াসী ছিলেন। একবার ভক্তের প্রদত্ত পুষ্প স্বয়ং আঘ্রাণ না করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণচরণে অর্পণ করিলে দাতা জানিতে চাহিলেন, "আপনি কি ফুল ভালবাসেন না?" উত্তর আসিল, "নিশ্চয়ই! তা না হলে কি

ঠাকুরকে দিতে পারতাম?” একদিন তিনি দেখিলেন রন্ধননিরতা ছাত্রী দেশাচার অনুযায়ী ব্যঞ্জনের স্বাদ লইয়া লবণের পরিমাণ পরীক্ষা করিতেছেন ; অমনি তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে, ভারতে দেবোদ্দেশে রন্ধন করা হয় এবং ভোগের পূর্বে কেহ গ্রহণ করে না।

স্বামী তুরীয়ানন্দের শিক্ষায় এখন সকলেই অহিংস ও নিরামিষাশী। একদিন তাঁহার তাবুর পাটাতনের নিম্নে একটি র‍্যাটল-স্নেক্ (ঝুম্-ঝুমে সাপ) প্রবেশ করিল। উহা ভয়ানক বিষাক্ত এবং চলার সময়ে ঝুম্‌ঝুম্ শব্দ করে। অহিংস আশ্রমবাসীরা সর্পটির প্রাণবধ করিলেন না, পরন্তু তাহাকে কৌশলে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় দূরে লইয়া গিয়া রজ্জু ছোট করিয়া কাটিয়া মুক্তি দিলেন। দুই একদিন পরে দেখা গেল, সেই নেক্‌টাই (গলাবন্ধ)-পরা সাপটি পুনর্বার যথাস্থানে সমুপস্থিত! এই দিনও পূর্ববৎ তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া আরও দূরে নিক্ষেপ করা হইল।

কথাপ্রসঙ্গে তুরীয়ানন্দজী একদিন জানাইলেন যে, ঠাকুর একবার বলিয়াছিলেন, “আমার আরো সব ভক্ত আছে যারা ভিন্ন ভাষা বলে, ভিন্ন দেশে থাকে এবং যাদের চাল চলনও ভিন্ন।” অতঃপর গম্ভীরভাবে কহিলেন, “মা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, তোমরাই সেই ভক্তমণ্ডলী।” এমন অচিন্তনীয় শুভসংবাদে সেখানে মৃত্যুর নীরবতা বিরাজিত হইল। অবশেষে একটি ছাত্রী সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, তাঁহার ন্যায় অযোগ্যা নারী এবংবিধ সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইতে পারেন না। স্বামী তুরীয়ানন্দ উত্তর দিলেন, “কে যোগ্য? ঈশ্বর কি যোগ্যতার মাপ করেন?” ইহার অল্পকাল পরেই ঐ ছাত্রীটি শেষমুহূর্ত পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ইহলোক হইতে চিরবিদায় হইলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রায় দুই বৎসর শান্তি আশ্রমে ছিলেন। ইতোমধ্যে সান্ ফ্রান্সিস্‌কো, ওক্‌ল্যাণ্ড, লস্ এঞ্জেলিস্ প্রভৃতি স্থানের ভক্তদের

অনুরোধে কয়েক মাস ঐ সব স্থানে গিয়া বাস করেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সান্ ফ্রান্সিস্কোতে অবস্থানকালে তিনি পিত্তকোষের পাথুরি-রোগে কিছুদিন শয্যাগত ছিলেন। ঐ নগরের এক ভক্তমহিলা একদা জানাইলেন যে, তাঁহার পতি তাঁহার বেদান্তালোচনার বিরোধিতা করেন। প্রতিকারকল্পে হরি মহারাজ উপদেশ দিলেন যে, সতীর পতির আদেশ পালনীয়; সুতরাং বেদান্তচর্চা একটু কম করিলেও ক্ষতি নাই। পরন্তু ইহাতেও অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তিনি ঐ ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। ভক্তমহিলা নিষেধ করিয়া বলিলেন যে, এই উগ্রপ্রকৃতির লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে অপমানমাত্র লাভ হইবে। তিনি তথাপি ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়া সহাস্যে তাঁহার করমর্দন করিলেন। অমনি সমস্ত বিরোধ তিরোহিত হইয়া বন্ধুভাব প্রতিষ্ঠিত হইল ও ভদ্রমহিলার ধর্মপথের কণ্টক বিদূরিত হইল।

শান্তি আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ পুনর্বার আশ্রমের কার্যে মন দিলেন; কিন্তু পাশ্চাত্ত্য পরিবেশের মধ্যে অবিরাম পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ও স্নায়ুমণ্ডলী দুর্বল হইয়া পড়িল। এদিকে স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিবার এক প্রবল আগ্রহও তাঁহার মনে জাগিতেছিল। অতএব চিকিৎসকের পরামর্শে স্থির হইল যে, তিনি ভারতে যাইবেন। অনুমতির জন্য স্বামী বিবেকানন্দকে ভারতে পত্র লিখা হইল। উত্তর তারযোগে না আসিয়া চিঠিতে আসায় যাত্রার একটু দেরি হইয়া গেল। বিদায়মুহূর্তে জগন্মাতা তাঁহাকে দেখাইলেন যে, তিনি ভারতে না গেলে আশ্রমের সমৃদ্ধি ও শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। তুরীয়ানন্দ সে কথা না শুনিয়াই সান্ ফ্রান্সিস্কো বন্দরে জাহাজে উঠিলেন (জুন, ১৯০২)। হৃদয় ভারাক্রান্ত থাকায় বিদায়কালে গুরুদাসকে বলিলেন, "জগন্মাতার আদেশ অগ্রাহ্য করে আমি ভুল করেছি। এখন আর উপায় নেই।"

ভারতে উপস্থিত হইবার পূর্বেই রেঙ্গুনে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, স্বামীজী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। এত আগ্রহ, এত চেষ্টা সবই ব্যর্থ হইল। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন যে, আর বিদেশে ফিরিবেন না, অবশিষ্ট জীবন ভগবচ্চিন্তায়ই কাটাইবেন। তদনুসারে বিদেশী পোশাক ও ঘড়ি চিরতরে পরিত্যক্ত হইল। অতঃপর মঠে কিয়দ্দিবস যাপনান্তে তপস্যার উদ্দেশ্যে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন; সঙ্গে গেলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর আদেশে ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল।

বৃন্দাবনে ইঁহারা প্রায় তিন বৎসর ছিলেন। তৃতীয় বৎসরের শেষদিকে স্বামী তুরীয়ানন্দের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। আরোগ্যলাভান্তে তিনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে মায়াবতী গমন করেন ও ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল মঠে ফিরিয়া যান। উক্ত বৎসর নভেম্বর মাসে হরি মহারাজ আলমোড়া ও নৈনিতালের পথে উত্তরাখণ্ডে যাইয়া পুনর্বার তপস্যায় নিরত হন। আমরা তাঁহাকে প্রথমে কনখল, পরে হৃষীকেশ ও তৎপরে উত্তরকাশীতে দেখিতে পাই। উত্তরকাশীতে দেবী-গিরিজীর নিকট তিনি কিছুদিন শাস্ত্রালোচনা করেন। এই শীতপ্রধান অঞ্চলেও হরি মহারাজ অতি অল্প বস্ত্রই ব্যবহার করিতেন, এমন কি, শীতকালে দেবী-গিরিজীর দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াও শীতবস্ত্রাদি গ্রহণ করিতেন না। এই ধীর, স্থির, তেজপুঞ্জময় সন্ন্যাসীর পূত পদক্ষেপে তখন ঐ অঞ্চল পবিত্রীকৃত হইয়াছিল এবং তাঁহার সুযশ সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। পাঠাদিকালে তিনি সর্বদা জ্ঞানমুদ্রা-অবলম্বনে পদ্মাসনে বসিয়া থাকিতেন এবং অল্পই কথা কহিতেন। এই তপস্বীর গুণে মুগ্ধ দেবী-গিরিজী তাঁহার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি প্রাচীন উপনিষদ্গুলি ও গীতার শ্লোকগুলি মুখস্থ করিয়া ও প্রতিশ্লোকের উপর দীর্ঘকাল মনঃসংযম করিয়া উহাদের মর্মকথা অবগত হইয়াছিলেন; সাধনার ফলে মন্ত্রার্থ তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। নয়মাস এইরূপে

জন্য রক্ত দূষিত হওয়ায় উহা ভীষণাকার ধারণ করে এবং অস্ত্রোপচার করিতে হয়। তিতিক্ষাশক্তিতে স্বামী তুরীয়ানন্দ এত উচ্চাধিকার লাভ করিয়াছিলেন যে, এই অস্ত্রপ্রয়োগকালে ক্লোরোফর্ম্ ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন ও সজ্ঞানে কোন মুখবিকৃতি পর্যন্ত না করিয়া এই অবর্ণনীয় যন্ত্রণা সহ্য করেন। আর একদিন তিনি বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হইয়া রোগশয্যায় পড়িয়া আছেন, জীবনের আশামাত্র নাই। অকস্মাৎ তিনি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ যাত্রা আর যাওয়া হল না।" উক্ত ঘটনার অনেক পরে এক গ্রাষ্মের সন্ধ্যায় কাশী সেবাশ্রমে তিনি স্বামী নির্বেদানন্দ প্রভৃতির নিকট এই সম্বন্ধে এইরূপ বলেন—"পুরীতে সেদিন বাইরের জগতের হুঁশ চলে যাওয়ার পর বহু সাধু ও পরে বহু দেবদেবী দেখতে থাকি! তারপর হঠাৎ দেখি, প্রাণ যেন বেরিয়ে যেতে চাচ্ছে; কিন্তু আর একটা শক্তি ভেতর থেকে তাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করছে। প্রাণের সঙ্গে এবং সেই শক্তির সঙ্গে একটা টাগ্-অব্-ওয়ার (টানাটানি) লেগে গেছে দেখলুম। খানিক পরে প্রাণ জয়ী হয়ে উৎক্রমণ করতে যাচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ দেখি স্বামীজী এসে বলছেন, 'হরি-ভাই, এখন কোথায় যাচ্ছ? এখনও তো সময় হয় নি।' সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের পরাভূত শক্তিটির তেজ যেন অনেক বেড়ে গেল এবং সে ঊর্ধ্বগামী প্রাণকে এক হেঁচকায় টেনে এনে স্বস্থানে বসিয়ে দিলে। তারপরই আমার বাহ্যসংজ্ঞা ফিরে এল এবং চোখ মেলে বললুম, 'এ যাত্রা যাওয়া হল না।'"

পাঁচ-ছয় মাস পুরীধামে অতিবাহিত হইলে তিনি ব্রহ্মানন্দজী ও সারদানন্দজীর সহিত ১০ই নভেম্বর কলিকাতায় আসিয়া 'উদ্বোধনে' উঠিলেন। এখানে তাঁহার দেহে পুনর্বার অস্ত্রোপচার হয়। তখনও তিনি ক্লোরোফর্ম্-ব্যবহারে অস্বীকৃত হইলেন, স্বীয় মনকে দেহ হইতে তুলিয়া লইয়া তিনি স্বাত্মানন্দে মগ্ন রহিলেন এবং দ্রষ্টা হিসাবে দেখিতে লাগিলেন, কে

যেন কাহার দেহে অস্ত্রচালনাদি করিতেছে। স্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ উন্নতি হইলে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তিনি কাশীধামে গমন করিলেন। তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট সার্ধ তিন বৎসর ৺বিশ্বনাথের পুণ্যক্ষেত্রেই যাপিত হইয়াছিল। হরি মহারাজের জীবনে এই কয়টি বৎসর অধ্যাত্মমহিমায় ভরপূর।

তাঁহার অধ্যয়ননিষ্ঠা ছিল অপূর্ব। অসুখের মধ্যেও নিয়মিত পড়া চলিত। নিবিষ্টমনে তিনি যখন অধ্যয়নে বসিতেন তখন সময়ের জ্ঞান থাকিত না। তিনি সাধারণতঃ প্রতিকার্য যথাসময়ে করিতে অভ্যস্ত ছিলেন; প্রাতঃকৃত্য, ধ্যান, ভ্রমণ, পাঠ, স্নান, আহার—এই ক্রম ঘড়ির মত পালিত হইত। কিন্তু অধ্যয়নরত হরি মহারাজকে সেবক সময়ের কথা বারংবার স্মরণ করাইয়া দিলেও "এই উঠি," "এই উঠি" বলিয়া ক্রমেই দেরি করিয়া ফেলিতেন। পাঠের পর তৈলমর্দনাদির সময় আবার পঠিত বিষয় আলোচনা করিতে করিতে তিনি বলিতেন, "স্বামীজীও এরূপ করতেন—এতে অধীত বিষয় চিরকালের জন্য আয়ত্ত হয়ে যেত।" শাস্ত্রপাঠ-শ্রবণেও তাঁহার বিশেষ রুচি ছিল। যথাসময়ে নির্দিষ্ট সাধু-পাঠক উপনিষদ্ বা ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। পাঠশেষে হরি মহারাজ দীর্ঘকাল ধরিয়া পঠিত বিষয়ে নবালোকপাত করিতেন কিংবা শ্রোতাদিগের সন্দেহাদি নিরাস করিতেন।

নিজের ধ্যানাভ্যাস ও অনুভূতি সম্বন্ধে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন যে, একবার তিনি নিদ্রাত্যাগপূর্বক সমস্ত সময় ধ্যানে অতিবাহিত করার সঙ্কল্প করেন। নিদ্রা কমিতে কমিতে যখন সম্পূর্ণ দুরীভূত হইয়াছে, তখন তাঁহার মনে পড়িল, নিদ্রার অভাবে স্বামীজীর শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; তাঁহারও নিদ্রা একেবারে চলিয়া গেল না কি? ইহাতে দৈহিক পীড়াদি হইতে পারে ভাবিয়া তিনি চেষ্টা করিয়া আবার নিদ্রাকে ফিরাইয়া আনিলেন। জিতনিদ্রাবস্থায় তিনি সাত-আট দিন ছিলেন।

এই যোগিরাজকে গুরুভ্রাতারা কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিলে মন্দ হইবে না। তখন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ কাশীধামে রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের এক প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসিবৃন্দ গঙ্গাস্নানান্তে তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, শরৎ, আমার ইচ্ছা হচ্ছে হরি মহারাজকে প্রণাম করতে। এমন মহাপুরুষ দুর্লভ। দুরারোগ্য ব্যাধির কথা ভুলে তিনি কেমন সুস্থ আছেন!" অতঃপর হরি মহারাজের ঘরের পার্শ্ব দিয়া ফিরিবার পথে স্বামী সারদানন্দের মনে হইল, "এই সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নয়।" অমনি অতর্কিতে গৃহে ঢুকিয়া হরি মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?" যখন জানিলেন স্বামী সারদানন্দ, তখন ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "আমি রোগে অন্ধপ্রায় হয়েছি; তাই তুমি আমায় অপ্রস্তুত করলে! আমি কি তোমার মহিমা জানি না?"

গুরুভ্রাতাদের প্রতি হরি মহারাজের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার নিদর্শন পাঠক পূর্বেই পাইয়াছেন। তাঁহার কাশীবাসকালে স্বামী অদ্ভুতানন্দের দেহত্যাগ হয়। তখন হরি মহারাজের শরীর দুর্বল ছিল, চলিতে কষ্ট হইত। তথাপি তিনি তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। তখন রাস্তা মেরামত হইতেছে; তাই পথের উপর খোয়া পড়িয়া আছে। একদিন কোন যান-বাহন না পাওয়ায় তিনি ঐ বন্ধুর রাজপথের উপর দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। লাটু মহারাজের মহাসমাধির পরে ঐ সময়ের অবস্থাদি বর্ণনা করিয়া হরি মহারাজ যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা অন্যত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে শুধু লাটু মহারাজের অতি উচ্চ অনুভূতি-মহিমাই খ্যাপিত হয় নাই, পত্রের প্রতিচ্ছত্রে হরি মহারাজেরও উচ্চভাব-ধারণার ক্ষমতা, গুরুভ্রাতৃপ্রেম ও পরগুণগ্রাহিতা দৃঢ়াঙ্কিত রহিয়াছে। সেবকদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ এবং আচরণ ছিল অপূর্ব। এই বিষয়টি স্বামী

ব্রহ্মানন্দের কথার অনুধাবন করিলেই সম্যক্ উপলব্ধ হইবে। একদিন জনৈক গুরুভ্রাতা যখন কোনও সেবক সম্বন্ধে মহারাজের নিকট সমালোচনা করেন, তখন তিনি এই বলিয়া উত্তর দেন যে, সেবকদের নিকট শুধু সেবা দাবী না করিয়া তাহাদিগকে কিছু ধর্মভাব দেওয়া আবশ্যক। হরি মহারাজের নিকট তাহারা ঐরূপ পায় বলিয়া সেখানে পড়িয়া থাকে। বস্তুতঃ সেবকগণ যতক্ষণ তাঁহার নিকট থাকিতেন ততক্ষণ তাঁহাদের মন এক উচ্চ রাজ্যে বিচরণ করিত। ইহার মহিমা উপলব্ধি না করিতে পারিয়া তাঁহারা ঘটনাক্রমে অন্যত্র চলিয়া গেলেও এই আকষণ তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ দূরদূরান্তর হইতে তৎসকাশে লইয়া আসিত। তিনি সেবকদিগকে বলিতেন, "তোদের দায়িত্ব আমার উপর; তাই তোদের কল্যাণের জন্যই বকি।" তিনি একদিকে যেমন অতি কঠোর ছিলেন, অপরদিকে ছিলেন তেমনি কোমল। একদিন যথাসময়ে সেবক তৈলমর্দনের জন্য না আসায় হরি মহারাজ অপরের দ্বারা কার্য সমাধা করাইতেছেন, এমন সময়ে সেবক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমনি ভৎ´সনা নামিয়া আসিল বজ্রনির্ঘোষে। উহা সহ্য করিতে না পারিয়া সেবক কাঁদিয়া ফেলিলেন। তৎক্ষণাৎ হরি মহারাজের সেই ক্রোধের অভিনয় কোথায় ভাসিয়া গেল। অতঃপর আশীর্বাদচ্ছলে সেবকের মাথায় হস্তস্থাপনমাত্র সেবক সেদিন অনুভব করিলেন যেন স্নেহের সহিত সেই হস্ত-অবলম্বনে বিদ্যুৎপ্রবাহবৎ এক অধ্যাত্মশক্তি দেহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে!

হরি মহারাজকে সাধারণতঃ শুষ্কজ্ঞানী বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের শিক্ষাগুণে তাঁহাতে জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। শরীর দুর্বল হইলেও তিনি পদব্রজে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইতেন এবং বহুক্ষণ ধরিয়া গঙ্গাদর্শন করিতেন। সোপান বাহিয়া জল পর্যন্ত অবতরণ করা শক্তিতে কুলাইত না বলিয়া পরিচিত কাহারও দ্বারা

গঙ্গাবারি আনাইয়া উহা সযত্নে মস্তকে ও দেহে ছিটাইতেন। কোনও আধুনিক শিক্ষায় গর্বিত যুবক গঙ্গাস্নানকে কুসংস্কারমাত্র বলিয়া উল্লেখ করিলে তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়াছিলেন যে, যে বিদেশের দুই-চারি পাতা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহারা নিজেদের শাস্ত্রের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে, স্বামীজী সেই সব পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীকে সেইসব স্বদেশী শাস্ত্রাবলম্বনেই পরাস্ত করিয়াছিলেন। শিবরাত্রিতে কেহ উপবাস করিলে কিংবা ৺বিশ্বনাথ-দর্শনে যাইতেছে শুনিলে তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন। একদিন শ্রীমদ্‌ভাগবত-পাঠকালে পাঠক পুস্তকাধারের উপর কোনও আবরণ না দেওয়ায় তিনি সারাক্ষণ অতি গম্ভীর হইয়া রহিলেন এবং পাঠান্তে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের মতে ভগবান, ভক্ত ও ভাগবত অভিন্ন; ভাগবতকে গ্রন্থমাত্র মনে না করিয়া আরও শ্রদ্ধা প্রদর্শন আবশ্যক।

হরি মহারাজকে অনেক ক্ষেত্রে ব্যয়কুণ্ঠ বলিয়া মনে হইত। ভক্তগণ স্বেচ্ছায় তাঁহার সেবার জন্য যে অর্থাদি দিতেন তাহা যথেষ্ট ছিল বলিয়া সেবকগণ ব্যয়সম্বন্ধে একটু মুক্তহস্ত হইবেন—ইহাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু হরি মহারাজ সর্বপ্রকার ব্যয়ের উপর শ্যেনদৃষ্টি রাখিতেন। অথচ আয় ও উদ্বৃত্ত অর্থ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। জনৈক সেবক একদিন রহস্যচ্ছলে কৃপণতার দোষ আরোপ করিলে তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, গৃহস্থরা অতি পরিশ্রমপূর্বক অর্থ উপার্জন করেন; অতএব তাঁহাদের দানের টাকা বৃথা ব্যয় করা অনুচিত। এই ব্যয়সংক্ষেপ ও অর্থাগমের ফলে কিছু টাকা উদ্বৃত্ত হইলে সেবক একবার প্রস্তাব করিলেন যে, উহার কিয়দংশ হরি মহারাজের অতি আদরের আলমোড়া আশ্রমে দেওয়া যাইতে পারে। অমনি তিনি বাধা দিয়া কহিলেন যে, ঐ অর্থ তাঁহার নামে জমা থাকিলেও উহা তাঁহার নিজস্ব নহে, উহা সঙ্ঘের; সঙ্ঘাধ্যক্ষ এই বিষয়ে যাহা করিবেন, তাহাই চরম।

সংসারবিরাগী মোক্ষপথচারী সন্ন্যাসীর মনেও কল্যাণকামনা জাগ্রত থাকে। হরি মহারাজ সাধুদিগকে সর্বদা স্মরণ করাইয়া দিতেন যে, স্বামীজীর নির্ধারিত পথই তাঁহাদের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ ; আর সমাগতদিগকে নিজের রোগজীর্ণ শরীর দেখাইয়া প্রায়ই বলিতেন, "ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ করি নি বলে এত ভুগতে হচ্ছে।" সেবাশ্রমের সাধুদের বলিতেন, "তিন দিন ঠিক ঠিক এই নারায়ণসেবা করলে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়ে যায়। যারা করেছে তারা প্রাণে প্রাণে বুঝেছে।"

প্রৌঢ়ে স্বদেশী আন্দোলনের সময় যেমন, বৃদ্ধকালে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের সময়ও তেমনি তাঁহার স্বদেশপ্রেম প্রতিকথায় বহুধা আত্মপ্রকাশ করিত। তিনি মনে করিতেন যে, গান্ধীজী রাজনীতিক্ষেত্রে স্বামীজীর আদর্শই অনুসরণ করিতেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও তাঁহার প্রীতি-আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন ; তাই শেষশয্যায় শায়িত অবস্থায়ও তাঁহার মুখে কখন কখন চিত্তরঞ্জনের নাম উচ্চারিত হইত।

দেশের বালকদের চরিত্র গঠন ও সৎশিক্ষার জন্য প্রাচীন আদর্শে ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়—ইহা ছিল তাঁহার অন্যতম আকাঙ্ক্ষা। তাই যুবক সাধুদিগকে সর্বদা এই কার্যে উৎসাহিত করিতেন। তাঁহারই উদ্দীপনায় স্বামী সদ্ভাবানন্দ মিহিজামে 'রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ' স্থাপন করেন ; পরে উহা দেওঘরে স্থানান্তরিত হয়।

বৃদ্ধবয়সে কোন কার্য করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না বলিয়া তিনি সৎপ্রসঙ্গের দ্বারা অপরের সেবা করিতেন। ইহাতে যথেষ্ট ক্লান্তি হইলেও তিনি কর্তব্যবোধে বিরত হইতে পারিতেন না। একদিন সেবকের সহিত নীরবে বসিয়া আছেন ; অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আর পারি না।" সেবক অবাক্ হইয়া জানিতে চাহিলেন যে, হরি মহারাজ কোন কাজ না করিয়াও 'আর না-পারা'র কথা তুলেন কিরূপে? হরি মহারাজ

শান্তভাবে সেদিন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, জাগতিক অর্থে তিনি কোন কার্য না করিলেও যে-সব সেবক ও ভক্ত তাঁহার আশ্রয় লইয়াছে কিংবা যাহারা দুইটি সৎকথা-শ্রবণের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার নিকট বসিয়া থাকে, তাহাদের মঙ্গলচিন্তা তাঁহাকে করিতে হয় এবং স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডার হইতে অমূল্য রত্নরাজি অকাতরে অবিরাম বিলাইতে হয়। যাঁহারা ইহা করেন তাঁহারাই মাত্র জানেন, এই কার্য কত শ্রমসাধ্য—অপরে বুঝিবে কিরূপে?

দীর্ঘ কঠোর তপস্যায় হরি মহারাজের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে উহা ব্যাধির আকরে পরিণত হইল। বহুমূত্ররোগ তো তাঁহার ছিলই। কাশীধামে উপস্থিত হইবার পর তাঁহার দুইবার ইনফ্লুয়েঞ্জা হইল। তদুপরি পুরাতন হাঁপানিও দেখা দিল। রক্ত দূষিত হওয়ার ফলে গায়ে কোনপ্রকার ক্ষত হইলে উহা বিষাক্ত ঘায়ে পরিণত হইতে লাগিল এবং বারংবার অস্ত্রোপচার করিতে হইল। কিন্তু এই সব সত্ত্বেও এই বিদেহ মহাপুরুষের তিতিক্ষাদর্শনে লোক অবাক্ হইত।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পৃষ্ঠভাগে দুষ্ট ব্রণ হইলে চিকিৎসকগণ একটি বড় মাংসখণ্ড অপসারিত করেন। হরি মহারাজের নির্দেশে এবারেও ক্লোরোফর্ম-ব্যবহার হয় নাই। এই পীড়াদায়ক অস্ত্রোপচারকালেও বিন্দুমাত্র যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে না দেখিয়া চিকিৎসক অনেকটা ভরসা পাইলেন এবং পরদিন ঐ অংশের বন্ধনাদি খুলিয়া যখন দেখিলেন যে, এক খণ্ড মাংস ঝুলিতেছে, উহা সরাইয়া ফেলা কর্তব্য, তখন হরি মহারাজকে কিছুই না বলিয়া কাটিতে উদ্যত হইলেন। অমনি তিনি অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ডাক্তার কারণ বুঝিতে না পারিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। হরি মহারাজ তখন বুঝাইয়া দিলেন যে, ইচ্ছাশক্তি-প্রয়োগে দেহ হইতে মন উঠাইয়া লইলে যন্ত্রণাবোধ থাকে না, কিন্তু

সেদিন পূর্বে কিছু না বলায় মন দেহেই আবদ্ধ ছিল, অতএব প্রাকৃতিক নিয়মে যন্ত্রণাবোধও ছিল।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বর্ষার প্রারম্ভে তাঁহার পৃষ্ঠে একটি সামান্য ব্রণ হইয়া ক্রমে বৃহৎ দুষ্ট ব্রণে পরিণত হইল। কলিকাতা হইতে ডাক্তার আসিয়া সর্বশেষ অস্ত্রোপচার করিলেন। এবারেও ক্লোরোফর্ম ব্যবহার হইল না। কিন্তু ডাক্তার বলিয়া রাখিলেন, "আপনাকে সাধারণ রোগীর মত চীৎকার করিতে হইবে, তাহা হইলে আমিও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিব।" কার্যতঃ অস্ত্রপ্রয়োগকালে তিনি কোনও শব্দ করিলেন না; শুধু ডাক্তারের কথা রাখিবারই জন্য যেন সর্বশেষে "মা রে" বলিয়া কৃত্রিম সুরে চীৎকার করিয়া সকলকে একটু হাসাইলেন মাত্র।

এই তিতিক্ষার ব্যাখ্যা একদিন তাঁহার স্বমুখে শোনা গিয়াছিল। সেবাশ্রমেই একবার তাঁহার হাতের তালুতে অস্ত্রোপচারের সময় যন্ত্রণার লক্ষণ না দেখিয়া পরদিন স্বামী নির্বেদানন্দ ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, "ভাখ, মনটা ছেলেমানুষের মত। তাকে ধরে রাখলে ক্রমাগত বলতে থাকে, 'ছাড়, ছাড়।' তাই একবার একটু ছেড়ে দিয়েছিলাম; কিন্তু তখনও ডাক্তারের কাজ শেষ হয়নি দেখে আবার ধরে ফেললাম।" তারপর খানিক ক্ষণ মৌন থাকিয়া পুনরায় হঠাৎ তাঁহার নিজস্ব অপূর্ব ভঙ্গীতে গীতার শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন, "যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে" (যাঁহাতে অবস্থিত হলে যোগী গুরুদুঃখেও বিচলিত হন না)। আর সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "ভাষ্যকার (আচার্য শঙ্কর) বলেছেন, 'শস্ত্র-সম্পাত-জনিতেনাপি দুঃখেন ন বিচাল্যতে'" (শস্ত্রাঘাত-জনিত দুঃখেও বিচলিত হন না)। ফলতঃ প্রথম ব্যাখ্যায় তিনি যেন যৌগিক প্রত্যাহার-সিদ্ধির উল্লেখ করিলেন এবং দ্বিতীয়টিতে স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের স্বরূপ দেখাইলেন।

মহাসমাধির দুই-এক দিন পূর্বে আবাল-সন্ন্যাসী স্বামী তুরীয়ানন্দ সেবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কৌপীন ও কমণ্ডলু কোথায়?" ঐ গুলি ঠিক ঠিক আছে জানিয়া বলিলেন, "আমি সাধু, গাছতলায় থাকব, ভিক্ষা করে খাব। এখানে কি? এখন কোথায় আছি?" স্থানকালাতীত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "আমায় কৌপীন পরিয়ে দাও, কমণ্ডলু দাও—আমি গাছতলায় থাকব।" চিরযোগীর আর এক ইচ্ছা মাঝে মাঝে প্রবল হইয়া উঠিত—তিনি বসিয়া ধ্যান করিবেন। সেই অবস্থায় ঐরূপ করিতে দেওয়া মারাত্মক। তবু দৃঢ়-স্বরে বারংবার আদেশ করিতেন, "আমায় বসিয়ে দাও।" উপেক্ষা না করিতে পারিয়া কেহ সেই আদেশপালনান্তে উপবিষ্ট দুর্বল শরীরকে ধরিয়া রাখিলে বলিতেন, "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—গায়ে হাত দিও না।"

দেহত্যাগের প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বেই তিনি বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "আর পাঁচ-ছয় দিন খুব আনন্দ করে নাও।" পূর্বরাত্রের শেষে আবার বলিয়া উঠিলেন, "কাল শেষদিন, কাল শেষদিন!" শেষদিন আসিল। প্রাতে স্বামী অখণ্ডানন্দের সহিত যথারীতি সদালাপ হইল। অতঃপর যতই সন্ধিক্ষণ সমুপস্থিত হইতে লাগিল ততই মায়ামুক্ত মহাপুরুষ প্রিয়জনের শেষবন্ধন ছিন্ন করার উদ্দেশে সকলকে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, তা হলে নিশ্চিন্ত হতে পারি।" সকলের নিকট এইরূপে বিদায় লইয়া বলিলেন, "তবে যাই, তবে যাই!" মহাপ্রয়াণের দিনে আহারগ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন—চরমমুহূর্তের পূর্বে শুধু চরণামৃত পান করিলেন। অতঃপর বসাইয়া দিতে বলিলেন; কিন্তু কেহ সাহস করিয়া সে কার্যে অগ্রসর হইল না দেখিয়া খেদোক্তি করিলেন, "সব বোকা, কেউ বুঝতে পারছে না—শরীর যাচ্ছে, প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।" সকলকে তখনও নিশ্চল দেখিয়া অগত্যা পদদ্বয় টানিয়া লম্বা করিয়া দিতে

বলিলেন এবং প্রণামের উদ্দেশ্যে হস্তদ্বয় তুলিয়া ধরিতে বলিলেন। তারপর করজোড়ে বলিলেন, "জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ! বল, বল তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ।" স্বামী অখণ্ডানন্দ উপনিষদের বাণী উচ্চারণ করিলেন, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" হরি মহারাজ উহার পুনরাবৃত্তি করিলেন, আর বলিলেন, "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য, সব সত্য—সত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত।" ক্রমে বাক্ নিরুদ্ধ হইল। অনন্তশয্যায় শায়িত মহাপুরুষ বিকচকমলসদৃশ চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাভূমি সন্দর্শন করিতে করিতে ২১শে জুলাই, শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটের সময় মায়ার জগৎ হইতে বিদায় লইলেন। সমস্ত রাত্রি ভজন-কীর্তনে অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রাতে সেই পূতদেহ পুষ্পমাল্যে সজ্জিত হইয়া মণিকর্ণিকার পুণ্যতোয়া জাহ্নবী-সলিলে বিসর্জিত হইল।

স্বামী অদ্বৈতানন্দ

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ অধিক বয়সে ঠাকুরের নিকট আসেন। ত্যাগী ভক্তদের মধ্যে তিনিই ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ; এমন কি, ঠাকুরের অপেক্ষাও তিনি কয়েক বৎসরের বড় ছিলেন। এই জন্য এবং ঐ নামীয় অপরের সহিত পার্থক্যরক্ষার জন্য ঠাকুর তাঁহাকে 'বুড়ো গোপাল' বা 'মুরুব্বি' আখ্যা দিয়াছিলেন; আর ভক্ত-মহলে তাঁহার নাম ছিল 'গোপাল-দাদা' বা 'গোপাল-দা'। সন্ন্যাসের পর তাঁহার নাম হয় স্বামী অদ্বৈতানন্দ; কিন্তু সে নাম তত প্রচলিত ছিল না।

ঠাকুরের নিকট আগমনের পূর্বে গোপাল-দার স্ত্রীবিয়োগ হয়। সেই দারুণ শোকে পতিত গোপাল-দা প্রথম জানিতে পারেন সংসার কত অনিত্য। সেই বৈরাগ্যের ফলে তাঁহার মন এক সংসারাতীত নিত্যসত্যের অন্বেষণে ফিরিতে লাগিল। ঐ সময় তাঁহার বন্ধু সিঁথিনিবাসী শ্রীযুত মহেন্দ্র কবিরাজ দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। তিনি গোপাল-দাকে তদবস্থ দেখিয়া ঠাকুরের কথা শুনাইলেন। অতঃপর

"গোপাল বিশ্বাস-সহ আইলা দেখিতে।
শান্তিদাতা রামকৃষ্ণে মহেন্দ্রের সাথে॥ (পুঁথি)।[১]

কবিরাজ মহেন্দ্র পালের সহিত এই প্রথম দর্শনকালে কিন্তু গোপাল-দা স্বীয় শোকনাশ-বিষয়ে আশার আলোক পাইলেন না; অতএব সেদিন

১ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি', পৃঃ ৪৩০। তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাগমনের কাল অনিশ্চিত। ইহারও পূর্বে সম্ভবতঃ সিঁথিতে প্রথম দর্শন হইয়া থাকিবে। 'কথামৃত', ১ম ভাগ, ৬ পৃষ্ঠায় আছে যে, প্রথম দর্শন হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে।

স্বামী অদ্বৈতানন্দ

ঠাকুরের উপর তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধাও জন্মিল না—মনে করিলেন, ইনি সাধারণ সাধুদেরই মত একজন। কিন্তু বন্ধু ছাড়িলেন না, আর গোপাল-দার অশান্ত মনও এই হতাশাকে চরম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। বন্ধুর যুক্তিগুলিও নেহাৎ অসার ছিল না—মহাপুরুষকে কি একদিনে চিনিতে পারা যায়? ভিতরের সন্ধান পাইতে হইলে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে হয়। সুতরাং গোপাল-দা পুনর্বার বন্ধুসহ দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন।

আত্মীয়বিয়োগের ক্ষত কত গভীর তাহা বিষাদগ্রস্ত ব্যক্তিও প্রথমে ধারণা করিতে পারেন না; কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসক যখন তাঁহাকে ক্রমে সুস্থ করিয়া তুলেন, তখন তাঁহার বুঝিতে বাকী থাকে না যে, এতাদৃশ সুচিকিৎসক ভিন্ন ঈদৃশ রোগের উপশম সুদূরপরাহত। দ্বিতীয়বার শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসিয়া গোপাল-দা তাঁহার ভালবাসায় বাঁধা পড়িলেন এবং উহাই ক্রমে নিবিড়তর হইয়া তাঁহার সমস্ত সংসারবন্ধন দূর করিয়া দিল। ঠাকুরকে পাইলেন তিনি তাঁহার ব্যথার ব্যথিরূপে; আর তাঁহার মুখে অবিরাম ভাগবতী কথা শুনিয়া ও বৈরাগ্যের অনুপ্রেরণা পাইয়া তিনি জানিলেন যে, এই সংসাররূপ মায়ামরীচিকায় মুগ্ধ জীবের পক্ষে বৈরাগ্যই একমাত্র মহৌষধ। সংসারের সকল সম্বন্ধই মায়িক; কেবল শ্রীগুরুর যে চরণস্পর্শ মানবকে এই ক্ষণ-ভঙ্গুর সংসারের অতীতে লইয়া যায়, উহাই জীবনের একমাত্র ভরসা। গোপাল-দা এখন হইতে সর্বতোভাবে শ্রীরামকৃষ্ণেরই আশ্রয় লইলেন। ইহাতে ঠাকুরের মহিমার যেমন পরিচয় পাই, গোপাল-দার শুদ্ধসত্ত্ব ভাবেরও তেমনি আশ্চর্য প্রমাণ পাই। কারণ স্ত্রীবিয়োগ অনেকেরই হয়; কিন্তু উহার ফলে গুরুর সান্নিধ্যলাভ ও সংসার ত্যাগ করিয়া ভগবানের জন্য উন্মত্ত হওয়া বড়ই বিরল। তবে ইহাও সত্য যে, উপযুক্তকালে বাহিরের পরিবেশ ও মানসিক অবস্থার সামঞ্জস্য না ঘটিলে তাদৃশ নবজীবন-লাভ সম্ভব হয় না। গোপাল দার জীবনে তাহাও ঘটিয়াছিল।

গোপাল-দার পিতার নাম শ্রীগোবর্ধন ঘোষ। তাঁহারা জাতিতে সদ্গোপ এবং তাঁহাদের পৈতৃক ভিটা চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত জগদ্দল (রাজপুর) গ্রামে। সম্ভবতঃ ইং ১৮২৮-এর এক শুভদিনে ঐ গ্রামে গোপাল-দার জন্ম হয়।[২] কিন্তু তিনি প্রায়শঃ কলিকাতার উত্তরে সিঁথিতে বাস করিতেন এবং সিঁথির বেণীমাধব পালের চিনাবাজারে বুরুশ, ম্যাটিং, খড়্‌রা, পাপোষ ইত্যাদির একটি দোকানে কাজ করিতেন। বেণীপাল ব্রাহ্ম ভক্ত হইলেও শরৎ ও বসন্তকালের উৎসবাদিতে মধ্যে মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে আপন ভবনে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে আত্মসমর্পণের পূর্বে এই বাটীতে গোপাল-দা একবার তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলেন; কিন্তু উহা প্রাণের নিরীক্ষণ নহে—চক্ষের দর্শন অথবা ঔৎসুক্যের উদাস ঈক্ষণ মাত্র। উহা গোপাল-দার চিত্তে বৈরাগ্যের আকাঙ্ক্ষা জাগায় নাই বা ভগবান্‌লাভের জন্য কোনও গভীর উদ্দীপনার সঞ্চার করে নাই। তবে তিনি সেই দিনই চিনিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যসত্যই ভগবৎ-প্রেমিক।

যাহা হউক, ঠাকুরের সহিত গোপাল-দার পরিচয় ক্রমে গভীর শ্রদ্ধাভক্তিতে পরিণত হইল এবং উহা পরিপূর্ণাবস্থায় গোপাল-দাকে গৃহ হইতে টানিয়া আনিয়া লাটুর সহযোগে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ও শ্রীশ্রীমায়ের সেবায় নিযুক্ত করিল। শ্রীপ্রভুর সহিত তাঁহার সে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আংশিক বিবরণ সংগ্রহ করাও বর্তমানে অসম্ভব। বিচ্ছিন্নভাবে যতটুকু সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহা হইতেই উহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় মাত্র।

---

২ 'পুঁথি'তে শুর উপাধির উল্লেখ থাকিলেও বেলুড় মঠের ট্রাস্ট-ডিড্‌ দৃষ্টে আমরা ঘোষ উপাধিই গ্রহণ করিলাম। পুঁথিতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, গোপাল-দার নিজস্ব কাগজের দোকান ছিল। তাঁহার জন্মতারিখ অজ্ঞাত, তবে বেলুড় মঠে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা বা অঘোর চতুর্দশীতে জন্মতিথি প্রতিপালিত হয়।

গোপাল-দার বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট দীক্ষা লইবেন ; কিন্তু ঠাকুর কখনও সাধারণ অর্থে গুরুগিরি করিতেন না বলিয়া গোপাল-দা একটা অভাব বোধ করিতেছিলেন। অথচ সকলের সম্মুখে এইরূপ অনুরোধ জানাইতেও পারিতেন না। তাই এক দ্বিপ্রহরে আহারের পূর্বে ঠাকুরকে একাকী বাগানে ভ্রমণরত দেখিয়া গোপাল-দা তাঁহার শ্রীচরণে মনের ইচ্ছা নিবেদন করিলেন। দূর হইতে লাটু লক্ষ্য করিলেন, গোপাল-দা নতজানু হইয়া রহিয়াছেন এবং ঠাকুরের চরণ ধরিয়া খুব কাঁদিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন—তখনও গোপাল-দার চক্ষে জল। অতঃপর কি হইল লাটু জানেন না ; কিন্তু ইহার পর হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় গোপাল-দাকে বিষ্ণু-মন্দিরে কীর্তন করিতে দেখা যাইত। ইহা সম্ভবতঃ ১৮৮৫ অব্দের কথা।

আর একদিন দুই সেবককে লইয়া ঠাকুর একটু কৌতুক করিয়াছিলেন। ঠাকুর কথায় কথায় লাটুকে বলিলেন, "এখানকার কথা মানতে হবে।" সরল লাটু অমনি কহিলেন, "এখানকার কথা তো আমি জানি না। আপনি আমাকে এখানকার কথা বুঝিয়ে দিন।" অমনি ঠাকুর গোপালকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো গোপাল, শোনো লেটো কি বলে। বলে, 'এখানকার কথা বুঝিয়ে দিন।' এখানকার কথা কি বোঝানো যায় ? তুমিই বল তো, বাপু ? এ কেমন আবদার !" গোপাল-দা উত্তর দিলেন, "আপনার তো জানা আছে, বলে দিন না।" মধ্যস্থকে বিপক্ষে যোগ দিতে দেখিয়া ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "ওগো, তোমার এ কি রকম কথা ! এখানকার কথা কি জানিয়ে দিতে আছে ?" মধ্যস্থ বলিলেন, "এখানকার কথা শুনবার জন্যই তো আমরা সব এসেছি। আমাদের না বললে আমরা জানব কেমন করে ?" হার মানিয়া ঠাকুর স্মিতহাস্যে বলিলেন, "এখন নয়, এখন নয় ; এখানকার কথা এখন নয়। সময় হলে একদিন তোমরা সব বুঝবে।"

'কথামৃত'-পাঠে জানা যায় যে, করুণানিধান ঠাকুর একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই গোপাল-দাকে কৃপা করিয়াছিলেন। সেদিন (১৮৮৫ খ্রীঃ, ১১ই ডিসেম্বর) কাশীপুরে প্রেমের ছড়াছড়ি—নিরঞ্জন ও কালীপদকে ঠাকুর কৃপা করিলেন; পরে দুইটি ভক্তমহিলাও কৃপালাভ করিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। ঠাকুর অতঃপর গোপাল-দাকে ডাকাইয়া আনিয়া কৃপা করিলেন।

ঠাকুরের সেবা করিয়া ও উপদেশ শুনিয়া গোপাল-দা নিজেকে চরিতার্থ মনে করিলেও তাঁহার বৈরাগ্যপূর্ণ মন স্বতঃই সাধনার জন্য ব্যাকুল হইত। সেই প্রেরণায় তিনি কখন কখনও নরেন্দ্রাদির সহিত কাশীপুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ধ্যানজপ ও তপশ্চর্যা করিতেন। দক্ষিণেশ্বরে থাকা কালে (১৮৮৪ খ্রীঃ, ৫ই এপ্রিল) একবার তাঁহার মনে তীর্থভ্রমণের ইচ্ছা জাগিয়াছিল। ঠাকুর যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি এখন ইচ্ছা তীর্থে যাওয়া?" গোপাল-দা উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে হাঁ। একটু ঘুরে-ঘেরে আসি।" ঠাকুর তখন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, "যতক্ষণ বোধ যে, ঈশ্বর সেথা সেথা, ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন হেথা হেথা, তখনই জ্ঞান।" তিনি আরও বলিলেন, "যা চায়, তা কাছেই; অথচ লোকে নানা স্থানে ঘোরে।" সেইবারেই গোপাল-দার তীর্থভ্রমণ হইয়াছিল কি-না জানা নাই; কিন্তু ইহা সত্য যে, কাশীপুরে থাকাকালে (১৮৮৬) তিনি একবার তীর্থদর্শনে গিয়াছিলেন। অতঃপর কলিকাতায় সমবেত গঙ্গাসাগর-যাত্রী সাধুদিগকে গেরুয়াবস্ত্র, রুদ্রাক্ষের মালা ও চন্দন দিতে চাহিলে ঠাকুর নির্দেশ দিলেন যে, উহা ত্যাগী ভক্তদিগকে দান করিলেই উত্তম হইবে; কারণ ইঁহাদের অপেক্ষা উচ্চ স্তরের সাধু আবার কোথায় পাওয়া যাইবে? গোপাল-দা ঠাকুরের কথায় সম্মত হইয়া দ্বাদশখানি গেরুয়াবস্ত্র ও সমসংখ্যক রুদ্রাক্ষের মালাদি ঠাকুরের হস্তে অর্পণ করিলে ঠাকুর উহা

নরেন্দ্রাদি-ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করিলেন। রামকৃষ্ণসঙ্ঘে উহা এক স্মরণীয় ঘটনা; কারণ ঐ অনুষ্ঠানের মধ্যেই ভাবী ত্যাগি-সঙ্ঘের অমোঘ বীজ নিহিত ছিল। সেই ত্যাগীদের নাম নরেন্দ্র, রাখাল, যোগীন্দ্র, বাবুরাম, নিরঞ্জন, তারক, শরৎ, শশী, গোপাল, কালী ও লাটু। উদ্বৃত্ত গেরুয়াখানি পরে গিরিশচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৩]

গোপালা-দা নিজে খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতেন এবং অপরের জিনিস-পত্র পরিপাটি দেখিলে আনন্দ প্রকাশ করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবদ্ভাবে বিভোর থাকিলেও ব্যাবহারিক জীবনে তাঁহার প্রতিকার্যে সুশৃঙ্খলা লক্ষিত হইত। তাই তিনি গোপাল-দার সেবা পছন্দ করিতেন। গোপাল-দার সেবার দৃষ্টান্ত অতি অল্পই রক্ষিত হইয়াছে। তবে আমরা জানি যে, কাশীপুরে ঠাকুরকে ঔষধ খাওয়াইবার ভার ছিল গোপাল-দার উপর। কিন্তু তখন দিবারাত্র একটানা পরিশ্রম চলিয়াছে। একদিন ঔষধ দিবার সময় অতীত হইয়া যাইতেছে দেখিয়া ঠাকুর হাত নাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই বুড়ো লোকটা কোথায়?" গোপাল-দা ঘুমাইতেছেন শুনিয়া ঠাকুর খুব আনন্দসহকারে অপর একজনকে বলিলেন, "আহা, কত রাত জেগেছে! একটু ঘুমুক—তাকে আর জাগিও না। তুমি বরং ওযুধটা ঢেলে দাও।" ঠাকুর জানিতেন, সেই গুছানো বৃদ্ধ-লোকটির এই অনুপস্থিতি স্বেচ্ছাকৃত নহে—প্রকৃতির বিধানে ক্লান্ত শরীরের ইহা অনিচ্ছাকৃত অপারগতা। শ্রীশ্রীমা গোপাল-দার সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে কথা বলিতেন; অতএব গোপাল-দা ডাক্তারের নিকট বিশেষ পথ্য প্রস্তুতের প্রণালী শিখিয়া উহা যথাসময়ে তাঁহাকে শিখাইয়া দিতেন।

গোপাল-দা নিম-জল দিয়া ঠাকুরের গলার ক্ষত পরিষ্কার করিয়া দিতেন

৩ 'পুঁথি'র (৬২০ পৃঃ) মতে দেহত্যাগের পূর্বে ঠাকুর এই একাদশ জনকে অন্যভাবেও সন্ন্যাস দিয়াছিলেন।

একদিন ঐরূপ করিতেছেন এমন সময় ঠাকুর "উঃ! উঃ" করিয়া উঠিলেন। ঠাকুরের কষ্ট দেখিয়া গোপাল-দার নিজেরও কষ্ট হইল এবং বলিলেন, "থাক্, আর ধোয়াব না।" ঠাকুর কিন্তু বলিলেন, "না না, তুমি ধুইয়ে দাও। এই দেখ, আমার আর কোন কষ্ট হচ্ছে না।" এই বলিয়া তিনি দেহ হইতে নিজের মন উঠাইয়া লইলেন এবং ইহার পর মুখে কোন শব্দ উঠিল না বা কোন মুখবিকৃতিও দেখা গেল না। স্বেচ্ছায় ধৃতবিগ্রহ অবতারপুরুষে কি না সম্ভবে?

গৃহহীন ও আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন গোপাল-দার অবলম্বন তখন একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ও তদীয় সেবক ও ভক্তবৃন্দ। তাঁহার সুখ দুঃখ সহানুভূতি তখন গুরুভ্রাতাদেরই সহিত বিজড়িত এবং তাঁহার আবেদনস্থল শ্রীগুরুর পাদপদ্ম। কাশীপুরে নরেন্দ্রনাথ একবার নির্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন হইলে তাঁহার দেহে মৃতের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। অমনি কিংকর্তব্য-বিমূঢ় গোপাল-দা ব্যস্তসমস্ত হইয়া ঠাকুরের নিকট ছুটিয়া গিয়া বলিলেন, "নরেন মরে গেছে।" ঠাকুর সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "বেশ হয়েছে। এখন ঐ ভাবে কিছুক্ষণ থাক। আমায় সমাধির জন্য বড় জ্বালিয়েছিল।" সেদিন নরেন্দ্রের বাহ্যজ্ঞানলাভের পরও দেহজ্ঞান ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছিল, তাই তিনি পার্শ্বস্থ ব্যক্তিদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন, "আমার দেহ কোথায়?"

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর গোপাল দার কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান রহিল না; সুতরাং বরাহনগরে মঠ স্থাপিত হইলে তিনি সেখানেই আসিলেন।[৪]

৪ বরাহনগর মঠে ত্যাগীদের যোগদানের ইতিবৃত্ত এবং তাঁহাদের সন্ন্যাসগ্রহণের পারম্পর্য সুপরিজ্ঞাত নহে। 'কথামৃতে'র মতানুসারে ১৮৮৭ খ্রীঃ, ২১শে ফেব্রুয়ারীর পূর্বেই নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, কালী, বাবুরাম, তারক, গোপাল-দা ও সারদার সন্ন্যাস হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু "যোগীন, লাটু শ্রীবৃন্দাবনে আছেন, তাঁহারা এখনও মঠ দেখেন নাই" (৪র্থ ভাগ, ৩৪২ পৃঃ)। তারক ও গোপাল-দাই সর্বপ্রথম মঠে যোগ

তবে তিনি সব সময়েই মঠে থাকিতেন না; অন্যান্য গুরুভ্রাতার ন্যায় প্রায়ই তীর্থদর্শনে যাইতেন বা তপস্যায় নিষ্ক্রান্ত হইতেন। ঐ কালের পূর্ণ ইতিহাস অজ্ঞাত। স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী (২০।৮।৮৮ তারিখ) হইতে পাই যে, ১৮৮৮ অব্দে গোপাল-দা ৺কেদার ও বদরিকাশ্রম দর্শন করেন এবং ঐ সময়ে গঙ্গাধর মহারাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। দীর্ঘকাল পরে গঙ্গাধর মহারাজ তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হন। ঐ তীর্থদর্শন হইতে ফিরিয়া গোপাল-দা কিছুকাল বৃন্দাবনে বাস করেন। ১৮৯০ ইং-তে মীরাটে পুনর্বার গঙ্গাধর মহারাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ে একসঙ্গে হরিদ্বার-কুম্ভে যান।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাশীতে বংশী দত্তের বাটীতে থাকিয়া যখন তপস্যা করিতেছিলেন, তখন কালীকৃষ্ণ (স্বামী বিরজানন্দ) মহারাজ কাশীধামে যাইয়া প্রমদাদাস বাবুর বাগানে স্বামী যোগানন্দ, অভেদানন্দ ও সচ্চিদানন্দ প্রভৃতির সহিত মিলিত হন এবং পরে স্বামী অদ্বৈতানন্দ ও সচ্চিদানন্দের সহিত পঞ্চকোশীভ্রমণে নির্গত হন। ইহাতে তাঁহাদের তিন দিন লাগিয়াছিল।

ইং ১৮৯৬ অব্দেও আমরা স্বামী অদ্বৈতানন্দকে ৺কাশীধামে বংশী দত্তের বাটীতে কঠোর তপস্যায় নিরত দেখিতে পাই। তাঁহার সহিত বাসের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল এমন এক ব্যক্তি বলেন যে, সেখানে প্রাত্যহিক সাধনা ও জীবনপ্রণালীতে তাঁহার চিরাচরিত নিয়মানুবর্তিতা ও সুশৃঙ্খলা

দেন। "কুমারবৈরাগ্যবান ভক্তেরা যাতায়াত করিতে করিতে আর বাড়িতে ফিরিলেন না। নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, বাবুরাম, শরৎ, শশী, কালী রহিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে সুবোধ ও প্রসন্ন (সারদা) আসিলেন। যোগীন ও লাটু বৃন্দাবনে ছিলেন; এক বৎসর পরে আসিয়া জুটিলেন। গঙ্গাধর সর্বদাই মঠে যাতায়াত করিতেন। ... তিব্বত হইতে ফিরিবার পর তিনি মঠে রহিয়া গিয়াছিলেন। ... হরি... মঠের ভাইদের সর্বদা দর্শন করিতে আসিতেন। ...পরে মঠে থাকিয়া যান।" (ঐ, ৩য় ভাগ, ৩২০-৩২১ পৃঃ; ঐ, ২য় ভাগ, ২৮৫-২৮৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। প্রথম দল সন্ন্যাস গ্রহণ করেন আঁটপুর হইতে ফিরিবার পর (১৮৮৭-এর জানুয়ারীর শেষে) মাঘের প্রারম্ভে।

প্রখরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সব কার্যে তিনি যেন ঘড়ির মত চলিতেন। প্রচণ্ড শীতের সময়েও তিনি অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানান্তে শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে কম্পিতকলেবরে বাসস্থলে ফিরিতেন। মাসের পর মাস এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি মাধুকরীর দ্বারা যাহা পাইতেন তাহাতেই গ্রাসাচ্ছাদন হইত। এক শিবমন্দিরের পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তিনি বাস করিতেন। ঐ কক্ষটি এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিত যে, লোকে দেখিয়া অবাক হইত। ব্যবহার্য সামগ্রী বিশেষ কিছুই ছিল না—দুই-এক খানি পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, সমস্তই অতি পরিপাটীভাবে রক্ষিত হইত। শরীরধারণের জন্য এই সব আবশ্যকীয় বিষয়ে ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ সম্বন্ধশূন্য হইয়া তখন তিনি সাধনভজনেই মগ্ন থাকিতেন। বস্তুতঃ জীবনের একমাত্র কর্তব্য সাধনের অনুকূল হইবে বলিয়াই তাঁহার বাহ্যিক ব্যবহারে সর্বত্র তাদৃশ একটা নিখুঁত ভাব প্রকাশ পাইত।

ইহারই একসময়ে পায়ে কাঁটা ফুটিয়া তিনি বিশেষ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত প্রমদাদাস বাবুকে লিখিত স্বামী শিবানন্দের (১৩।৮।৯৬ তারিখের) পত্রে জানিতে পারা যায়—"আমাদের বৃদ্ধ স্বামী, যিনি ৺বারাণসী-পুরী সেবা করিতেছেন, তাঁহার পায়ে একটি কণ্টক বিদ্ধ হইয়া বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন, লিখিয়াছেন। দুই বার অস্ত্র করিতে হইয়াছে—উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার সংবাদ লইবেন এবং কোনরূপ সাহায্য করিতে ত্রুটি করিবেন না। পত্রপাঠমাত্রেই সংবাদ লইবেন। তিনি কুচবিহারের ৺কালীবাড়ির পশ্চাদ্ভাগে বাবু সাগরচন্দ্র সুরের বাটীতে আছেন। বড়ই কষ্ট পাইতেছেন।" যাহা হউক, সেবারে সকলের বিশেষ যত্নে গোপাল-দা শীঘ্রই সারিয়া উঠিয়া পুনর্বার কাশীধামেই তপস্যায় মগ্ন হইলেন।

এদিকে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য-বিজয়ান্তে মঠে প্রত্যাবর্তনপূর্বক গুরুভ্রাতাদিগের সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। স্বামী অদ্বৈতানন্দ যদিও সুদীর্ঘকাল কাশীতেই তপো-নিরত ছিলেন এবং তখনই ঐ স্থানত্যাগের কোনও সঙ্কল্প পোষণ করিতেন না, তথাপি স্বামীজীর সপ্রেম আহ্বানে অচিরে আলমবাজারের মঠে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজীর প্রতি তাঁহার আনুগত্য এতই প্রবল ছিল যে, তিনি তাঁহার আদেশে বৃদ্ধ বয়সে 'লঘুকৌমুদী' পড়িতে আরম্ভ করেন। তখন সবেমাত্র নূতন মঠনির্মাণের জন্য বেলুড়ে গঙ্গাতীরে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করা হইয়াছে। অতঃপর গৃহনির্মাণাদি-কার্যের তত্ত্বাবধানের সুবিধা হইবে মনে করিয়া (১৮৯৮-এর প্রথম ভাগে) মঠ আলমবাজার হইতে বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানে উঠাইয়া আনা হইলে তপস্বী বৃদ্ধ গোপাল-দার শেষ অক্লান্ত কর্মজীবন আরম্ভ হইল। নবসংগৃহীত ভূমিতে পূর্বে নৌকা ও জাহাজ-সংস্কার হইত বলিয়া উহা তখন বড়ই বন্ধুর ছিল এবং গৃহনির্মাণ করিয়া বাস করার অনুপযুক্ত ছিল। স্বামী অদ্বৈতানন্দের প্রথম কর্তব্য হইল, শ্রমিকদের সাহায্যে ভূমি সমতল করা। তপস্বী সাধকগণ এরূপ কার্যে সাধারণতঃ অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং অপারগও হন। গোপাল-দা কিন্তু এই কর্মকে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারের ভিত্তি ও তপস্যারূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই ইহাতে তাঁহার একান্ত মনোনিবেশ দেখিয়াও আশ্চর্যবোধ হয় না। দ্বিপ্রহরে মঠে আহার কবিতে গেলে যাতায়াতে অনেকটা সময় নষ্ট হয় দেখিয়া তিনি কার্যস্থলেই খাবার আনাইয়া খাইতেন। এইরূপে তাঁহার একনিষ্ঠ পরিশ্রমের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রথম স্থায়ী মঠ গড়িয়া উঠিয়াছিল।

অবশেষে মঠের নূতন বাটীর কার্য শেষ হইলে তিনি তাহাতেই বাস করিতে থাকিলেন। ঐ সময়ে মঠের আভ্যন্তর অনেক কার্যের তত্ত্বাবধান তাঁহাকেই করিতে হইত। তবে তাঁহার প্রধান কর্মক্ষেত্র

ছিল সবজি-বাগান। মঠ নির্মিত হইলেও দৈনন্দিন অভাব তখন যথেষ্টই ছিল ; সুতরাং খাদ্যোৎপাদনও একান্ত প্রয়োজন ছিল। এই সম্বন্ধে লাটু মহারাজ এক সময় বলিয়াছিলেন, "আরে, বুড়ো গোপাল-দা না থাকলে মঠের ব্রহ্মচারীদের ভাতের উপর তরকারি জুটত না। সবজি-বাগান করতে বুড়ো গোপাল-দাকে কতই না খাটতে হয়েছে !"

শ্রীশ্রীমাও একবার গোপাল-দার এই আন্তরিকতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। সেদিন কলিকাতায় শ্রীশ্রীমাকে দেখিতে গিয়া গোপাল-দা কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন যে, তাঁহার শরীর বাতগ্রস্ত হইলেও তিনি মঠের প্রয়োজন-বোধে বাগানে খুব খাটেন ; মঠের জমিতে যা কিছু হওয়া সম্ভব—ঢেঁড়স, বেগুন, কাঁচকলা—সবই করিয়াছেন ; অতএব তরকারি আর বড় একটা কিনিতে হয় না ; অধিকন্তু শ্রীশ্রীমাকে মাঝে মাঝে কিছু কিছু পাঠাইয়া দেন ; অথচ নূতন ধারায় লালিত ও শিক্ষিত নবাগত ব্রহ্মচারীরা এ সবের মর্যাদা বা প্রয়োজন না বুঝিয়া প্রায় নিশ্চেষ্ট থাকেন। সব শুনিয়া মা বলিলেন, "হ্যাঁ, বাবা, তুমি সেকেলে লোক—তুমি তো আর ছেলেদের মত থাকতে পারবে না। মঠও তো একটা সংসার, খাওয়া-দাওয়া তো আছে—তুমি থাকতে পারবে কেন ? তাই দেখে থাক।"

মঠের দৈনন্দিন কার্যপরিচালনার দায়িত্ব ঐ সময়ে প্রধানতঃ স্বামী প্রেমানন্দের উপর ন্যস্ত ছিল। স্বামী অদ্বৈতানন্দ তাঁহাকে সর্বকার্যে যথাসম্ভব সাহায্য করিতেন এবং বাবুরাম মহারাজ অনুপস্থিত থাকিলে স্বহস্তে ঠাকুরপূজা করিতেন। পূজা তিনি অতি নিষ্ঠাসহকারেই করিতেন। একটি ঘটনায় তাঁহার মনোভাব সুন্দর ধরিতে পারা যায়। একদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দ জনৈক পূজারীকে সাবধান করিয়া দিতেছিলেন, "ঠাকুরের ভোগ, নৈবেদ্যাদি খুব সাবধানে রেখো।" শুনিয়াই গোপাল-দা উহার সমর্থনে কহিলেন যে, কাশীপুরে তিনি একদিন অনবধানতাবশতঃ ঠাকুরের

আহার্যের উপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলে ঠাকুর আর উহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই—সরাইয়া লইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তদবধি গোপাল-দা ঐ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ছিলেন।

সাধারণ বাঙ্গালীর তুলনায় গোপাল-দার বয়স তখন খুবই হইয়াছে; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার সঙ্ঘের সেবাজ্ঞানে তখনও তাঁহার দেহকে কেন্দ্র করিয়া অবিরাম কর্মের স্রোত চলিতেছে। সাধ্যানুযায়ী স্বীয় ক্ষীয়মাণ শক্তির সদ্ব্যবহারে তিনি কখনই কুণ্ঠিত ছিলেন না; আর সঙ্গে সঙ্গে ছিল তাঁহার স্বভাবোচিত সুশৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। তাঁহার যত্নে তখন মঠের বাগান পূজার ফুল এবং ভোগের ফল ও তরকারিতে পূর্ণ থাকিত। আর তাঁহার অন্যতম কর্ম ছিল গো-সেবা। সেখানেও তাঁহার অনিন্দনীয় পারিপাট্য আত্মপ্রকাশ করিত।

নবাগত ব্রহ্মচারীদিগকে তখন গোপাল-দার সহিত এই সকল কাজ করিতে হইত; কিন্তু আধুনিক স্কুল-কলেজ হইতে সদ্য-আগত এবং এই প্রকার কাজে ও পরিপাটীতে অনভ্যস্ত নবাগতরা তাঁহার সহিত সমতালে চলিতে পারিত না। ফলে গোপাল-দা সাতিশয় বিরক্ত হইতেন এবং সময়ে সময়ে ভর্ৎসনা করিতেন। কিন্তু একদিন ঠাকুর তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন, সর্বভূতে তিনিই বিদ্যমান। এই অনুভূতির পরে তাঁহার ঐ স্বভাবের পরিবর্তন হইল। তিনি বলিতেন, "সর্বভূতে তিনিই বিরাজমান; কাকে নিন্দা করি, আর কারই বা সমালোচনা করি?" ঠাকুরের সংসার, আর ইহারা ঠাকুরেরই সন্তান—এই মনোভাব লইয়াই তিনি বাকী কয়টা দিন কাটাইয়া গিয়াছিলেন।

ইহারই মধ্যে আবার রসিকতারও অভাব ছিল না। একসময়ে গোপাল-দা সবজি-বাগান ও অপর একজন সাধু ফুল-বাগান দেখিতেন। ফুলবাগানে সব ব্রহ্মচারীরা কাজ করিতেছে—তরকারি-বাগানের ব্যবস্থা

হইতেছে না দেখিয়া গোপাল-দা বলিলেন, "আহা, নূতন ছেলেদের অত খাটাতে নেই—ফুল-বাগানের মাটি বড় শক্ত। ওরে ছেলেরা, তোরা এখানে এসে কাজ কর—এই মাটি নরম।" উপস্থিত সকলেই জানিতেন যে, বস্তুতঃ সবজি-বাগানের কাজ অনেক অধিক শ্রমসাধ্য। সুতরাং এরূপ মন্তব্যে হাস্যেরই উদ্রেক হইল। প্রাচীনভাবে ভাবিত বুড়োমানুষ গোপাল-দার চা-এর সম্বন্ধে অদ্ভুত বিরুদ্ধ ধারণা ছিল। তিনি চা পান করিতেন না এবং অপরকেও পান করিতে নিষেধ করিতেন। ইহা লইয়া অনেক ক্ষেত্রে বেশ রসিকতা জমিয়া উঠিত। গোপাল-দা একবার একজনকে বলিলেন, "ওরে, চা খাস নি, খাস নি—রক্ত হেগে মরবি।" সম্বোধিত ব্যক্তি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "গোপাল-দা, যত ফোঁটা চা, তত ফোঁটা রক্ত।" গোপাল-দাও তখন ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন, "খুব খা, খুব খা।" অমনি হাসির রোল পড়িয়া গেল।

বয়স তাঁহার বেশী ছিল; সেই জন্য জনসাধারণের কল্যাণার্থে অনুষ্ঠিত সমস্যাবহুল সেবাদি-কার্যে তিনি যোগ দিতেন না। ফলতঃ বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁহার জীবন ঘটনাবহুল ছিল না। কিন্তু যতদিন দেহে প্রাণ ছিল, ততদিন তাঁহার চিত্তে ঠাকুরের আদর্শে জীবন পরিচালিত করিবার এক আকুল প্রচেষ্টা ছিল। ইহাতে যদিও তিনি কল্পনাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি সেই আদর্শকে আরও নিকটে পাইবার জন্য সাধকোচিত অতৃপ্তি ও আক্ষেপ তাঁহার জীবনকে বড়ই মধুর ও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিত। গীতাপাঠ তিনি খুব ভালবাসিতেন এবং নিয়মিত পাঠের জন্য স্বীয় সুন্দর হস্তাক্ষরে পঞ্চগীতা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সত্যের প্রতি তাঁহার ছিল অগাধ শ্রদ্ধা—আর ইহা তিনি অনেকটা ঠাকুরের নিকটই শিক্ষা করিয়াছিলেন। পেটের অসুখের জন্য একবার জনৈক কবিরাজ ঠাকুরকে তিনটি লেবু খাইতে বলেন। ঠাকুর গোপাল-দাকে উহা সংগ্রহ করিতে বলিলে তিনি অনেকগুলি

লেবু আনিয়া হাজির করিলেন। সত্যের জীবন্ত বিগ্রহ ঠাকুর কিন্তু তিনটি মাত্র লেবু রাখিয়া বাকী সব ফিরাইয়া দিলেন। গোপাল-দা চাক্ষুষ দেখিতে পাইলেন, তিনি যাঁহাকে জীবনের ধ্রুবতারারূপে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কথা ও কার্যের মধ্যে বিন্দুমাত্র অসামঞ্জস্য নাই। ইহা স্বতঃই তাঁহার মনে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর তিনি স্বয়ং যেমন সত্যনিষ্ঠ ছিলেন, মঠের ব্রহ্মচারীদিগকেও তেমনি সত্যপরায়ণ হইতে বলিতেন এবং ঐ বিষয়ে উৎসাহ দিতেন।

তাঁহার তীর্থভ্রমণের কিঞ্চিৎ উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি। শরীর বৃদ্ধ হইলেও মন ছিল তাঁহার অদম্য উৎসাহে পরিপূর্ণ। সেই মনোবলে তিনি ৺কেদারনাথ হইতে কন্যাকুমারী এবং দ্বারকা হইতে কামাখ্যা পর্যন্ত প্রধান তীর্থগুলি দর্শন করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি শ্রীশ্রীমাকে লইয়া গয়াধামে যান। ১৮৯০-৯১-এর শীতকালে তিনি হরিদ্বারে কুম্ভোপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। কোন্নগরের নবাইচৈতন্য বাবুর সহিত তিনি ১৮৯৭-এর নভেম্বরে রায়পুরে পৌঁছেন এবং পরে দাক্ষিণাত্যভ্রমণে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ১৮৯৮-এর ২৩শে মার্চ স্বামী সুবোধানন্দ ও নির্মলানন্দের সহিত মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৯৯-এর শেষে তিনি দার্জিলিং-এ যান এবং ৫ই নভেম্বর মঠে ফিরিয়া আসেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজীর ভারত-প্রত্যাগমনের কয়েক দিন পরে অদ্বৈতানন্দজী জন কয়েক গুজরাটী ভদ্রলোকের সহিত দ্বারকায় যান এবং পরবৎসর ৭ই ফেব্রুয়ারী মঠে উপস্থিত হন।

শেষবয়স পর্যন্ত সামান্য ব্যায়ামাদি-সহায়ে তাঁহার স্বাস্থ্য মোটের উপর ভালই ছিল বলিতে হইবে। অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা তাঁহার মনঃপূত ছিল না এবং ভগবানও তাঁহাকে সেইরূপ অবস্থায় খুব কমই ফেলিয়াছিলেন। স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কেহ সেবা করিতে অগ্রসর হইলেও স্বাবলম্বী গোপাল-দা

তাহাকে নিবৃত্ত করিতেন—নিজের সমস্ত নিজেই করিতেন এবং উহাতেই ছিল তাঁহার তৃপ্তি। সঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং বাঁয়া-তবলায় হাত খুব মিষ্ট ছিল।

দেহত্যাগের কিছু পূর্বে তিনি পেটের অসুখে ভুগিতেছিলেন। ইহার প্রতিকারকল্পে তিনি প্রত্যহ একটু ব্যায়াম করিতেন। কিন্তু এই ভাবে জরাজীর্ণ শরীরকে ধরিয়া রাখা কষ্টকর হওয়ায় এবং প্রতিকারের চেষ্টা-সত্ত্বেও রোগের বৃদ্ধি হইতে থাকায় একদিন তিনি ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যুক্তকরে কাতরকণ্ঠে নিবেদন করিলেন, "প্রভু, আমায় এই কষ্ট থেকে মুক্তি দাও।" ঠাকুর সে প্রার্থনা শুনিলেন, মুক্তি তাঁহার শীঘ্রই আসিল।

শোনা যায় যে, অন্তিম অসুখের সময় তাঁহার এক অলৌকিক দর্শনলাভ হয়। তিনি দেখিলেন, ঠাকুর গদাহস্তে সম্মুখে উপস্থিত। গদা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত গোপাল-দা ঠাকুরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "আমি এবারে গদাধররূপে আবির্ভূত।" ঠাকুরের আগমনে সর্বপ্রকার বিবাদ-বিচ্ছেদ দূরীকৃত হইবে—ঠাকুর কি গদাধরমূর্তিতে সেদিন এই ইঙ্গিতই করিয়াছিলেন? মনে রাখিতে হইবে—ঠাকুরের পিতৃদত্ত নাম ছিল গদাধর। কে জানে, অবতারপুরুষের সর্বপ্রকার সার্থক ক্রিয়াকলাপ ও নামাদির পশ্চাতে কোথায় কোন্ অর্থ লুক্কায়িত থাকে?

অবশেষে শেষের দিন আগত। সেই দিনের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাণস্পর্শী বিবরণ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের একখানি পত্রে আছে—"২৮শে ডিসেম্বর (১৯০৯) মঙ্গলবার বেলা ৪॥ ঘটিকার সময় গোলাপ-দাদা স্বধামে গমন করেছেন।[৫] সামান্য জ্বর হয়েছিল মাত্র। কেহ ঠাওরাইতে

[৫] ১৩ই পৌষ, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, অপরাহ্ণ ৪টা ১৫ মিঃ বেলুড় মঠে দেহত্যাগ হয় ('উদ্বোধন')।

পারে নাই যে, এত শীঘ্র তিনি দেহরক্ষা করিবেন। শেষসময়ের মুখকান্তি অতি সুন্দর! শ্রীশ্রীপ্রভুর ভক্তের লীলাই এক আশ্চর্য। সে সময়ে মতি ডাক্তার উপস্থিত ছিল। লেবু দুধ খেলেন। মতিবাবুকে নমস্কার করে হাসিতে হাসিতে দেহত্যাগ!" একাশী বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বামী অদ্বৈতানন্দ মহারাজ বাঞ্ছিতধামে চলিয়া গেলেন; কিন্তু পশ্চাতে রাখিয়া গেলেন পরবর্তী সন্ন্যাসিসঙ্ঘের জন্য একখানি অনুকরণীয় আদর্শ জীবন।